এঙ্গেলস

অ্যান্টি - ড্যুরিং

হের
অয়গেন
ড্যুরিং-এর
বিজ্ঞানে বিপ্লব

মনীষা

বিষয়সুচি

তিনটি সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রথম ১
দ্বিতীয় ৫
তৃতীয় ১৪

ভূমিকা

১ সাধারণ প্রসঙ্গ ১৭
২ হের ড্যুরিং কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৩২

প্রথম খণ্ড। দর্শন

৩ শ্রেণীবিন্যাস। পূর্বসিদ্ধান্তবাদ ৪১
৪ বিশ্ব-প্রকল্পবাদ ৫০
৫ প্রাকৃতিক দর্শন ৫৭
৬ প্রাকৃতিক দর্শন। সৃষ্টিক্রম, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন ৭০
৭ প্রাকৃতিক দর্শন। জীবজগৎ ৮২
৮ প্রাকৃতিক দর্শন। জীবজগৎ (উপসংহার) ৯৪
৯ নৈতিকতা ও বিধি। শাশ্বত সত্য ১০৪
১০ নৈতিকতা ও নিয়মবিধি। সাম্য ১১৮
১১ নৈতিকতা ও নিয়মবিধি। স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা ১৩৩
১২ 'ডায়ালেকটিক্‌স'। পরিমাণ ও গুণ ১৪৮
১৩ ডায়ালেকটিক্‌স। নিরাকরণের নিরাকরণ ১৬১
১৪ উপসংহার ১৭৯

দ্বিতীয় খণ্ড। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

১ বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ১৮৫
২ বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব ২০০
৩ বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব (পরবর্তী অংশ) ২১০
৪ বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব (শেষ অংশ) ২২১
৫ মূল্য-মানের তত্ত্ব ২৩৪
৬ সরল ও মিশ্র শ্রম ২৪৯
৭ পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্য ২৫৬
৮ পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্য (শেষাংশ) ২৬৮
৯ অর্থনীতির প্রাকৃতিক সূত্রাবলি। জমির খাজনা ২৮০
১০ 'বিচারমূলক ইতিহাস' থেকে ২৮৯

তৃতীয় খণ্ড। সমাজবাদ

১ ঐতিহাসিক ভিত্তি ৩২৭
২ তত্ত্বগত ভিত্তি ৩৪২
৩ উৎপাদন ৩৬৬
৪ বণ্টন ৩৮৩
৫ রাষ্ট্র, পরিবার, শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪০১

পরিশিষ্ট

ডায়ালেকটিক্‌স প্রসঙ্গে ৪১৭
'অ্যাণ্টি-ড্যুরিং'-এর জন্যে এঙ্গেলসের প্রারম্ভিক লেখা ২৭
বস্তুগত কারণ থেকে উদ্ভূত পদাতিক বাহিনীর রণকৌশল ৫৮
'অ্যাণ্টি-ড্যুরিং'-এর নোট ৬৭
টীকা ৪৭৯
নাম-সূচী ৫১১

তিনটি সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রথম

'কোন অন্তরের তাগিদে' যে এই বইখানি লেখা হয়েছে, তা মোটেই নয়; বরং উল্টো। সমাজতন্ত্রে পারদর্শী আবার সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কারকরূপে হের ড্যুরিং যখন হঠাৎ তিন বছর আগে শতাব্দীর প্রতি তাঁর চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন, তখন জার্মানির বন্ধুরা বারবার আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি যেন তখনকার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র Volksstaat পত্রিকায় এই নতুন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের একটা বিচারমূলক বিশ্লেষণ করি।[১] পার্টি তখনও একেবারে নতুন এবং পার্টির মধ্যে তখন সবে মাত্র সুনির্দিষ্ট একতা অর্জিত হয়েছে; সেই পার্টির মধ্যে সংকীর্ণতাবাদী ভাঙন ও বিশৃংখলার একটা নতুন উপলক্ষ যাতে না দেখা দেয়, সেই জন্যই তাঁরা এই কাজটাকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। জার্মানির অবস্থা কি তা আমার চাইতে তাঁদের পক্ষেই আরও ভালোভাবে বিচার করা সম্ভব, সুতরাং কর্ত্তব্যের দিক থেকে তাঁদের মতামত গ্রহণ করতে আমি বাধ্য ছিলাম। তাছাড়া, বোঝাই যাচ্ছিল যে সমাজতন্ত্রী পত্রপত্রিকার এক অংশ এই নব দীক্ষিতকে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছেন; যদিও সে আন্তরিকতা শুধু ড্যুরিং-এর সুনামের দিকে তাকিয়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে ঠিক হের ড্যুরিংয়ের সুনামের জন্যেই পার্টির পত্রপত্রিকার ঐ অংশে এমন সদিচ্ছা বর্তমান ছিল যাতে তাঁর তত্ত্বটিকে যাচাই না করেই গ্রহণ করা যায়। তার ওপর এমন লোকও ছিলেন যাঁরা এই তত্ত্বটিকে জনবোধ্যরূপে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করার জন্যে তখনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর সর্বশেষে, হের ড্যুরিং ও তাঁর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি বিজ্ঞাপন ও ষড়যন্ত্রের সকল কৌশল প্রয়োগ করছিলেন যাতে Volksstaat পত্রিকা বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষিত এই নতুন নীতিটি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট মত দিতে বাধ্য হয়। তা সত্ত্বেও এক বছর কেটে যাওয়ার পরেই আমি মনস্থির করতে পারি যে অন্য কাজে গাফিলতি

করে এই টোকো আপেলেই দাঁত ফোটাবো। এ আপেল এমন যে একবার কামড়ালে পুরোটাই গলাধঃকরণ করতে হয়; তার ওপর আপেলটা শুধু টকই নয়, খুব বড়ও বটে। এক নতুন দার্শনিক প্রণালীর চূড়ান্ত ব্যবহারিক ফলরূপেই নতুন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বটিকে উপস্থিত করা হয়েছিল। সুতরাং প্রণালীটির সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারেই তত্ত্বটি যাচাই করা দরকার এবং সেজন্যে প্রণালীটিকেই যাচাই করা দরকার হল। হের ড্যুরিং যে বিরাট এলাকার মধ্যে পৃথিবীর সকল বস্তু এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তার পিছু পিছু সেই বিরাট এলাকায় প্রবেশ করা দরকার হল। Volksstaat-এর উত্তরসূরী 'লাইপ্‌ৎসিগ্‌ ফোরভার্ট'স' কাগজে ১৮৭৭ সালের গোড়া থেকে ধারাবাহিকভাবে যে-প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় তার উৎপত্তি ঐখানে। পরস্পর সংযুক্ত একটি সমগ্র বস্তুরূপে সেগুলি সেগুলির যোগসূত্র বজায় রেখে সামগ্রিকভাবে এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে।

সুতরাং এইভাবে ও বিষয়টির প্রকৃতির ফলেই সমালোচনা এত খুঁটিনাটিতে যেতে বাধ্য হল যা বিষয়টির অর্থাৎ হের ড্যুরিংয়ের রচনার বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর অনুপাতের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তবে আরও দুটি কথা বিবেচনা করলেও আলোচনার দৈর্ঘ্য ক্ষমা করা যেতে পারে। একদিকে, এখানে যে বিভিন্ন বিষয় ছুঁয়ে যেতে হবে, সেই প্রসঙ্গে এর থেকে আমি সুযোগ পেলাম যাতে সেইসব বিতর্কিত বিষয়ে সদর্থক ধরনে আমার মতামত প্রকাশ করতে পারি—যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখন যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক আগ্রহ রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এই কাজ করা হয়েছে, এবং যদিও হের ড্যুরিং-এর প্রণালীর বিকল্প আর একটি প্রণালী উপস্থিত করা কোনমতেই এই রচনার উদ্দেশ্য নয়, তা হলেও আমি যে বিভিন্ন মতামত উপস্থিত করেছি, তার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না বলে আশা করি। এরই মধ্যে আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেছি যে এদিক থেকে আমার রচনা একেবারে বিফলে যায়নি।

অপরপক্ষে সমসাময়িক জার্মানিতে প্রণালী-সৃষ্টিকারী হের ড্যুরিং কোন-মতেই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নন। কিছুদিন ধরে জার্মানিতে বিশ্বসৃষ্টিপ্রক্রিয়া, সাধারণভাবে প্রাকৃতিক দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা 'প্রণালী' ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি ডজন ডজনে গজিয়ে উঠছে। অতি নগণ্য doctor philosophiae থেকে ছাত্র পর্যন্ত একটা সম্পূর্ণ 'প্রণালীর' কম

কোন কিছুতে মাথা খাটাবে না। আধুনিক রাষ্ট্রে ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক নাগরিককে যে যে বিষয়ে ভোট দিতে ডাকা হয় সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার দক্ষতা তার আছে; অর্থনীতিতে ধরে নেওয়া হয়, প্রত্যেক পণ্যভোগী তার ভরণপোষণের জন্য যে যে পণ্য খরিদ করে, সেসব পণ্যের গুণাগুণ বিচারে সে যথেষ্ট পারদর্শী; ঠিক তেমনভাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এখন একইরকম কথা ধরে নিতে হবে। লোকে যেসব বিষয়ে পড়াশোনা করেনি সেইসব বিষয়েই লিখবে—বিজ্ঞানের স্বাধীনতা বলতে এই অর্থ ধরা হয় এবং নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রূপে এটিকেই হাজির করা হয়। যাই হোক জার্মানিতে এই যে অতি-প্রগলভ ছদ্মবিজ্ঞান সর্বত্র সামনে ঠেলে আসছে এবং কর্ণবিদারী গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যধ্বনিতে সবকিছু ডুবিয়ে দিচ্ছে, সেই ছদ্মবিজ্ঞানের অতিবিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত অন্যতম নিদর্শন হলেন হের ড্যুরিং। গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যধ্বনি কবিতায়, দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ইতিহাস রচনায়, গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যধ্বনি বক্তৃতা কক্ষে ও বক্তৃতা মঞ্চে, সর্বত্রই গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যধ্বনি; এই গুরুগম্ভীর বাক্যধ্বনি শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তার গভীরতার দাবি রাখে, অপরাপর জাতির সরল সাধারণ অর্থহীন বাক্যধ্বনি থেকে নিজেকে পৃথক করে; গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যধ্বনিই জার্মানির বুদ্ধিজাত শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ব্যাপকভাবে উৎপন্ন দ্রব্য—সস্তা কিন্তু খারাপ—ঠিক জার্মানিতে তৈরি অন্যান্য দ্রব্যের মতোই; তবে দুর্ভাগ্য শুধু এই যে ঐসব দ্রব্যের সঙ্গে এটিকেও ফিলাডেলফিয়াতে প্রদর্শন করা হয়নি।২ এমনকি সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে হের ড্যুরিংয়ের সৎ দৃষ্টান্তের পর থেকে জার্মান সমাজতন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে গুরুগম্ভীর অর্থহীন বাক্যের পেছনে ছুটছে এবং এমন নানা ধরনের মানুষ পয়দা করছে যাঁরা 'বাস্তবে' বিজ্ঞানের কখনও একটি বর্ণও শেখেননি, তাঁরাই 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে যথেষ্ট ভড়ং করে চলেছেন।৩ এঁরা 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে চাল মারেন অথচ বাস্তবিকপক্ষে কখনও 'বিজ্ঞানের' একটি বর্ণও শেখেননি। এটি একটি বালখিল্য রোগ, জার্মান ছাত্রের সোস্যাল ডেমোক্রেসিতে প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ এরই দ্বারা চিহ্নিত এবং এর থেকে অবিচ্ছেদ্য; তবে আমাদের শ্রমিকেরা তাদের উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ প্রকৃতির সাহায্যে একে জয় করবে তাতে সন্দেহ নেই।

হের ড্যুরিংয়ের পেছনে পেছনে আমাকে এমন সব বিষয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে, যেগুলি সম্বন্ধে আমি বড়জোর শৌখিন চর্চার দাবি করতে পারি—

কিন্তু তা আমার দোষ নয়। এরকম ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মিথ্যা বা বিকৃত দৃঢ়োক্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ সময়ই আমি শুধু সঠিক ও অবিসম্বাদী তথ্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে একথা বলা যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত সাধারণ মতামতের প্রশ্ন—অর্থাৎ সেটা এমন ক্ষেত্র যেখানে পেশাদার প্রকৃতি-বিজ্ঞানী পর্যন্ত নিজের বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন, অনধিকার প্রবেশ করেন পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্রে ঐ কারণে তিনি আমাদের সকলের মতোই, যেকথা হের ভিরচাও স্বীকার করেছেন 'অর্ধদীক্ষিত'।[৪] ছোটখাটো অশুদ্ধতা ও অনিপুণতার জন্যে এই বিষয়ে পরস্পরকে যেটুকু প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আশা করি আমিও সেটুকু প্রশ্রয় পাবো। এই ভূমিকা যখন শেষ করছি ঠিক এমন সময় হের ড্যুরিং রচিত প্রকাশকের বিজ্ঞাপন পেলাম যে হের ড্যুরিং একখানি নতুন 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ রচনা করেছেন: Neue Grundgesetze zur rationellen Physik und Chemie।* পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমি সচেতন, তবু আমি বিশ্বাস করি যে আমার ড্যুরিং মহাশয়কে আমি চিনি। তাই মনে করি তাঁর গ্রন্থখানি না দেখেই অগ্রিম বলার অধিকার আছে যে, তাতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের যে সমস্ত সূত্র উপস্থিত করা হবে সেগুলি ভুলভ্রান্তি ও নতুনত্বহীনতার জন্যে অর্থনীতি, বিশ্বপ্রকল্পবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত যে সব সূত্র হের ড্যুরিং আগেই আবিষ্কার করেছেন এবং যেগুলি আমার এই বইতে পর্যালোচিত হয়েছে, সেগুলির পাশাপাশি স্থান পাওয়ার যোগ্য; আরও বলতে পারি যে অতি নিম্ন তাপাংক মাপার জন্যে হের ড্যুরিং যে রিগোমিটার যন্ত্র তৈরি করেছেন তাতে উচ্চ বা নিম্ন কোনরকম তাপাংকই মাপা হবে না। মাপা হবে শুধু হের ড্যুরিংয়ের মূঢ় অহমিকা।

লণ্ডন ১১ জুন ১৮৭৮।

* 'যৌক্তিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নতুন বুনিয়াদী সূত্রাবলী'।—সম্পাদক।

দ্বিতীয়

এ বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে আশা করিনি। বইয়ের সমালোচনার বিষয়বস্তু এখন কার্যত বিস্মৃত ; ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সাল ধরে রচনাটি লাইপ্‌ৎসিগ-এর 'ফোরভার্টস' কাগজে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে বহু সহস্র পাঠকের হাতে তো পৌঁছেছিলই, অধিকন্তু সমগ্রভাবে একখানি আলাদা গ্রন্থরূপেও এটি প্রকাশিত হয় এবং সেই সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাহলে, অনেক বছর আগে হের ড্যুরিং সম্বন্ধে আমি কি বলেছিলাম সে বিষয়ে আজও কোন লোকের আগ্রহ কি করে থাকে ?

আমার মনে হয় তার প্রথম কারণ হল এই বইখানি ঐ সময়ে প্রচলিত আমার প্রায় অন্য সমস্ত বইয়ের মতোই 'সোস্যালিষ্ট-বিরোধী আইন'[৫] জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়। হোলি অ্যালায়েন্স-এর[৬] অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের বংশানুক্রমিক আমলাতন্ত্রসুলভ সংস্কার দ্বারা যাদের মস্তিষ্ক পাথর হয়ে যায়নি, তাদের কাছে এই নিষেধাজ্ঞার ফল নিশ্চয়ই স্বতঃ-প্রতীয়মান : নিষিদ্ধ বইখানির দ্বিগুণ বা তিনগুণ বিক্রী এবং বার্লিনস্থ সেই-সব ভদ্রলোকদের অপদার্থতার স্বরূপ উৎঘাটন—যে ভদ্রলোকেরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন কিন্তু তা কার্যকর করতে পারেন না। সত্যি, সম্রাটের সরকারের দয়ায় আমার ছোটখাট বইয়েরও এত নতুন সংস্করণ করতে হয়েছে, যা আমার পক্ষে সামলান দুঃসাধ্য ; বইগুলি আমি উপযুক্তরূপে সংশোধন করার সময় পর্যন্ত পাইনি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেমন ছিল তেমনই ছাপাতে দিতে বাধ্য হয়েছি।

তবে আরও একটা কারণ ছিল। হের ড্যুরিংয়ের যে 'প্রণালী' এই বইতে সমালোচিত, সে প্রণালী বহুবিস্তীর্ণ তত্ত্বগত ক্ষেত্রে প্রসারিত ; এবং তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই আমাকে পেছন পেছন যেতে হয়েছে ; তাঁর ধারণার বিরুদ্ধে উপস্থিত করতে হয়েছে আমার ধারণা। ফলে আমার নেতি-বাচক সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায় ইতিবাচক ; যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও কমিউনিস্ট বিশ্বদর্শনের জন্যে মার্কস ও আমি লড়ে এসেছি, তর্কযুদ্ধটা তারই এক একত্র-

গ্রথিত বিবরণে রূপান্তরিত হয় এবং এই বিবরণের আওতায় এসেছে বেশ ব্যাপক সংখ্যক বিষয়াবলী। মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র' ও 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে' প্রথম উপস্থাপিত হওয়ার পর আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর পুরো বিশ বছর ধরে সেটা 'তা দেওয়া' চলে এবং তারপর প্রকাশিত হয় 'ক্যাপিটাল'। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তীর্ণ থেকে বিস্তীর্ণতর মণ্ডলীতে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেছে, এখন ইউরোপের সীমান্ত থেকে বহু দূরবর্তী প্রতিটি দেশে যেখানে একদিকে সর্বহারা শ্রেণী এবং অন্যদিকে নির্ভীক বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিকগণ বর্তমান, তাঁদের মধ্যেও স্বীকৃতি এবং সমর্থন লাভ করছে। তাই মনে হয় এমন এক জনসংখ্যা আছেন যাঁদের এই বিষয়ে আগ্রহ এত বেশি যে ড্যুরিং-নীতির বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধগুলি তাঁরা আরও এই কারণে গ্রহণ করেন যাতে তর্কযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত সদর্থক ধারণাগুলিও পাওয়া যায়—যদিও এ তর্কযুদ্ধের বক্তব্যে এখন আর বিশেষ প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার এই গ্রন্থে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গিটি মার্কসই বহুল পরিমাণে প্রতিপন্ন ও বিকশিত করেন, সে তুলনায় আমি যা করি তা খুবই নগণ্য; সেজন্যে আমাদের দুজনের মধ্যে আপনা থেকেই ধরে নেওয়া ছিল যে তাঁকে না জানিয়ে আমার এই রচনা প্রকাশ করা হবে না। ছাপার আগে গোটা পাণ্ডুলিপিটি আমি তাঁকে পড়িয়ে শোনাই; ('সমালোচনামূলক ইতিহাস থেকে') অর্থনীতি অংশের দশম পরিচ্ছেদটি মার্কসই লিখেছিলেন, তবে দুঃখের কথা যে বাহ্য কারণে আমি এটিকে কিছু পরিমাণে সংক্ষেপ করতে বাধ্য হই। বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা আমাদের বরাবরের অভ্যাস।

একটি অধ্যায় ছাড়া বর্তমানে নতুন সংস্করণটিতে আগেকার সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কোন বদল হয়নি। একে তো আমার এমন সময় ছিল না যে ভালো করে সংশোধন করি, যদিও বিষয়টি উপস্থাপিত করার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যা বদলাতে পারলে আমি খুশি হতাম। তাছাড়া মার্কস যেসব পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন, সেগুলি ছাপার মতো করে তৈরি করতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে একাজ অনেক বেশি জরুরি। তার ওপর কোনরকম অদলবদল করার ব্যাপারে আমার বিবেক থেকে বাধা আসছে। বইখানির বিষয় যখন বাদানুবাদমূলক, তখন আমার লেখায় কোন সংস্কার করা উচিত হবে না, কারণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সে সুযোগ নেই।

আমি শুধু হের ড্যুরিংয়ের জবাবের একটা প্রত্যুত্তর দেওয়ার দাবি করতে পারতাম; কিন্তু আমার আক্রমণ সম্বন্ধে হের ড্যুরিং কি লিখেছেন আমি তা পড়িনি। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে—পড়বও না; তত্ত্বের দিক থেকে আমি তাঁকে আমি সম্পূর্ণ খণ্ডন করেছি। তাছাড়া পরবর্তীকালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ওপর যে জঘন্য অবিচার করেছে, সেই কারণে সাহিত্যগত বাদানুবাদে তাঁর ক্ষেত্রে শালীনতার সমস্ত নিয়মই আমার আরও কঠোরভাবে পালন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য শাস্তি এড়াতে পারেনি তা সত্য। যে বিশ্ববিদ্যালয় এত নীচে নেমে গেছে যে সর্বজনবিদিত অবস্থার মধ্যে হের ড্যুরিং-এর শিক্ষাদান সম্পর্কিত স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়েই যখন একই ধরনের সুবিদিত অবস্থায় হের শ্‌ভেনিঙ্গারকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন আর অবাক হওয়া উচিত নয়।[৮]

আমি কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার স্বাধীনতা নিয়েছি শুধু একটি অধ্যায়ে, তা হল তৃতীয় ভাগের (Part III) 'তত্ত্ব বিষয়ক' দ্বিতীয় অধ্যায়। আমি যে বিশ্বদর্শনের পক্ষে, একমাত্র তারই একটি কেন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে ঐ অধ্যায়ে এবং সেটিকে যদি আমি আরও সহজবোধ্য ধরনে, আরও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বলবার চেষ্টা করে থাকি, তাতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর কিছু বলার থাকতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে এরকম করার একটা বিশেষ কারণও ছিল। আমার বন্ধু লাফার্গের জন্য বইটির তিনটি অধ্যায় আমি সংশোধন করি ('ভূমিকা'র প্রথম অধ্যায় এবং তৃতীয় ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)—উদ্দেশ্য ছিল যে এগুলি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে একটি আলাদা পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হবে; ফরাসি সংস্করণটি ইতালীয় ও পোলিশ সংস্করণের ভিত্তিরূপে কাজ করে, তারপর আমি একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করি, নাম দিই: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft।* কয়েক মাসের মধ্যে এর তিনটি সংস্করণ ছাপা হয়,—তাছাড়া রুশ ও ডেনিশ অনুবাদও প্রকাশিত হয়।[৯] এইসব সংস্করণে শুধু আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ধিত

---

* 'Socialism : Utopian and Scientific' নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত।
—সম্পাদক

হয়েছে; মূল গ্রন্থের নতুন সংস্করণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত পরবর্তী পাঠটির বদলে আমি যদি মূল পাঠের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতাম তা হলে তা হতো পাণ্ডিত্যাভিমানের পরিচয়।

আমার আর যেটুকু বদলানোর ইচ্ছা ছিল তা প্রধানত দুটি বিষয় সম্বন্ধে। প্রথমত, আদিম সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আঠারশ'নাতাত্তর সালে পৌঁছানোর পর তবেই এই বিষয়ের চাবিকাঠিটি ধরিয়ে দেন মর্গান।[১০] তবে ইত্যবসরে এখন সমস্ত উপাদান আমার Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats (জুরিখ, ১৮৮৪)* গ্রন্থে সেই উপাদান কাজে লাগাই, সুতরাং এখন উপরোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করলেই কাজ চলবে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হল তত্ত্বগত প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত অংশ সম্বন্ধে। আমার সেই ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক জিনিসই অপরিষ্কার ছিল, আজকের দিনে তার অনেকখানিই বেশ পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট ধরনে বলা যায়। ঐ অংশটির উন্নতি বিধানের অধিকার আমি গ্রহণ করিনি এবং সেজন্যেই এখানে আমি তার বদলে নিজেকে সমালোচনা করতে বাধ্য।

সচেতন দ্বন্দ্ববাদকে জার্মান ভাববাদী দর্শন থেকে উদ্ধার করে তাকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার উপর প্রয়োগ করার ব্যাপারে বোধহয় মার্কস আর আমিই ছিলাম একমাত্র লোক। কিন্তু যে প্রকৃতি একই সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক ও বস্তুবাদী তার ধারণা করতে হলে অঙ্কশাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। অঙ্কশাস্ত্রে মার্কসের ভালোই বুৎপত্তি ছিল কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা তাল রাখতে পারতাম শুধু টুকরো-টুকরোভাবে, ছেদ দিয়ে দিয়ে এবং বিশিষ্টরূপে। তাই যখন আমি ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে বাসস্থান বদল করে লণ্ডনে এলাম[১১] এবং তার ফলে এদিকে নজর দেওয়ার সময় পেলাম তখন অঙ্কশাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব, লিবিগ-এর[১২] ভাষায় এক 'Moulting' (খোলস ছাড়া) প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পার হলাম এবং আট বছরের বেশির ভাগই ঐ দুই বিষয়ের চর্চায় কাটালাম। আমি যখন এই প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি, ঘটনাক্রমে ঠিক তখনই হের ড্যুরিংয়ের তথাকথিত প্রাকৃতিক-দর্শন নিয়ে আমাকে ব্যস্ত হতে হল। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে সঠিক

---

* 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'।—সম্পাদক।

পারিভাষিক শব্দ খুঁজে পাইনি, তত্ত্বগত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণত বেশ আনাড়ীর মতোই চলেছিলাম। অপরপক্ষে এই বিষয়ে আমার নিজের প্রতি আস্থার অভাব তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে আমি বেশ সাবধান হয়ে পড়ি এবং তখনকার কোন সুপরিজ্ঞাত তথ্য সম্পর্কে আমি বাস্তবিকই কোন ভুল করেছি—আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা চলে না কিংবা স্বীকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তভাবে উপস্থিত করেছি সে অভিযোগও চলে না। এই সম্পর্কে একজন মাত্র গাণিতিক প্রতিভাধরকে পেয়েছিলাম—যাঁর প্রতিভা তখনো অনাবিষ্কৃত এবং যিনি মার্কসের কাছে একটি চিঠিতে অভিযোগ করেন যে $\sqrt{-1}$-এর সম্মানের ওপর আমি জংলীর মতো আক্রমণ করেছি।[১৩]

বলাবাহুল্য, গণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমি খুঁটিনাটিতেও নিশ্চিত হতে পারি (সাধারণভাবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না) যে, প্রকৃতির অসংখ্য পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে গতির সেই একই দ্বান্দ্বিক নিয়মাবলী পথ কেটে চলে—যে নিয়মাবলী ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর আপাত-আকস্মিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে; সেই একই নিয়মাবলী যা অনুরূপভাবে নানা চিন্তার বিকাশকে সূত্রের মতো গ্রথিত করে এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে চেতনার পর্যায়ে উন্নীত হয়; সেই নিয়মাবলীকে হেগেলই প্রথম সর্বাঙ্গীণ কিন্তু দুজ্ঞেয়রূপে বিকশিত করেন এবং যেগুলিকে এই দুজ্ঞেয়রূপ থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ সরল ও বিশ্বজনীনরূপে মনের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরাই ছিল আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য প্রাচীন প্রাকৃতিক দর্শন তার বাস্তবমূল্য এবং অন্তর্নিহিত বহু ফলদায়ক বীজ* সত্ত্বেও আমাদের সন্তুষ্ট করতে

কার্ল ফোগ্‌ট যাদের মননহীন জনতা বলেছেন, তাদের সঙ্গে মিলে প্রাচীন প্রাকৃতিক দর্শনকে আক্রমণ করা অনেক সহজ, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা তত সহজ নয়। তাতে অনেক আজগুবি ও বাজে কথা আছে বটে তবে এ দর্শনেরই সমসাময়িক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাভিত্তিক প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের অ-দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে বেশি কিছু নয়, এবং বিবর্তন তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে দেখা যায় যে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যা যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞোচিত। সুতরাং ত্রেভিরানাস ও ওকেনের গুণাগুণ স্বীকার করে হেগেল উচিত কাজই করেছিলেন(১৪)। ওকেন তাঁর আদিমপঙ্ক (Slime) ও আদিম অণুকোষের (Vesicle) ভেতর দিয়ে জীববিদ্যা বিষয়ক এমন এক তত্ত্ব উপস্থিত করেন যা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে প্রোটোপ্লাজম ও কোষরূপে আবিষ্কৃত হয়। সুনির্দিষ্টভাবে হেগেলের কথা ধরলে তিনি তাঁর

পারে না। এই বইতে যে কথা আরও বিস্তীর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা হল এই যে প্রাকৃতিক দর্শনে, বিশেষ করে তার হেগেলীয় ধরনে, ভুলের কারণটা হচ্ছে সেই দর্শনে প্রকৃতির কোন কালানুক্রমিক বিকাশ, কোন 'উত্তরাধিকার' স্বীকৃত হয়নি, স্বীকৃত হয়েছে শুধু 'সংস্থাবস্থান'। একদিকে এর ভিত্তি ছিল হেগেলের প্রণালীরই ভেতরে তাতে ঐতিহাসিক বিকাশের একমাত্র সূত্র ছিল 'আত্মা' (sprit) কিন্তু অন্যদিকে তৎকালীন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সামগ্রিক অবস্থা এর উৎপত্তির কারণ। এদিক থেকে কান্টের অনেক পেছনে রয়েছেন হেগেল—কান্টের নীহারিকা তত্ত্ব দ্বারা তখন সৌর-মণ্ডলের উৎপত্তি সূচিত হয়ে গেছে এবং জোয়ার-ভাটার ফলে পৃথিবীর আবর্তন গতির হ্রাস আবিষ্কার হওয়ায় ঐ পদ্ধতির দিন ফুরিয়ে যায়[১৬]। সর্বশেষে,

---

সমসাময়িক প্রায়োগিকদের চেয়ে অনেক বিষয়েই অনেক উপরে ছিলেন। প্রায়োগিকরা মনে করতেন অব্যাখ্যাত ঘটনার ব্যাখ্যা তখনই হয়ে যায়, যখন তাঁরা সেই ঘটনার উপর কোন বল (force) বা শক্তি (power) আরোপ করতে পারেন, যেমন, মাধ্যাকর্ষণ বল; প্লাবিতার শক্তি, বৈদ্যুতিক সংযোগজাত ক্ষমতা ইত্যাদি; কিংবা যেখানে এতে চলবে না সেখানে কোন অজ্ঞাত পদার্থ: আলোকে তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এইসব কাল্পনিক ধারণা এখন বাতিল হয়ে গেছে, কিছু ক্ষমতা সংক্রান্ত যে জুয়াচুরির বিরুদ্ধে হেগেল লড়েছিলেন, সেটি এখনো সানন্দে ভেসে ওঠে। যেমন একেবারে ১৮৫৯ সালেও হেলমহোৎস-এর ইন্‌সব্রুক বক্তৃতা (**Helmholtz's, Po-Pulare Yorlesungen, II. Heft, 1871, S. 190**)(১৫)। আঠার শতকের ফরাসিদের কাছ থেকে নিউটনকে দেবতা বানানোর উত্তরাধিকার আর ইংরেজদের দ্বারা নিউটনের উপর ধন ও সম্মানের বর্ষণ, দুইয়ের বিপরীতভাবে হেগেলই এই তথ্য বের করে আনেন যে আকাশের গ্রহনক্ষত্রসমূহের আধুনিক বলবিদ্যা আসলে প্রতিষ্ঠা করেছেন কেপ্‌লার (জার্মানি যাকে খেতে দেয়নি) এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত সূত্রটি কেপ্‌লারের তিনটি সূত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমনকি বিশেষ স্পষ্টভাবে তাঁর তৃতীয় সূত্রে। হেগেল তাঁর **Naturphilosophie, 270** ও তাঁর অতিরিক্ত অংশে, (**Hegel's Werke, 1842, VII. Band, Seite 98 und 113 bis 115**), সামান্য কয়েকটি সরল সমীকরণের দ্বারা যা প্রমাণ করেছেন তাই আবার অতি আধুনিক গাণিতিক বলবিদ্যার ফলরূপে দেখা দিয়েছে···গুস্টাফ কির্চফের **Vorlesungen uler mathematiseha Physik** রচনায় (**2 Auflage, Leipzig, 1877, S. 10**) এবং হেগেল প্রথমে এটিকে যে সরল গুণিতক-রূপে বিকশিত করেছিলেন মূলত সেইভাবেই দেখা গেছে। আধুনিক কমিউনিজমের সঙ্গে ইউটোপিয়ানদের সম্বন্ধ যে রকম, সচেতন দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতি সম্পর্কিত দার্শনিকদের সম্বন্ধও সেইরকম। (এঙ্গেল্‌সের টীকা)।

আমার কাছে প্রকৃতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক নীতি রচনা করার কথাই ওঠেনি, প্রকৃতির মধ্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করা এবং প্রকৃতি থেকে সেইগুলিকে বিকশিত করে তোলাই আমার কাজ ছিল।

কিন্তু আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি বিভাগ ধরে প্রণালীবদ্ধভাবে এই কাজ করা এক বিরাট ব্যাপার; শুধু যে অধ্যয়নের ক্ষেত্রেই এটা প্রায় অপরিসীম তাই নয়; এই সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি-বিজ্ঞানই এমন জোরের সঙ্গে বিপ্লবী রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে যে যাঁরা তাঁদের সমস্ত অবসর সময় এর পেছনে নিয়োগ করতে পারেন, তাঁরাও এর গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না। কিন্তু কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর থেকে আরও গুরুতর কর্তব্যের জন্যে আমার সময়ের ওপর এত দাবি এসেছে যে আমি আমার নিজের কাজ ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছি। আপাতত এই বইতে যেটুকু ইঙ্গিত দিয়েছি তাই নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন কোন সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে যখন আমি আমার ফলাফলগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করতে পারবো—মার্কস যেসব অতি মূল্যবান গাণিতিক পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন হয়তো সেগুলিও এই সঙ্গে প্রকাশ করা যাবে।[১৭]

তা সত্ত্বেও তাত্ত্বিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমার রচনাটি হয়তো অনেকখানি পরিমাণে কিংবা সম্পূর্ণভাবেই বাহুল্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বিশুদ্ধ প্রায়োগিক আবিষ্কারগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—শুধু সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োজন থেকেই তত্ত্বগত প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপরে যে বিপ্লবের চাপ আসছে সে বিপ্লব এমন ধরনের যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির দ্বান্দ্বিক চরিত্রটিকে প্রায়োগিকদের চৈতন্যের কাছে, এমনকি যারা অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী তাদের কাছেও, ক্রমবর্ধমানভাবে তুলে ধরতে হবে। আগেকার অনমনীয় বিরোধগুলি, সুতীক্ষ্ণ ও অনতিক্রম্য ভেদ রেখাগুলি, ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শেষ 'প্রকৃত' গ্যাসটিও যখন দ্রবীভূত করা গেছে এবং প্রমাণ করা গেছে যে, কোন পদার্থকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যায় যেখানে তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, তখন অবস্থাগুলির পূর্বতন অনপেক্ষ চরিত্রের শেষ চিহ্নও অবলুপ্ত।[১৮] গ্যাসসমূহের গতিশীল তত্ত্ব সংক্রান্ত থিসিসে বলা হয়েছে যে সমান তাপমাত্রায় নিখুঁত গ্যাসগুলির মধ্যে এক একটি গ্যাস-অণু যে বেগে ধাবিত হয়, তার বর্গগুলি সেইসব গ্যাসের আণবিক ওজনের সঙ্গে বিপরীতভাবে আনুপাতিক। এই

থিসিসের ফলে তাপও সোজাসুজি সেইসব ধরনের গতির মধ্যে স্থান পেয়ে যাচ্ছে, যেসব ধরনকে তৎক্ষণাৎ গতিরূপে পরিমাপ করা যায়। যেখানে মাত্র দশ বছর আগে তখনকার সদ্য আবিষ্কৃত গতির বিরাট বুনিয়াদি নিয়মটিকে শুধু শক্তির নিত্যতার নিয়মরূপে ধারণা করা হতো, কেবলমাত্র গতির অবিধ্বংসিতা ও অসৃষ্টোৎপন্নতার অভিব্যক্তিরূপে, অর্থাৎ শুধু তার পরিমাণগত দিক থেকে, সেখানে এই সংকীর্ণ ও নেতিবাচক ধারণার বদলে ক্রমে ক্রমে শক্তির রূপান্তর সম্পর্কিত সদর্থক ধারণাই ক্রমবর্ধমানরূপে এগিয়ে আসছে; প্রক্রিয়াটির পরিমাণগত অন্তর্বস্তুর মধ্যেই সর্বপ্রথম এটা স্বীকৃতি পেল এবং অপার্থিব সৃষ্টিকর্তার শেষ চিহ্নও মুছে গেল। গতি (তথাকথিত শক্তি) যখন গতিশীল শক্তি (তথাকথিত যান্ত্রিক বল) থেকে বিদ্যুৎ, তাপ, স্থৈতিক শক্তি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয় কিংবা তার বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটে, তখন গতির পরিমাণ যে অপরিবর্তিত থাকে তা এখন আর নতুন কথা বলে প্রচার করার দরকার হয় না; এখন এরই সুদৃঢ় ভিত্তিতে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় অনুসন্ধান চলেছে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে—যে বিরাট বুনিয়াদি প্রক্রিয়ার জ্ঞানের মধ্যেই প্রকৃতির সকল জ্ঞান সন্নিবেশিত এবং যেহেতু ক্রমবিবর্তন তত্ত্বের আলোকেই জীববিদ্যার অনুশীলন এগিয়েছে, সেহেতু জৈব প্রকৃতির রাজত্বে শ্রেণীবিন্যাসের বহু অনড় সীমারেখা এক এক করে মুছে গেছে। অন্তবর্তী যেসব বন্ধনের শ্রেণীবিন্যাস প্রায় অসম্ভব, সেগুলির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, ঘনিষ্ঠতর অনুসন্ধানের ফলে নানা জীব এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে চলে যাচ্ছে, এবং যেসব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মতো মনে করা হতো, সেগুলির পরমমূল্য হারিয়ে যাচ্ছে; এখন এমন স্তন্যপায়ী জীবের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে যারা ডিম পাড়ে, এমন পাখীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে—অবশ্য যদি সংবাদ সমর্থিত হয়—যারা চারপায়ে হাঁটে।[২০] বহু বছর আগে কোষ আবিষ্কারের পর স্বতন্ত্র জান্তব সত্তার ঐক্যকে কতকগুলি কোষের যৌথ কাঠামোর মধ্যে মিশিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভিরচাও। তাতে তিনি বৈজ্ঞানিক বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তুলনায় বরং প্রগতিশীল দিকেই বেশি এগিয়েছিলেন।[২১] আর এখন জান্তব (সুতরাং মানবিকও) স্বাতন্ত্র্যের ধারণা অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে কারণ রক্তের শ্বেতকণা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি উচ্চতর প্রাণীর শরীরে অ্যামিবার মতো গুঁড়ি মেরে মেরে চলে। যাই হোক এই যে দুই মেরুর বৈপরীত্যকে সামঞ্জস্য বা সমাধানের অযোগ্য বলে উপস্থিত করা হয়, এই যে

জোর করে শ্রেণীভেদ ও পৃথকীকরণের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা হয়—ঠিক এইগুলি থেকেই আধুনিক তত্ত্বগত প্রকৃতিবিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধ, আধিবিদ্যক রূপ পেয়েছে। যদি স্বীকার করা হয় যে এইসব বৈপরীত্য ও ভেদ প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া গেলেও সেগুলির সিদ্ধতা আপেক্ষিক মাত্র, এবং অপরপক্ষে সেগুলির কল্পিত অনমনীয়তা ও চূড়ান্ত পরমসিদ্ধতা কেবলমাত্র আমাদের চিন্তাশীল মনদ্বারা প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, তাহলে সেই স্বীকৃতিই প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক ধারণার সারবস্তু। এই স্বীকৃতিতে পৌঁছানো সম্ভব কারণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান তথ্যগুলি সেদিকে যেতে আমাদের বাধ্য করেছে; কিন্তু আরও সহজেই এই স্বীকৃতিতে পৌঁছানো যায় যদি দ্বান্দ্বিক চিন্তার নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে আমরা এই তথ্যগুলির দ্বান্দ্বিক চরিত্রের দিকে অগ্রসর হই। আর যাই হোক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এখন এতদূর এগিয়েছে যে তার পক্ষে দ্বান্দ্বিক সামান্যীকরণ আর এড়ানো সম্ভব নয়। তবে তার পক্ষে এই প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে যদি মনে রাখা যায় যে, যেসব ফলাফলের মধ্যে তার অভিজ্ঞতাগুলির সারমর্ম সংক্ষেপিত, সেগুলি প্রত্যয় (কনসেপট)। প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার কৌশল মানুষের সহজাত নয়, প্রতিদিনের সাধারণ চৈতন্যের সঙ্গেও তাকে পাওয়া যায় না, তার জন্যে প্রকৃত চিন্তা প্রয়োজন এবং সেই চিন্তারও অনরূপভাবেই এক দীর্ঘ প্রায়োগিক ইতিহাস আছে, তার প্রয়োজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চেয়ে কমও নয় বেশিও নয়। গত আড়াই হাজার বছর ধরে দর্শনের ক্রমবিকাশের ফলাফলগুলি আত্মসাৎ করার শিক্ষা পেলে তবেই তার পক্ষে একদিকে এমন প্রাকৃতিক দর্শন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, যে দর্শন তার থেকে দূরে, তার বাইরে এবং তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্যদিকে, নিজের সীমাবদ্ধ চিন্তাপদ্ধতি যা ইংরেজদের প্রয়োগবাদিতা থেকে উত্তরাধিকাররূপে তার কাছে এসেছে—সেই সীমাবদ্ধ চিন্তাপদ্ধতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

লণ্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

তৃতীয়

এই নতুন সংস্করণটি আগেকার সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ এবং শুধুমাত্র লেখার কায়দায় দু-একটা সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি অধ্যায়— 'সমালোচনামূলক ইতিহাস থেকে' নামক দ্বিতীয় ভাগের দশম অধ্যায় আমি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার স্বাধীনতা নিয়েছি। তার কারণ নিম্নরূপ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আগেই বলা হয়েছে যে যাবতীয় মৌলিক বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই এই অধ্যায়টি মার্কসের রচনা। এটা প্রথমে লেখা হয়েছিল কোন পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে, সেই পাণ্ডুলিপির ওপর আমি অনেকখানি কাঁচি চালাতে বাধ্য হই, যেসব অংশে অর্থনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের নিজের ধারণাগুলি ড্যুরিং-এর প্রস্তাবাবলীর সমালোচনাকে ছাপিয়ে গেছে, ঠিক সেগুলিই আমাকে কাটতে হয়। কিন্তু পাণ্ডুলিপির এই অংশটি আজও পর্যন্ত স্থায়ী ও অত্যধিক কৌতূহলের বিষয়। মার্কস যেসব অনুচ্ছেদে পেটি, নর্থ, লক ও হিউমের মতো লোককে সাবেকী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করেছেন, সেগুলি যতদূর সম্ভব পূর্ণ ও বিশ্বস্তরূপে প্রকাশ করতে আমি বাধ্য বলে মনে করি; আর কোয়েসনের 'Economic Tableau' যা আধুনিক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কাছে স্ফিংস-এর মতোই অমীমাংসিত ধাঁধা হয়ে থেকে গেছে, সে সম্বন্ধে মার্কসের ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে আমি আরও বাধ্য। অপরপক্ষে, যুক্তির সূত্র বজায় রেখে যেখানেই সম্ভব আমি সেইসব অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছি, যেগুলি একান্তভাবে হের ড্যুরিং-এর লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আর বাকি কথা হল: এই বইয়ের পূর্বতন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বইয়ের মতামতগুলি যে পরিমাণে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তার জন্যে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট।

লণ্ডন — এফ. এঙ্গেল্‌স

২৩ মে, ১৮৯৪

ভূমিকা

এক

সাধারণ প্রসঙ্গ

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বিরোধ এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যেকার নৈরাজ্য—মূলত এই উপলব্ধির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। আঠার শতকের বড় বড় ফরাসি দার্শনিক যেসব নীতি প্রণয়ন করেন, মনে হয় তত্ত্বগত আকৃতির দিক থেকে আধুনিক সমাজতন্ত্র যেন গোড়ার দিকে সেইসব নীতিরই আরো যুক্তিসম্মত বিস্তৃতিরূপে আর্বিভূত হয়েছিল।* বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনার যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও হাতে-পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমশলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসি দেশে যে মহামানবেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন, তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো কর্তৃত্বশক্তি তাঁরা স্বীকার করেননি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সবকিছুই তাঁদের কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয়; যুক্তির কাঠগড়ার সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠিই হয় যুক্তি। হেগেল বলেন, সে

---

* 'ভূমিকা'র খসড়া রূপরেখায় উপরোক্ত অংশটি এইভাবে লেখা হয়েছিল: 'হাতের কাছের সমাজে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের মধ্যে, শ্রমিক ও শোষকদের মধ্যে যেসব শ্রেণীদ্বন্দ্ব রয়েছে মূলত সেগুলির উপলব্ধি থেকেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল বটে, তবে আঠারো শতকের বড় বড় ফরাসী দার্শনিক যেসব নীতি প্রণয়ন করেন, তত্ত্বগত আকৃতির দিক থেকে সেইসব নীতিরই আরো অতিরিক্ত ও সুসঙ্গত বিস্তৃতিরূপেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়; এই ফরাসি দার্শনিকরা সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রতিনিধি, মোরেলি ও মাবলিও তার অন্তর্ভুক্ত।'—সম্পাদক।

সমস্ত বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর* : প্রথমত এই অর্থে যে, মনুষ্য মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত ধারণাগুলিই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে নিজেদের দাবি করে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে বাস্তবের সঙ্গে এই নীতি মিলত না, সে বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দাঁড় করানো হয়। তদানীন্তন সব ধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তা-কুঁড়ে। বিশ্ব এ যাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যা কিছু অতীত, তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, (যুক্তির রাজত্ব) এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিশেষাধিকার ও নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার স্বয়ং প্রকৃতির নিয়মজাত সাম্য এবং মানবের অলংঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়ণ লাভ করেছে বুর্জোয়া সমানাধিকারে, বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে, এবং যুক্তির শাসন, রুশোর 'সামাজিক

(ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই: 'আইনের ধারণা, চিন্তা সহসা স্বীকৃতি আদায় করে নিল, এর বিরুদ্ধে অন্যায়ের পুরাতন কাঠামো দাঁড়াতে পারলো না। সুতরাং এই আইনের ধারণার উপর এবার সংবিধানের প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আকাশে এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনের মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায় নি যে, মানুষ দাঁড়ালো তার মাথার ওপর অর্থাৎ idea-র (ভাবনার) ওপর এবং বাস্তবকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবমূর্তি অনুযায়ী। আনাক্সাগোরাস প্রথমে বলেছিলেন, Nous অর্থাৎ যুক্তি পৃথিবীকে শাসন করে; কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ স্বীকার করতে পারল যে, idea-ই মানবিক বাস্তবতাকে শাসন করবে। এবং সে হল এক অপরূপ অরুণোদয়। সমস্ত চিন্তাশীল সত্তাই এই পবিত্র দিনটির উদযাপনে অংশ নেয়। একটা অপূর্ব আবেগে তখন আন্দোলিত হয় মানুষ, যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায়, ঐ যেন এল বিশ্বের সঙ্গে স্বর্গীয় নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, Philosophie der Geschichte. ১৮৪০, পৃ ৫৩৫) লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল বর্তৃক এইরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট-বিরোধী আইনটা অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি?) এঙ্গেলসের টীকা।

চুক্তি' বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ররূপে। অষ্টাদশ শতকের মহামনীষীদের পক্ষে তাঁদের পূর্বসূরীদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বার্গারদের (বুর্জোয়া) (যারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিল) বৈরিতার পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গরিব মজুরদের সাধারণ বৈরিতা। এই পরিস্থিতি ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। অপিচ, জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত শক্তির দ্বারা ভারাক্রান্ত: মজুরি-খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব এবং গিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে প্রকাশিত হয়, সেই পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী এবং গিল্ডের বাইরেকার দিনমজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। এবং অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা যুগপৎ সেকালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে (আনাব্যাপটিস্টরা ও) টমাস মুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলার, মহান ফরাসি বিপ্লবে বাব্যেফদের নাম করা যায়।

তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এইসব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অনুসারী তাত্ত্বিক বক্তব্যও ছিল; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি*, অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্টসুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাবলি)। সাম্যের দাবিটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদের কথা নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান।

(জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে) সন্ন্যাসীসুলভ এক ধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউরোপীয়: সাঁ-সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারিয় আন্দোলনের

---

* এঙ্গেলস এখানে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী টমাস ম্যুর (১৬শ শতাব্দী) ও তম্মাসো কাম্পানেল্লার (১৭শ শতাব্দী) রচনার কথা বলেছেন।—সম্পাদক।

পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনের তখনো একটা তাৎপর্য ছিল; ফুরিয়ে; এবং ওয়েন—ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদ্ভূত বৈরিতার প্রভাবে ইনি ফরাসি বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা বিষয় তিনজনের মধ্যেই অভিন্ন।* ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমধ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে, সেই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেননি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে (শুরু না করে) ফরাসি দার্শনিকদের মতে তাঁরা (অবিলম্বে) সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এঁদেরও অভিলাষ যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন, কিন্তু তাঁদের রাজত্ব ফরাসি দার্শনিকদের থেকে ততটা দূরে, যতটা সুদূর মর্ত থেকে স্বর্গ।

কেননা (আমাদের এই তিন সংস্কারকের কাছে) ফরাসি দার্শনিকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগৎটাও সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই কারণে, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষেপণীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির—এবার তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে কী এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গতি বেয়ে আসা এক অনিবার্য ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ বছর আগেও তার এ অভ্যুদয় ঘটতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব সমাজকে পাঁচশ বছরের ভ্রান্তি, সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

সমস্ত ইংরেজ ও ফরাসি সমাজতন্ত্রীর ধারণার সারকথা এইরকমই; ভাইৎলিংসহ প্রথম দিকের জার্মান সমাজতন্ত্রীদেরও তাই।* এদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ; আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তার শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ, কাল

* 'ইউটোপীয় চিন্তাধারা উনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ভাবনাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু ভাবনাকে করছে। এই কিছুদিন আগেও ফরাসি ও ইংরেজ সমাজ-তন্ত্রীরা সকলেই তাদের অর্ঘ নিবেদন করেছে। ভাইৎলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও এই একই পথের পথিক।' 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' থেকে। —সম্পাদক।

ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ-নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক-একটা চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় এক এক রকম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার স্বীয় বোধ, জীবনধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত, সেই হেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এটা ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু এক ধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে সেটাই আজও পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। অতএব সেটা হচ্ছে অতি বহুবিধ মতান্তরের এক জগাখিচুড়ি ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ সমাজ-চিত্রের এমন জগাখিচুড়ি, যা অপেক্ষাকৃত কম বিস্ময়কর।* বিতর্কের স্রোতে বিভিন্ন উপাদানের সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ণ ধারগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও তৈরি হয়ে উঠবে ততই সহজে।

সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার পরে আবির্ভূত হয় নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেল। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিসাবে দ্বান্দ্বিকতার পুনঃপ্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক এবং এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সার্বভৌম জ্ঞানসম্পন্ন মনীষী অ্যারিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন।** অন্যপক্ষে নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার

---

* 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে' বাক্যটি এইভাবে লেখা আছে '...বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনামূলক রচনা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ সমাজ-চিত্রের জগাখিচুড়ি, যার বিরোধিতা হবে সবচেয়ে কম;...' সম্পাদক।

** 'ভূমিকা'য় প্রাথমিক খসড়া অনুচ্ছেদটি এইভাবে বর্ণিত: 'প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক, আর অ্যারিস্টটল—যিনি প্রাচীন পৃথিবীর হেগেল—তিনি দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মূল ধারণাগুলি তখনই বিশ্লেষণ করে ফেলেছিলেন।'—সম্পাদক।

চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা), তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত আধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) যুক্তিপ্রকরণের মধ্যে অনড়ভাবে স্থিতি লাভ করে,—অষ্টাদশ শতকের ফরাসিরাও তদ্বারা প্রায় পুরোপুরি প্রভাবিত হন, অন্ততপক্ষে তাঁদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক, সেগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসিরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন। দিদেরোর Le Neveu de Rameau২২ এবং রুসোর Discours sur L'origine et les fondements de L'inegalite parmi les hommes ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব ও ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। পরে এ সম্বন্ধে আরো সুবিস্তারে বলতে হবে।

সাধারণভাবে প্রকৃতি বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি তখন সর্বপ্রথম চোখে পড়ে নানা সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ার বিন্যাস ও সমবায়ের অসংখ্য জটিলতা, যেখানে যা ছিল এবং যেমন ছিল তা থাকে না, সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। (সুতরাং প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাদপটে ; এগুচ্ছে, সমান্বিত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কের ওপর।) বিশ্বের এই আদিম, সরল কিন্তু মূলত সঠিক যে বোধ, সেটা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে নিরূপণ করেন হেরাক্লিটাস : সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই প্রবহমান, নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও বিলয়।

কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক ছবির সাধারণ চরিত্র এই ধারণার দ্বারা প্রকাশিত হলেও যেসব খুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি, তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ ধারণা অপ্রতুল এবং যতক্ষণ এইসব খুঁটিনাটি আমরা না বুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার উপলব্ধি হতে পারে না। এই খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদাভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তারে প্রকৃতি, বিশেষ কারণ, ফলাফল ইত্যাদি।

মূলত এ কাজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ও ঐতিহাসিক গবেষণার; এগুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা সাবেকী গ্রীকেরা সুযুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল; কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে, তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে।

(কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোন বিচারমূলক বিশ্লেষণ, তুলনা এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না)। যথাযথ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি তাই প্রথম রচিত আলেকজেন্দ্রীয় যুগে২৩।* গ্রীকদের দ্বারা এবং পরে বিকশিত হয় মধ্য যুগে আরবদের দ্বারা। সত্যিকারেই প্রকৃতিবিজ্ঞান শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, এবং তদবধি ক্রমবর্ধমান দ্রুততায় তা নিয়ত এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বর্গে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহুবিধ রূপের জৈব বস্তুর অভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন—গত চারশ বছরে আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে অতিকায় পদক্ষেপ হয়েছে তার মূল ভিত্তি ছিল এইগুলি। কিন্তু কাজের এ ধরনের ফলে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপুল সমগ্রতা থেকে তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাস আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয়, স্থিতির মধ্যে, মূলত পরিবর্তমান বস্তু হিসাবে নয়, নিয়ত স্থির বস্তু হিসাবে, জীবনের মধ্যে নয়, মৃত্যুর মধ্যে। বেকন ও লক কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তার মধ্যে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক সংকীর্ণ আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি আধিবিদ্যক তাঁর কাছে বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে, অনুসন্ধেয় বস্তু হিসাবে এগুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। আধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তরূপে দুরপনেয় প্রতিতত্ত্বের

---

* বিজ্ঞানের বিকাশের আলেকজান্দ্রীয় যুগ হল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর থেকে কথাটার উৎপত্তি। সেকালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া যুগে গণিত, (ইউক্লিড, আর্কিমিডিস), ভূগোল, জ্যোতিবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ইত্যাদির প্রভূত বিকাশ হয়।—সম্পাদক।

(antitheses) ধারায়, 'তাহার বাণী, ইতি ইতি বা নেতি নেতি, কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।'[২৪] তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতির সঙ্গে নেতির কোন সম্পর্ক নেই; কার্য ও কারণ অনড় প্রতিতত্ত্ব যুক্ত।

প্রথম দৃষ্টিতে এ ধরনের চিন্তা আমাদের কাছে খুবই উজ্জ্বল মনে হয়, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেওয়ালের মধ্যেকার সংসারে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার ব্যাপক দুনিয়ায় পা বাড়ায়, অমনি অতি আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হতে থাকে তার। আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে সে ক্ষেত্রের পরিমাণ বদলায়,—কিন্তু তাহলেও, কালক্রমেই এ চিন্তাধারা একটা সীমায় পৌঁছয়, তার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায়। আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, বিদ্যমানতার বিচারে ভুলে যায় সে বিদ্যমানতার শুরু ও শেষের কথা; স্থিতির বিচারে ভোলে গতির কথা; শুধু গাছই দেখে, দেখে না অরণ্য।

দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেমন জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে তাকে খুন বলা যাবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব, কেননা শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়ত একটা প্রক্রিয়া।

একইভাবে প্রতিটি জৈব সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা এবং সেই সত্তা নয়ও; প্রতিমুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে; প্রতিমুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে; দীর্ঘ বা স্বল্পকালের মধ্যে তার দেহে পদার্থ সম্পূর্ণ নবীভূত হয়ে উঠছে, তার স্থান নিচ্ছে অন্য পরমাণু, ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে, তবু সে নয়।

তাছাড়া গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রতিতত্ত্বের (antithesis) দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্ত দুটি যে পরিমাণে পরস্পরবিরোধী, সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য; এবং যতকিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। একইভাবে দেখা যায়, কার্য ও কারণ সম্পর্কের যে বোধ সেটা শুধু বিচ্ছিন্ন এক-একটা ঘটনার ক্ষেত্রেই খাটে, কিন্তু এই আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়, তখনই সেই কার্যকারণ পরস্পর প্রতিধাবিত হয় এবং কার্যকারণ যেখানে নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা যখন ভাবি তখনও কার্যকারণ বোধ একেবারে গুলিয়ে যায়, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

আধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এইসব প্রক্রিয়া ও ভাবনা-ধারার কোনটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে দ্বান্দ্বিক মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে বস্তু ও তার উপস্থাপনা বা ভাবনা অনুধ্যেয়। উপরে যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন।

দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন ক্রমবর্ধমানভাবে অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ-প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রাকৃতিক ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক; (নিয়ত পৌনঃপুনিক একটা বৃত্তে চিরকালের জন্য একই ভাবে সে ঘোরে না, সত্যিকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির আধিবিদ্যক সম্বন্ধ-বোধের বিরুদ্ধে তিনি গুরুতর আঘাত করেন এইটি প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল।) কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম; এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, লেখক ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল ভাবনার অভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক উপস্থাপন সম্ভব হতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক

তার কাজ।* অষ্টাদশ শতকের ফরাসিদের কাছে (এমনকি হেগেলের কাছেও) সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা-বোধ সেটা এই যে, তা সঙ্কীর্ণ চক্রে ঘূর্ণমান, (চিরকালের মত) অপরিবর্তনীয়, গ্রহ, তারা সব চিরন্তন—যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই—যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলি অন্তর্ভুক্ত; তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে, যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে এখানে জন্মায়, বসবাস করে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদিবা পৌনঃপুনিক চক্রেই আবর্তিত হয়, তা হলেও এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে সীমাহীনরূপে। উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বন্দ্বমূলক, তার আর এমন কোন দর্শনের প্রয়োজন নেই যা অন্যসব বিজ্ঞানের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।** বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞান যখনই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য হয়, তখনই এ সামগ্রিকতার জন্য একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর (নতুবা অনাবশ্যক)। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু স্বাধীনভাবে টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান—আকারগত তর্কবিদ্যা (formal logic)-ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সব কিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের খাস বিজ্ঞানের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

অবশ্য প্রকৃতিবিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব, তার পাল্টা গবেষণালব্ধ আসল মালমশলার অনুপাতে, তা হলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁতে, ১৮৩৮-১৮৪২ প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে

---

* 'সমাজতন্ত্র: ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' বইটিতে অনুচ্ছেদটি এইভাবে লেখা আছে: 'সাবেকী বস্তুবাদের কাছে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও বলপ্রয়োগের এক কদাকার স্তূপ; আধুনিক বস্তুবাদ তাকে দেখে মানব সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়ারূপে এবং সেই বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য।'—সম্পাদক।

** 'সমাজতন্ত্র: ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' বইতে অনুচ্ছেদটি এইভাবে লেখা আছে: 'দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত: দ্বন্দ্বমূলক; রাণীর মত যা বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের উপর শাসনাধিকার দাবি করে আসছিল তেমন কোন একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নেই।'—সম্পাদক।

আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্যের বিকাশের সমানুপাতে প্রলেতারিয়েত-বুর্জোয়া শ্রেণী সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। 'পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সর্বজনীন সামঞ্জস্য ও সর্বজনীন সমৃদ্ধি—বুর্জোয়া অর্থনীতির এইসব শিক্ষাকে বাস্তব ঘটনা ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে থাকে।* এসব ঘটনাকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না ফরাসি ও ইংরেজদের সমাজতন্ত্রকে—যা তাদের তাত্ত্বিক চিন্তার প্রকাশ, যদিও সে প্রকাশ খুবই অপরিণত। কিন্তু ইতিহাসেব পুরনো ভাববাদী ধারণা তখনো অপসৃত হয়নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রামের কোন জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের ; উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন ঘটনাগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, (আদিম পর্যায়গুলি বাদে) সমস্ত অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস২৬ ; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলি চিরকালই উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার ফল ; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবনার সমগ্র উপসৌধটার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। (ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন ; কিন্তু তাঁর ইতিহাসবোধ ছিল ভাববাদী।) এবার কিন্তু ভাববাদ

* 'ভূমিকা'র প্রাথমিক খসড়ায় এইটুকু অতিরিক্ত আছে, 'তেমনিই ফ্রান্সে ১৮৩৫ (১৮৩৪) সালে লিঁয়োর সশস্ত্র অভ্যুত্থান মারফৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছিল। ইংরেজ ও ফরাসি সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বগুলি ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং জার্মানিতেও তার প্রতিধ্বনি ও সমালোচনা অবধারিত ছিল, যদিও সেখানকার শিল্প তখন ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্তর থেকে সবেমাত্র উঠে আসতে আরম্ভ করেছে। জার্মানির চাইতে জার্মানদের মধ্যেই এখন যে তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র গড়ে উঠল তাকে ঐ কারণেই সমস্ত মাল-মসলা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়…।'—সম্পাদক।

বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়—ইতিহাস-দর্শন থেকে ; এবার প্রবর্তিত হল ইতিহাসের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ; এযাবৎকাল যা হয়েছে সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে 'জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

(সে সময় থেকে সমাজতন্ত্র আর কোন বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার হয়ে রইল না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিক-ভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক ফল। যথাসম্ভব নিখুঁত অটুট একটা সমাজব্যবস্থা বানানো আর নয়, তার কাজ হল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ঘটনা পরম্পরা অনুধাবন করা, যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরিতার অনিবার্য উদ্ভব এবং তৎসৃষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা।) কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল, যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসি বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা জানা ছিল না সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিকে বর্জন করা। (পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করা অনিবার্য ঘটনা ; সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কীসে সেই শোষণ, কি ভাবে তার উদ্ভব।) কিন্তু সে জন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে এবং একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অবশ্যম্ভাবিতার মধ্যে দেখানো এবং সেই হেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করা যা তখনো অন্তরালবর্তী, কারণ সমালোচকেরা তখন পর্যন্ত আসল জিনিসকে, প্রক্রিয়াটিকে আক্রমণ করার চাইতে বরং তার মন্দ ফলাফলগুলিকেই আক্রমণ করে এসেছেন। এ কাজ নিষ্পন্ন হল উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ ; বাজার থেকে পণ্য হিসাবে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পুরো মূল্য দিয়েই কেনে তাহলেও সে যে মূল্য দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য আদায় করে

নেয়, এবং শেষ পর্যন্ত এই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই সেই মূল্য সমষ্টির সৃষ্টি যা থেকে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ জমা হচ্ছে। এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সবকিছু খুঁটিনাটি (ও সম্পর্কগুলি) বিস্তারিত করে তোলা।

তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র ও বিলুপ্ত দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপার যখন মোটামুটি এইরকম তখন হঠাৎ হের ইউজেন ড্যুরিং বেশ সশব্দেই মঞ্চে প্রবেশ করে ঘোষণা করলেন যে তিনি দর্শন, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রে এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন।

হের ড্যুরিং আমাদের কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কিভাবে তা পূর্ণ করেছেন, এবার সে কথা বিচার করে দেখা যাক।

দুই

হের ড্যুরিং কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

'Kursus der Philosophie, 'Kursus der National-und Sozialokonomie' এবং 'Kritische Geschichte der Nationalokonomie und des Sozialismus'—হের ড্যুরিং-এর এই রচনাগুলির সঙ্গেই এখানে আমাদের প্রধান সম্পর্ক।২৭ বিশেষ করে প্রথমোক্ত রচনাটি আমাদের মনোযোগ দাবি করছে।

একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই নিজের পরিচয় দিয়ে হের ড্যুরিং বলেছেন যে, তিনি 'সেই লোক যিনি এই শক্তির (দর্শনের) **প্রতিনিধিত্ব করার দাবি** রাখেন—তাঁর নিজের কালে এবং আশু ভবিষ্যৎ-বিকাশ যতদূর পর্যন্ত আন্দাজ করা যায় ততদূর পর্যন্ত।'* এইভাবে তিনি ঘোষণা করলেন যে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের 'যতখানি দেখা সম্ভব' ততখানির তিনিই একমাত্র প্রকৃত দার্শনিক। তাঁর থেকে যে কেউ সরে যাবে সেই সত্য থেকে সরে যাবে। এমন কি হের ড্যুরিং-এর আগেও অনেক ব্যক্তি নিজেদের সম্বন্ধে এই রকম কিছু ভেবেছেন। কিন্তু এক রিচার্ড ভাগনার ছাড়া সম্ভবত তিনিই প্রথম যিনি প্রশান্ত মনে এই কথা বলে ফেললেন। তিনি যে সত্যের উল্লেখ করেছেন তা হল 'শেষ ও চূড়ান্ত সত্য।'

হের ড্যুরিং এর দর্শন হচ্ছে '**স্বাভাবিক প্রণালী** অথবা **বাস্তবতার দর্শন**। …এর মধ্যে বাস্তবতাকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে যাতে পৃথিবী সম্বন্ধে কোন কল্পনাশ্রয়ী ধারণার বা বিষয়ীগতভাবে সীমাবদ্ধ ধারণায় **কোন রকম ঝোঁক না থাকে**।' সুতরাং হের ড্যুরিং-এর নিজের যেসব ব্যক্তিগত ও বিষয়ীগত সীমাবদ্ধতা তিনি নিজেও **অস্বীকার করতে পারবেন না**—এই

---

* হের ড্যুরিং-এর রচনার সকল উদ্ধৃতিতে বড় হরফগুলি এঙ্গেলসের।—সম্পাদক।

দর্শনের প্রকৃতি এমনই যে তা তাঁকে ঐ সব সীমারও ওপরে উঠিয়ে দেবে। আর যদি তাঁকে শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের বিধান দেওয়ার মত অবস্থায় আসতে হয় তাহলে বাস্তবিকপক্ষে এর প্রয়োজন আছে, যদিও সে অলৌকিক ঘটনা কিভাবে ঘটবে এখনো পর্যন্ত আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না।

'জ্ঞানের এই স্বাভাবিক প্রণালী যা আপনা থেকেই মনের কাছে মূল্যবান' তা 'চিন্তার গভীরতায় বিন্দুমাত্র অপহ্নব না ঘটিয়ে সত্তার মৌলিক রূপগুলিকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছে।' এর 'সত্যিকারের সূক্ষ্মদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে 'এমন এক দর্শনের উপাদান পাওয়া যায় যা বাস্তব এবং সেই কারণে তার গতি হল প্রকৃতি ও জীবনের বাস্তবতার দিকে ; যে দিগন্ত শুধু আপাতদৃশ্যমান, তার সিদ্ধতা এই দর্শন স্বীকার করতে পারে না, পরন্তু তার প্রচণ্ড বিপ্লবাত্মক গতি দ্বারা অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির সকল বিশ্ব ও সকল আকাশকে উন্মুক্ত করে দেয়।' এ এক নতুন চিন্তা-পদ্ধতি এবং 'একেবারে তলা থেকেই' এর ফলগুলি হল মৌলিক সিদ্ধান্ত ও মতামত…প্রণালী-সৃষ্টিকারী ধারণা…প্রতিষ্ঠিত সত্য।' এর ভেতর দিয়ে আমাদের সামনে আমরা পাচ্ছি 'এমন এক রচনা যাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে ঘনীভূত উদ্যোগের মধ্যে'—তার মানে যাই হোক ; এমন এক 'তথ্যানুসন্ধান যা মূলে প্রবেশ করবে…এক দৃঢ়মূল বিজ্ঞান…বস্তু ও মানুষ সম্বন্ধে এক কঠোর বৈজ্ঞানিক ধারণা…চতুর্দিকে অনুপ্রবেশকারী চিন্তার রচনা…পূর্বাবয়ব ও সিদ্ধান্তের সৃষ্টিশীল বিবর্তন যা চিন্তাদ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য…পরম মূলতত্ত্ব।' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের প্রণালীবদ্ধভাবে সুবোধ্য ও ঐতিহাসিক রচনা তো দিয়েছেনই যার মধ্যে আবার ঐতিহাসিক রচনাগুলি 'আমার অপূর্ব রচনা শৈলীতে ঐতিহাসিক বিবরণের জন্যে বিশেষ লক্ষণীয়, আর যেগুলি অর্থনীতি সংক্রান্ত সেগুলি 'সৃষ্টিশীল পরিবর্তন' নিয়ে এসেছে ; কিন্তু তারও উপর তিনি শেষকালে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্যে এক নিজস্ব ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন যে পরিকল্পনা 'এমন এক স্বচ্ছ তত্ত্বের ব্যবহারিক ফল যে তত্ত্ব বস্তুসমূহের শেষ শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে' এবং সেই কারণে ড্যুরিং-এর দর্শনের সবই ভ্রমের অতীত এবং মুক্তির পক্ষে একমাত্র পন্থা। কেননা 'আমি আমার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অর্থনীতির পাঠক্রমে যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো এঁকেছি. শুধু তার মধ্যেই এক সত্যিকারের স্বকীয়তা সেই মালিকানার স্থান গ্রহণ করতে পারে,

যে মালিকানা কেবল আপাতদৃশ্যমান, ক্ষণস্থায়ী, এমন কি হিংসাভিত্তিকও বটে।' এবং ভবিষ্যৎকে এই দিকেই চলতে হবে।

হের ড্যুরিং কর্তৃক ড্যুরিং-এর নামে এরকম মহিমাগুলি অনায়াসে আরও দশগুণ বাড়ানো যেত। এখনই হয়ত পাঠকের মনে সন্দেহ জেগে থাকতে পারে যে আলোচ্য ব্যক্তিটি বাস্তবিকই দার্শনিক, না একটি—তবে আমরা পাঠকদের অনুরোধ করি যে পূর্বোক্ত 'মূলের গভীরতার' সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন তাঁদের রায় মুলতবি রাখেন। ওপরে আমরা চয়নিকাটি উপস্থিত করলাম শুধু এ কথাটিই বোঝানোর জন্যে যে, আমাদের সামনে যিনি তিনি এমন কোনো সাধারণ সমাজতন্ত্রী বা দার্শনিক নন যে, শুধু নিজের মতামত বলে দিয়ে তার মূল্য বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেবেন, তিনি এক অসাধারণ প্রাণী, পোপের মতই তিনিও নিজেকে ভ্রান্তিহীন বলে দাবি করেন, তাঁর নীতিই মুক্তির একমাত্র পথ, এবং কেউ যদি অতি-অধম পাষণ্ডত্বে পতিত হতে না চান তবে তাঁকে স্রেফ এই নীতিই স্বীকার করতে হবে। সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে (এবং সম্প্রতি জার্মান সাহিত্যেও), যে সব রচনা প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেছে, যাতে নানারকম বুদ্ধির নানা লোক সমস্যা-সমাধানের উপযোগী যথেষ্ট মালমশলা না পেয়ে বেশ সরলভাবেই নিজেদের মনের মধ্যে সেই সব সমস্যা পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের রচনার বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ত্রুটিবিচ্যুতি যাই হোক সেগুলির সমাজতান্ত্রিক সদিচ্ছা কোনো সময়েই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে আমাদের সামনে যে রচনা হাজির তা কোনো মতেই ঐ সব রচনার মধ্যে পড়ে না। বরং বিপরীত—হের ড্যুরিং আমাদের কতকগুলি নীতি উপহার দিয়ে ঘোষণা করছেন যে এগুলি শেষ ও চূড়ান্ত সত্য, সুতরাং এর বিরোধী যে-কোন মতামত গোড়া থেকেই মিথ্যা; তিনি শুধু অনন্য-সাধারণ সত্যেরই অধিকারী নন, পর্যবেক্ষণের একমাত্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও শুধু তাঁরই অধিকারে, সে তুলনায় অন্য সব পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। হয় তিনি ঠিক—এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে উপস্থিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, প্রথম অতিমানব, কারণ তিনি মানুষ হয়েও অভ্রান্ত। আর না হয় তিনি ভুল এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের রায় যাই হোক, তাঁর যদি কোন সদিচ্ছা থেকে থাকে তবে সে সম্বন্ধে উদারভাবে বিবেচনা করতে গেলে তাতে কিন্তু তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে অপমান করা হবে।

কোন মানুষ যখন শেষ ও চূড়ান্ত সত্য এবং একমাত্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধিকারী এখন ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক বাকি মানব সমাজের প্রতি তাঁর কিছু পরিমাণ অবজ্ঞা থাকবে তা স্বাভাবিক। সুতরাং হের ড্যুরিং যখন তাঁর পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং তার ব্যতিক্রম হিসাবে তিনি নিজেই সামান্য কয়েকজনকে মহৎ ব্যক্তি বলে আখ্যা দেন—যারা তার 'মূলের গভীরতা'র বিচারমঞ্চে দাক্ষিণ্যের আশ্রয় পায়, তখন আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়।

দার্শনিকদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যটি প্রথমে শোনা যাক: 'লীবনিৎজ মহত্তর মনোবৃত্তি থেকে বঞ্চিত…রাজসভার দার্শনিকদের মধ্যে লোকটি শ্রেষ্ঠ।' কাণ্টকে অবশ্য এখনো কোন রকমে সহ্য করা গেছে কিন্তু তারপর থেকে সবই একেবারে গোলমাল: এলো অব্যবহিত পরবর্তী কালের ইপিগনিদের উন্মত্ত প্রলাপ এবং তেমনই শিশুসুলভ ও ফাঁকা মূর্খতা…যাদের নাম ফিকটে, শেলিং…নির্বোধ প্রাকৃতিক দর্শন আওড়ানোর বীভৎস ব্যঙ্গচিত্র…কাণ্টোত্তর বীভৎসা' এবং 'বিকারগ্রস্ত উদ্ভট কল্পনা'—যার শীর্ষে 'হেগেল'। শেষোক্ত ব্যক্তি হেগেলীয় হ য ব র ল ব্যবহার করেন, 'উপরন্তু আঙ্গিকের মধ্যে পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক আচরণ' ও তার অমার্জিত স্থূলতা দ্বারা 'হেগেলীয় মড়ক' ছড়িয়ে দেন।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের বেলায়ও এর চেয়ে ভাল কিছু জোটেনি, কিন্তু শুধু ডারউইনেরই যখন নাম করা হয়েছে তখন তাঁর কথাতেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে: 'ডারউইনীয় অর্ধ-কবিতা এবং রূপান্তর-কুশলতা, আর তার সঙ্গে উপলব্ধি সম্বন্ধে স্থূল ও সচেতন সঙ্কীর্ণতা ও ব্যবর্তনের তীক্ষ্ণতায় দুর্বলতা।… আমাদের মতে ডারউইনবাদের, যার থেকে অবশ্য লামার্কের সূত্রগুলিকে বাদ দিতে হবে, সেই বৈশিষ্ট্য হল মানবতার বিরুদ্ধে এক বর্বরতা।'

কিন্তু সোস্যালিস্টরা মার খেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নগণ্য অন্তত সেই লুই ব্লাঙ্ককে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই পাপী এবং হের ড্যুরিং-এর আগে (কিম্বা পরে) তাঁদের যে খ্যাতি তাঁরা তার উপযুক্ত নন। শুধু সত্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধেই নয়, তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ১৮৭১ সালের জনকয়েক কমিউনার্ডকে ও বাবুফকে বাদ দিলে তাঁদের আর কেউই 'মানুষ' নন। ইউটোপিয়ান (কাল্পনিক সমাজবাদী) তিনজনকে বলা হয়েছে 'মধ্যযুগীয় সামাজিক অ্যালকেমিস্ট'। তাঁদের মধ্যে

কিছুটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে সাঁ-সিমঁকে কারণ তাঁর একমাত্র অপরাধ 'মানসিক উন্নয়ন' এবং সদয়ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তিনি ধর্মীয় ব্রাতিকে ভুগতেন। কিন্তু ফুরিয়ের বেলায় হের ড্যুরিং-এর পুরোপুরি ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কারণ ফুরিয়ে 'সব রকম উন্মত্ততাই প্রকাশ করেছেন…যে সব ধারণা লোকে সাধারণত উন্মাদ আশ্রমের মধ্যেই দেখা যাবে বলে আশা করে… উন্মত্ততম স্বপ্ন…বিকারের ফল।…অকথ্য ধরনের নির্বোধ এই ফুরিয়ে', এই 'বালখিল্য মন,' এই 'গণ্ডমূর্খটি' আবার সোস্যালিস্টও নন, তাঁর ফালান্‌স্টেরি ২৮ কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ সাম্যবাদ নয় বরং 'দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরনে গঠিত এক ব্যঙ্গচিত্র'। আর তারপর 'এই উচ্ছ্বাসগুলি (নিউটন সম্পর্কে ফুরিয়েরের উচ্ছ্বাসগুলি) দেখেই কেউ যদি…বুঝতে না পারেন যে ফুরিয়েরের নাম এবং তাঁর সমগ্র ফুরিয়েরবাদের মধ্যে শুধু প্রথম শব্দাংশটিতেই (ফু-পাগল) কিছু সত্য আছে, তাহলে তাঁকেও কোন না কোন গণ্ডমূর্খ' শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে হবে'। সব শেষে, রবার্ট ওয়েনের 'ধারণাগুলো ছিল দুর্বল ও আজেবাজে…তাঁর যুক্তির নীতিবত্তা অতি স্থূল…দুই একটা অতি সাধারণ কথা বা আরও অধঃপতিত হয়ে বিকৃতিতে পরিণত…পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি নির্বোধ ও অমার্জিত।…ওয়েনের ধ্যানধারণারধারাটিকে আরও গুরুতররূপে সমালোচনা করা পণ্ডশ্রম…তাঁর অহঙ্কার'—ইত্যাদি ইত্যাদি। অত্যন্ত রসিকতা সহকারে হের ড্যুরিং ইউটোপিয়ানদের চরিত্র চিত্রণ করেছেন তাঁদের নাম দিয়ে যেমন: সাঁ-সিমঁ—সাঁ (পুণ্যাত্মা); ফুরিয়ের—ফু (পাগল); অংফাঁত্যাঁ—অংফাঁ (বালখিল্য; তারপরে শুধু এইটুকু যোগ করা দরকার: Owen o woe! (ওয়েন—হায় রে কপাল!)—আর তাহলেই সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে চারটি শব্দের মধ্যে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে নেওয়া যাবে; আর এ বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে তাহলে 'তাকেও কোন না কোন গণ্ডমূর্খ' শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে হবে।'

পরবর্তী কালের সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর মতামতস্বরূপ সংক্ষেপে শুধু লাসাল ও মার্কস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক:

লাসালঃ পণ্ডিতম্মন্য,…উদগ্র বিদ্যাবাগীশতা…প্রচার করার জন্যে চুল-চেরা সাধারণতত্ত্ব ও সামান্য হাবিজাবির উৎকট খিচুড়ী…হেগেলীয় কুসংস্কার, অর্থহীন ও আকৃতিহীন…বিভীষিকাময় উদাহরণ…অদ্ভুত রকমে সীমাবদ্ধ…তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়ে সাড়ম্বর প্রদর্শন…আমাদের ইহুদি

বীর···পুস্তিকা লেখক···সাধারণ···জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত অস্থিরতা।'

মার্কস: "ধারণার সংকীর্ণতা···তাঁর গ্রন্থ ও কৃতিত্বগুলিকে খাঁটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে আমাদের ক্ষেত্রে (সমাজতন্ত্রের সমালোচনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে) সেগুলির কোন স্থায়ী তাৎপর্য নেই, এবং বুদ্ধিমার্গীয় প্রবণতার সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে সেগুলিকে বড়জোর এইভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেগুলি আধুনিক সংকীর্ণতাবাদী বিদ্যাবাগীশতার একটি শাখার প্রভাবের লক্ষণ··ঘনীভূত চিন্তা ও প্রণালীবদ্ধ করণের অক্ষমতা ···চিন্তা ও লিখন ভঙ্গির খর্বতা, ভাষার স্থূল কৃত্রিমতা···ইংরেজিয়ানা অহমিকা···প্রতারণা···নিষ্ফলা ধারণা যেগুলি বাস্তবে ইতিহাস ও তর্কশাস্ত্রগত অলীক কল্পনার জারজ সন্তান···বিভ্রান্তিকর বিকৃতি···ব্যক্তিগত অহমিকা··· নীচ মুদ্রাদোষ...বদমেজাজী···রসিকতার নামে ভাঁড়ামি...চীনা পাণ্ডিত্য··· দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপদতা।'

এমনি আরও কত কী—কারণ হের ড্যুরিং-এর গোলাপ বাগিচা থেকে এতো একটি ছোট্ট তোড়া মাত্র—ওপর ওপর সংগৃহীত ফুল দিয়ে তৈরি। হের ড্যুরিং-এর যদি কোনো শিক্ষা থেকে থাকে তাহলে তাঁর এই মধুর গালাগালি-গুলির মধ্যে এতটুকুও জঘন্যতা বা বদমেজাজ খুঁজে পাওয়া উচিত না; তবে একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে এই গালাগালিগুলিও শেষ ও চূড়ান্ত সত্য কিনা তা নিয়ে এখন আমরা এতটুকুও মাথা ঘামাচ্ছি না। এবং—এখনকার মত—আমরা এগুলির মূলের গভীরতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উচ্চারণ করব না, কারণ যদি করি তা হলে আমরা কোন্ শ্রেণীর গণ্ডমূর্খ সে অনুসন্ধানও নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। হের ড্যুরিং যাকে 'সুবিবেচক বাকভঙ্গি এবং প্রকৃত অর্থে অকঠোর বাকভঙ্গির সুনির্বাচিত ভাষা' বলে বর্ণনা করেছেন—আমরা শুধু ভেবেছিলাম যে একদিকে তারই একটা উদাহরণ দেওয়া আমাদের কর্তব্য; অন্য দিকে, হের ড্যুরিং-এর কাছে আমাদের এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া কর্তব্য যে তাঁর নিজের ভ্রান্তিহীনতা যতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য তাঁর পূর্বগামী-দের অপদার্থতাও তার চেয়ে কিছু কম সত্য নয়, আর ঘটনা যদি বাস্তবিকই সেইরকম হয় তাহলে আমরা অতঃপর সর্বকালের এই শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার সম্মুখে গভীরতম শ্রদ্ধা সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

প্রথম খণ্ড

দর্শন

তিন

শ্রেণীবিন্যাস। পূর্বসিদ্ধান্তবাদ

হের ড্যুরিং এর মতে পৃথিবী ও জীবন সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধরনের চৈতন্যের বিকাশই দর্শন—এবং ব্যাপকতর অর্থে সকল জ্ঞান ও অভীপ্সার নীতিগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। যেখানেই কতকগুলি প্রজ্ঞান বা অনুপ্রাণনার পরম্পরা কিংবা সত্তার এক গুচ্ছ বহিরঙ্গ মানবচৈতন্য দ্বারা পরীক্ষিত হয়, সেখানেই এই সকল প্রকাশের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি আবশ্যিকভাবে দর্শনের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এই নীতিগুলি হয় বহুমুখী জ্ঞান ও মননের সরল উপাদান, (এখন পর্যন্ত সেগুলিকে সরল বলেই ধরে নেওয়া হয়)। পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিন্যাসের মতই বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ সংস্থাপনকে মূলগত আকৃতি ও মূলগত উপাদানে পর্যবসিত করা যায়। এই সকল চূড়ান্ত উপাদান অথবা সূত্র একবার আবিষ্কৃত হওয়ার পর সেগুলি পরিজ্ঞাত ও নাগালের মধ্যেকার যাবতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে তো বটেই, যেসব জিনিস এবং যে-বিশ্ব অজ্ঞাত ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে সম্বন্ধেও ঐ সূত্রগুলি বলবৎ। সুতরাং দার্শনিক সূত্রগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত পরিপূরকত্ব প্রদান করে যার ফলে বিজ্ঞানগুলি এমন একটি সমভাবাপন্ন প্রণালীতে পরিণত হয় যার দ্বারা প্রকৃতি ও মানবজীবনকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সকল অস্তিত্বের মৌলিক আকৃতি ছাড়া দর্শনের কাছে পর্যালোচনার জন্য দুটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয় উপস্থিত—প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ। সেই কারণে আমাদের উপাদান সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তিনটি ভাগে বিন্যস্ত যথা, বিশ্বের সাধারণ ছক, প্রকৃতির নীতিসমূহের বিজ্ঞান এবং সর্বশেষে মানবজাতির বিজ্ঞান। এই অনুক্রমের মধ্যে আবার একই সময় এক অভ্যন্তরীণ যুক্তিগত পরম্পরা বর্তমান, কারণ যেসকল আনুষ্ঠানিক নীতি সকল সত্তার পক্ষে প্রয়োজ্য, সেগুলি আগে আসে, আর যেসব বস্তুর জগতে সেগুলিকে প্রয়োগ করা হবে, সেগুলি আপন আপন অধীনতার ক্রম অনুসারে পরে আসে।

এই পর্যন্ত হের ড্যুরিং-এর কথা প্রায় হুবহু দেওয়া হল।

সুতরাং এখানে তাঁর কারবার নীতি নিয়ে, আনুষ্ঠানিক মতবাদ নিয়ে—যেগুলি বাইরের থেকে আসেনি, এসেছে চিন্তা থেকে; সেগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের জগতের উপর এবং সেই কারণে প্রকৃতি ও মানুষকে সেগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। কিন্তু চিন্তা এইসব নীতি পাচ্ছে কোথা থেকে? নিজের কাছ থেকে? না, কারণ হের ড্যুরিং নিজেই বলছেন: বিশুদ্ধ চিন্তার জগৎ সীমাবদ্ধ রয়েছে যুক্তিগত প্রকল্প ও গণিতের আঙ্গিকের মধ্যে (আমরা দেখতে পাব যে শেষের এগুলি আবার ভুল)। যুক্তিগত প্রকল্পের সম্পর্ক থাকতে পারে কেবল চিন্তার আঙ্গিকের সঙ্গে; কিন্তু এখানে আমরা কারবার করছি শুধু সত্তার আঙ্গিক, বহির্বিশ্বের আঙ্গিক নিয়ে এবং এই আঙ্গিকগুলিকে চিন্তা কখনই তার নিজের ভেতর থেকে সৃষ্টি করতে বা বের করে আনতে পারে না, পারে শুধু বহির্বিশ্ব থেকে। কিন্তু তাহলে গোটা সম্পর্কটাই উল্টে যায়: নীতিগুলি সার পর্যালোচনার সূচনাবিন্দু নয়, তার শেষ ফল; সেগুলি প্রকৃতি ও মানবেতিহাসে প্রযুক্ত নয় বরং প্রকৃতি ও মানব ইতিহাস থেকেই নিষ্কাশিত; প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ নীতিগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে না বরং নীতিগুলি যতক্ষণ প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে মানানসই, শুধু ততক্ষণই সেগুলির মূল্য।

এটি এ বিষয়ে একমাত্র বস্তুবাদী ধারণা, আর হের ড্যুরিং-এর বিপরীত ধারণা ভাববাদী, তিনি সব জিনিসকে একেবারে মাথার উপর দাঁড় করিয়েছেন এবং বাস্তব পৃথিবীকে গঠন করেছেন ধারণা থেকে, প্রকল্প ও নকশা থেকে, অথবা এমন সব বর্গ থেকে যেগুলি পৃথিবীর আগেই অনন্তকাল ধরে কোথাও বিরাজ করছিল—ঠিক যেন একজন হেগেলের মতো।

বস্তুত হের ড্যুরিং-এর শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের সঙ্গে হেগেলের 'বিশ্বকোষ'২৯ তথা তদন্তর্গত বিকারগ্রস্ত উদ্ভট কল্পনাগুলি তুলনা করা যাক। হের ড্যুরিং-এর কাছে আমরা প্রথমে পেয়েছি সাধারণ বিশ্ব-প্রকল্পবাদ, হেগেল-এর নাম দিয়েছেন 'যুক্তিশাস্ত্র' তারপর তাঁরা উভয়েই এই সকল প্রকল্প বা যুক্তিগত বর্গগুলিকে প্রয়োগ করেছেন প্রকৃতির উপর: প্রকৃতির দর্শন; আর শেষপর্যন্ত সেগুলিকে প্রয়োগ করেছেন মানুষের জগতে, হেগেল তার নাম দিয়েছেন মনের দর্শন। সুতরাং ড্যুরিং-এর অনুক্রমের অভ্যন্তরীণ যুক্তিগত পরম্পরা 'খুব স্বাভাবিকভাবেই' আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেগেলের

'বিশ্বকোষে'—এই বিশ্বকোষ থেকে তিনি এত বিশ্বস্তভাবে এটিকে গ্রহণ করেছেন যে হেগেলীয় গোষ্ঠীর ভ্রাম্যমান ইহুদী বার্লিনের অধ্যাপক মিশেলেটের চোখ দিয়ে একেবারে জল গড়িয়ে পড়বে।৩০

একেবারে স্বভাববাদীর মতো 'চৈতন্য', ও 'চিন্তাকে' যদি এমন কিছু বলে ধরে নেওয়া যায় যা গোড়া থেকেই আছে এবং গোড়া থেকেই সত্তার ও প্রকৃতির বিরোধী, তাহলে ফল এইরকমই দাঁড়ায়। ঘটনা যদি ঐরকমই হতো তাহলে চৈতন্য ও প্রকৃতি, চিন্তা ও সত্তা, চিন্তার নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়ম কী করে এত কাছাকাছি হল ভাবলে খুবই আশ্চর্য লাগে। কিন্তু যদি আরও প্রশ্ন তোলা যায় যে চিন্তা ও চৈতন্য বাস্তবিকই কী এবং কোথা থেকে এল, তাহলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি মানুষের মস্তিষ্কের ফসল এবং মানুষ নিজেও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন—যে প্রকৃতি তার পরিবেশের মধ্যে এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে ; সুতরাং ঐকথা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষের মস্তিষ্কের ফসলগুলি যেহেতু শেষ পর্যন্ত আবার প্রকৃতিরও ফসল সেইহেতু মস্তিষ্কের ফসলগুলি প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রতিবন্ধ নয় বরং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।৩১

কিন্তু হের ড্যুরিং এ রকম সাদাসিধেভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন না। তিনি শুধু মানব সমাজের নামেই চিন্তা করেন না (শুধু সে কাজটাও বড় সামান্য নয়), নভোমণ্ডলস্থ সকল গ্রহ-তারার অধিবাসী সমস্ত সচেতন ও যুক্তিবাদী প্রাণীর নামেও তিনি চিন্তা করেন।

> বস্তুতঃ 'চৈতন্য ও জ্ঞানের উপর "মানবিক" সংজ্ঞা আরোপ করে সেগুলির সার্বভৌম বৈধতা এবং নিঃশর্ত সত্যতার দাবি নাকচ করলে, এমন কি সে সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করলে, তাতে চৈতন্য ও জ্ঞানের মূল রূপগুলিকেই অধঃপতিত করা' হবে।•

নভোমণ্ডলস্থ কোন গ্রহ-তারায় দুই-দুগুণে পাঁচ হয় এরকম সন্দেহ যাতে জাগতে না পারে সে জন্যে তিনি চিন্তাকে মানবিক বলে নির্দেশ করার সাহস পাচ্ছেন না ; তাই চিন্তার একমাত্র বাস্তব ভিত্তি যে মানুষ ও প্রকৃতি তার থেকেই তিনি চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন, তার ফলে এমন এক মতাদর্শে'র মধ্যে তিনি একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন যাতে তিনি 'উত্তরাধিকারী' হেগেলের 'উত্তরাধিকারী' রূপেই প্রতিভাত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি

নভোমণ্ডলস্থ অন্যান্য গ্রহ-তারায় আবার হের ড্যুরিং-এর সঙ্গে আমাদের ঘন ঘন দেখা হবে।

বলা বাহুল্য, মতাদর্শগত এই রকম ভিত্তির উপর কোন বস্তুবাদী নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরে আমরা দেখতে পাব যে হের ড্যুরিং একাধিকবার গোপনে গোপনে প্রকৃতির উপরই সচেতন কর্মতৎপরতার গুণ—যাকে সহজ ভাষায় দেবত্ব বলা হয়—আরোপ করতে বাধ্য হয়েছেন।

সে যাই হোক আমাদের এই বাস্তববাদী দার্শনিকের পক্ষে সকল বাস্তবতার ভিত্তিকে বাস্তব জগৎ থেকে চিন্তার জগতে সরিয়ে দেওয়ার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। এই সাধারণ বিশ্বপ্রকল্পবাদ এবং সত্তার এইসব আনুষ্ঠানিক নীতি—এগুলির বিজ্ঞানই হল তাঁর দর্শনের ভিত্তি। বিশ্বপ্রকল্পবাদকে আমাদের মন থেকে রচনা না করে, শুধু যদি আমাদের মনের ভেতর দিয়ে বাস্তব পৃথিবী থেকে রচনা করি, যা আছে তা থেকেই যদি আমরা সত্তার নীতি নির্ণয় করি, তা হলে তার জন্যে দর্শনের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় পৃথিবী ও পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে সদর্থক জ্ঞান, এবং তার থেকে যা পাওয়া যায় তাও দর্শন নয় পরন্তু সদর্থক বিজ্ঞান। কিন্তু সে ক্ষেত্রে হের ড্যুরিং-এর গোটা গ্রন্থটাই হবে একটা পণ্ডশ্রম।

অধিকন্তু, দর্শন হিসাবে দর্শনের যদি আর দরকার না থাকে, তাহলে কোন প্রণালীর, এমনকি দর্শনের কোন স্বাভাবিক প্রণালীরও আর প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতির সকল প্রক্রিয়াই প্রণালীবদ্ধভাবে সংযুক্ত—এই অনুভূতি থেকেই বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করতে অগ্রসর হয় যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, কি সাধারণ কি বিশেষ ক্ষেত্রে, এই প্রণালীবদ্ধ সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু চূড়ান্ত ও যথোপযুক্তভাবে এই আন্তঃসম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা এবং যে বিশ্ব-প্রণালীর মধ্যে আমরা বাস করি তার একটি অবিকল ভাবমূর্তি রচনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব এবং চিরকালই অসম্ভব থাকবে। মানব জাতির বিবর্তনের পথে কোন সময়ে যদি পৃথিবীর অন্তর্গত শারীরিক এবং মানসিক ও ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্কের এরূপ কোন শেষ ও চূড়ান্ত প্রণালী উপস্থিত করা যায়, তবে তার অর্থ হবে যে মানুষের জ্ঞান শেষ সীমায় পৌঁছেছে, আর যখন সমাজকে সেই প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এ এক আজগুবি ধারণা, একেবারে জ্ঞানকাণ্ডহীন। সুতরাং মানব জাতির সামনে একটা বিরোধ

উপস্থিত হচ্ছে : একদিকে তাকে সকল আন্তঃসম্পর্কের মধ্যেই পার্থিব প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে ; অন্যদিকে, মানুষ ও বিশ্বপ্রণালী দুইয়েরই যে-প্রকৃতি, তার ফলে এই কাজ কখনই পূর্ণরূপে সম্পাদিত হতে পারবে না। তবে পৃথিবী ও মানুষ এই দুই উপাদানের প্রকৃতির মধ্যেই শুধু এই বিরোধ নয়, এই বিরোধই আবার সকল বৌদ্ধিক অগ্রগতির প্রধান প্রেরণা এবং মানব সমাজের অন্তঃহীন প্রগতিশীল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে দিনে দিনে নিরন্তরভাবে, যেমন নিরবচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের এক অসীম পরম্পরার ভেতর দিয়ে গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধান পাওয়া যায়। পার্থিব প্রণালীর প্রতিটি ভাবমূর্তি বাস্তবিকপক্ষে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং হয়ে থাকে—বিষয়গত দিক থেকে ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারা এবং বিষয়ীগত দিক থেকে সৃষ্টিকারীর দৈহিক ও মানসিক সংস্থান দ্বারা। কিন্তু হের ড্যুরিং আগে থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবী সম্বন্ধে বিষয়ীগতভাবে সীমাবদ্ধ ধারণার কোন প্রবণতা তাঁর যুক্তি-প্রকরণের মধ্যে থাকতে পারে না। আমরা আগে দেখেছি যে তিনি সর্বব্যাপী—সম্ভাব্য সকল গ্রহ-তারাতেই বর্তমান। এখন আবার দেখছি যে তিনি সর্বজ্ঞও বটেন। বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সমস্যাগুলি তিনি মীমাংসা করে ফেলেছেন, ফলে সকল বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের পথেই প্রাচীর তুলে দিয়েছেন।

সত্তার মূল রূপগুলির বেলায়ও যা বিশুদ্ধ, অঙ্কের বেলায়ও তাই : হের ড্যুরিং মনে করেন, সেটিকে কারণ থেকে কার্যরূপে উৎপাদন করা যায় অর্থাৎ বহির্জগৎ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার না করে তাঁর মগজ থেকেই বের করে আনতে পারেন।

> বিশুদ্ধতার গণিতে মনের কারবার হল : 'তার নিজের স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনার সঙ্গে' ; 'মন যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিজে থেকেই সৃষ্টি করতে পারে তার উপযুক্ত বস্তু হল' সংখ্যা ও অঙ্কের ধারণা, আর সেই জন্যে এর এমন 'যথার্থতা আছে যা কোন **বিশেষ** অভিজ্ঞতা থেকে এবং পৃথিবীর বাস্তব মর্মবস্তু থেকে স্বাধীন।'

প্রত্যেক ব্যক্তির **বিশেষ** অভিজ্ঞতা থেকে বিশুদ্ধ গণিতের যথার্থতা যে স্বাধীন সে কথা ঠিক, প্রত্যেক বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সকল তথ্য সম্বন্ধেও একথা সত্য, বাস্তবিকপক্ষে যে কোন তথ্য সম্বন্ধেই সত্য। চুম্বকের যে দুটি মেরু, জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে গঠিত, হেগেল যে মৃত আর হের

ডা্যরিং যে জীবিত—এই তথ্যগুলি আমার বা অন্য যে-কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, এমন কি হের ডা্যরিং-এর সাধু জীবন যখন সাঙ্গ হবে তখনও এগুলি তাঁর অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু একথা মোটেই সত্য নয় যে বিশুদ্ধ গণিতে মন শুধু নিজের সৃষ্টি ও কল্পনা নিয়ে কাজ করে। বাস্তব পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন সূত্র থেকে সংখ্যা ও অঙ্কের ধারণা নিষ্কাশিত হয়নি। যে দশ আঙ্গুল দিয়ে মানুষ গুনতে শেখে অর্থাৎ প্রথম গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, সেগুলি আর যাই হোক, মনের স্বাধীন সৃষ্টি কখনই নয়। গণনার জন্য গণনাযোগ্য বস্তুর তো প্রয়োজন আছেই, তার উপর এমন দক্ষতারও প্রয়োজন হয় যাতে বস্তুগুলির সংখ্যা ছাড়া অন্য সমস্ত গুণাগুণ বাদ দিয়ে রাখা যায়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হল এই দক্ষতা। সংখ্যার ধারণার মতই অঙ্কের ধারণাও সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ থেকে ধার করা, বিশুদ্ধ চিন্তার ভেতর দিয়ে মনের মধ্যে তার উদয় হয়নি। আকার-আকৃতি আছে এমন সমস্ত জিনিস নিশ্চয়ই ছিল এবং অঙ্কের ধারণায় পৌছানর আগে আকারগুলিকে নিশ্চয়ই তুলনা করা হয়েছিল। বিশুদ্ধ গণিতের কারবার হল বাস্তব পৃথিবীর স্থানগত (space) আকৃতি ও পরিমাণগত সম্বন্ধের সঙ্গে, অর্থাৎ এমন জিনিসের সঙ্গে যা প্রকৃতই অত্যন্ত বাস্তব। এই জিনিসটি পরম বিমূর্ত রূপে দেখা দেয় বলে শুধু উপর উপর ভাবেই বহির্জগৎ থেকে তার উৎপত্তি ঢাকা থাকতে পারে। কিন্তু এই সব আকৃতি ও সম্বন্ধগুলিকে যাতে বিশুদ্ধ অবস্থায় অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় সেই জন্যে অন্তর্বস্তু থেকে সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা দরকার, অন্তর্বস্তুকে অবান্তর রূপে পাশে সরিয়ে রাখা দরকার; এইভাবে দেখা যায় বিন্দু আছে কিন্তু তার আয়তন নেই, রেখা আছে কিন্তু তার প্রস্থ বা ঘনত্ব নেই, A ও B আর X ও Y, ধ্রুবক (constant) ও চল (variable) এইভাবে পাই; একেবারে শেষে গিয়ে তবেই আমরা পৌঁছাই মনের নিজের স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনার কাছে অর্থাৎ কাল্পনিক পরিমাণের কাছে। এমন কি গাণিতিক পরিমাণগুলিকে যদিও পরস্পর থেকে উৎপন্ন বলে দৃশ্যত মনে হয়, তাহলেও তার থেকে প্রমাণ হয় না যে তাদের উৎপত্তি পূর্বতঃসিদ্ধরূপে, শুধু প্রমাণ হয় তাদের যুক্তিসিদ্ধ সম্বন্ধ। 'একটি আয়তক্ষেত্র তার এক একপাশ ঘিরে ঘুরতে থাকলে তার থেকে একটি বেলনের (cylinder) আকৃতি নির্ধারণ করার ধারণা মনে আসার আগে কতকগুলি প্রকৃত আয়তক্ষেত্র ও বেলন—সেগুলির রূপ যতই অসম্পূর্ণ হোক—নিশ্চয়ই পরীক্ষা করা হয়েছিল। অন্য

সকল বিজ্ঞানের মত গণিতের উৎপত্তিও মানুষের প্রয়োজন থেকে : জমির ও পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর পরিমাপ থেকে, সময়ের হিসাব থেকে এবং বলবিদ্যা থেকে। কিন্তু চিন্তার প্রত্যেকটি বিভাগের মতই যে সমস্ত নিয়ম বাস্তব পৃথিবী থেকে নিষ্কাশিত, সেইগুলি বিকাশের কোন এক পর্যায়ে এসে বাস্তব পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেগুলিকে পৃথিবীর বিরুদ্ধে এই বলে খাড়া করা হয় যে এগুলি স্বাধীন, এ নিয়মগুলি বাইরে থেকে আসছে এবং এগুলির সঙ্গে পৃথিবীর নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। সমাজে ও রাষ্ট্রে ঘটনাবলী এইভাবে ঘটেছিল, এবং এইভাবে, অন্যভাবে নয়, বিশুদ্ধ গণিতকে পরে পৃথিবীর উপর প্রয়োগ করা হয়, যদিও ঐ একই পৃথিবী থেকে এই গণিতকে ধার করে আনা হয়েছে এবং পৃথিবীর আন্তঃসম্পর্কের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এটি একটি অংশমাত্র ; আর এটিকে যে একেবারে প্রয়োগ করা যায় তা ঠিক এই কারণেই।

কিন্তু হের ড্যুরিং-এর কল্পনা অনুসারে গণিতের স্বতঃসিদ্ধগুলিও—'বিশুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের মতে যেগুলির প্রমাণ প্রয়োজন হয় না, প্রমাণ করাও যায় না,' সেগুলি থেকে কোনরূপ প্রায়োগিক সংমিশ্রণ ব্যতিরেকেই তিনি সমগ্র বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র টেনে নিয়ে আসতে পারেন এবং তারপর সেইটিকে পৃথিবীর উপর প্রয়োগ করতে পারেন। ঠিক সেইভাবেই তিনি মনে করেন যে প্রথমত তিনি তাঁর মাথা থেকেই সৃষ্টি করে দিতে পারেন সত্তার মূল রূপ-গুলিকে, সকল জ্ঞানের সরল উপাদানগুলিকে ও দর্শনের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে, এবং এগুলি থেকে সিদ্ধান্ত টানতে পারেন সমগ্র দর্শন অথবা পৃথিবীর প্রকল্পবাদ সম্বন্ধে। আর তারপর রাজার মত ডিক্রি জারি করে তার এই সংবিধানটিকে আরোপ করতে পারেন প্রকৃতি ও মানব সমাজের উপর। দুর্ভাগ্য যে, ১৮৫০ সালের Manteuffelite ৩২ প্রুশিয়ানদের নিয়ে এ প্রকৃতি মোটেই গঠিত হয়নি, মনুষ্য সমাজের মধ্যেও তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ।

গণিতের স্বতঃসিদ্ধগুলি এমন অভিব্যক্তি যার মধ্যে চিন্তাগত বিষয়বস্তু সামান্যতম ; গণিত এইগুলিকে ধার করে আনতে বাধ্য হয়েছে তর্কবিজ্ঞান থেকে। স্বতঃসিদ্ধগুলিকে শেষ পর্যন্ত এইরকম দুটিতে নামিয়ে আনা যায় :

(১) সমগ্র তার অংশের চেয়ে বড়। বক্তব্যটি একই অর্থের দ্বিরুক্তি মাত্র, কারণ 'অংশ' একটি পরিমাণগত ধারণা, গোড়া থেকেই 'সমগ্রের' ধারণার সঙ্গে তার সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত এ সম্পর্ক এমনই যে 'অংশের' সরল অর্থ

হল—পরিমাণগত 'সমগ্র' কয়েকটি পরিমাণগত 'অংশের' দ্বারা গঠিত। একথা স্পষ্টভাবে বললে তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধটি আমাদের এক পাও এগিয়ে দেয় না। এমন কি এই দ্বিরুক্তিটিকে একরকম প্রমাণও করা যায় যদি বলা হয়: যা কয়েকটি অংশ দ্বারা গঠিত তাই সমগ্র; যে কয়েকটি দ্বারা সমগ্র গঠিত হয় তার প্রত্যেকটি একটি অংশ; সুতরাং অংশ সমগ্রের চেয়ে ছোট—এর মধ্যে দ্বিরুক্তির শূন্যগর্ভতা থেকে অন্তর্বস্তুর শূন্যগর্ভতা আরও প্রকট।

(২) দুটি রাশি যদি কোন তৃতীয় রাশির সঙ্গে সমান হয় তাহলে তারা পরস্পরের সঙ্গে সমান। হেগেল ইতিপূর্বেই দেখিয়ে গিয়েছেন যে এই বক্তব্যটি একটি সিদ্ধান্ত, তর্কবিজ্ঞান এর সঠিকতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।[৩৩] সুতরাং বক্তব্যটি প্রমাণিত—যদিও বিশুদ্ধ গণিতের বাইরে থেকে। সমতা ও অসমতা সম্বন্ধে বাকী স্বতঃসিদ্ধগুলি এই সিদ্ধান্তেরই যুক্তিসঙ্গত প্রসার মাত্র।

গণিতে বা অন্য কোথাও এইসব সামান্য নীতির বিশেষ কোন মূল্য নেই। আরও অগ্রসর হতে হলে আমরা বাস্তব সম্পর্কগুলিকে নিয়ে আসতে বাধ্য হই—যে সব সম্পর্ক ও স্থানগত আকৃতি বাস্তব বস্তু থেকে গৃহীত। রেখা, সমতল, কোণ, বহুভুজ, ঘনক, গোলক ইত্যাদির ধারণা বাস্তব থেকেই গৃহীত। স্থূল ভাবাদর্শের উপর অতি আস্থা থাকলে তবেই গণিতজ্ঞদের কথা বিশ্বাস করা যায় যে মহাশূন্যে একটি বিন্দুর সঞ্চরণ থেকে প্রথম রেখার আবির্ভাব, একটি রেখার সঞ্চরণ থেকে প্রথম সমতলের আবির্ভাব, একটি সমতলের সঞ্চরণ থেকে প্রথম কঠিন পদার্থের আবির্ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম ধারণার বিরুদ্ধে ভাষা পর্যন্ত বিদ্রোহ করবে। তিন মাত্রার গাণিতিক চিত্রকে বলা হয় কঠিন পদার্থ, corpus solidium—সুতরাং লাতিন ভাষায়ও এটি একটি স্পর্শযোগ্য বস্তু; সেই জন্যে এর নাম এসেছে কঠোর বাস্তবতা থেকে, মনের স্বাধীন কল্পনা থেকে কখনই নয়।

কিন্তু এত বাকবিস্তারের প্রয়োজন কি? অভিজ্ঞতার পৃথিবী থেকে বিশুদ্ধ গণিতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে হের ড্যুরিং ৪২ ও ৪৩[৩৪] পৃষ্ঠায় সোৎসাহে গান ধরেছেন, গান ধরেছেন তার কারণ-কার্য রূপ সম্বন্ধে, মনের নিজস্ব স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনার প্রতি নিবিষ্টতা থাকা সম্বন্ধে। তারপর ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন:

> 'অবশ্য একথা সহজেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে ঐ গাণিতিক উপাদানগুলি (সংখ্যা, পরিমাণ, দেশ, কাল এবং জ্যামিতিক গতি) শুধু আকৃতির দিক থেকেই আদর্শ,… সুতরাং অনপেক্ষ পরিমাণ-

গুলি এমন জিনিস যা সম্পূর্ণরূপে প্রায়োগিক, তা যে প্রজাতিতেই সেগুলির স্থান হোক না কেন', ...কিন্তু 'গাণিতিক প্রকল্পগুলির এমন চরিত্র চিত্রণ সম্ভব যা, অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও উপযুক্ত'।

শেষ বক্তব্যটি প্রত্যেক বিমূর্তকরণ সম্বন্ধেই কম বেশি সত্য, কিন্তু তাতে কোন মতেই প্রমাণ হয় না যে সেটি বাস্তব থেকে বিমূর্ত রূপ পায়নি। বিশ্ব-প্রকল্পে বিশুদ্ধ গণিতের উৎপত্তি বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে—আর প্রকৃতির দর্শনে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রায়োগিক, বহির্জগৎ থেকে গৃহীত তারপর তা থেকে বিচ্ছিন্ন। কোনটা আমরা বিশ্বাস করব?

চার

বিশ্ব-প্রকল্পবাদ

'সর্বব্যাপক সত্তা অখণ্ড। তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে পাশে বা উপরে কিছু নেই। দ্বিতীয় কোনো সত্তাকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করলে, এ যা নয় একে তাই করা হবে, অর্থাৎ একে আরও ব্যাপকতর সমগ্রের অংশ বা উপাদানে পরিণত করা হবে। আমরা আমাদের একত্রীভূত চিন্তাকে কাঠামোর মত প্রসারিত করি বলে এই চিন্তা-ঐক্যের অন্তর্গত কোন জিনিসই নিজের মধ্যে দ্বৈতভাব রক্ষা করতে পারে না। আবার কোন কিছুই এই চিন্তা ঐক্যকে এড়িয়ে যেতে পারে না। ...চেতনার বিভিন্ন উপাদানকে একটি ঐক্যের মধ্যে সংযুক্ত করাই সকল চিন্তার সারাৎসার।...সমন্বয়ের ঐক্যের বিন্দু থেকেই জগতের অবিভাজ্যতার ধারণা এসেছে এবং পৃথিবীকে এমন কিছু রূপে উপলব্ধি করা হয়েছে যেখানে সব কিছুই একটি ঐক্যের মধ্যে গ্রথিত; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ইউনিভার্স নামের মধ্যেও একথা অন্তর্নিহিত।'

এই পর্যন্ত হের ড্যুরিং-এর বক্তব্য। গাণিতিক পদ্ধতির এটিই প্রথম প্রয়োগ :

'প্রত্যেক সমস্যারই মীমাংসা করতে হবে স্বতঃসিদ্ধভাবে, সরল মূল আঙ্গিক অনুসারে, যেন আমরা সরল...গাণিতিক নীতি... নিয়েই কারবার করছি।'

'সর্বব্যাপী সত্তা অখণ্ড'। বিবৃক্তি অর্থাৎ কর্তৃপদে যে কথা আগেই বলা হয়েছে কর্মপদে তারই পুনরাবৃত্তি করলে যদি স্বতঃসিদ্ধ তৈরি হয়, তাহলে আমরা এখানে একেবারে খাঁটি স্বতঃসিদ্ধ পাচ্ছি। হের ড্যুরিং কর্তৃপদে বলে দিচ্ছেন যে সব কিছুই সত্তায় বিধৃত, আর

সর্বপদে নির্ভয়ে ঘোষণা করছেন যে তাহলে তার বাইরে কিছু নেই।
কী বিরাট 'দর্শনতন্ত্র-সৃষ্টিকারী চিন্তা !'

বাস্তবিকই এটি দর্শনতন্ত্র-সৃষ্টিকারী। পরবর্তী ছ'লাইনের মধ্যেই হের ড্যুরিং সত্তার অখণ্ডতাকে একত্রীভূত চিন্তার সাহায্যে ঐক্যে রূপান্তরিত করেছেন। বিভিন্ন বস্তুকে একটি ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসাই যখন সকল চিন্তার সারবস্তু, তখন সত্তার ধারণা করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একত্রীভূত রূপে ধারণা করা হচ্ছে। এবং পৃথিবীকে অবিভাজ্যরূপে মনে করা হচ্ছে, আর যেহেতু ধারণাকৃত সত্তা, পৃথিবীর ধারণা একত্রীভূত, সেহেতু প্রকৃত সত্তা ও প্রকৃত পৃথিবীও এক অবিভাজ্য ঐক্য। তখন 'মন যদি সত্তাকে তার সমাকার বিশ্বজনীনতার মধ্যে ধারণা করতে পেরে থাকে, তাহলে আর তার বাইরের বস্তুর কোন স্থান থাকে না।'

এ অভিযানের কাছে অস্টারলিৎজ ও জেনা, কোনিগ্রাট্‌ ও সিডান একেবারে তুচ্ছ।[৩৫] প্রথম স্বতঃসিদ্ধটিকে সমাবেশ করার পর এক পৃষ্ঠাও যেতে-না-যেতে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যে আমরা ত্যাগ করে ফেললাম, ঝেড়ে ফেললাম, ধ্বংস করলাম সব কিছুকেই যা পৃথিবীর বাইরে—ঈশ্বর ও তাঁর স্বর্গীয় দলবল, স্বর্গ নরক আর তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরত্ব।

সত্তার অখণ্ডত্ব থেকে তার ঐক্যে পৌঁছানো যায় কী করে? সে সম্বন্ধে ধারণা করলেই পৌঁছানো যাবে। যে পরিমাণে আমরা ঐক্যের ধারণাটিকে সত্তার চারিদিকে কাঠামোর মত ছড়িয়ে দেব, চিন্তার মধ্যে তার অখণ্ডত্ব ততই ঐক্যে, চিন্তা-ঐক্যে পরিণত হবে; কারণ চৈতন্যের উপাদানগুলিকে একটি ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসাই সকল চিন্তার সারাৎসার।

শেষ বক্তব্যটি সোজাসুজি অসত্য। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলিকে একটি ঐক্যে সংগ্রথিত করার মতই চৈতন্যের বস্তুগুলিকে তাদের বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করাও চিন্তা। বিশ্লেষণ ছাড়া সমন্বয় হয় না। দ্বিতীয়ত, চিন্তা কোন রকম ভুল না করে কেবলমাত্র চৈতন্যের সেই উপাদানগুলিকেই ঐক্যে গ্রথিত করতে পারে যাতে বা যার আসল মূল প্রতিরূপের মধ্যে এই ঐক্য আগেই বর্তমান ছিল। স্তন্যদায়ী প্রাণীদের ঐক্যের মধ্যে যদি একটি জুতার বুরুশ অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাতে কিন্তু সে বুরুশ স্তন্যদায়ী গ্রন্থি অর্জন করবে না। সুতরাং সত্তার ঐক্য কিম্বা, ঐক্যরূপে সত্তার ধারণা যুক্তিযুক্ত কিনা এই প্রশ্নটিই তো প্রমাণ করার কথা ছিল; হের ড্যুরিং যখন

ভরসা দেন যে সত্তাকে তিনি দ্বৈত হিসাবে নয়, ঐক্য হিসাবে ধারণা করেন, তখন তিনি শুধু নিজের অ প্রামাণিক মতই ব্যক্ত করেন, তার বেশি কিছু নয়।

তাঁর চিন্তাধারাকে নির্ভেজালভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলে এই রকম দাঁড়ায়: 'সত্তা নিয়ে আমি আরম্ভ করছি। সুতরাং সত্তা কী তাই আমি চিন্তা করছি। সত্তার চিন্তা একটি একত্রীভূত চিন্তা। কিন্তু চিন্তন ও সত্তার মধ্যে সম্মতি থাকতে হবে। তাদের পরস্পরের সঙ্গে মানানসই হতে হবে, তারা "একই বিন্দুতে মিলে যাবে"। সুতরাং সত্তা বাস্তবেও ঐক্য। কাজেই তার "বাইরে" কিছু থাকতে পারে না।' হের ড্যুরিং যদি দৈববাণীর মত বাক্য না শুনিয়ে, ছদ্ম আবরণ বাদ দিয়ে এইভাবে কথা বলতেন তাহলে তাঁর মতাদর্শ পরিষ্কার বোঝা যেত। চিন্তন ও সত্তার একত্ব দিয়ে চিন্তাজনিত কোন কিছুর বাস্তবতা প্রমাণের চেষ্টা বাস্তবিকই এক অসম্ভব বিকারগ্রস্ত কল্পনা। এ কল্পনা হেগেলের।

হের ড্যুরিং এর প্রমাণের গোটা পদ্ধতিটাও যদি সঠিক হত, তাহলেও তিনি অধ্যাত্মবাদীদের কাছ থেকে এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারতেন না! এরা সংক্ষেপে জবাব দিতেন: আমাদের কাছেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরলই বটে; এ-পারের জগৎ আর ও-পারের জগতের মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করি তা সুনির্দিষ্টভাবেই শুধুমাত্র আমাদের এই পার্থিব ও আদি পাপের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; নিজের মধ্যে এবং নিজের জন্যে অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে সকল সত্তাই একটি ঐক্য। এবং তাঁরা হের ড্যুরিং-এর সঙ্গে সঙ্গে চলবেন তাঁর পরম প্রিয় অন্যান্য নভোমণ্ডলীয় গ্রহ-তারায় আর এমন এক বা একাধিক গ্রহ-তারা দেখিয়ে দেবেন যেখানে আদি পাপ ছিল না, সুতরাং সেখানে পৃথিবী ও পরপারের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং বিশ্বের ঐক্য সেখানে পরম বিশ্বাসের বস্তু।

সবচেয়ে মজার কথা যে, সত্তার ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করার জন্যে হের ড্যুরিং ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্যাগত* (ontological) প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। সেটি এইরূপ: যখন আমরা ঈশ্বরের কথা ভাবি তখন আমরা তাঁকে সকল পরিপূর্ণতার সমষ্টিরূপে ধারণা করি। কিন্তু সকল পরিপূর্ণতার সমষ্টির মধ্যে সকলের আগে আসে অস্তিত্ব, কারণ অস্তিত্বহীন সত্তা অবশ্যই ত্রুটিহীন নয়। সুতরাং ঈশ্বরের ত্রুটিহীনতার মধ্যে অস্তিত্বকে ধরতেই হবে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে।

হের ড্যুরিং-এর যুক্তিও ঠিক এই ধরনের : যখন আমরা সত্তার কথা ভাবি তখন আমরা তাকে একটি ধারণা রূপে কল্পনা করি। একটি ধারণার মধ্যে যা কিছু আছে তা এক ঐক্য। সত্তা যদি এক ঐক্য না হতো তাহলে সত্তার ধারণার সঙ্গে সত্তার সামঞ্জস্য হতো না। সুতরাং এটি অবশ্যই এক ঐক্য। সুতরাং ঈশ্বর নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন আমরা সত্তার কথা বলি, কেবলমাত্র সত্তার কথাই বলি, তখন ঐক্যের মধ্যে শুধু এই কথাই আসে যে, আমরা যেসব বস্তুর উল্লেখ করছি সেগুলি—থাকে, আছে। এই সত্তার ঐক্যের মধ্যেই সেগুলি রয়েছে, অন্য কোন ঐক্যের মধ্যে নয়। সেগুলি সবই থাকে—এই সাধারণ বচন থেকে তারা কোন অতিরিক্ত গুণ পেতে পারে না, তা সে গুণ অভিন্ন হোক বা না হোক, শুধু তাই নয় ঐ সাধারণ বচনের ফলে এরকম সমস্ত গুণাগুণের বিবেচনাই সাময়িকভাবে বাদ পড়ে যায়। কারণ, সত্তা যে এই সকল বস্তুর মধ্যেই অভিন্ন, এই সরল মৌলিক তথ্য থেকে আমরা এক মিলিমিটারও সরে যাওয়া মাত্র বস্তুগুলির বিভিন্নতা পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে।

এগুলির সকলের বেলায় কেবলমাত্র সত্তা সমভাবে প্রযোজ্য—এই তথ্য থেকে স্থির করা যায় না যে বিভিন্নতাগুলি কি নিয়ে গঠিত, সেগুলি সাদা না কালো, জীবন্ত না প্রাণহীন, এ পৃথিবীর না পরপারের।

পৃথিবীর সত্তা দিয়ে তার ঐক্য গঠিত নয়, যদিও সত্তা তার ঐক্যের ভিত্তি, কারণ এক হবার আগে তাকে অবশ্যই হতে হবে অস্তিত্ববান। বাস্তবিকই সত্তা সর্বদাই একটি খোলা প্রশ্ন—আমাদের পর্যবেক্ষণ-মণ্ডলের সীমার বাইরে। পৃথিবীর বাস্তব ঐক্য তার বস্তুময়তার দ্বারা গঠিত। এর প্রমাণ শুধু কয়েকটি কথার যাদুতে হয়নি, হয়েছে দর্শন ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য বিকাশের মধ্য দিয়ে।

এখন মূল গ্রন্থে ফিরে আসা যাক। হের ড্যুরিং যে সত্তার কথা বলছেন তা

> 'সেই বিশুদ্ধ, আত্ম-সম সত্তা নয় যার কোন বিশেষ নির্ধারক ক্ষমতা নেই, যা বাস্তবিকপক্ষে শূন্যতার অথবা ধারণার অভাবের প্রতি-রূপ মাত্র।'

কিন্তু আমরা অচিরেই দেখতে পাব যে হের ড্যুরিং-এর বিশ্ব বাস্তবে এমন একটি সত্তা নিয়ে শুরু যার মধ্যে কোনরকম অভ্যন্তরীণ পৃথকীকরণ থাকে না,

কোনরকম গতি বা পৃথকীকরণ থাকে না, এবং তার ফলে সেটি বাস্তবিকপক্ষে শূন্যতার ধারণার প্রতিরূপ এবং সেই কারণে বাস্তবেও শূন্য। কেবলমাত্র এই **সত্তা-শূন্যতা** থেকেই বিশ্বের বর্তমান পৃথকীকৃত পরিবর্তনশীল অবস্থা বর্ধিত হয়, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় একাট বৃদ্ধি, একটি **বিকাশ**; এই কথাটি ধরতে পারলে তবেই আমরা এই নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যেও 'আত্ম-সম অবস্থায় বিশ্বজনীন সত্তার ধারণা রক্ষা করতে' পারি। সুতরাং এবার আমরা সত্তার ধারণা পাচ্ছি এক উচ্চতর ক্ষেত্রে যেখানে এর ভেতর জড়তা ও পরিবর্তন, সত্তা ও বিকাশ দুইই আছে। এইখানে পৌঁছাবার পর আমরা দেখতে পাই যে,

পৃথকীকরণের সরলতম উপায় হল গণ (genus) ও প্রজাতি (species), অর্থাৎ সাধারণ ও বিশেষ—এছাড়া বস্তুসমূহের গঠন বোঝা যেতে পারে না।

> কিন্তু এগুলি হল **গুণাগুণ** পৃথকীকরণের উপায়, এগুলির আলোচনার পর আরও বলা হচ্ছে: 'গণের বিরুদ্ধে রয়েছে পরিমাণের ধারণা—এমন এক সমমাত্রা (homogeneity) যার মধ্যে প্রজাতির পার্থক্য আর থাকে না'; এইরূপে আমরা **গুণ** থেকে চলে যাচ্ছি **পরিমাণে** এবং সেটিকে সব সময়েই **'মাপা যায়'**।

'সাধারণ ফল-প্রকল্পের এই তীক্ষ্ণ বিভাজন' এবং তার 'বাস্তবিকই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির' সঙ্গে হেগেলের অমার্জিত উন্মাদ প্রলাপ আর বিকারগ্রস্ত কল্পনার তুলনা করা যায়। আমরা দেখতে পাই হেগেলের 'লজিক' গ্রন্থটি শুরু হয়েছে সত্তা থেকে—হের ড্যুরিং-এরও তাই; এরপর সত্ত হয়ে দাঁড়ায় **নাস্তি**, হের ড্যুরিং-এরও ঠিক তাই; এই অস্তি-নাস্তি থেকে রূপান্তর হয় **বিকাশে**, যার ফল হল নির্ধারক সত্তা অর্থাৎ সত্তার উচ্চতর ও পূর্ণতর রূপ—হের ড্যুরিং-এরও ঠিক তাই। নির্ধারক সত্তা থেকে আসে **গুণ**, আর গুণ থেকে পরিমাণ—হের ড্যুরিং-এরও ঠিক তেমনই। কোন মূল রূপ যাতে বাদ পড়ে না যায় সেজন্যে তিনি অন্য একটি ক্ষেত্রে বলেছেন:

> 'পরিমাণগত ক্রম যতই থাকুক, অননুভূতির জগৎ থেকে অনুভূতির জগতে উত্তরণ ঘটে কেবলমাত্র **গুণগত উল্লম্ফনের** ভেতর দিয়ে; সে সম্বন্ধে আমরা…বলতে পারি যে এক ও অভিন্ন গুণের ক্রমমাত্র থেকে এটির অসীম পার্থক্য।'

পরিমাপগত সম্পর্কের হেগেলীয় সংযোগ-বিন্দু ঠিক এইটি, তাতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সংযোগ-বিন্দুতে বিশুদ্ধ পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে এক

পরিমাণগত উল্লম্ফন দেখা দেয়, যেমন, উত্তপ্ত বা শীতল জলের ক্ষেত্রে, যেখানে স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের সন্ধিক্ষণে স্বাভাবিক চাপের প্রভাবে সমগ্র জলের এক নতুন অবস্থায় উল্লম্ফন ঘটে, ফলে পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের অনুসন্ধানেও আমরা মূলে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি, দেখতে পেয়েছি যে হের ড্যুরিং-এর গভীর মূল সমন্বিত বুনিয়াদী প্রকল্পের মূলগুল হল—হেগেলের **বিকারগ্রস্ত কল্পনা,** তাঁর 'লজিক'-এর প্রথম খণ্ডের 'সত্তা সম্পর্কিত তত্ত্ব' ৩৬—এবং তা ঠিক ঠিক প্রাচীন-হেগেলীয় 'পরম্পরায়' পরিবেশিত—চুরি ঢাকবারও বিশেষ কোন চেষ্টা হয়নি।

তাঁর পূর্বসূরী যে লেখকের ওপর তিনি চূড়ান্ত কুৎসা বর্ষণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকেই সত্তার গোটা ছকটা চুরি করেও তিনি সন্তুষ্ট নন ; পরিমাণ থেকে গুণে উল্লম্ফন সদৃশ পরিবর্তনের উদাহরণ নিজেই দেওয়ার পর তিনি অম্লান বদনে মার্কস সম্বন্ধে লিখেছেন :

> 'যেমন পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হয়, এই হেগেলীয় বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট ধারণা সম্বন্ধে (মার্কস-এর) উল্লেখ কি রকম হাস্যকর !'

বিভ্রান্তিকর, অস্পষ্ট ধারণা ! এখানে রূপান্তরটা কার? আর ড্যুরিং মশাই, এখানে হাস্যকরই বা কে ?

সুতরাং তাঁর নির্দেশমত এইসব ছোট ছোট সুন্দর জিনিসগুলি 'স্বতঃসিদ্ধভাবে স্থিরীকৃত' তো হয়ইনি, বরং স্রেফ বাইরে থেকে অর্থাৎ হেগেলের 'লজিক' থেকে আমদানি করা হয়েছে। এবং আমদানির ধরনটা এমনই যে হেগেল থেকে ধারকরা অংশটুকু ছাড়া গোটা অধ্যায়টার মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঙ্গতির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত প্রশ্নটাই শেষ পর্যন্ত দেশ ও কাল, জাড্য ও পরিবর্তন সম্বন্ধে এক অর্থহীন চুলচেরা বিচারে পর্যবসিত।

সত্তা থেকে হেগেল এগিয়েছেন সারাৎসারে, ডায়ালেকটিকস বা দ্বন্দ্বতত্ত্বে। এখানে তিনি প্রতিবিম্ব নির্ধারণের প্রশ্ন অনুধ্যানের নির্ধারকগুলি এবং সেগুলির অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক আলোচনা করেছেন ; তারপর এসেছেন কার্য-কারণের সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনায় এবং শেষ করেছেন অপরিহার্যতা দিয়ে। হের ড্যুরিংও অন্য কিছু করেন নি। হেগেল যার নাম দিয়েছেন সারাৎসার-তত্ত্ব, হের ড্যুরিং তাকেই 'সত্তার যৌক্তিক ধর্মাবলী' বলে আখ্যাত করেছেন। যাই হোক এই-

গুলির গঠনের সবচেয়ে বড় কথা হল 'শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ বৈপরীত্য। কিন্তু হের ড্যুরিং দ্বন্দ্ব বা বিরোধকে একেবারে অস্বীকার করেছেন—সে কথায় আমরা পরে আসব। তারপর তিনি গিয়েছেন কার্য-কারণ তত্ত্বে এবং সেখান থেকে অপরিহার্যতার মতবাদে, সুতরাং হের ড্যুরিং যখন নিজের সম্বন্ধে বললেন: 'আমরা যারা খাঁচার বাইরে থেকে দার্শনিকতা করি না', তখন মনে হয় তিনি বলতে চান যে তিনি একটি খাঁচার ভেতরেই অর্থাৎ বিভিন্ন বর্গ সম্বন্ধে হেগেলীয় প্রকল্পের খাঁচার ভেতরেই দার্শনিকতা করেন।

পাঁচ

প্রাকৃতিক দর্শন

দেশ ও কাল

এবার আমরা **প্রাকৃতিক দর্শনে** পৌঁছাচ্ছি। এখানেও আবার পূর্বসূরীদের প্রতি হের ড্যুরিং-এর অসন্তোষের কারণ যথেষ্ট। প্রাকৃতিক দর্শন

> 'এত নীচে নেমে যায় যে তা একটা নীরস, কৃত্রিম ছন্দহীন পদ্যে পরিণত হয়, যার ভিত্তি অজ্ঞতা'। 'শেলিং আর ঐরকম অন্য দার্শনিক যারা পরম সত্তার পুরোহিতবৃত্তি নিয়ে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়, তাদের সেই কুৎসিত বিকারগ্রস্ত দার্শনিকতায় নেমে আসে' প্রাকৃতিক দর্শন। ক্লান্তির ফলে আমরা এইসব 'বিকলাঙ্গ' তা থেকে বেঁচে গেছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত তার জায়গায় এসেছে শুধু 'অস্থিরতা'; 'আর যদি সাধারণ লোকের কথা ধরি তা হলে সবাই জানেন, কোন বড় দরের হাতুড়ে বিদায় নিলে তার ফল প্রায়ই শুধু এই হয় যে আরও ছোট দরের হাতুড়ে—তবে ব্যবসার ব্যাপারে অধিকতর পটু—সেই উত্তরাধিকারী রূপে নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়ে তার পূর্বগামীর মালপত্রই বেচতে আরম্ভ করে।' 'পৃথিবীব্যাপী ধারণার জগতে অভিযান করার ইচ্ছা' প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা নিজেরা সামান্যই অনুভব করেন, ফলে তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা 'উন্মাদ ও হঠকারী সিদ্ধান্তে' ঝাঁপ দেন।

সুতরাং মুক্তির প্রয়োজন খুবই জরুরী, তবে সৌভাগ্যক্রমে হের ড্যুরিং পাশেই আছেন।

কালের সঙ্গে পৃথিবীর বিকাশ আর দেশ বা স্থানের মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যেসব আপ্তবাক্য এর পরে আসছে, সেগুলিকে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম

করার জন্যে আমাদের আবার 'বিশ্ব-প্রকল্পবাদে'র কতকগুলি অনুচ্ছেদে ফিরে যেতে হবে।

অসীম—হেগেল যাকে বলেছেন নিকৃষ্ট অসীম—তা আরোপ করা হয়েছে সত্তার উপর এবং তাও হেগেলকেই অনুসরণ করে ('এনসাইক্লোপিডিয়া,' ৯৩,৩৭। তারপর চলেছে এই অসীমের অনুসন্ধান।

'কোনো অসীমের স্বচ্ছতম রূপ, যে রূপকে কোনো স্ববিরোধ ছাড়াই ধারণা করা যায়, তা হল কোন সংখ্যাগত পরম্পরায় সংখ্যার সীমাহীন সঞ্চয়।…যেকোন সংখ্যার সঙ্গে আমরা আরও একটি একক যোগ করতে পারি, অথচ তাতে আরও সংখ্যার সম্ভাবনা কখনই নিঃশেষিত হয় না—তেমনই সত্তার প্রতিটি অবস্থার পরে আসে আরও এক অবস্থা এবং সীমাহীনভাবে এই সকল অবস্থার জন্মই অসীম। একেবারে সঠিকভাবে এই অসীমের ধারণা করা হয়েছে, ফলে তার মূল আকৃতি শুধু একটিই, দিক্‌নির্দেশও একটিই। এই অসীমে অবস্থাসমূহের সঞ্চয়ের মধ্যে একটি বিপরীত দিকনির্দেশের ধারণা আছে কিনা সে কথা যদিও আমাদের চিন্তার কাছে অকিঞ্চিৎকর, তাহলেও এই পশ্চাদবর্তনশীল অসীম হল বে-পরোয়াভাবে গঠিত ভাব-মূর্তি মাত্র। বাস্তবিকই, এই অসীমকে যখন প্রকৃতপক্ষে বিপরীত দিক অতিক্রম করতে হবে, তখন এর প্রতিটি অবস্থার পেছনে থাকবে সংখ্যাসমূহের সীমাহীন পরম্পরা। কিন্তু তাতে পরিগণিত সীমাহীন সংখ্যাগত পরম্পরার এমন এক বিরোধ উপস্থিত হবে যা মোটেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না, সুতরাং অসীমের মধ্যে কোন দ্বিতীয় দিকনির্দেশ আছে একথা স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ।'

অসীমের এই ধারণা থেকে প্রথম সিদ্ধান্ত টানা যায় যে পৃথিবীতে কারণ ও কার্যের পরম্পরাটি নিশ্চয়ই কোন সময় আরম্ভ হয়েছিল :

'যদি ধরে নেওয়া হয় যে অসংখ্য কারণ আগে থেকেই একের পর এক দাঁড়িয়ে গেছে, তবে তা হবে ধারণার অতীত, কারণ এতে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে যা গোনা যায় না তাই গোনা হয়েছে।'

এইভাবে একটি চূড়ান্ত কারণ প্রমাণ করা হল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল :

'সুনির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম : স্বতন্ত্র বস্তুসমূহের কোন প্রকৃত প্রজাতির সমরূপতাগুলির সঞ্চয় শুধু এইভাবেই ধারণা করা যায় যে সেগুলি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা গঠিত হচ্ছে।' যে কোন বিশেষ কালে আকাশের গ্রহতারাগুলির সংখ্যাই যে নিজের মধ্যে সসীম হতে হবে তাই নয়, পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর, এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বতন্ত্র বস্তুকণাসমূহেরও মোট সংখ্যা সসীম হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই শেষোক্ত প্রয়োজনের জন্যই পরমাণুহীন কোনো গঠনের কথা কল্পনা করা যায় না। সকল বাস্তব বিভাজনেরই সর্বদা একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে—অগণনীয়কে গণনা করার বিরোধিতা এড়াতে হলে সীমা থাকতেই হবে।• একই কারণে আজ পর্যন্ত পৃথিবী যতবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরেছে, তার সংখ্যা বলা না গেলেও সে সংখ্যা অবশ্যই সসীম হবে ; শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সকল পুনরাবর্তনশীল প্রক্রিয়ারই নিশ্চয় কোন আরম্ভ ছিল, আর প্রকৃতির মধ্যে পরপর যে সমস্ত পৃথকীকরণ ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়, সেগুলির জড় নিশ্চয়ই একটি আত্ম-সম অবস্থার মধ্যে। বিনা বিরোধেই এই অবস্থা অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু কাল নিজেই যদি ধারণাযোগ্য সম্ভাবনাসমূহের বৈচিত্র্যের ফলে আমাদের মনের দ্বারা আপন খেয়াল-খুশি মতো বিভক্ত না হয়ে, বাস্তব অংশ দ্বারা গঠিত হত, তাহলে এই ধারণাও বাতিল হয়ে যেত। কালের প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত পার্থক্যসূচক অন্তর্বস্তুর জন্যে বিষয়টি একদম আলাদা হয়ে যায়, আকৃতিগুলি—তাদের পৃথকীকরণ যোগ্যতার জন্যই গণনার জগতে অবস্থান করে। আমরা যদি এমন অবস্থা কল্পনা করি যেখানে কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং যার আত্ম-সমতার মধ্যে আনুপূর্বিকতায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকে না, তাহলে কালের যে ধারণা অধিকতররূপে বিশেষীকৃত তা অধিকতররূপে সাধারণ সত্তার ধারণায় নিজেকে রূপান্তরিত করে। শূন্য স্থিতিকালের সঞ্চয়ের অর্থ কী হবে তা একেবারেই অকল্পনীয়।

এইসব কথা বলে তিনি ভাবছেন, এইসবগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে তিনি বেশ ভাল রকম নৈতিক উন্নতি সাধন করেছেন। প্রথমে তাঁর আশা

যে এগুলি অন্তত অকিঞ্চিৎকর সত্যরূপে পরিগণিত হবে না; কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে: 'অসীমের বিভিন্ন ধারণা এবং সেগুলির গুণাগুণ বিচারকে আমরা যে অতি সরল পদ্ধতির দ্বারা এমন গুরুত্বে এগিয়ে দিয়েছি যা আগে কখনও জানা যায়নি—সেই পদ্ধতিগুলি স্মরণ করুন···এখন যে তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা সাধন করা হল তারই ফলে স্থান ও কালের বিশ্বজনীন ধারণার উপাদানগুলি এত সরল রূপ পেতে পারল।'

আমরা এগিয়ে যেতে সাহায্য করলাম। এখন তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা সাধন করা হলো! এই 'আমরা' কারা, এই 'এখনই' বা কখন? তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা সাধন করছে কে?

'থিসিস: কালের মধ্যে পৃথিবীর একটা আরম্ভ আছে, আর দেশের দিক দিয়েও তা সীমাবদ্ধ বটে।

'প্রমাণ: কারণ যদি ধরা হয় যে কালের মধ্যে পৃথিবীর কোন আরম্ভ নেই, তাহলে কালের প্রতিটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত নিশ্চয়ই অনন্তকাল কেটে গেছে, ফলে পৃথিবীতে বস্তুসমূহের পূর্বানুক্রমিক অবস্থার এক সীমাহীন পরম্পরা নিশ্চয়ই অতিক্রান্ত হয়েছে। যাই হোক, কোন পরম্পরার সীমাহীনতা ঠিক এরই মধ্যে নিহিত যে পূর্বানুক্রমিক সমন্বয় দ্বারা তাকে কখনই সম্পূর্ণ করা যায় না। সুতরাং বিশ্বের অসীম অতিবাহিত পরম্পরা অসম্ভব, ফলে পৃথিবীর অস্তিত্বের অপরিহার্য ভিত্তি হলো যে তার আরম্ভ থাকতে হবে। আর এটিই ছিল প্রথম প্রামাণ্য বিষয়।

'দ্বিতীয়টি সম্পর্কে যদি বিপরীতটি আবার ধরে নেওয়া যায়, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই সহ অবস্থিত বস্তুসমূহের সীমাহীন সমগ্র। যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কোন সহজ জ্ঞানের সীমা-বিশেষের মধ্যে প্রদত্ত হয়নি, তার মাত্রাগুলির ধারণা করার একমাত্র উপায় হলো তার অংশগুলির সমন্বয়সাধন, কেবলমাত্র পরিপূরিত সমন্বয় দ্বারাই এরূপ প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমষ্টি ধারণা করা যায় অথবা একই একককে বারবার তার নিজের সঙ্গে যোগ করে ধারণা করা যায়। সুতরাং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত জগতের সামগ্রিক ধারণা করার জন্য ধরে নিতে হবে যে এক সীমাহীন জগতের অংশসমূহের পূর্বানুক্রমিক

সমন্বয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ; অর্থাৎ সহ-অবস্থানকারী সকল বস্তুর সংখ্যায়নে সীমাহীন কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে বলে ধরতে হবে। তা অসম্ভব। এই কারণে প্রকৃত বস্তুসমূহের সীমাহীন সমষ্টিকে একটি নির্দিষ্ট সমগ্ররূপে মনে করা যায় না, আর সেই জন্য সেটিকে **একই সময়ে** অস্তিত্ববান বলে মনে করা যায় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে দেশগত দিক থেকে জগৎ সীমাহীন নয়, বরং সীমার মধ্যে আবদ্ধ। দ্বিতীয় যা প্রমাণ করার ছিল—তা এই।'

একখানি সুপরিচিত গ্রন্থ থেকে এই বাক্যগুলি হুবহু নকল করা হয়েছে ; গ্রন্থখানি প্রথম বের হয় ১৭৮১ সালে, তার নাম : 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিচার'[৩৮] (Critique of Pure Reason), লেখক ইমানুয়েল কান্ট। সেই বইয়ে প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় বিভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যাংশ : 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রথম বিরোধ'-এর মধ্যে সবাই ঐ বাক্যগুলিকে পড়তে পারেন। সুতরাং হের ড্যুরিং-এর খ্যাতির একমাত্র ভিত্তি হল যে তিনি কান্ট-বর্ণিত একটি ধারণার ওপর যোগ করেছেন শুধু নামটি—'নির্দিষ্ট রাশির সূত্র'—আর আবিষ্কার করেছেন যে এমন এক কাল ছিল যখনও পর্যন্ত কাল হিসাবে কিছু ছিল না, যদিও একটা জগৎ ছিল। বাকি সবটা অর্থাৎ হের ড্যুরিং-এর টীকার মধ্যে যেটুকু অর্থ আছে—তা হল, 'আমরা' হচ্ছি ইমানুয়েল কান্ট, আর 'এখন'টা হচ্ছে পঁচানব্বই বছর আগে। সত্যিই 'খুবই সরল'। যে 'গূঢ়ার্থ আজ পর্যন্ত জানা ছিল না' তারই উদ্ঘাটন।

অবশ্য কান্ট কিন্তু মোটেই দাবী করেন নি যে তাঁর প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং উল্টো ; পরের পৃষ্ঠায় তিনি বিপরীত কথাটাই রেখেছেন এবং প্রমাণ করেছেন : কালের মধ্যে জগতের সূচনা হয়নি এবং দেশের মধ্যে তার শেষ নেই ; আর ঠিক এরই মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন সেই বিরোধাভাস, সমাধানহীনবিরোধ, যে একটিকে ঠিক অপরটির মতই প্রকাশ করা যায়। 'কান্ট-এর মতো' লোকও সমাধানহীন মুস্কিলে পড়েছেন দেখে ক্ষুদ্রতর মানুষদের মনে হয়তো একটু সন্দেহ জাগত। কিন্তু আমাদের সাহসী বীর যিনি 'একেবারে মাটি থেকে মৌলিক সিদ্ধান্ত ও মতামত' বানিয়ে ফেলেন, তিনি কিন্তু ঘাবড়াননি ; নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কান্টের বিরোধাভাসের যতখানি দরকার তিনি তা বেশ হৃষ্টচিত্তে নকল করেছেন আর বাকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

সমস্যাটার সমাধান খুবই সরল। অনন্তকাল আর সীমাহীন দেশ—এই শব্দগুলির সরল অর্থ গোড়া থেকেই বুঝিয়ে দেয় যে কোন দিকেই কোন শেষ নেই, না সামনে বা পেছনে, না উপরে বা নীচে, না ডাইনে বা বাঁয়ে। সীমাহীন পরম্পরার অসীমত্ব থেকে এই অসীম যথেষ্ট রকমে ভিন্ন কারণ প্রথমটি সর্বদাই আরম্ভ হয় এক থেকে, একটা প্রথম নির্দিষ্ট কাল থেকে। আমাদের বিষয়-বস্তুর উপর এই পরম্পরার ধারণা যে খাটে না, ধারণাটিকে দেশের উপর প্রয়োগ করলেই তা সোজাসুজি বোঝা যায়। সীমাহীন পরম্পরাকে যখন দেশের ক্ষেত্রে সরিয়ে দেওয়া যায়, তখন তা হয় একটি রেখা যা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এক নির্দিষ্ট দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তারিত। এর দ্বারা কি দেশের সীমাহীনতা এতটুকুও ব্যক্ত হয়েছে? না, তার উল্টো; দেশ সম্পর্কিত মাত্রার (Spatial Dimensions) ধারণার মধ্যে রয়েছে ছ'টি রেখা যা এই এক বিন্দু থেকে তিনটি বিপরীত দিকে রেখায়িত, সুতরাং আমরা এই রকম মাত্রা পাব ছ'টি। একথাটা কান্ট এত পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে পৃথিবীর দেশ গত সম্পর্কের উপর তিনি তাঁর সংখ্যাগত পরম্পরাগুলিকে সরিয়ে এনেছিলেন শুধু পরোক্ষভাবে, ঘোরানো পথে। পক্ষান্তরে, দেশের মধ্যে ছ'মাত্রা স্বীকার করার জন্যে হের ড্যুরিং আমাদের বাধ্য করছেন, আবার ঠিক তার পরই গাউস-এর গাণিতিক রহস্যবাদের বিরুদ্ধে (যে গাউস দেশের প্রচলিত তিন মাত্রা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি) বিক্ষোভ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। [৩৯]

কালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, উভয় দিকে প্রসারিত অসীম রেখা বা এককগুলির পরম্পরার একটা রূপক আছে, কিন্তু আমরা যদি কালকে এমন একটি পরম্পরা বলে মনে করি যার গণনা এক থেকে এগিয়ে গেছে কিম্বা এমন একটি রেখা বলে মনে করি যা কোন নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা করেছে, তাহলে আমরা আগেই ধরে নিই যে কালের একটা আরম্ভ আছে: যা আমাদের প্রমাণ করতে হবে ঠিক তাকেই আমরা প্রারম্ভসূত্ররূপে উপস্থিত করি কালের অনন্ততাকে আমরা যে রূপ দিই তা একপেশে, খণ্ডিত; কিন্তু একপেশে, খণ্ডিত অনন্তের মধ্যেও স্ব-বিরোধ আছে—তা হল 'বিরোধহীনরূপে কল্পিত অনন্তের' একেবারে বিপরীত। এই বিরোধ অতিক্রম করতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে, যে-এক থেকে আমরা পরম্পরাটি গণনা করতে আরম্ভ করি। যে-বিন্দু থেকে আমরা লাইনটি মাপতে অগ্রসর হই, তা পরম্পরার মধ্যে যে কোন একটি,

লাইনের বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে যে কোন একটি—আর এই এক বা এই বিন্দুকে যেখানেই রাখি না কেন, তাতে পরম্পরা বা লাইনের কিছু যায় আসে না।

কিন্তু 'গণনাকৃত সীমাহীন সংখ্যা পরম্পরার' যে বিরোধ তার কি হবে? হের ড্যুরিং যেই মাত্র এটিকে গণনা করার সুচতুর খেল খতম করবেন, তখনই আমরা এটিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার অবস্থায় পৌঁছাবো।—∞ (ঋণাত্মক অসীম) থেকে ০ পর্যন্ত গোনা শেষ করে তিনি ফিরে আসুন। স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-বিন্দু থেকেই ৬ তিনি গুণতে আরম্ভ করুন, একটি অসীম পরম্পরা তাঁকে পেছনে ফেলে আসতে হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই কর্তব্যকর্মটিকেও। ১+২+৩+৪······তাঁর এই নিজের অসীম পরম্পরাটিকেই তিনি শুধু উল্টে দিন এবং অসীম থেকে পেছন দিকে ১ পর্যন্ত গোনার চেষ্টা করুন; সমস্যা সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই শুধু সেই এরকম চেষ্টা করবে—তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আবার: হের ড্যুরিং যদি বলেন যে অতিবাহিত কালের সীমাহীন পরম্পরা গোনা হয়ে গেছে, তা হলে তিনি বলছেন যে কালের একটা আরম্ভ আছে, কারণ তা না হলে তিনি তো 'গণনা' আরম্ভ করতেই পারতেন না। সুতরাং যে জিনিসকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি তার যুক্তির মধ্যে সেটিকেই আবার প্রারম্ভসূত্র রূপে উপস্থিত করছেন। সুতরাং গণনাকৃত সীমাহীন পরম্পরার ধারণা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যার বিশ্বব্যাপী ড্যুরিংগীয় সূত্রটি হচ্ছে contradictio in adjecto, তার নিজের মধ্যেই একটা বিরোধ রয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে সেটি একটি হাস্যকর বিরোধ।

যে অসীমের শেষ আছে কিন্তু আরম্ভ নেই, তা সেই অসীমের চেয়ে কিছু কম বা বেশি রকম সীমাহীন নয়, যার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। সামান্যতম দ্বান্দ্বিক অন্তর্দৃষ্টি থাকলে হের ড্যুরিং বুঝতেন যে শুরু ও শেষ অবশ্যই এক সঙ্গে থাকে—যেমন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু—শেষ যদি বাদ পড়ে তাহলে শুরুটাই হয় শেষ—যে একটি প্রান্ত ঐ পরম্পরায় বর্তমান; এবং ঐভাবেই এর উল্টোটা। সীমাহীন পরম্পরা নিয়ে কাজ করার গাণিতিক রীতির জন্যেই এই প্রতারণাটা ঘটতে পেরেছে। গণিতে অনির্দিষ্ট ও অসীমে পৌঁছবার জন্যে নির্দিষ্ট ও সসীম থেকে শুরু করা প্রয়োজন হয় বলে সকল গাণিতিক পরম্পরাই, কি ধনাত্মক কি ঋণাত্মক, এক থেকে যাত্রা শুরু করে,

না হলে সেগুলিকে হিসাবের কাজে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু গণিতজ্ঞের বিমূর্ত প্রয়োজন বাস্তব জগতের পক্ষে বাধ্যতামূলক নিয়ম নয়।

বলতে কি, স্ববিরোধ বাদ দিয়ে হের ড্যুরিং কখনই প্রকৃত অসীমের কল্পনা করতে পারবেন না। অসীম হচ্ছে একটা স্ববিরোধ, অসীমের মধ্যে ভূরি-ভূরি স্ববিরোধ। গোড়াতেই এই স্ববিরোধ যে শুধুমাত্র সসীম দিয়েই অসীম গঠিত হয়েছে—তবুও এটাই বাস্তব। বাস্তব জগতের সীমাহীনতা আমাদের যত স্ববিরোধের মুখে পৌঁছে দেয়, তার সীমাবদ্ধতাও তার চেয়ে কিছু কম দেয় না; আমরা আগেই দেখেছি যে এই স্ববিরোধগুলি এড়াবার জন্যে আমরা যতই চেষ্টা করি, ততই আমরা আরও নতুন ও নিকৃষ্ট বিরোধে জড়িয়ে পড়ি। অসীম যে একটা বিরোধ ঠিক সেই কারণেই এটি একটি সীমাহীন প্রক্রিয়া, দেশ ও কালের মধ্যে সীমাহীনভাবে নিজেকে উদঘাটিত করে চলেছে। স্ববিরোধ সরিয়ে নিলে অসীমও শেষ হয়ে যাবে। হেগেল এ কথাটি বেশ সঠিকভাবে দেখতে পেয়েছিলেন; যেসব ভদ্রমহোদয় এই বিরোধ নিয়ে কূটতর্ক তুলতেন, তাঁদের প্রতি তাঁর বেশ অবজ্ঞাই ছিল।

আরও এগিয়ে যাওয়া যাক। তাহলে কালের একটা আরম্ভ ছিল। এই আরম্ভের আগে কী ছিল? ছিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, একটা আত্ম-সম অপরিবর্তন-শীল অবস্থায়। এই অবস্থায় পরিবর্তনের পরম্পরা আসে না বলে কালের অধিকতর বিশেষীকৃত ধারণা নিজেকে রূপান্তরিত করে সত্তার অধিকতর সাধারণ ধারণায়। প্রথমত, হের ড্যুরিং-এর মাথায় ধারণার কী পরিবর্তন হয় তা নিয়ে আমাদের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কালের ধারণা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় হলো প্রকৃত বাস্তব কাল—সেটাকে হের ড্যুরিং এত সহজে এড়াতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, কালের ধারণা সত্তার অধিকতর সাধারণ ধারণায় যতই রূপান্তরিত হোক, তার দ্বারা আমরা এক ধাপও এগুচ্ছি না। কারণ সকল সত্তার মৌলিক রূপ হল দেশ ও কাল, আর কালের বাইরে সত্তা যেমন অসম্ভব, দেশের বাইরে সত্তাও তেমনি। এই কাল-বহির্ভূত সত্তার ধারণার তুলনায় হেগেলের 'কালহীনতার মধ্যে অতিবাহিত সত্তার' ধারণা কিংবা নব্য-শেলিঙ্গীয় 'পূর্ববোধাতীত সত্তার'[৪০] ধারণা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত। সেই কারণে হের ড্যুরিং বেশ সাবধানে শুরু করেছেন: প্রকৃতপক্ষে এটা অবশ্য কাল, কিন্তু তা এমন ধরনের যাকে সত্যি সত্যি কাল বলা চলে না, বস্তুত কাল হিসাবে কাল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয়,

কেবল আমাদের মনের দ্বারা ইচ্ছামত বিভক্ত—বিশেষত্বসূচক ঘটনাবলীর দ্বারা কালকে ভরাট করলে তবেই তা গণনার যোগ্য—শূন্য কালক্রম পুঞ্জীভূত হওয়ার তাৎপর্য কল্পনা করাও যায় না। এই পুঞ্জীভবন বলতে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সে কথা এখানে অবান্তর; প্রশ্ন হল জগতের যে অবস্থা এখানে কল্পনা করা হয়েছে তার কালক্রম আছে কিনা, তা কালের মধ্যে একটা কালক্রম অতিক্রম করছে কিনা। লক্ষ বা উদ্দেশ্য ছাড়া শূন্যস্থানে মাপজোক করে আমরা যেমন কিছু পেতে পারি না, ঠিক তেমনি অন্তর্বস্তু বাদ দিয়ে এইরকম কালক্রমের মাপজোক করেও আমরা কিছু পেতে পারি না—এটা অনেকদিনই জানা; এইরকম প্রচেষ্টা ক্লান্তিকর বলেই হেগেল এই অসীমকে বলেছেন নিকৃষ্ট। হের ড্যুরিং-এর মতে কেবলমাত্র পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই কালের অস্তিত্ব; কালের মধ্যে এবং কালের ভেতর দিয়ে পরিবর্তনের কোন অস্তিত্ব নেই। কাল যেহেতু পরিবর্তন থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, ঠিক সেই হেতু পরিবর্তন দ্বারা এর পরিমাপ সম্ভব, কেননা পরিমাপের জন্যে সর্বদাই এমন কিছু দরকার যা পরিমেয় বস্তু থেকে পৃথক আর যে-কালের মধ্যে কোন বোধগম্য পরিবর্তন ঘটে না, তা কাল না-হওয়া থেকে অনেক দূর; তা বরং বিশুদ্ধ কাল—যার উপর কোন বিজাতীয় সংমিশ্রণের প্রভাব নেই অর্থাৎ সেটা প্রকৃত কাল, কাল বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। বাস্তবিকপক্ষে যদি আমরা কালের ধারণাকে সমস্ত বিজাতীয় ও বহিরাগত সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে একেবারে বিশুদ্ধভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করি তা হলে কালের মধ্যে যে সব বিবিধ ঘটনা একসঙ্গে অথবা একের পর এক ঘটে থাকে, সেগুলি প্রাসঙ্গিক নয় বলে আমরা সেগুলিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হই এবং এইভাবে এমন এক কালের ধারণা তৈরি করি যেখানে কোন কিছুই ঘটে না। সুতরাং এই কাজ করতে গিয়ে আমরা কালের ধারণাকে সত্তার সাধারণ ধারণার মধ্যে আচ্ছন্ন হতে দিই না, বরং তারই দ্বারা আমরা এই প্রথম বিশুদ্ধ কালের ধারণায় পৌঁছাই।

কিন্তু হের ড্যুরিং জগতের আত্মসম প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিয়ে যে গোলযোগে পড়েছেন, সে তুলনায় এইসব বিরোধ ও অসম্ভাব্যতা ছেলেখেলা মাত্র। জগৎ যদি কখনো এমন অবস্থায় থেকে থাকে যখন কিছুই বদলাচ্ছিল না, তাহলে সেই অবস্থা থেকে পরিবর্তন ঘটল কী করে? যা একান্তভাবে অপরিবর্তনীয়, বিশেষ করে অনাদিকাল থেকেই, যখন তার এই

অবস্থা, তখন সে সম্ভবত নিজে নিজেই এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, গতি ও পরিবর্তনের অবস্থায় পৌঁছে যেতেও পারে না। সুতরাং বাইরে থেকে, বিশ্বের বাইরে থেকে নিশ্চয় কোন প্রারম্ভিক অভিঘাত এসে তাকে সচল করেছিল। কিন্তু সবাই জানেন যে এই 'প্রারম্ভিক অভিঘাত' কথাটা শুধু ঈশ্বরেরই নামান্তর মাত্র। যে-ঈশ্বর ও অজ্ঞাতলোককে হের ড্যুরিং তাঁর বিশ্ব-প্রকল্পবাদের মধ্যে এত সুন্দরভাবে অনাবৃত করার ভান করেছেন, তিনিই আবার সে দুটিকে এখানে প্রাকৃতিক দর্শনের মধ্যে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ়রূপে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

হের ড্যুরিং আরও বলছেন :

> 'সত্তার কোন নিত্য উপাদানের উপর যখন ব্যাপ্তি আরোপিত হয়, তখন সেটা তার নিশ্চায়কতায় দৃঢ়বদ্ধ থাকে। পদার্থ ও যান্ত্রিক শক্তি···সম্বন্ধে এ কথা খাটে।'

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, প্রথম বাক্যটি হলো হের ড্যুরিং-এর স্বতঃসিদ্ধ—দ্বিরুক্তিবহুল বাগাড়ম্বরের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যাপ্তি যেখানে বদলায় না, সেখানে তা যা ছিল তাই থাকে। সুতরাং পৃথিবীতে বিদ্যমান যান্ত্রিক শক্তির পরিমাণ চিরকাল ধরে একই থাকে। আমরা অবশ্য এই কথা তুলছি না যে, এর মধ্যে যেটুকু ঠিক তা দেকার্তে জানতেন প্রায় ৩০০ বছর আগে, দর্শনের মধ্যে সে কথা তিনি বলেওছিলেন,[৪১] একথাও তুলছি না যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে শক্তির নিত্যতার তত্ত্ব প্রায় ২০ বছর ধরে চালু আছে : এটাকে যান্ত্রিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ করে হের ড্যুরিং এর কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। তবে অপরিবর্তনীয় অবস্থার সময়ে যান্ত্রিক শক্তিটি কোথায় ছিল? হের ড্যুরিং গোঁ ধরেছেন যে কিছুতেই এই প্রশ্নের জবাব দেবেন না।

ড্যুরিং মশাই, সেই সময় চিরন্তন আত্ম-সম যান্ত্রিক শক্তিটি কোথায় ছিল এবং তার সাহায্যে কিসের মধ্যে গতিসঞ্চার হলো? উত্তর :

> 'ব্রহ্মাণ্ডের আদিম অবস্থা, কিম্বা আরও সাদা কথায় বললে পদার্থের অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের আদিম অবস্থা—যেখানে কালের মধ্যে পরিবর্তনের পুঞ্জীভবন ঘটে নি—এই বিষয়টিকে শুধু সেই মনই অবজ্ঞা করতে পারে যে-মন নিজের প্রজনন শক্তিকে নিজ হাতে খণ্ডিত করাকেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলে বোধ করে।'

সুতরাং, হয় তোমরা পরীক্ষা না করেই আমার অপরিবর্তনীয় আদিম অবস্থার কথা মেনে নেবে, আর না হয় আমি, সৃষ্টিশক্তির অধিকারী ইউজেন ড্যুরিং তোমাদের নপুংসক বুদ্ধিজীবী বলে চিহ্নিত করব। তাতে অবশ্য অনেক ব্যক্তি ভয় পেতে পারেন কিন্তু আমরা যারা হের ড্যুরিং-এর প্রজনন শক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত এর আগেই দেখেছি, তারা আপাতত এই ভদ্র গালাগালির জবাব মুলতুবি রেখে ফের জিজ্ঞাসা করতে পারি : কিন্তু ড্যুরিং মশাই, সেই যান্ত্রিক শক্তির ব্যাপারটা কি হল দয়া করে বলবেন কি ?

অমনি হের ড্যুরিং বেশ বিব্রত বোধ করবেন, আমতা আমতা করে বলবেন,

> 'সেই প্রারম্ভিক চূড়ান্ত অবস্থার পরম সত্তা নিজের মধ্য থেকে রূপান্তরের কোনো সূত্র যোগায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা যে অস্তিত্ব-শৃংখলের সঙ্গে পরিচিত, তার প্রতিটি নতুন গ্রন্থি, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রন্থির বেলায়ও অবস্থাটা এক ধরনের। বর্তমানে বিবেচনাধীন মূল বিষয়টি সম্বন্ধে যিনিই কোন আপত্তি ওঠাতে চান, তাঁকেই এই মর্মে সাবধান হতে হবে যে যখন শৃংখলগুলি তত সুস্পষ্ট নয়, তখন যেন সেগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান মধ্যবর্তী পর্যায় ঢুকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ধারাবাহিকতার সেতু রচনারও সম্ভাবনা রয়েছে, যার সাহায্যে পেছন দিকে সরে গিয়ে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার অবলুপ্তিতে পৌঁছানো সম্ভব। বিশুদ্ধ ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই ধারাবাহিকতার সাহায্যে প্রধান মুশকিল দূর হয় না বটে কিন্তু আমাদের কাছে এটিই হলো সকল নিয়মানুবর্তিতার মূল রূপ, সাধারণভাবে রূপান্তরের যত রূপ জানা আছে সে সবেরই মূল রূপ ; তাই প্রথম ভারসাম্য ও তার বিচ্যুতির মধ্যে এটিকে একটি মাধ্যম রূপে ব্যবহার করার অধিকারও আমাদের আছে। কিন্তু তথাকথিত (!) গতিহীন ভারসাম্যকে যদি আমরা সেইসব ধারণার আদর্শে কল্পনা করতাম যে-সব ধারণা আজকালকার বলবিদ্যায় বিশেষ আপত্তি (!) ব্যতিরেকেই গৃহীত হয়, তাহলে এ কথা বোঝবার কোন উপায় থাকত না যে পদার্থ কী করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পৌঁছালো।'
>
> শুনতে পাই ভরের গতিশীলতা ছাড়াও এমন এক রূপান্তর আছে যাতে

ভর সঞ্চালন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সঞ্চালনে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তা কী করে—সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সাধারণ সূত্র পাওয়া যায় নি, সুতরাং এই প্রক্রিয়াগুলি যদি শেষ পর্যন্ত খানিকটা অন্ধকারের মধ্যে ঘটে, তাহলেও আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না।'

ব্যস, এইটুকুই হের ড্যুরিং-এর মোট বক্তব্য। বস্তুত এইসব শোচনীয় ও ঘৃণ্য চাতুরী ও বাগাড়ম্বরের ফলে আমরা যদি থেমে যাই তাহলে আমাদের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা খুঁজে পেতে হবে প্রজনন শক্তির স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গহানির মধ্যে, নিশ্চিত অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে। পরম সত্তা নিজে থেকেই পরিবর্তনে উত্তরণ ঘটাতে পারে না, তা হের ড্যুরিং স্বীকার করেন। পরম ভারসাম্য নিজে থেকেই গতিতে রূপান্তরিত হবে, তারও কোন উপায় নেই। তাহলে আছে কি? তিনটি মিথ্যা ও ছেঁদো যুক্তি।

প্রথমত, আমাদের পরিচিত অস্তিত্বশৃংখলের প্রতিটি গ্রন্থি (তা সে যত ছোটই হোক) থেকে পরবর্তী গ্রন্থিতে কি ভাবে পৌছানো যাচ্ছে তা দেখানো তেমনই শক্ত। হের ড্যুরিং মনে করেন পাঠকেরা অবোধ শিশু। অস্তিত্ব-শৃংখলের ক্ষুদ্রতম গ্রন্থিগুলির মধ্যে ব্যষ্টিগত উত্তরণ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু; তার কাজে যখন কোন বাধা পড়ে, তখন কেউই, এমন কি হের ড্যুরিং-ও একথা ভাবেন না যে প্রথম গতি শূন্য থেকে উঠেছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়, বরং সকলেই মনে করেন যে এটিকে শুধুমাত্র কোন পূর্ববর্তী গতির স্থানান্তর, রূপান্তর বা সংক্রমন বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু গতি এসেছে গতিহীনতা থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে। এ কথা স্বীকার করাই এখানে যে আসল বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, আমরা পাচ্ছি 'ধারাবাহিকতার সেতু'। বিশুদ্ধ ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এতে অবশ্য আমাদের মুশকিল আসান হয় না, কিন্তু তাহলেও গতিহীনতা ও গতির মাঝামাঝি মাধ্যম হিসাবে এটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। দুঃখের বিষয় যে অচলতার মধ্যেই থাকে গতিহীনতার ধারাবাহিকতা, সুতরাং এর থেকে কি করে গতি উৎপন্ন হবে তা আগের চেয়েও রহস্যময় হয়ে রইল। একেবারে গতিহীনতা থেকে বিশ্বজনীন গতিতে উত্তরণটিকে হের ড্যুরিং যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করুন এবং তার জন্য যত সুদীর্ঘ স্থায়িত্বই নির্দিষ্ট করুন, আমরা কিন্তু এক মিলিমিটারের অযুত ভাগের এক ভাগও এগোলাম না। সৃষ্টিক্রিয়া ব্যতিরেকে আমরা কখনই নাস্তি থেকে কিছুতেই অস্তিতে পৌঁছাতে পারি

না—তা সে কিছু যদি গাণিতিক অন্তর-এর মত অতি ক্ষুদ্র হয় তবুও। সুতরাং ধারাবাহিকতার সেতুটি গর্দভের সেতু ও* নয়—ওর উপর দিয়ে শুধু হের ড্যুরিংই পার হতে পারেন।

তৃতীয়ত, হের ড্যুরিং-এর মতে বলবিদ্যা হলো ভাব সংগঠনের অন্যতম প্রধান যন্ত্র; বর্তমান কালের সেই বলবিদ্যা যতদিন প্রচলিত থাকবে ততদিন কোন মতেই ব্যাখ্যা করা যাবে না যে গতিহীনতা থেকে গতিতে পৌঁছানো কি করে সম্ভব। কিন্তু তাপ সম্পর্কে বলবিদ্যাগত তত্ত্বে দেখা যায় যে কোন কোন অবস্থায় ভরের সঞ্চালন আণবিক সঞ্চালনে পরিবর্তিত হয় (যদিও এখানেও এক গতির উৎপত্তি আর এক গতি থেকেই, গতিহীনতা থেকে কখনই নয়); এবং হের ড্যুরিং সলজ্জভাবে বলতে চাইছেন যে সম্ভবত এর থেকেই সম্পূর্ণ স্থিতি (ভারসাম্যের অবস্থায়) ও গতির (গতিশীল অবস্থায়) মধ্যে একটি সেতু রচিত হতে পারে। কিন্তু এ সব প্রক্রিয়া 'খানিকটা অন্ধকারের মধ্যে' ঘটে থাকে। আর ড্যুরিং মশাই আমাদের অন্ধকারের মধ্যেই বসিয়ে রেখে গেলেন।

তাঁর সমস্ত গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা নিয়ে আমরা এখানেই পৌঁছলাম—তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর বাজে কথার মধ্যে আমরা বরাবরই আরও গভীরভাবে ডুবে গেছি এবং শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছানো অবধারিত সেখানেই পৌঁছেছি: 'অন্ধকারের মধ্যে'। কিন্তু তাতে তিনি বিশেষ লজ্জা পান নি। ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই স্পর্ধা সহকারে ঘোষণা করেছেন যে তিনি

> 'সোজাসুজি জড় ও যান্ত্রিক বলসমূহের আচরণ থেকে আত্মসম স্থায়িত্বের ধারণাকে একটা বাস্তব অন্তর্বস্তু করতে সমর্থ হয়েছেন।'

আর এই ভদ্রলোকই অন্যদের বলেন 'হাতুড়ে'!

'অন্ধকারের মধ্যে' এইসব অসহায় পরিক্রমা ও বিশৃংখলা সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটি সান্ত্বনা থেকে যাচ্ছে, সে সান্ত্বনা নিশ্চয়ই আমাদের আত্মার উন্নতি বিধান করবে:

> 'আকাশের অন্যান্য গ্রহতারার অধিবাসীদের গণিত শাস্ত্রকে আমাদের স্বতঃসিদ্ধগুলির উপরেই দাঁড়াতে হবে।' অন্য কিছুর উপরে নয়।

---

* মূলে এখানে কয়েকটি শব্দের খেলা রয়েছে: জার্মান Eselsrbucks (গর্দভের সেতু) শব্দের আর একটি মানে হলো বুদ্ধিহীন বা অলস ছাত্র কর্তৃক ব্যবহৃত এক ধরনের অবৈধ পাঠ-সহায়িকা; অপটু হাতে আক্ষরিক তর্জমা টাট্টু ঘোড়া।—সম্পাদক।

ছয়

প্রাকৃতিক দর্শন

সৃষ্টিক্রম, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন

বর্তমান পৃথিবী কিভাবে জন্মালো এবার আমরা সেই সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে পৌঁছাচ্ছি। শোনা যায় আইওনীয় দার্শনিকেরা যাত্রা শুরু করেন জড়ের বিশ্বজনীন বিসর্পণের (dispersion) অবস্থা থেকে। কিন্তু পরবর্তী-কালে, বিশেষ করে কান্টের সময় থেকে, এক আদি নীহারিকা পুঞ্জের ধারণা নতুন ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুমিত হয় মাধ্যাকর্ষণ ও তাপ বিকীরণের ফলে আকাশের গ্রহতারাগুলি এক একটি পৃথক ঘন-বস্তু রূপে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। সমকালীন তাপের যান্ত্রিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীনতর অবস্থাগুলি অনেক বেশী সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, 'গ্যাসীয় বিসর্পণের অবস্থা থেকে শুধু তখনই কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত শুরু করা যায় যখন তার ভিতরকার যান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে আগে হতেই আরও সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব। অন্যথায় এই ধারণাটাই যে বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে শুধু তাই নয়, উপরন্তু সিদ্ধান্তগুলি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিম কুয়াশাটা বাস্তবিকই আরও দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়;……ইতিমধ্যে তখনও এ সবই এমন একটা ঝাপ্‌সা ও নিরাকার বিসর্পণের ধারণারূপে বজায় থাকে যা আরও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না; সুতরাং 'এই গ্যাসীয় ব্রহ্মাণ্ড' থেকে আমরা 'শুধু একটা অতি ধোঁয়াটে ধারণাই' পাই।

কোপার্নিকাসের সময় থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৃহত্তম অগ্রগতি হলো কান্টের তত্ত্ব অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান নীহারিকা পুঞ্জ থেকে আকাশের সকল গ্রহ-তারার উৎপত্তির তত্ত্ব। কালের মধ্যে প্রকৃতির কোন ইতিহাস নেই— সে-ধারণা এই প্রথম ধাক্কা খেতে আরম্ভ করল। তার আগে পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত যে,

আকাশের গ্রহতারাগুলি একেবারে গোড়া থেকে সর্বদাই একই অবস্থায় আছে এবং সর্বদাই একই পথে চলেছে; এমন কি বিভিন্ন গ্রহতারায় ব্যষ্টিগত অবয়বগুলি লোপ পেলেও গণ ও প্রজাতিগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরা হত। এ কথা সত্য যে প্রকৃতি স্পষ্টতই অবিরাম গতিতে চলছিল, কিন্তু এই গতিটিকেও একই প্রক্রিয়ার নিরন্তর পুনরাবৃত্তি বলে মনে হত। আধিবিদ্যক চিন্তাধারার সঙ্গে এই ধারণাটির মিল ছিল অবিকল—কান্টই এই ধারণায় প্রথম ফাটল ধরালেন এবং ধরালেন এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে তাঁর প্রমাণাদির অধিকাংশই আজও বলবৎ। আবার সঙ্গে সঙ্গে খুব কঠোরভাবে বিবেচনা করলে কান্টের তত্ত্বটি এখনো পর্যন্ত একটি প্রকল্প (Hypothesis) মাত্র। কিন্তু কোপার্নিকাসের বিশ্বব্যবস্থাও* এখন পর্যন্ত এর বেশী কিছু নয়।[৪২] আর তারা-ভরা আকাশে এই রকম তপ্ত—লাল গ্যাসপুঞ্জের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের প্রমাণ, যে প্রমাণের প্রতিবাদ চলে না—পাওয়ার পর থেকে কান্টের তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিরোধিতা শুরু হয়ে গেছে। এই রকম নীহারিকাময় অবস্থা ছাড়া হের ড্যুরিং পর্যন্ত তাঁর বিশ্ব-রচনা সম্পূর্ণ করতে পারতেন না, কিন্তু প্রতিহিংসাবশে তিনি দাবী করেছেন যে এই নীহারিকাময় অবস্থার অন্তর্গত যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি তাঁকে দেখানো হোক; এবং যেহেতু কেউই তা দেখাতে পারে না তাই তিনি বিশ্বের এই নীহারিকাময় অবস্থা সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক মন্তব্য করেছেন। দুর্ভাগ্য যে সমকালের বিজ্ঞান এই ব্যবস্থাটিকে হের ড্যুরিংয়ের কাছে সন্তোষজনকভাবে বর্ণনা করতে পারে না। তেমনই আরও অনেক প্রশ্ন সম্বন্ধেও জবাব দিতে পারে না। বানরদের লেজ

---

* এঙ্গেলস তাঁর 'লুডভিগ ফয়ারবাখ' গ্রন্থে (১৮৮৬) কোপার্নিকাসীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন: 'তিনশো বছর ধরে কোপার্নিকাসীয় সৌরজাগতিক ব্যবস্থাটা ছিল একটি প্রকল্প—বিপক্ষে একের তুলনায় এর পক্ষে সম্ভাবনা ছিল একশো, হাজার বা দশ হাজার, কিন্তু তাহলেও সব সময় সেটি ছিল একটি প্রকল্পমাত্র। কিন্তু পরে এই ব্যবস্থা থেকে গৃহীত তথ্য দ্বারা লেভেরিয়ার যখন একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্বের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করলেন, এবং শুধু তাই নয়, আকাশের কোন জায়গায় এই গ্রহটি আবশ্যিক স্থান হবে তাও হিসাব করে দিলেন, আর গল (galle) যখন বাস্তবিকই এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করলেন তখন কোপার্নিকাসীয় ব্যবস্থাটি প্রমাণ হয়ে গেল।' F. Engels, 'Ludwig Feuerbach', Marx Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow 1962, P. 371. —সম্পা।

থাকে না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত শুধু এটুকুই বলতে পারে: কারণ তাদের লেজ খসে গেছে। কিন্তু তাতে যদি কেউ উত্তেজিত হয়ে বলেন, এর মানে গোটা প্রশ্নটাকেই এমন এক অস্পষ্ট নিরাকার ধরনের খসে যাওয়ার ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যা আরও সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা যায় না—যদি তিনি বলেন যে ধারণাটা খুবই ধোঁয়াটে—তাহলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ওপর এ রকম নৈতিকতা প্রয়োগ থেকে আমরা এক পা-ও এগোতে পারছি না। বিতৃষ্ণা বা বদমেজাজের উপযোগী এইসব বক্তব্য সব সময় সব জায়গায় ব্যবহার করা যায় না, আর ঠিক সেই কারণেই কোনোখানে কোনো সময়েই ব্যবহার করা উচিত নয়। আদি নীহারিকাপুঞ্জের যান্ত্রিক ব্যবস্থাটা হের ড্যুরিং নিজেই আবিষ্কার করুন না কেন, তাতে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না।

সৌভাগ্যক্রমে এখন আমরা জানতে পারলাম যে, 'পার্থিব মাধ্যমের একেবারে সমভাবাপন্ন অবস্থার সঙ্গে কিম্বা অন্য কথায় জড়ের আত্ম-সম অবস্থার সঙ্গে' কান্টের নীহারিকাপুঞ্জ মোটেই 'মোটেই মেলে না'। কান্টের সৌভাগ্য যে তিনি বর্তমান গ্রহতারার পেছনে নীহারিকা গোলকে পৌঁছেই সন্তুষ্ট ছিলেন, জড়ের আত্ম-সম অবস্থার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি! প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কান্টের নীহারিকা গোলককে সমকালীন প্রকৃতি-বিজ্ঞান যখন আদি নীহারিকাপুঞ্জ বলে বর্ণনা করে, তখন সেই কথাটিকে যে আপেক্ষিক অর্থে বুঝতে হবে তা বলাবাহুল্য। এটি আদি নীহারিকাপুঞ্জ কারণ এক দিকে এর থেকেই বর্তমান গ্রহতারা ইত্যাদির উৎপত্তি, আর অন্য দিকে জড়ের আদিমতম আকৃতি এটিই, এখন পর্যন্ত আমরা এই পর্যন্তই পেছনে যেতে পেরেছি। নীহারিকা পর্যায়ের আগে জড় বস্তু আরও অনেক অপরিমেয় সংখ্যক আকৃতি পরম্পরা অতিক্রম করেছে—এ অনুমান এর দ্বারা খণ্ডিত তো হয়ই না বরং প্রকারান্তরে এরই মধ্যে নিহিত থাকে।

হের ড্যুরিং বুঝছেন যে এখানেই তাঁর সুযোগ। বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আপাতত সেইখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি যেখানটাকে আপাতত আদি নীহারিকাপুঞ্জ বলে ধরা হয়; আর হের ড্যুরিং তাঁর বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের সাহায্যে পৌঁছে যাচ্ছেন আরও অনেক পেছনে—'পার্থিব মাধ্যমের সেই অবস্থায় যে অবস্থাটিকে বিশুদ্ধরূপে স্থিতীয় (ঐ ধারণার বর্তমান অর্থে) বলেও বোঝা যেতে পারে না আবার গতীয় বলেও'—একেবারেই বোঝা

যেতে পারেনা, সেই একই কারণে। 'জড় ও যান্ত্রিক বলের ঐক্য যাকে আমরা বলি পার্থিব মাধ্যম তাকেই এমন একটা যুক্তিসঙ্গত-বাস্তব-সূত্র রূপে অভিহিত করা যায় যার দ্বারা জড়ের আত্ম-সম অবস্থা সূচিত হয়, ক্রমবিকাশের যতগুলি স্তর গণনা করা যায় এই অবস্থা তার পূর্বশর্ত।'

জড়ের আত্ম সম আদিম অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে এখনো অনেক দেরি। এখানে এটিকে বলা হয়েছে জড় ও যান্ত্রিক বলের ঐক্য আর সেটি একটি যুক্তিসঙ্গত-বাস্তব সূত্র ইত্যাদি। সুতরাং জড় ও যান্ত্রিক বলের ঐক্য শেষ হওয়া মাত্র গতির শুরু।

'নিজের মধ্যে' (in itself) আর 'নিজের জন্য' (for itself) এই হেগেলীয় ধারণা দুটিকে বাস্তবের দর্শনে ব্যবহারযোগ্য করার জন্যে পূর্বোক্ত যুক্তিসঙ্গত-বাস্তব সূত্রটি একটি অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। একটা বস্তু, প্রক্রিয়া বা ধারণার লুকায়িত ও অবিকশিত স্ববিরোধগুলির মৌলিক স্বরূপতা হচ্ছে হেগেলের 'নিজের মধ্যে' কথাটির অন্তর্গত; আর 'নিজের জন্য'—এর মধ্যে রয়েছে এইসব লুকায়িত উপাদানের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য এবং তাদের সংঘাতের সূত্রপাত। সুতরাং গতিহীন আদিম অবস্থাটিকে জড় ও যান্ত্রিক বলের ঐক্য বলে মনে করতে হবে আর গতিতে উত্তরণকে মনে করতে হবে তাদের পার্থক্য ও বিরোধিতা। ঐ আজগুবি আদিম অবস্থার বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল শুধু এইটুকু যে ঐ অবস্থাটিকে 'নিজের মধ্যে' নামক হেগেলীয় ধারণার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব এবং তেমনই আজগুবিভাবে 'নিজের জন্য' ধারণার মধ্যে তা শেষ করা সম্ভব। হেগেল আমাদের রক্ষা করুন! জড়ই সকল বাস্তবতার বাহন, বলছেন হের ড্যুরিং, সে অনুসারে জড় থেকে আলাদাভাবে কোন যান্ত্রিক বল হতে পারে না। তাছাড়া যান্ত্রিক বল জড়েরই এক অবস্থা। মৌলিক অবস্থায় যখন কিছু ঘটে নি, তখন জড় এবং তার অবস্থা অর্থাৎ যান্ত্রিক বল দুই ই এক ছিল। পরে যখন কিছু ঘটতে আরম্ভ করল তখন এই অবস্থা নিশ্চয়ই জড় থেকে আলাদা হয়ে থাকবে। সুতরাং এই সব রহস্যময় বচন নিয়েই আমাদের বিদায় নিতে হবে, ভরসা রাখতে হবে যে আত্ম-সম অবস্থাটা না স্থিতীয়, না গতীয়, না ভারসাম্যে অবস্থিত, না গতিতে। এখনো জানতে পারলাম না ঐ অবস্থায় যান্ত্রিক বল কোথায় ছিল আর বাইরে থেকে কোন অভিঘাত ছাড়া অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া পরম গতিহীনতা থেকে আমরা কি করে গতিতে পৌছাব।

হের ড্যুরিং-এর আগেকার বস্তুবাদীরা জড় ও গতির কথা বলেছেন। হের ড্যুরিং গতিকে তাঁর তথাকথিত মৌলিক আকৃতিরূপে যান্ত্রিক বলে পর্যবসিত করেছেন, ফলে জড় ও গতির মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধটা তাঁর পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আগেকার সকল বস্তুবাদীদের কাছেও কথাটা পরিষ্কার ছিল না। অথচ বিষয়টা বেশ সরল। গতি হল জড়ের অস্তিত্বের ধরন। গতি ছাড়া জড় কোথাও কখনো হয় নি, হতে পারেও না। প্রত্যেক নির্দিষ্ট মুহূর্তে পৃথিবীর জড় বস্তুসমূহের প্রতিটি ব্যষ্টিগত পরমাণু নিম্নলিখিত কোন না কোন গতিরূপে বা একসঙ্গে কয়েকটি গতিরূপে বর্তমান, যথা— মহাজাগতিক স্থানের মধ্যে গতি, আকাশের বিভিন্ন গ্রহতারার ক্ষুদ্রতর ভর-সমূহের যান্ত্রিক গতি, তাপীয়, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক প্রবাহরূপে আণবিক গতি, রাসায়নিক বিখণ্ডিকরণ বা সম্মেলন, জৈব জীবন ইত্যাদি। সকল বিরাম (rest) ও ভারসাম্যতা আপেক্ষিক মাত্র, জড়ের কোন না কোন নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবেই কেবল সেগুলির অর্থ আছে। যেমন, পৃথিবীর ওপর একটি বস্তু যান্ত্রিক ভারসাম্যে বা যান্ত্রিক বিরামে অবস্থান করতে পারে কিন্তু তাতে পৃথিবীর গতিতে ও সমগ্র সৌর জগতের গতিতে অংশগ্রহণের পক্ষে তার বিন্দুমাত্র বাধা পড়ে না; ঠিক তেমনি তার ক্ষুদ্রতম পদার্থ-কণাগুলি নিজ নিজ তাপ দ্বারা নির্ধারিত স্পন্দন সম্পাদন করাতে, কিম্বা তার অণুগুলিকে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পার করাতে কোন বাধা পড়ে না। গতি ছাড়া জড়ের যেমন ধারণা করা যায় না, ঠিক তেমনই জড় ছাড়া গতিরও ধারণা করা যায় না। সুতরাং জড়ের মতই গতিও সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; পুরানো দর্শনে (দেকার্ত) একথাই ব্যক্ত হয়েছে যে পৃথিবীতে গতির পরিমাণ সব সময়ই এক। সেজন্যে গতি যখন এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় তখন স্থানান্তরের দিক থেকে, গতির কারণ হিসেবে একে সক্রিয় বলে ধরা যেতে পারে, আর এটি যে স্থানান্তরিত হচ্ছে সে দিক থেকে এটি নিষ্ক্রিয়। এই সক্রিয় গতিকে আমরা বলি বল, আর নিষ্ক্রিয় গতিকে বলি বলের প্রকাশ। সুতরাং একথা দিবালোকের মত স্বচ্ছ যে প্রকাশ যত বড় বলও তত বড়, কারণ দুটির মধ্যে একই গতি স্থান পেয়েছে।

সুতরাং জড়ের গতিহীন অবস্থা একটি শূন্য ও অর্থহীন ধারণা, 'বিকারগ্রস্তের উদ্ভট কল্পনা' মাত্র। এরকম ধারণায় পৌঁছাতে হলে আপেক্ষিক যান্ত্রিক

ভারসাম্যটিকে (যে অবস্থায় পৃথিবীর ওপর কোন বস্তু বিরাজ করতে পারে) অনাপেক্ষিক পরম বিরাম বলে মনে করা প্রয়োজন আর তারপর এই ভার-সাম্যকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করা প্রয়োজন। বিশ্বজনীন গতিকে যদি বিশুদ্ধ যান্ত্রিক বলে পর্যবসিত করা হয়, তাহলে এর পথ সুগম হয় নিশ্চয়ই। গতিকে বিশুদ্ধ যান্ত্রিক বলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার আর একটি সুবিধা আছে— তার থেকে ধারণা করা যায় যে বলটি বিরামের অবস্থায় বা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং সেই কারণে এটি তখনকার মত অকার্যকর । কারণ অনেক সময়ে যা ঘটে সেইভাবে যদি গতির স্থানান্তর এমন একটা জটিল প্রক্রিয়া হয় যার মধ্যে কয়েকটি মধ্যবর্তী শৃংখল উপস্থিত রয়েছে, তাহলে শৃংখলের শেষ বন্ধনীটি বাদ দিয়ে আসল স্থানান্তরটিকে ইচ্ছামত যেকোন সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায়। উদাহরণস্বরূপ এই রকমই ঘটে যখন কোন লোক বন্দুকে কার্তুজ ভরে নেয় কিন্তু সেই মুহূর্তটি স্থগিত রাখে, যখন ঘোড়া টেপার ফলে বারুদের দহন দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত গতির স্থানান্তর ঘটে, গুলি বেরিয়ে যায়। সুতরাং একথা কল্পনা করা সম্ভব যে গতিহীন, আত্ম-সম অবস্থার সময় জড়ের মধ্যে বলের কার্তুজ ভরা হয়েছিল ; আর জড় ও যান্ত্রিক বলের ঐক্য বলতে হের ড্যুরিং যদি কিছু বুঝে থাকেন তবে এটিই বুঝেছেন বলে মনে হয়। এ ধারণা অর্থহীন, কারণ এর দ্বারা সারা বিশ্বে এমন একটি অবস্থাকে অনাপেক্ষিক রূপে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে যে-অবস্থা স্বভাবতই আপেক্ষিক এবং সেইজন্য যে কোন একটি সময়ে জড়ের শুধু একটি অংশকেই প্রভাবিত করতে পারে। একথাটা যদি ছেড়েও দিই তাহলেও মুশকিল থেকে যায় : প্রথমত, পৃথিবীটাতে কার্তুজ ভরা হল কি করে, কারণ বন্দুকগুলো তো আজকাল নিজে নিজে কার্তুজ ভরে না ; দ্বিতীয়ত, তাহলে কার আঙুল দিয়ে ঘোড়া টেপা হল ? আমরা যতই এ-পাশ ও-পাশ করি না কেন হের ড্যুরিং-এর পথে চলতে গেলে আমাদের সর্বদাই ফিরে ফিরে আসতে হবে— সেই ভগবানের আঙুলের কাছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে বাস্তবতার দার্শনিকপ্রবর চলে এসেছেন বলবিদ্যা ও ভৌত বিজ্ঞানে। তাপের যান্ত্রিক তত্ত্ব স্বয়ং রবার্ট মায়ার-এর হাতে একটু একটু করে যতখানি বিকশিত হয়েছিল, আবিষ্কারের পরবর্তী প্রজন্মে বাস্তবিক পক্ষে তার আর তার চেয়ে অগ্রগতি হয় নি—এই বলে তিনি বিলাপ করছেন। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাই এখনো খুব ধোয়াঁটে ; আমাদের 'সব সময় মনে রাখতে হবে যে জড়ের গতির অবস্থাসমূহের মধ্যে

স্থিতীয় সম্বন্ধও বর্তমান এবং এইগুলিকে যান্ত্রিক কর্মদ্বারা পরিমাপ করা যায় না ;…আগে যদি আমরা প্রকৃতিকে মস্তবড় কর্মী বলে'বর্ণনা করে থাকি আর এখন যদি আমরা কঠোরভাবে এই শব্দের অর্থ করি তাহলে আমাদের আরও বলতে হবে যে আত্মসম অবস্থা ও স্থিতীয় সম্বন্ধের মধ্যে যান্ত্রিক কর্ম প্রকাশিত হয় না। সুতরাং স্থিতীয় থেকে অতীতের মধ্যবর্তী সেতুটিকে আমরা আবার হারিয়ে ফেলছি ; তথাকথিত লীন তাপ যদি এখন পর্যন্ত এই তত্ত্বের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে থেকে থাকে তাহলে এর মধ্যেও আমাদের একটি ত্রুটি স্বীকার করতেই হবে—মহাজাগতিক ক্ষেত্রে আরোপ করার সময় একথা মোটেই অস্বীকার করা যায় না।'

এই গোটা আপ্তবচনটি আগের মতই বিবেকের দংশন ছাড়া আর কিছু নয় ; সে বিবেক বেশ ভালভাবেই জানে যে পরম গতিহীনতা থেকে গতি সৃষ্টি করতে গিয়ে একেবারে পাঁকের মধ্যে আটকে গেছে, কিন্তু তবু একমাত্র রক্ষাকর্তা অর্থাৎ স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন করতে লজ্জা পাচ্ছে। স্থিতীয় ও গতীয়ের মধ্যে, ভারসাম্য থেকে গতির মধ্যে যে সেতু তা যদি বলবিদ্যার মধ্যে এমনকি তাপ সংক্রান্ত বলবিদ্যার মধ্যেও পাওয়া না যায়, তাহলে হের ড্যুরিংই বা তার গতিহীন অবস্থা থেকে গতির মধ্যেকার সেতু খুঁজে বার করতে বাধ্য থাকবেন কেন ? বেকায়দা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে এইতো তাঁর সুযোগ।

সাধারণ বলবিদ্যায় স্থিতীয় থেকে গতীয়ের মধ্যে সেতু হল—বহিরস্থ অভিঘাত। যদি এক হন্দর ওজনের একটা পাথর মাটি থেকে ১০ গজ উপরে শূন্যে তোলা হয় এবং সেটিকে এমন অবাধভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় যে সেটি আত্ম-সম ও স্থিতিশীল অবস্থায় ঝুলতে থাকে, তা হলে শুধু দুগ্ধপোষ্যদেরই বিশ্বাস করানো যাবে যে পাথরটির বর্তমান অবস্থানে কোন যান্ত্রিক বলবিদ্যাগত কর্ম রূপ পায় নি কিম্বা পূর্বেকার অবস্থান থেকে তার দূরত্বটিকে বলবিদ্যাগত কর্ম দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। পথ চলতি যে কোন লোক হের ড্যুরিংকে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে পাথরটা নিজে নিজে দড়ির কাছে ওঠে নি, আর বলবিদ্যার যে কোনো বই তাকে বলে দিতে পারবে যে তিনি যদি পাথরটিকে আবার পড়তে দেন তাহলে পড়ার সময় সেটি ঠিক ততখানি বল-বিদ্যাগত কর্ম সমাধা করবে যতখানি সেটিকে ১০ গজ ওপরে তোলার জন্যে

প্রয়োজন হয়েছিল। এমন কি পাথরটা যে শূন্যে ঝুলছে এই সোজা কথাটার মধ্যে বলবিদ্যাগত কর্ম নিহিত রয়েছে, কারণ এটি দীর্ঘকাল ঝুলতে থাকলে দড়িটা ছিঁড়ে যায়—রাসায়নিক বিয়োজনের ফলে দড়িটি আর পাথরের ভার বহন করতে পারে না। কিন্তু ঠিক এইরকম সরল মৌলিক আকৃতিতেই (হের ড্যুরিং-এর ভাষায়) সকল বলবিদ্যাগত প্রক্রিয়াকে পর্যবসিত করা যায়, আর যথেষ্ট পরিমাণ বহিরস্থ অভিঘাত হাতে থাকলে স্থিতীয় থেকে গতীয়ের ভিতরকার সেতু খুঁজে পাবে না এমন ইঞ্জিনিয়ার আজও জন্মায় নি।

গতি যে তার বিপরীতের মধ্যে অর্থাৎ বিরামের মধ্যে আপন পরিমাপ খুঁজে পাবে, আমাদের আধিবিদ্যকের কাছে এ বড় খুবই তিক্ত, সমস্যাটাও খুবই কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই এটি একটি জাজ্বল্যমান স্ববিরোধ—আর হের ড্যুরিং-এর মতে প্রত্যেকটি স্ববিরোধই বাজে কথা। তা সত্ত্বেও এ তথ্য অস্বীকার করা যায় না যে একটা ঝুলন্ত পাথরের মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক গতি নিহিত এবং পাথরটির ওজন আর মাটি থেকে তার দূরত্ব দিয়ে সেই গতিকে অবিকলভাবে মাপা যায়; ইচ্ছামত বিভিন্নভাবে তার ব্যবহার হতে পারে, যেমন সোজাসুজি পড়ে গিয়ে, আর নয়ত আনত সমতলে গড়িয়ে গিয়ে কিম্বা কোন অক্ষদণ্ড ঘুরিয়ে। কার্তুজ ভরা বন্দুকের বেলায়ও একথা সত্য। গতিকে তার বিপরীতে অর্থাৎ বিরামের মধ্যে ব্যক্ত করার সম্ভাবনা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে মোটেই কঠিন নয়। আমরা আগে দেখেছি, দ্বান্দ্বিক দর্শনের কাছে সমগ্র প্রতিবিধানটি (antithesis) আপেক্ষিক, বিরাম বা নিঃশর্ত ভারসাম্য বলে কোন জিনিস নেই। আলাদা আলাদা প্রতিটি গতি ভারসাম্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে, আর সামগ্রিক গতি আবার ভারসাম্য শেষ করে দেয়। সুতরাং যখন বিরাম ও ভারসাম্য ঘটে তখন সেগুলি হল সীমিত গতির ফল এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে এই গতিকে তার ফল দ্বারা পরিমাপ করা যায় ও ব্যক্ত করা যায় আর ফলের ভেতর থেকেই তাকে কোন না কোন রূপে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সরলভাবে উপস্থিত করলে হের ড্যুরিং সন্তুষ্ট হতে পারেন না। উত্তম আধিবিদ্যক হিসাবে তিনি প্রথমে গতি ও ভারসাম্যের মাঝখানে এক বিরাট সমুদ্র সৃষ্টি করেন—যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই—তার পর অবাক হয়ে দেখেন যে তার এই আত্মনির্মিত সমুদ্র পার হওয়ার মত কোন সেতু খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি তাঁর আধিবিদ্যক রসিনান্তের পিঠে চড়ে

কান্টীয় 'অজ্ঞেয় বস্তু'-কে (Thing-in-itself) তাড়া করলেও পারতেন, কারণ শেষ পর্যন্ত এই অনাবিষ্কৃত সেতুর পেছনে এই জিনিসই লুকিয়ে রয়েছে, আর কিছু না।

কিন্তু তাপ সম্বন্ধে আধিবিদ্যক তত্ত্ব আর আবদ্ধ বা লীন তাপ যা তাঁর তত্ত্বের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে, তার কি হবে ?

স্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপের নীচে হিমাঙ্কে অবস্থিত এক পাউণ্ড বরফ যদি তাপের সাহায্যে ঐ একই তাপমাত্রায় এক পাউণ্ড জলে রূপান্তরিত হয় তাহলে যে পরিমাণ তাপ লুপ্ত হয় তার দ্বারা ঐ এক পাউণ্ড জলকে শূন্য^0 ডিগ্রী থেকে ৭৯ ; ৪^0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম করা যায় কিম্বা ৭৯'৪ পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়ান যায়। এই এক পাউণ্ড জলকে স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করে তাকে যদি ১০০ ডিগ্রী তাপ মাত্রায় বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে সমস্তটা জল বাষ্পে পরিবর্তিত হওয়া পর্যন্ত যতখানি তাপ লুপ্ত হবে তা প্রায় সাতগুণ বেশী—তার দ্বারা ৫৩৭'২ পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী উপরে তোলা যায়।[৫৩] যে তাপ লুপ্ত হয় তাকে বলা হয় আবদ্ধ তাপ। বাষ্পটিকে ঠাণ্ডা করে যদি আবার জলে পরিণত করা হয় এবং জল যদি আবার বরফে পরিণত হয় তাহলে যতখানি তাপ আগে আবদ্ধ হয়েছিল ঠিক ততখানি তাপ আবার এখন মুক্তি পায় অর্থাৎ তাকে তাপ হিসাবে অনুভব ও পরিমাপ করা যায়। বাষ্পের ঘনীকরণ ও জলের হিমকরণের ফলে যে তাপ-মুক্তি ঘটে তার জন্যেই বাষ্প ১০০ ডিগ্রীতে শীতল হলে শুধু আস্তে আস্তেই জলে রূপান্তরিত হয়, আর ঐ একই কারণে হিমাংকে অবস্থিত জলরাশি শুধু আস্তে আস্তেই বরফে রূপান্তরিত হয়। এই হলো আসল ঘটনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাপ যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ কি ঘটে ?

তাপের বলবিদ্যাগত তত্ত্ব অনুসারে কোন বস্তুর ভৌতভাবে সক্রিয় ক্ষুদ্রতম কণাগুলির বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর স্পন্দন দ্বারা তাপ গঠিত হয়—যে স্পন্দন তাপমাত্রা ও সমাহরণের (aggregation) অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে যে কোন রকম গতিতে পরিবর্তিত হতে পারে ; এই তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, যে-তাপ অদৃশ্য হয়ে গেছে সে তাপ কর্ম সম্পাদন করেছে, কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। বরফ গলে গেলে পৃথক পৃথক অণুর মধ্যেকার দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, একটা আলগা ধরনের পাশাপাশি

অবস্থিতি তার স্থান গ্রহণ করে; স্ফুটনাংকস্থ জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন তা এমন এক অবস্থায় পৌঁছায় যেখানে আলাদা আলাদা অণুগুলির আর পরস্পরের ওপর কোন লক্ষণীয় প্রভাব থাকে না, এমন কি তাপের প্রভাবে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কথা পরিষ্কার যে, বস্তুবিশেষের একক অণুগুলি তরল অবস্থার চাইতে গ্যাসীয় অবস্থায় অনেক বেশী শক্তিশালী, আবার ঘন অবস্থার চাইতে তরল অবস্থায় অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং আবদ্ধ তাপ অদৃশ্য হয় নি, শুধু রূপান্তরিত হয়েছে এবং আণবিক টানের রূপ ধারণ করেছে। আলাদা আলাদা অণুগুলি যে অবস্থায় পরস্পরের সম্পর্কে অনাপেক্ষিক বা আপেক্ষিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে সে অবস্থা যখন আর বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ তাপ মাত্রা যখনই ন্যূনতম ১০০ ডিগ্রি বা শূন্য ডিগ্রীর নীচে নেমে যায় তখন এই টান শিথিল হয়, অণুগুলি যে শক্তি নিয়ে আগে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, এখন আবার ঠিক সেই শক্তি নিয়েই তারা পরস্পরের কাছে ঘেঁষে আসে ; এই শক্তি অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু আবার তাপ রূপে পুনরাবির্ভূত হয়, যে পরিমাণ তাপ আগে আবদ্ধ ছিল, ঠিক সেই পরিমাণ তাপই আবার আবির্ভূত হয়। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য একটি প্রকল্প—তাপের আধিবিদ্যক তত্ত্ব সবটাই তাই, কারণ আজ পর্যন্ত কেউ কখনো অণুই দেখে নি, তার স্পন্দন তো দূরের কথা। ঠিক এই কারণেই এর মধ্যে বহু ভুল থাকবে, এই সমগ্র আনকোরা তত্ত্বের মধ্যে তা আছেও ; কিন্তু এই তত্ত্ব অন্তত কি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে অথচ গতিকে যে ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না, এই ধারণার সঙ্গে তার কোন বিরোধ ঘটে না, এমন কি তাপের রূপান্তরের সময়ও তার গতিবিধির হিসাব দিতে পারে। সুতরাং তাপের বলবিদ্যাগত তত্ত্বের পক্ষে লীন বা আবদ্ধ তাপ কোন বাধা সৃষ্টি করে না। বরং কি ঘটে সে সম্বন্ধে এই তত্ত্বই সর্বপ্রথম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে ; এর মধ্যে অন্য কোন প্রতিবন্ধকের প্রশ্ন নেই—প্রতিবন্ধক শুধু এই পর্যন্ত যে, যে-তাপ অন্য কোন রকম আণবিক কর্মক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়, পদার্থবিদরা এখনো তাকে 'আবদ্ধ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেন, যে শব্দটি এখন অপ্রচলিত ও অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

সুতরাং সমাহরণের ঘন, তরল ও গ্যাসীয় আকৃতিতে আত্ম-সম অবস্থাগুলি ও বিরামের শর্তগুলি দ্বারা অবশ্যই যান্ত্রিক কর্ম সূচিত হয়—অন্তত ততদূর পর্যন্ত সূচিত হয়, যতদূর পর্যন্ত যান্ত্রিক কর্মই তাপের পরিমাপ।

পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠদেশ আর সমুদ্রের জলরাশি দুই-ই তাদের সমাহরণের বর্তমান অবস্থায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপ্রাপ্ত তাপের প্রতিনিধি স্থানীয়—অবশ্য ঠিক তারই অনুরূপ এক সম ও নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক বল পাওয়া যেতে পারে। যে গ্যাসীয় গোলক থেকে পৃথিবী বিকশিত হয়েছে, তার তরল অবস্থায় এবং পরবর্তী কালে প্রধানত ঘনাকার সমাহিত অবস্থায় রূপান্তরের পথে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আণবিক শক্তি তাপরূপে মহাশূন্যে বিকীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং হের ড্যুরিং তাঁর রহস্যজনক ধরনে যে অসুবিধার কথা অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন, তার কোন অস্তিত্ব নেই। এমনকি তত্ত্বটিকে মহাজাগতিক ভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে আমাদের সামনে ত্রুটি ও ফাঁক উপস্থিত হতে পারে বটে—আমাদের জ্ঞানার্জনের অসম্পূর্ণ উপায়ই যার কারণ, কিন্তু তত্ত্বের দিকে থেকে অনতিক্রম্য বাধা কোথাও দেখা যায় না। এখানেও স্থিতি থেকে গতির মধ্যবর্তী সেতু হল বহিরস্থ অভিঘাত—ভারসাম্যে অবস্থিত বস্তুর উপর ক্রিয়া করতে গিয়ে অন্যান্য বস্তু যে শৈত্য বা তাপ সৃষ্টি করে তাই। ড্যুরিং-এর প্রাকৃতিক দর্শনের মধ্যে যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই মনে হয় যে গতিহীনতা থেকে গতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার সকল প্রচেষ্টাই অসম্ভব, বিশুদ্ধ স্থিতীয় বা বিরামশীল অবস্থা যে ওপর দিকে নিজের দ্বারাই গতিতে পৌঁছাতে পারে, সে সেতুটি খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব।

এই কথা বলে সৌভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের জন্যে আত্মসম আদিম অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেলাম। হের ড্যুরিং চলে গেলেন রসায়ন শাস্ত্রে—তাঁর বাস্তবতার দর্শন দ্বারা প্রাকৃতিক নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সুযোগে সেগুলি তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, যথা:

(১) সাধারণভাবে সকল পদার্থের পরিমাণ; (২) সরল (রাসায়নিক) মৌল উপাদানগুলির পরিমাণ আর (৩) যান্ত্রিক বলের পরিমাণ ধ্রুব থাকে।

অতএব পদার্থ এবং তার সরল আঙ্গিক উপাদানগুলি (সেগুলি যতদূর পর্যন্ত পদার্থ দ্বারা গঠিত ততদূর পর্যন্ত) যে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, গতিকেও যে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না—যে কথা সারা বিশ্ব বহুকাল ধরে জানে—সেগুলির শুধু অতি অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হের ড্যুরিং-এর একমাত্র সদর্থক দান, অজৈব পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর প্রাকৃতিক দর্শনের পরিণতিই এই।

এইসব আমরা অনেক আগেই জানতাম। কিন্তু জানতাম না যে নিষ্ক্রিয়তার নিয়ম আছে এবং সেই হিসাবে 'বস্তু-প্রণালীর পরিকল্পগত গুণাগুণ' আছে। কান্ট নিয়ে এর আগে যা ঘটেছিল, এখনও আবার তাই দেখছি: কোন পুরানো পরিচিত বক্রোক্তি তুলে নিয়ে হের ড্যুরিং তার ওপরে এক ড্যুরিং মার্কা এঁটে দিয়েছেন এবং তার ফলটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন: 'একেবারে তলা থেকে মৌলিক সিদ্ধান্ত ও মতামত…প্রণালী—সৃষ্টিকারী ধারণা…দৃঢ়মূল বিজ্ঞান।'

কিন্তু এই জন্যে আমাদের কোন রকমেই হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন কি সবচেয়ে দৃঢ়মূল বিজ্ঞানের মধ্যে এবং সবচেয়ে সুশৃঙ্খল সমাজের মধ্যেও যে ত্রুটি থাকুক না কেন, হের ড্যুরিং অন্তত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একটি কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন: 'পৃথিবীতে যত স্বর্ণ বিদ্যমান তার পরিমাণ সব সময় নিশ্চয় এক ছিল। সাধারণভাবে পদার্থের যতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকতে পারে, এরও ততটুকুই ঘটে থাকবে।' এই বিদ্যমান স্বর্ণ দিয়ে আমরা কি কিনতে পারি, দুর্ভাগ্যক্রমে হের ড্যুরিং সেকথা কিন্তু বলেন নি।

সাত

প্রাকৃতিক দর্শন

জীবজগৎ

'কয়েকটি মধ্যবর্তী ধাপের একটি মাত্র সমাকার সোপান বেয়েই চাপ ও অভিঘাতের বলবিদ্যা থেকে সংবেদন ও ধারণার যোগসূত্রে পৌঁছাতে হয়।'

এইটুকু ভরসা দিয়েই হের ড্যুরিং জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর কিছু বলার কষ্ট এড়িয়ে গেছেন। যে চিন্তানায়ক পৃথিবীর বিকাশের পথ ধরে পশ্চাদবর্তন করতে করতে তার আত্ম-সম অবস্থা বের করে ফেলেছেন, অন্যান্য গ্রহতারাতেও অবাধে বিচারণ করেছেন, তাঁর অবশ্য একথাটাও যে সঠিকভাবে জানা উচিত ছিল, তা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যায়। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিমাণ সম্বন্ধে হেগেলের পাতস্থানীয় (nodal) রেখা দ্বারা সম্পূর্ণ না করলে ড্যুরিং-প্রদত্ত ভরসাটি শুধু অর্ধ সত্য। ক্রমিকতা যতই থাকুক না, এক ধরনের গতি থেকে আর এক ধরনের গতিতে রূপান্তর সর্বদাই একটি উল্লম্ফন বা চূড়ান্ত পরিবর্তন। গ্রহতারার গতিশীল রূপান্তর থেকে আরম্ভ করে কোন বিশেষ গ্রহতারায় অবস্থিত ক্ষুদ্রতর ভরগুলির গতিশীলতার বলাবিদ্যায় রূপান্তর পর্যন্ত একথা সত্য; তেমনই সত্য ভরসমূহের গতিশীলতার রূপান্তর পর্যন্ত—তারই মধ্যে আছে ভৌত-বিদ্যা দ্বারা অনুশীলিত গতির নানা রূপ: তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বকতা। অনুরূপভাবে অণুর ভৌতবিদ্যা থেকে পরমাণুর ভৌতবিদ্যার রূপান্তর অর্থাৎ রসায়ন, তাব সঙ্গে আবার এক চূড়ান্ত উল্লম্ফন জড়িত; সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে অ্যালবুমেনের রাসায়নিকতায় রূপান্তর—যাকে আমরা বলি জীবন, তা আরও স্পষ্টভাবেই ঘটে।[৪৪] তারপর জীবনমণ্ডলের মধ্যে উল্লম্ফন ক্রমেই কমে আসতে থাকে, অনুভূতির অগোচর হতে থাকে।—সুতরাং আবার হের ড্যুরিং-এর ভ্রম সংশোধন করে দিতে হলো সেই হেগেলকেই।

উদ্দেশ্যের ধারণা থেকে হের ড্যুরিং ধারণাগতভাবে জৈব পৃথিবীতে উত্তরণের পথে গেলেন। এটাও আবার হেগেলের কাছ থেকে ধার করা। হেগেল তাঁর Logic গ্রন্থে Doctrine of the Notion-এর (প্রত্যয়ের নীতির) মধ্যে রাসায়নিকতা থেকে জীবনে উত্তরণ দেখিয়েছেন উদ্দেশ্যবাদের সাহায্যে অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে। হের ড্যুরিং এর লেখা পড়তে গেলেই হেগেলীয় 'স্থূলতার' মধ্যে পড়তে হয়, আর তাকেই তিনি নিজের দৃঢ়মূল বিজ্ঞান বলে অম্লান বদনে চালিয়ে দেন। জীবজগৎ সম্বন্ধে উপায় ও লক্ষ্যের ধারণাগুলি প্রয়োগ করা কতখানি ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত সে কথা অনুসন্ধান করতে গেলে বড় বেশি দূর যেতে হয়। যাই হোক, হেগেলের 'অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য' অর্থাৎ এমন উদ্দেশ্য যা ভবিষ্য-দর্শনের জ্ঞানের মত কোন তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে আমদানি হয় নি, অজ্ঞেয় সত্তারি প্রয়োজনের মধ্যেই অবস্থিত আছে। সেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকেও প্রয়োগ করতে গেলে দর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা অনবরত প্রকৃতির ওপর সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা নির্বিচারে আরোপ করেন—বিচার-বিবেচনা না করেই। অন্য লোকের মধ্যে এতটুকু 'আত্মিকতার' 'ভৌতিকতার' ঝোঁক দেখলে হের ড্যুরিং-এর নৈতিক বিক্ষোভের অবধি থাকে না, অথচ তিনিই আবার আমাদের 'নিশ্চয়ভাবে' ভরসা দিচ্ছেন যে 'সহজাত প্রবৃত্তিগত সংবেদনগুলির সুস্পষ্ট সক্রিয়তার সঙ্গে যে পরিতৃপ্তি জড়িত থাকে সেগুলির খাতিরেই ঐ অনুভূতিগুলি প্রধানত সৃষ্টি হয়েছিল।' তিনি বলেছেন যে প্রকৃতি বেচারা 'বস্তুসমূহের পৃথিবীতে অনবরত শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বাধ্য', আর তা করতে গিয়ে তাকে এমন একাধিক ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে হয় 'যার জন্যে প্রকৃতির পক্ষে এমন চতুরতা প্রয়োজন যে চতুরতার অস্তিত্ব আছে বলে সাধারণত মনে হয় না।' কিন্তু এটা বা ওটা কেন করতে হয় সে কথাতো প্রকৃতি **জানেই**, পরিচারিকার কাজতো তাকে করতেই হয়, বিষয়ীগত সচেতন চিন্তার মধ্যে যা আপনা থেকেই অতি বড় সদ্গুণ সেই চাতুরী তো তার আছেই, তার ওপর তার একটা ইচ্ছাও আছে তার ওপর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আরও যা করে—যার দ্বারা পুষ্টি, প্রজনন প্রভৃতি আসল স্বাভাবিক কর্মগুলি নৈমিত্তিকভাবে সম্পন্ন হয়, সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ঐচ্ছিক বলে মনে না করে শুধু পরোক্ষভাবে **ঐচ্ছিক** বলেই মনে করা উচিত।' সুতরাং আমরা এমন এক প্রকৃতিতে পৌঁছলাম যা সচেতনভাবে চিন্তা ও ক্রিয়া

করে এবং তার ফলে আমরা একেবারে 'সেতুটি'র ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম— অবশ্য সে সেতু দ্বিতীয় থেকে গতীয় পর্যন্ত নয়, সর্বেশ্বরবাদ থেকে ঈশ্বরবাদ পর্যন্ত। নাকি হের ড্যুরিং অন্তত একবারের মত 'প্রাকৃতিক-দার্শনিক অর্ধ-কবিতা' নিয়ে খেলা করছেন ?

অসম্ভব! জৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবতার দার্শনিক মহাশয় যেটুকু বলতে পারেন তা এই প্রাকৃতিক দার্শনিক অর্ধ-কবিতাবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 'অসার পল্লবগ্রাহিতা ও ছদ্ম বৈজ্ঞানিক রহস্যময়তার দ্বারা গঠিত হাতুড়ে বৃত্তির' বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর ডারউইনবাদের 'কবিত্ব সৃষ্টিকারী চরিত্রগুলির' বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ডারউইনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল: তিনি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে স্থানান্তরিত করেছেন, অনেক পশু-উৎপাদকের ধারণার মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের তত্ত্বের ভিতর দিয়ে তিনি অবৈজ্ঞানিক অর্ধ-কবিতা অনুসরণ করেছেন, লামার্ক থেকে তিনি যা ধার করেছেন সেটুকু বাদ দিলে ডারউইন-বাদের বাকি সবটাই একটি মনুষ্যবিরোধী পাশবিকতা।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে নানা পর্যটন থেকে ফিরে এসে ডারউইন ধারণা করেন যে গাছপালা ও জীবজন্তু প্রজাতিগুলি সুস্থির (constant) নয়, সেগুলি প্রকরণের (variation) অধীন। ঘরে ফেরার পর এই ধারণাকে আরও অনুসন্ধান করার পক্ষে তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ছিল জীবজন্তু ও গাছপালা প্রজননের বিষয়। ঠিক এই বিষয়েই ইংল্যাণ্ড ছিল ধ্রুপদী দেশ, এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ড যতখানি সাফল্য অর্জন করেছিল সে তুলনায় জার্মানি তথা অন্যান্য দেশের সাফল্য খুবই কম। তাছাড়া সাফল্যগুলির অধিকাংশই ঘটেছিল বিগত শত বৎসরের মধ্যে, সুতরাং তথ্যগুলি প্রমাণ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল না। ডারউইন দেখতে পান, একই প্রজাতির জীবজন্তু ও গাছ-পালার মধ্যে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করলে পার্থক্য অনেক বেশি হয়—যেগুলিকে সাধারণভাবে পৃথক প্রজাতি বলে ধরা হয় তার চেয়েও বেশি পার্থক্য দেখা যায়। এইভাবে একটা কোন বিন্দু পর্যন্ত প্রজাতিসমূহের প্রকারণতা প্রতিষ্ঠিত হল, আর অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জীবের পক্ষে একটা অভিন্ন উৎপত্তির সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর ডারউইন অনুসন্ধান করে চললেন, প্রকৃতির মধ্যে কি এরকম কারণের সম্ভাবনা নেই যা উৎপাদনকারীর

সচেতন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে জীবিত প্রাণীর মধ্যে সেই একইরকম পরিবর্তন সৃষ্টি করবে যে পরিবর্তন কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা সৃষ্ট হয়?…প্রকৃতি যে বিরাটসংখ্যক জীবাণু সৃষ্টি করে আর যে নগণ্যসংখ্যক দেহতন্ত্র বাস্তবে পরিপক্কতা লাভ করে—এই অসামঞ্জস্যর মধ্যেই তিনি কারণগুলি খুঁজে পান। কিন্তু প্রতিটি জীবাণু যখন বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে তখন আবশ্যিকভাবেই অস্তিত্বের সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং তা প্রকাশিত হয় শুধু প্রত্যক্ষ শারীরিক হ্রাস বা সংঘাত রূপেই নয়, স্থান ও আলোকের জন্যে সংগ্রাম রূপেও —এমন কি গাছপালার ব্যাপারেও এই রকম ঘটে থাকে। এই সংগ্রামে ব্যষ্টিগুলির এমন কোন ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য আছে (তা যত সামান্য হোক) যাতে অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে একটু সুবিধা এনে দেয়, তাদের পক্ষে পরিপক্কতা ও প্রজননের সুযোগ সবচেয়ে বেশি একথা স্বতঃসিদ্ধ। এইভাবে ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রবণতা হল বংশগতি ধরে নেমে আসা, একই প্রজাতির অনেকগুলি ব্যষ্টির মধ্যে এগুলি যখন দেখা যায় তখন সঞ্চিত বংশগতির মাধ্যমে পূর্বগৃহীত পথে আরও সুপরিস্ফুট হওয়ার প্রবণতা আসে; আর যে ব্যষ্টিগুলির এইসব বৈশিষ্ট্য থাকে না, অস্তিত্বের সংগ্রামে তারা সহজেই মারা পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যোগ্যতমের উদ্বর্তন মারফত প্রজাতি পরিবর্তিত হয়।

ডারউইনের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে হের ড্যুরিং এখন দাবি করছেন। ডারউইন নিজেই নাকি স্বীকার করেছিলেন যে জনসংখ্যা বিষয়ক অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক ম্যালথাস-এর মতামত সামান্যীকরণ করে তার মধ্যেই অস্তিত্বের সংগ্রামের ধারণার উৎপত্তি খুঁজতে হবে আর এই কারণে অতি জনসংখ্যা সংক্রান্ত ম্যালথাসের পাদরিসুলভ ধারণার মধ্যে যা কিছু ত্রুটি নিহিত আছে, সে সমস্ত ত্রুটি ডারউইনের ধারণায়ও বর্তমান।

অথচ ডারউইন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম সম্পর্কিত ধারণাটির উৎস পাওয়া যাবে ম্যালথাসের মধ্যে। তিনি শুধু বলেছেন, ম্যালথাসীয় তত্ত্বকে সমগ্র পশু ও উদ্ভিদ জগতে প্রয়োগ করলে যা দাঁড়ায়, অস্তিত্বের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব তাইই। এত সরলভাবে দোষগুণ বিচার না করে ম্যালথাসীয় তত্ত্ব স্বীকার করতে গিয়ে ডারউইন যতবড় ভুলই করে থাকুন, তা সত্ত্বেও যে কোন লোক প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতির মধ্যে অস্তিত্বের জন্যে যে-সংগ্রাম চলেছে তা দেখবার জন্যে ম্যালথাসীয় চশমার

প্রয়োজন হয় না—প্রকৃতি যে বিপুল সংখ্যক জীবাণুর জন্ম দেয় এবং তার মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক পরিপক্বতা লাভ করে,এই স্ববিরোধিতা, বাস্তবে প্রায়ই এক অতি নিষ্ঠুর অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে স্ববিরোধিতার সমাধান হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তা বোঝার জন্য ম্যালথাসীয় চশমার দরকার হয় না। যে সব ম্যালথাসীয় যুক্তির ওপরে রিকার্ডো তাঁর মজুরীর সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেইসব যুক্তি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার পরেও রিকার্ডোর সূত্রের মূল্য যেমন বজায় আছে, তেমনই ম্যালথাসীয় ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই প্রকৃতির মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম চলতে পারে। শুধু তাই কেন, প্রকৃতির প্রাণীসমূহের (organism) সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাদের নিজস্ব নিয়ম আছে ; সে নিয়মগুলি সম্বন্ধে এখনো পর্যন্ত কোন অনুসন্ধান হয় নি বললেই হয়, যদিও নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রজাতিসমূহের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বের গুরুত্ব হবে চূড়ান্ত। তবে এই দিকে কাজ করার জন্যেও চূড়ান্ত প্রেরণা কে দিয়েছিলেন ? ডারউইন ছাড়া আর কেউ না।

সমস্যার এই সদর্থক দিক পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারটি হের ড্যুরিং সযত্নে পরিহার করেছেন। তার বদলে তিনি অস্তিত্বের সংগ্রামকেই বারবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে, দেখলেই বোঝা যায় যে অচেতন উদ্ভিদ আর সহৃদয় উদ্ভিদভোজীদের মধ্যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের কথাই ওঠে না : 'সঠিক ও সুনির্দিষ্ট রূপে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যাবে বর্বরতার রাজত্বে যেখানে জন্তুজানোয়ারেরা তাদের শিকারের ওপর এবং শিকার ভক্ষণের ওপর বেঁচে থাকে।' অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের ধারণাটিকে এই রকম সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নামিয়ে আনার পর ধারণাটির বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বিক্ষোভ উজাড় করে দিয়েছেন। যদিও তিনি নিজেই ধারণাটিকে সীমাবদ্ধ করেছেন বর্বরতার মধ্যে। কিন্তু এই নৈতিক বিক্ষোভ ফিরে এসে হের ড্যুরিংকেই আঘাত করে, কারণ অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম সম্পর্কে এই সীমিত ধারণার রচয়িতা শুধু তিনিই, সুতরাং শুধু তিনিই এর জন্যে দায়ী। অতএব যিনি 'পশুদের রাজত্বের মধ্যে প্রকৃতির সমস্ত কার্য-কলাপের নিয়ম ও জ্ঞান খুঁজতে গিয়েছিলেন তিনি ডারউইন নন (বাস্তবিক ডারউইন বেশ সুস্পষ্টভাবে সকল জৈব প্রকৃতিকে ঐ সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে-ছিলেন)—তিনি আসলে একটি মনগড়া জুজু, হের ড্যুরিং নিজেই সেই জুজুটিকে খাড়া করেছেন। অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম—এই নামটাকে অবশ্য হের

ড্যুরিং-এর সুউচ্চ নৈতিক বিক্ষোভের কাছে স্বচ্ছন্দে বলি দেওয়া যায়। তথ্যটা যে উদ্ভিদের মধ্যেও বর্তমান তা প্রতিটি মাঠ, প্রতিটি শস্যক্ষেত্র, প্রতিটি বনভূমি দ্বারাই তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া যায় ; এটার নাম কি হবে, 'অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম' না 'জীবনের অবস্থা ও যান্ত্রিক সুযোগসুবিধার অভাব'—প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন হল প্রজাতির সংরক্ষণ বা প্রকারণ এই তথ্য দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এ বিষয়ে হের ড্যুরিং একগুঁয়ে ও আত্ম-সম ধরনে নির্বাক থেকে গেছেন। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনের সময় যেমন ছিল, এখনকার মত সবই তেমন থাকতে পারে।

কিন্তু ডারউইনবাদ 'তার রূপান্তর ও পার্থক্যগুলি শূন্য থেকে উৎপাদন করেছে'। প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিষয়ে বিবেচনা করবার সময় কি কি কারণে পৃথক পৃথক ব্যষ্টির মধ্যে পরিবর্তনগুলি উৎপন্ন হল সে কথা ডারউইন হিসাবে ধরেন নি তা সত্য—এই রকম ব্যষ্টিগত বিচ্যুতিগুলি কিভাবে ক্রমে ক্রমে একটা জাতি, প্রকার বা প্রজাতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, সেকথাই তিনি প্রথমে আলোচনা করেছেন। এই কারণগুলি এখন পর্যন্ত অংশত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আর অংশত কেবলমাত্র সম্পূর্ণ সাধারণ শব্দে বর্ণনাযোগ্য ; এই কারণগুলি আবিষ্কার করার চাইতে কারণগুলির ফল কোন্ যুক্তি-সঙ্গত ধরনে সুস্থিত হয় বা স্থায়ী তাৎপর্য লাভ করে তা আবিষ্কার করাই ডারউইনের কাছে তখনকার মত অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য তা করতে গিয়ে ডারউইন তার আবিষ্কারের কর্মক্ষেত্রের ওপর অত্যন্ত ব্যাপক পরিধি আরোপ করেন, প্রজাতি পরিবর্তনের ব্যাপারে এটিকেই প্রধান কারক রূপে উপস্থিত করেন, ব্যষ্টিগত প্রকারণের পৌনঃপৌনিকতা অবহেলা করে বরং প্রকারণ-গুলি কোন আকৃতিতে সাধারণ হয়ে দাঁড়ায় সে কথার ওপরই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেন ; তবে এরকম ভুল তাঁর একার নয়। যাঁরা বাস্তবিকই এগিয়ে যান তাঁদের অনেকেই এ রকম ভুল করেন। অধিকন্তু ডারউইন যদি তাঁর ব্যষ্টিগত রূপান্তরগুলি শূন্য থেকে সৃষ্টি করে থাকেন এবং তা করতে গিয়ে কেবলমাত্র 'উৎপাদকের জ্ঞানই' প্রয়োগ করে থাকেন তা হলে উৎপাদককেও তাঁর জন্তু ও উদ্ভিদাদির আকৃতিগুলিকে—যেগুলি কাল্পনিক নয় বাস্তব—শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু আবার বলি এই রূপান্তর ও পার্থক্যগুলি ঠিক কি ভাবে ঘটে সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রেরণা দেন ডারউইনই, আর কেউ নন।

সম্প্রতিকালে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটিকে বিশেষ করে হেকেল আরও

প্রসারিত করেছেন। এখন মনে করা হয় যে প্রজাতিসমূহের প্রকারণ অভি-যোজন ও বংশগতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল; এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ধরা হয় যে অভিযোজন থেকেই প্রকারণের উৎপত্তি আর বংশগতি হল সংরক্ষণ-মূলক উপাদান। হের ড্যুরিং এটিকেও সন্তোষজনক মনে করেন নি। 'জীবনের যে অবস্থাগুলিকে প্রকৃতি সামনে এনে দেয় বা আটকে রাখে সেইসব অবস্থার সঙ্গে বাস্তব অভিযোজনের পূর্বশর্ত হল ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত ক্রিয়া ও অভিঘাত। নতুবা অভিযোজনটি শুধু আপাত প্রতীয়মান, তদুপরি ক্রিয়াশীল কারণতাটি পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক ও উদ্ভিদ সারির নিম্নস্তর ছাড়িয়ে ওঠে না।' এখানেও আবার নাম দেখেই হের ড্যুরিং-এর রাগ। কিন্তু প্রক্রিয়াটিকে তিনি যে নামই দিন, এখানে প্রশ্ন হল এই রকম প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই অঙ্গীসমূহের প্রজাতিগুলিতে প্রসারণ ঘটে কি ঘটে না। আর এখানেও হের ড্যুরিং-এর মুখে জবাব নেই।

'বাড়বার সময় যে পথে সব চেয়ে বেশি আলো পাওয়া যাবে উদ্ভিদ যদি সেই পথ ধরে তা হলে অনুপ্রাণনার এই ফলটি ভৌত বল এবং রাসায়নিক কারকের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়; একে যদি অভিযোজন বলে বর্ণনা করার চেষ্টা হয়, রূপক হিসাবে নয় (শব্দটির আসল অর্থে) তাহলে ধারণাগুলির মধ্যে একটা চিন্ময় বিভ্রান্তি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।' অন্যদের বিরুদ্ধে এমনই কঠোরতা প্রয়োগ করেছেন তিনিই যিনি ভাল ভাবেই জানেন কার ইচ্ছায় প্রকৃতি বিভিন্ন কাজ করে, যিনি প্রকৃতির কুশলতার কথা এমনকি তার ইচ্ছার কথাও বলে থাকেন! চিন্ময় বিভ্রান্তি তো বটেই, কিন্তু কার? হেকেলের না হের ড্যুরিং-এর।

শুধু চিন্ময় নয়, যুক্তিতেও বিভ্রান্তি। প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যের বলবত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হের ড্যুরিং প্রাণপণে জোর দিয়েছেন তা আমরা দেখেছি; 'উপায় আর লক্ষ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে কোন সচেতন অভিপ্রায়ের কথা মোটেই ধরে নেওয়া হয় না।' সচেতন অভিপ্রায় ব্যতীত, ধারণাসমূহের মাধ্যম ব্যতীত যে অভিযোজন—এত উৎসাহ সহকারে তিনি যার বিরোধিতা করছেন—সে অভিযোজন তা হলে এই রকম অচেতন উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা ছাড়া আর কি?

সুতরাং গেছো ব্যাং আর পত্র-ভুক পতঙ্গ যদি সবুজ হয়, মরুভূমির জন্তু-জানোয়ারের রং যদি বালির মত হলদে হয় আর মেরু অঞ্চলে জীবজন্তুর রং

যদি বরফের মত সাদা হয় তা হলে তারা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা কোন ধারণা অনুসরণ করে এইসব রং গ্রহণ করে নি ; বরং উল্টো, কেবলমাত্র ভৌত শক্তি আর রাসায়নিক কারকের ভিত্তিতে রংগুলির কারণ বোঝানো যায়। তবুও অস্বীকার করা যায় না যে এইসব রংয়ের জন্যে এই প্রাণীগুলিকে তাদের শত্রুরা সহজে দেখতে পায় না এবং সেই হিসাবে প্রাণীগুলি তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিযোজিত হয়ে পড়ে। কতকগুলি গাছগাছড়ার ওপরে পতঙ্গ বসলে গাছগাছড়াগুলি যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেগুলিকে ধরে খায়, সেইসব গাছগাছড়াও ঠিক একইভাবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজিত, এমন কি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অভিযোজিতও বটে। সুতরাং হের ড্যুরিং যদি জিদ করেন যে এই অভিযোজনকেও ধারণা মারফৎ কার্যকর হতে হবে, তাহলে তিনি এই কথাই বলছেন—শুধু ভাষাটা একটু ভিন্ন—যে, উদ্দেশ্যমূলক কর্মতৎপরতাকেও নিয়ে আসতে হবে ধারণার মারফত, হতে হবে সচেতন ও ঐচ্ছিক। এবং তার ফলে আমরা পৌঁছাচ্ছি এক উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে—হের ড্যুরিং-এর বাস্তবতার দর্শনে যা সাধারণত ঘটে থাকে। 'এই ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হত ঈশ্বরবাদ এবং তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না'—বলছেন হের ড্যুরিং—'কিন্তু এ সম্পর্কেও সব জিনিস এখন যেন পেছন দিকে চলেছে।'

অভিযোজন থেকে এখন আমরা আসছি বংশগতিতে। হের ড্যুরিং-এর মত অনুসারে, এক্ষেত্রেও ডারউইনবাদ সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছে। ডারউইন নাকি বলেছেন যে সমগ্র জীব জগৎ এক আদিম প্রাণসত্তা থেকে উদ্ভূত, বলতে গেলে একটি মাত্র প্রাণীর বংশধর। ড্যুরিং বলছেন, ডারউইনের মতে প্রকৃতির সমাকার উৎপন্নগুলির মধ্যে স্বাধীন সমান্তরাল পংক্তি বলে কিছু নেই যদি না সেগুলি অভিন্ন উদ্ভব দ্বারা সম্বন্ধিত হয় : এবং সেই কারণে ডারউইন ও তাঁর পূর্বতন মতামতগুলিকে অবশ্যই এমন বিন্দুতে এসে শেষ হতে হবে যেখানে জন্মদান করা বা অন্য ধরনে বংশ বিস্তার করার সূত্রটি ছিঁড়ে যায়।

সমস্ত বর্তমান জৈবদেহের পেছনে ডারউইন একটি আদিম প্রাণী খুঁজে পেয়েছেন একথাটা, ভদ্রভাবে বললে, হের ড্যুরিং-এর 'নিজের স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনার' ফল। ডারউইন তাঁর 'অরিজিন অফ্ স্পেসীস' (প্রজাতির উৎপত্তি) গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠায় পরিষ্কার বলেছেন যে

তিনি 'সকল প্রাণীকে বিশেষ সৃষ্টি বলে' মনে করেন না, 'অল্প কতকগুলি প্রাণীর বংশানুক্রমিক সন্তানসন্ততি বলে' মনে করেন।[৩৫] হেকেল আবার আরও অনেক এগিয়ে গেছেন। তিনি 'উদ্ভিদ জগতের জন্যে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বীজ উদ্ভিদের' ধারণা করেছেন, আবার 'জন্তুজগতের জন্যেও আর একটি বীজ ধরে নিয়েছেন' এবং আরও ধরে নিয়েছেন যে, এই দুইয়ের মধ্যে 'কতকগুলি স্বাধীন আদ্য-জীবাণু (Prolista) রয়েছে, তার প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত দুটি থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে monerom (হেকেল প্রকল্পিত প্রথম জীববর্গ) ধরনের একটি বিশেষ Archegone (বংশ প্রতিষ্ঠাতা) এর বংশধররূপে বিকশিত হয়েছে " (Schopfungsgeschichte, S.397)।[৩৬] ড্যুরিং এই আদিম প্রাণীটির উদ্ভাবন করেছিলেন শুধু এই কারণেই যাতে আদিম ইহুদী আদমের সঙ্গে তার তুলনা করে তার নামটা যতদূর সম্ভব খারাপ করে দেওয়া যায় এবং এই ব্যাপারে তাঁর—অর্থাৎ হের ড্যুরিং-এর দুর্ভাগ্য হল, তিনি ধারণাও করতে পারেন নি যে, স্মিথের আসিরীয় আবিষ্কারাদি থেকে দেখা গেছে এই আদিম ইহুদী একজন আদিম সেমিটিক, আর সৃষ্টি ও জলপ্লাবন সম্পর্কিত বাইবেলের গোটা ইতিহাসটাই প্রাচীন অসভ্যদের (হীদেনদের) ধর্মীয় পুরাণ কাহিনী—যে কাহিনীর অংশীদার হল বাবিলনীয়, চালডীয় ও আসিরীয়দের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরাও।

অবতরণের সূত্রটি যেখানে ছিঁড়ে গেছে, ডারউইন সেখানে হঠাৎ থেমে গেছেন—ডারউইনের বিরুদ্ধে এ তিরস্কার নিশ্চয়ই খুবই তীব্র এবং এর বিরুদ্ধে তিনি কোন সাফাইও দিতে পারছেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি বিজ্ঞানই এই ভৎ'সনা লাভ করেছে। এর কাছে অবতরণের সূত্র যেখানে ছিঁড়ে পড়ে সেখানেই তার 'শেষ'। অন্য প্রাণী থেকে আসেনি এ রকম কোন জৈব প্রাণী উপস্থিত করতে প্রকৃতি বিজ্ঞান এখনও সফল হয় নি, বস্তুত রাসায়নিক উপাদান থেকে সরল প্রাণপংক (Protoplasm) বা অন্যান্য অ্যালবুমিন জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করতেও এখন পর্যন্ত সফল হয় নি। সুতরাং জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত নিশ্চয়তা সহকারে শুধু এইটুকুই বলতে পারে যে এর উৎপত্তি নিশ্চয়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। যাই হোক, বাস্তবতার দর্শন হয়তো এবিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারে, কারণ সে দর্শনের মধ্যে এমন কিছু কিছু প্রাকৃতিক উৎপন্নের স্বাধীন সমান্তরাল লাইন রয়েছে যা অভিন্ন অবতরণের মাধ্যমে ঘটে নি। কিভাবে এগুলি অস্তিত্ব

গেল? স্বতঃস্ফূর্ত প্রজনন দ্বারা? কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রজননের অতি দুঃসাহসী সমর্থকেরাও এখন পর্যন্ত দাবী করেন নি যে এভাবে ব্যাকটিরিয়া, ভ্রূণগত ছত্রক ও অন্যান্য আদিমতম জীবদেহ ছাড়া আর কিছু উৎপন্ন হয়েছে—না কীটপতঙ্গ, না মাছ, না পাখি, না স্তন্যপায়ী। কিন্তু প্রকৃতির এই সমাকার উৎপন্নগুলি (অবশ্যই জৈব, কারণ এখানে আমরা শুধু সেগুলির কথাই বিবেচনা করছি) যদি অবতরণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে 'যেখানেই অবতরণের সূত্রটি ছিঁড়ে গেছে' সেখানেই তারা বা তাদের প্রতিটি পূর্বগামী নিশ্চয়ই এক পৃথক সৃষ্টি-কর্ম দ্বারা পৃথিবীতে স্থাপিত হয়ে থাকবে সুতরাং আবার আমরা পৌঁছে গেলাম এক সৃষ্টিকর্তার কাছে, যাকে ঈশ্বরবাদ বলা হয়, তার কাছে।

'শুধুমাত্র গুণাগুণের যৌন রচনার কাজটিকে ঐসব গুণাগুণের উৎপত্তির মূলনীতিতে পরিণত করা' ডারউইনের পক্ষে খুবই পল্লবগ্রাহিতার বিষয়—একথাও ঘোষণা করেছেন হের ড্যুরিং। আমাদের দৃঢ়মূল দার্শনিকের পক্ষে এটি আবার আর একটি স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনা। ডারউইন পরিষ্কারভাবে বিপরীত কথাটিই বলেছেন: স্বাভাবিক নির্বাচন কথাটির মধ্য দিয়ে শুধু প্রকারণসমূহের সংরক্ষণমূলক ধারণাই আসে, সেগুলির উৎপত্তির ধারণা আসে না। (পৃ ৬৩) তবুও, ডারউইন যা কখনো বলেন নি নতুন করে তাঁর ওপর তাই চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে ড্যুরিং-এর নিম্নোক্ত মানসিকতার গভীরতা কতখানি তা বুঝতে সাহায্য হয়: 'জননের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পবাদের মধ্যে যদি স্বাধীন প্রকারণের কোন নীতি দেখতে পাওয়া যেত তাহলে এ ধারণাটি হত খুবই যুক্তিসঙ্গত; কারণ বিশ্বজনীন উৎপত্তির নীতির সঙ্গে জননের মাধ্যমে বংশবিস্তারের নীতিটিকে একই ঐক্যের মধ্যে সম্মিলিত করা একটা স্বাভাবিক ধারণা, আর তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রজননকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা। পুনরুৎপাদনের পরম প্রতিবিধানের বদলে কেবলমাত্র উৎপাদন রূপে বিবেচনা করাও একটা স্বাভাবিক ধারণা।' আর যিনি এমনধারা রাবিশ লিখতে পারেন, তিনিই আবার অম্লান বদনে হেগেলকে তাঁর অর্থহীন 'হ য ব-র-ল'-র জন্যে ভর্ৎসনা করেন!

ডারউইনীয় তত্ত্বের চালিকা শক্তির কাছ থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান যে বিরাট প্রেরণা পেয়েছে, তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে হের ড্যুরিং খিটখিটে ভাবে যে সব স্ববিরোধী নালিশ ও খুঁতখুঁতানী ঝেড়েছেন তা আর বাড়িয়ে কাজ নেই। লামার্কের মহৎ কাজকর্মকে খাটো করে দেখার কথা ডারউইন বা

তাঁর প্রকৃতি বিজ্ঞানী শিষ্যসামন্তরা কখনই ভাবেন না ; বাস্তবিক পক্ষে এরাই সর্বপ্রথম লামার্ককে তাঁর বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এ কথা, যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায় যে লামার্কের সময়ে বিজ্ঞানের কাছে সে সব তথ্য তখনো একেবারেই অজানা ছিল—যার দ্বারা বিজ্ঞান প্রজাতিসমূহের উৎপত্তির প্রশ্নের জবাব দিতে পারত—অবশ্য জবাব দিতে পারত শুধু পূর্বাভাস রূপে অর্থাৎ যেন ভবিষ্যৎবাণী রূপে। ইতিমধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার বর্ণনামূলক ও শারীর স্থানমূলক—এই দুই রকম উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য জমা হয়েছে, তা ছাড়াও লামার্কের পরবর্তী কালে দুটি সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সেগুলির গুরুত্ব চূড়ান্ত রকমের : উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবাণুর বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা (জ্রূণবিদ্যা) আর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে রক্ষিত জৈব ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে গবেষণা (প্রত্নজীববিদ্যা)। জৈব জীবাণু থেকে পরিণত জীবে ক্রমবিকাশের সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে পরম্পরানুসরণের পরম্পরা—এ দুয়ের মধ্যে বাস্তবিকই একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে, আর ঠিক এই সামঞ্জস্য থেকেই ক্রমবিকাশের তত্ত্ব তার দৃঢ়তম ভিত্তি লাভ করেছে। যাইহোক এখন পর্যন্ত ক্রমবিকাশের তত্ত্বটিও খুবই প্রাথমিক স্তরে ; সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আরও গবেষণার পর প্রজাতিসমূহের ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত হবে।

জৈব জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বাস্তবতার দর্শনের কাছ থেকে আমরা কি ধরনের সদর্থক বক্তব্য শুনতে পারি ?

'প্রজাতিসমূহের প্রকারণ একটি পূর্ব-অনুমান, এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।' কিন্তু আবার তার পাশাপাশি রয়েছে 'প্রকৃতির সমরূপ উৎপন্ন সমূহের স্বাধীন সমান্তরাল রেখা যা অভিন্ন অবতরণের মাধ্যমে আসে নি।' স্পষ্টতঃই এর থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে যে বিষম উৎপন্নগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রজাতি প্রকারণ প্রদর্শন করে সেগুলি পরস্পর থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সমরূপ উৎপন্নের বেলায় তা নয়। তবে এ কথাটাও সম্পূর্ণ সঠিক নয় ; কারণ যেসব প্রজাতি প্রকারণ প্রদর্শন করে, এমন কি তাদের পক্ষে 'অভিন্ন অবতরণের মধ্যস্থতা বরং একটা গৌণ প্রাকৃতিক ক্রিয়া।' সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহলে আমরা অভিন্ন অবতরণ পাচ্ছি, তবে শুধু 'গৌণ

শ্রেণীর'। হের ড্যুরিং এর ওপর এত সব অমঙ্গল ও অস্পষ্টতা আরোপ করার পরও আবার তাকে শেষ পর্যন্ত খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছেন দেখে আমাদের নিশ্চয় আনন্দ করতে হবে। স্বাভাবিক নির্বাচনের বেলায়ও তাই; যে অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক নির্বাচন ক্রিয়া করে, তার বিরুদ্ধে এতসব নৈতিক বিক্ষোভ সত্ত্বেও হঠাৎ দেখছি: 'সুতরাং জীবসমূহের গঠনবিন্যাসের গভীরতর ভিত্তি খুঁজতে হবে জীবনের অবস্থা এবং মহাজাগতিক সম্বন্ধাবলীর মধ্যে, আর ডারউইন যে স্বাভাবিক নির্বাচনের ওপর জোর দিয়েছেন তা শুধু গৌণ উপাদান রূপেই আসতে পারে।' সুতরাং শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক নির্বাচনের সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রাম আর তার সঙ্গে ম্যালথাসের পাদরিসুলভ অতিজনসংখ্যা তত্ত্ব! বাস—বাকীটার জন্যে হের ড্যুরিং আমাদের লামার্ক ধরিয়ে দিয়েছেন।

উপসংহারে তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, আমূল রূপান্তর ও বিকাশ এ দুটি শব্দের যেন অপব্যবহার না হয়। তাঁর মতে আমূল রূপান্তর একটি অস্বচ্ছ ধারণা আর বিকাশের ধারণাটিকে শুধু ততদূর পর্যন্ত মঞ্জুর করা যায় যতদূর পর্যন্ত বিকাশের নিয়মগুলিকে সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই দুটি শব্দের বদলেই আমাদের 'বিরচন' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার, আবার সেই একই কাহিনী: জিনিস যা ছিল তাই থাকে, শুধু নামটুকু বদলে দিলেই হের ড্যুরিং সন্তুষ্ট। আমরা যখন ডিমের মধ্যে বাচ্চা মুরগীর বিকাশের কথা বলি তখন আমরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি, কারণ বিকাশের নিয়মগুলিকে আমরা কেবল অসম্পূর্ণভাবেই প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা তা বিরচনের কথা বলি তা হলেই সব পরিষ্কার। সুতরাং এর পরে আমরা আর বলব না: শিশুটি সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে, বলব: সেটি দুর্দান্তভাবে বিরচিত হচ্ছে। হের ড্যুরিংকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বলতে পারি যে তিনি Nibelungenring গ্রন্থকারের যোগ্য দোসর—শুধু তাঁর মহান আত্মাদরেই নয়, তার ভবিষ্যৎ রচয়িতার ভূমিকাতেও বটে।[৪৭]

আট

প্রাকৃতিক দর্শন। জৈব পৃথিবী

(উপসংহার)

'ভেবে দেখুন…প্রাকৃতিক দর্শনের মধ্যে আমাদের অংশটিকে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রারম্ভসূত্র দ্বারা সুসজ্জিত করতে হলে কী প্রকার সমর্থক জ্ঞান প্রয়োজন হয়। প্রথমে অংকশাস্ত্রের সকল মূল কৃতিত্বগুলি, তারপর বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে সঠিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞাগুলি আর তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও জ্ঞানান্বেষণের অনুরূপ শাখায় প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি—এরই ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।'

এই রকম বিশ্বাস ও ভরসার সঙ্গে হের ড্যুরিং এর গাণিতিক ও স্বভাববাদী পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিবরণ দিচ্ছেন—হের ড্যুরিং।' আলোচ্য অংশের ক্ষুদ্রতা থেকে এবং তার ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তসমূহ থেকে লক্ষ্য করা অসম্ভব যে সেগুলির পেছনে কী দৃঢ়-মূল সমর্থক জ্ঞান লুকিয়ে আছে। যাই হোক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ওপর ড্যুরিং-এর আপ্তবাণী সৃষ্টি করতে হলে তাপের বলবিদ্যাগত তুল্যাংক সংক্রান্ত সমীকরণটির চাইতে বেশি কিছু পদার্থবিদ্যা জানার দরকার হয় না, সকল পদার্থকেই যে মৌল অথবা মৌলসমূহের সম্মিলনে বিভক্ত করা যায় এর চেয়ে বেশি রসায়ন জানারও দরকার হয় না। তাছাড়া হের ড্যুরিং-এর মতো যিনি 'মহাকর্ষপরায়ণ পরমাণুর' কথা বলতে পারেন (পৃ ১৩১), তিনি শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যান যে তিনি অণু ও পরমাণুর ভেতরকার পার্থক্য সম্বন্ধে একেবারে 'অন্ধকারে'। মহাকর্ষ নয়, কিংবা বলবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যাগত অন্য কোন ধরনের গতি নয়, কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়াই অণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়—একথা সুবিদিত। আর যদি কেউ জৈব প্রকৃতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এগুতে পারেন—যা শূন্যগর্ভ, স্ববিরোধী

এবং চূড়ান্ত বিন্দুতে কুটিল, অর্থহীন, আপ্ত-বাক্যবাহুল্যে পরিপূর্ণ, যার চরম সিদ্ধান্ত একেবারেই বৃথা, তাহলে তিনি গোড়া থেকেই এই মত গঠন না করে পারবেন না যে এখানে হের ড্যুরিং যে সব জিনিসের কথা বলছেন সে সম্বন্ধে তিনি সামান্যই জানেন। পাঠকের এই মত একেবারে সুদৃঢ় হয়ে পড়ে যখন তিনি ড্যুরিং-এর সেই ইঙ্গিতে পৌঁছান যেখানে বলা হয়েছে যে জৈবজীবন সংক্রান্ত বিজ্ঞানে (জীববিদ্যায়) বিকাশ শব্দের পরিবর্তে বিরচন শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। যিনি এরকম ইঙ্গিত দিতে পারেন, তিনি প্রমাণ দেন যে জৈব জীবনের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে তার এতটুকুও ধারণা নেই।

নিম্নতম ব্যতীত অন্য সমস্ত জৈব পদার্থ কোষসমূহ দ্বারা গঠিত—এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যালবুমেন কণা, খুব বড় করে না দেখালে দেখা যায় না। এর ভিতরে একটি নিউক্লিয়স থাকে। কোষগুলির বাইরের দিকে সব সময়ই একটি ঝিল্লী (membrane) গড়ে ওঠে, তখন অন্তর্বস্তুগুলি অল্পবিস্তর তরল বা বায়বীয়। নিম্নতম কোষিক পদার্থ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত; জৈব জীবনের বিরাটতম অংশই বহুকোষবিশিষ্ট, অনেকগুলি কোষের জটিলতা—নিম্নতর জীবের মধ্যে এগুলি থাকে সমভাবাপন্ন, কিন্তু উচ্চতর জীবের মধ্যে এগুলি ক্রমেই আরও বিচিত্র বহিরঙ্গ যূথ ও ক্রিয়াকর্ম বিকশিত করে তোলে। যেমন মানুষের শরীরে অস্থি, মাংসপেশী, স্নায়ু, কণ্ডরা (tendon), বন্ধনী (ligament), তরুণাস্থি (cartilage), ত্বক—মোট কথা সকল কলাই (tissue) হয় কোষ দ্বারা গঠিত না হয় কোষ থেকেই সেগুলির প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু জীবনের সকল কোষিক সংগঠনগুলি—একদিকে অ্যামিবা যা খুবই সরল এবং বেশির ভাগ সময়ই অভ্যন্তরে নিউক্লিয়স সহ একটি ত্বকহীন অ্যালবুমিন কণা, অন্যদিকে মানুষ পর্যন্ত, আবার ক্ষুদ্রতম এককোষী ডেসমিড থেকে অত্যন্ত সুবিকশিত উদ্ভিদ পর্যন্ত—সর্বত্রই কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি একই, যথা: বিভাজন। কোষের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মাঝখানে সংকুচিত হয়, নিউক্লিয়সের দুই অংশের মধ্যে সংকোচন ক্রমেই অধিকতর পরিস্ফুট হতে থাকে, অবশেষে দুই অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি কোষ নিউক্লিয়স গঠন করে। কোষের নিজের মধ্যেও চলে একই প্রক্রিয়া; দুটি নিউক্লিয়সের প্রত্যেকটিই কোষিক পদার্থ সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের প্রণালীটি সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে হতে অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং স্বতন্ত্র কোষরূপে অস্তিত্ব

বজায় রাখে। এইভাবে বারবার কোষ বিভক্ত হতে হতে প্রাণীর অণ্ডটির গর্ভাধান হওয়ার পর তার ভ্রূণগত ফোস্‌কার ভেতর থেকে গোটা প্রাণীটি ক্রমে ক্রমে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে, এবং নিঃশোষিত কলাগুলির অভাব পূরণ হয় প্রাণীর মত একই পদ্ধতিতে। এরকম প্রক্রিয়াকে বিরচন নামে অভিহিত করা এবং বিকাশ নাম দিলে তাকে 'বিশুদ্ধ কল্পনা' বলে অখ্যাত করা —এরা দ্বারা এমন এক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যিনি এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—যদিও এখনকার দিনে সে কথা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত; এখানে যা চলেছে তা সঠিকভাবে এবং একান্তভাবে বিকাশই বটে, বাস্তবিকই একেবারে আক্ষরিক অর্থে বিকাশ—বিরচনের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই!

জীবন বলতে হের ড্যুরিং সাধারণভাবে কি বোঝেন সে বিষয়ে আমরা পরে আরো কিছু বলব। বিশেষভাবে তাঁর জীবনের ধারণা নিম্নরূপ:

'অজৈব পৃথিবীও কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় অভিঘাতের প্রণালী (system); কিন্তু যে বিন্দুতে বাস্তব পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়, ক্ষুদ্রতর অবয়বে সঞ্চালনযোগ্য একটি জীবাণু পরিকল্পনা অনুসারে এক অভ্যন্তরীণ বিন্দু থেকে বিশেষ খাত ধরে পদার্থসমূহের সঞ্চারণ শুরু হয়, শুধু সেই বিন্দুতেই আমরা সংকীর্ণতর ও বিশুদ্ধতর অর্থে বাস্তব জীবনের কথা বলার সাহস করতে পারি।'

এই বাক্যটির ব্যাকরণগত বিভ্রান্তি বাদ দিলেও তার সংকীর্ণতর ও বিশুদ্ধতর অর্থে এটি কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপের স্বয়ংক্রিয় প্রণালী (সে বস্তু যাই হোক), যেখানে বাস্তব পৃথকীকরণের শুরু জীবন যদি প্রথম সেখানেই আরম্ভ হয় তাহলে বলতে হবে যে হেকেলের আদ্য জীবাণুর রাজত্ব এবং সম্ভবত আরও অনেক কিছু মরে গেছে—অবশ্য পৃথকীকরণের ধারণায় কী অর্থ আরোপ করা হবে তার ওপরে এটা নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রতর জীবাণু-পরিকল্পনা মারফৎ এই পৃথকীকরণ যখন সঞ্চালিত হতে পারে তখনই যদি জীবনের শুরু হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে এককোষী জীব পর্যন্ত কোন কিছুকেই জীবন্ত বলে গণ্য করা যায় না। বিশেষ খাতে বস্তুসমূহের সঞ্চারণই যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন হয়, তাহলে জীবিতের মধ্য থেকে উপরোক্ত জীবগুলি ছাড়া আরও বাদ দিতে হবে Coelenterata-র সমগ্র উচ্চতর শ্রেণী (তবে medusae বাদ দিয়ে) অর্থাৎ সমস্ত polyp (শ্লিষ্ট জীবপুঞ্জের অন্তর্গত জীব) ও অন্যান্য উদ্ভিদপ্রাণী।[৪৮] একটি অভ্যন্তরীণ বিন্দু থেকে বিশেষ খাত বেয়ে বস্তুসমূহের সঞ্চরণই যদি জীবনের আবশ্যিক চিহ্ন হয় তাহলে বলতে হবে যে যেসব প্রাণীর হৃদপিণ্ড নেই

কিম্বা একাধিক হৃদপিণ্ড আছে সেসব প্রাণী মৃত। এই শিরোনামায় যেগুলির নাম আগে করা হয়েছে সেইগুলি ছাড়া আরও আসবে—সকল কীটপতঙ্গ, তারামাছ ও চক্রবৎ কীটাণু (হাক্সলের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে Annuloida ও Annulosa.[৪৯] খোলকবিশিষ্টদের (গলদা চিংড়ি) এক অংশ আর শেষ পর্যন্ত একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীও, যথা Amphioxus। তার ওপর আবার সমস্ত উদ্ভিদ।

সূতরাং সংকীর্ণতর ও বিশুদ্ধতর অর্থে বাস্তব জীবনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হের ড্যুরিং জীবনের এমন চারটি লক্ষণ জানিয়েছেন যেগুলি সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিরোধী এবং তার মধ্যে একটি লক্ষণ তো শুধু সমগ্র উদ্ভিদ জগৎই নয়, প্রাণী জগতেরও প্রায় অর্ধেককে চিরস্থায়ী মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 'একেবারে মূল থেকে টেনে এনে মৌলিক সিদ্ধান্ত ও মতামত উপহার দেবেন'—সে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা একথা বাস্তবিকই কেউ বলতে পারবে না।

আর একটি অনুচ্ছেদ এইরকম :

> 'প্রকৃতির মধ্যেও নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত সকল ধরনের দেহীরই ভিত্তি হল একটি সরল জাতিরূপ (type)' এবং 'অতি উচ্চ বিকশিত উদ্ভিদের গৌণতম অভিঘাতের মধ্যেও' এই জাতি রূপটির 'সাধারণ সারাংশ পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত থাকে।'

এই বক্তব্যটিও আবার পরিপূর্ণরূপে ও সম্পূর্ণরূপে বাজে কথা। সমগ্র জৈব প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে সরল জাতিরূপ হচ্ছে কোষ; এবং এটি নিশ্চয়ই উচ্চতর প্রাণী সমূহের ভিত্তি, পক্ষান্তরে নিম্নতম দেহীদের মধ্যে এমন অনেক আছে যেগুলি কোষের থেকে খুবই নীচে, যেমন আদ্য-অ্যামিবা (protamoeba), সম্পূর্ণরূপে অখণ্ড একটি সরল অ্যালবুমেনীয় কণা—এবং অন্যান্য Monera-র একটা গোটা পরম্পরা, আর তা ছাড়া থলিযুক্ত সমস্ত সামুদ্রিক আগাছা (siphoneae)। উচ্চতর দেহীগুলির সঙ্গে এইসব জিনিসের সম্পর্ক শুধু এই যে এদের সার উপাদান হল অ্যালবুমেন এবং সেই কারণে এরা অ্যালবুমেনের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে, অর্থাৎ বাঁচে ও মরে।

হের ড্যুরিং আরও বলেছেন :

> 'শারীরবৃত্তের দিক থেকে, সংবেদনের বন্ধন হল কোন না কোন রকম স্নায়ুযন্ত্রের সঙ্গে, তা সে যত সরলই হোক না কেন। সুতরাং সকল

জান্তব সৌষ্ঠবের বিশেষ লক্ষণ হল যে, তাদের সংবেদনের সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ নিজেদের অবস্থাসম্বন্ধে বিষয়ীগতভাবে সচেতন জ্ঞান আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে তীক্ষ্ণ সীমারেখা রয়েছে সেই বিন্দুতে যেখানে সংবেদনের দিকে উল্লম্ফন ঘটেছে। সুপরিজ্ঞাত উত্তরণশীল সৌষ্ঠবগুলির দ্বারা নিশ্চিহ্ন হওয়া দূরে থাক, বাইরের দিক থেকে ঠিক এইসব অমীমাংসিত বা মীমাংসার অযোগ্য বহিরঙ্গদের ভিতর দিয়েই এই সীমারেখাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।'

আবার :

'পক্ষান্তরে উদ্ভিদগুলি সম্পূর্ণরূপে এবং সবসময়ের জন্যে সংবেদনহীন, তাদের মধ্যে সংবেদনের চিহ্নমাত্র নেই, এমনকি তার সামর্থ্যও নেই।'

প্রথমত, হেগেল বলেছেন (Naturphilosophie, 351, Zusatz*) যে, 'বেদন হচ্ছে প্রাণীর differentia specifica, অর্থাৎ পরম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আবার আমরা হেগেলের মধ্যে 'স্থূলতার' নমুনা পেলাম ; আত্মসাৎ করার সরল প্রক্রিয়ার দ্বারা হের ড্যুরিং সেটিকে শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের মত মর্যাদার আসনে তুলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে উত্তরণশীল সৌষ্ঠব, বাইরে থেকে অমীমাংসিত বা মীমাংসার অযোগ্য বহিরঙ্গ (চমৎকার আবোলতাবোল) ইত্যাদি কথা এই আমরা প্রথম শুনছি। এইসব মধ্যবর্তী রূপ যে আছে, এমনসব দেহীও যে আছে যেগুলি উদ্ভিদ না প্রাণী সোজাসুজি বলা যায় না, এবং সেই জন্যে উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে আমরা যে কিছুতেই সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারি না—ঠিক এই তত্ত্ব থেকেই হের ড্যুরিং-এ প্রয়োজন হল যে, পৃথকীকরণের একটা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে—আবার তখনই এক নিশ্বাসে তিনি মেনে নিলেন যে তা কিন্তু দাঁড়াবে না। কিন্তু উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যবর্তী অনিশ্চিত রাজ্যে ফিরে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই ; যেসব সংবেদনশীল উদ্ভিদ এতটুকু ছোঁয়া লাগা মাত্র নিজেদের পাতা বা ফুল গুটিয়ে ফেলে, যেসব উদ্ভিদ পোকামাকড় খায়, সেগুলির "মধ্যে কি সংবেদনের চিহ্নমাত্র নেই, এমনকি সংবেদনের সামর্থ্যও নেই ? 'অবৈজ্ঞানিক অর্ধ-কবিতার' আশ্রয় না নিলে হের ড্যুরিং পর্যন্ত একথা বলতে পারবেন না।

---

* Philosophy of Nature, 351, Addendum.—Ed.

তৃতীয়ত, হের ড্যুরিং যখন জোর দিয়ে বলেন যে শারীরবৃত্তের দিক থেকে সংবেদনের বন্ধন হল কোন না কোন রকম স্নায়ু-যন্ত্রের সঙ্গে (তা যতই সরল হোক), তখন সেটাও আবার তাঁর স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পনা মাত্র। সমস্ত আদিম জন্তুই শুধু নয়, উদ্ভিদধর্মী প্রাণীরাও (Zoophytes), অন্ততপক্ষে তাদের বেশীর ভাগই সম্পূর্ণরূপে স্নায়ুযন্ত্রের চিহ্নহীন। কেবলমাত্র কীট থেকে আরম্ভ করেই এই যন্ত্র নিয়মিতভাবে দেখা যায়। হের ড্যুরিং-ই সর্বপ্রথম দৃঢ়োক্তি করেছেন যে, যেসব জন্তুর স্নায়ু নেই তাদের সংবেদন নেই। সংবেদন স্নায়ুর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত নয়, সংবেদন জড়িত রয়েছে কতকগুলি অ্যালবুমেন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে—এখনও পর্যন্ত সেগুলির আরও সঠিক পরিচয় নির্ধারিত হয় নি।

কিন্তু, হের ড্যুরিং দ্বিধাহীনভাবে ডারউইনের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছেন, তার থেকেই জীববিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের দৌড় বেশ বোঝা যায়:

'একথা কি ধরে নিতে হবে যে উদ্ভিদ থেকেই প্রাণীর বিকাশ হয়েছে'?

প্রাণী বা উদ্ভিদ কোনটি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই শুধু সেই এরকম প্রশ্ন করতে পারে।

সাধারণভাবে জীবন সম্বন্ধে হের ড্যুরিং আমাদের কেবল এইটুকুই বলতে পেরেছেন:

'যে বিপাক নমনীয়ভাবে সৃষ্টিশীল প্রকল্পবাদের (এটি কী বস্তু কে জানে?) মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় তা সব সময়ই প্রকৃত জীবন-ধারার বিশেষ লক্ষণ।'

জীবন সম্বন্ধে এই শিক্ষাই সব। আর ওদিকে 'নমনীয়ভাবে সৃষ্টিশীল প্রকল্পবাদের' অর্থহীন হ-য-ব-র-ল সুলভ বিশুদ্ধতম ড্যুরিঙ্গীয় প্রলাপের কাদায় আমাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সুতরাং জীবন কি তা জানতে হলে, আমাদের নিজেদেরই জিনিসটিকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে তা বোঝাই যাচ্ছে।

শারীরবৃত্তের রসায়নবিদগণ এবং রসায়নের শারীরবৃত্তিকগণ গত তিরিশ বৎসর ধরে অসংখ্য বার বলে এসেছেন যে, জীবনের সবচেয়ে সাধারণ আর সবচেয়ে লক্ষণাক্রান্ত ঘটনা হল জড়পদার্থের জৈব বিপাক; এখানে শুধু সেই কথাটাকেই হের ড্যুরিং তাঁর মধুর ও স্বচ্ছ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু জীবনকে জৈব বিপাকরূপে সংজ্ঞায়িত করার অর্থ জীবনকে জীবনরূপেই

সংস্থাপিত করা ; কারণ জড় পদার্থের জৈব আদানপ্রদান অথবা নমনীয়ভাবে সৃষ্টিশীল প্রকল্পবাদ দ্বারা বিপাককরণ—এটি এমন এক বাক্য যার নিজেরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন—জীবনের ভেতর দিয়ে, জৈব ও অজৈবের পার্থক্যের ভেতর দিয়ে, অর্থাৎ যা জীবিত এবং যা জীবিত নয় তার পার্থক্যের ভেতর দিয়ে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন ; সুতরাং এই ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা আর এগুতে পারি না।

জড় পদার্থের আদানপ্রদান জীবন ছাড়াও অন্যত্র ঘটে থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের এমন সমস্ত পরম্পরা আছে যেখানে উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচামালের সরবরাহ থাকলে প্রক্রিয়াগুলি অনবরত আপন অবস্থা সমূহেরই পুনরুৎপাদন করে, এবং তা এমনভাবে করে যাতে কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু সেই প্রক্রিয়ার বাহন হয়। গন্ধক জ্বালিয়ে সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড তৈরী করার সময় এইরকম ঘটে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সাল্‌ফার-ডাই-অক্সাইড SO_2 উৎপন্ন হয় আর তার সঙ্গে বাষ্প ও নাইট্রিক অ্যাসিড যুক্ত হলে সাল্‌ফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন শোষণ করে এবং সাল্‌ফিউ-রিক-অ্যাসিডে ($S_2 HO_4$) পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে নাইট্রিক-অক্সাইডে পর্যবসিত হয় ; এই নাইট্রিক অক্সাইড তৎক্ষণাৎ বাতাস থেকে নতুন অক্সিজেন শোষণ করে নাইট্রোজেনের উচ্চতর অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তখনই আবার এই অক্সিজেনকে সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইডের কাছে হস্তান্তর করে পুনরায় ঐ একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে ; সুতরাং তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে যৎসামান্য পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেই অফুরন্ত পরিমাণ সাল্‌ফার-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও জল সাল্‌ফিউ-রিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হতে পারে।

মৃত জৈব, এমনকি অজৈব ঝিল্লীর ভেতর দিয়ে তরল বা বায়বীয় পদার্থ চলাচলের মধ্যেও জড়বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে থাকে—উদাহরণ, ট্রবের কৃত্রিম কোষ [৫০] এখানেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জড়ের আদানপ্রদানের সাহায্যে আমরা আর অগ্রসর হতে পারি না, কারণ জড়বস্তুর যে বিশেষ ধরনের আদান-প্রদান থেকে জীবনের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, জীবনের মধ্যে দিয়ে তারই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের অন্য কোন পদ্ধতি ধরতে হবে।

অ্যালবুমিনীয় বস্তুসমুহের অস্তিত্বের পদ্ধতি হল জীবন। আর এই অস্তিত্বের পদ্ধতির সারকথা হল এই সব পদার্থের রাসায়নিক উপাদানগুলি অনবরত নিজেদেরই পুনরুৎপাদন করে চলেছে।

আধুনিক রসায়নে অ্যালবুমিনীয় পদার্থ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—ডিমের সাধারণ সাদা অংশের অনুরূপ সকল পদার্থই এই নামের অন্তর্গত; এগুলি প্রোটিন পদার্থ নামেও পরিচিত। নামটা খুব যুৎসই নয়, কারণ ডিমের সাধারণ সাদা অংশটি তার সঙ্গে সম্বন্ধিত অন্য সব পদার্থের তুলনায় একেবারে প্রাণহীন ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে—হলদে অংশের সঙ্গে মিলে এটি শুধু বিকাশমান ভ্রূণের আহার্য মাত্র। তবে অ্যাল-বুমিনীয় পদার্থসমূহের রাসায়নিক সংঘটন সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত জ্ঞানের পরিধি খুব সামান্য হলেও অন্য নামের তুলনায় এ নামটিই ভাল, কারণ এটি বেশী সর্বজনীয়।

যেখানে আমরা জীবন দেখতে পাই, সেখানেই দেখি তা কোন অ্যালবুমিনীয় পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত আর যেখানেই আমরা এমন কোন অ্যালবুমিনীয় পদার্থ দেখতে পাই যা বিলয়ের পথের পথিক নয়, সেখানেও আমরা ব্যতিক্রমহীন-ভাবে দেখতে পাই জীবনের দৃশ্য। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে কোন জীবিত বস্তুর মধ্যে জীবনের এইসব দৃশ্যের বিশেষ বিশেষ পৃথকীকরণ আনয়নের জন্যে অন্যান্য রাসায়নিক সংযোগেরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু নিরাবরণ জীবনের জন্যে সেগুলির প্রয়োজন নেই—ব্যতিক্রম শুধু ততদূর পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত সেগুলি খাদ্য হিসাবে পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অ্যালবুমেনে রূপান্তরিত হয়। যেসব নিম্নতম জীবন্ত সত্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে সরল অ্যালবুমেন কণা ছাড়া আর কিছু নয়; এই কণাগুলি আগে থেকেই জীবনের সকল ঘটনার সারাংশ প্রদর্শন করছে।

কিন্তু জীবনের এইসব বিশ্বজনীন রূপ যা সকল জীবন্ত দেহীর মধ্যে সমান-ভাবে উপস্থিত সেগুলি কি? সেগুলির মধ্যে সর্বোপরি রয়েছে একটি অ্যাল-বুমিনীয় পদার্থ যা তার পরিপার্শ্ব থেকে অন্যান্য উপযুক্ত বস্তু শোষণ করে হজম করে, আর অপরদিকে পদার্থটির অন্যান্য প্রাচীনতর অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পরি-ত্যক্ত হয়। অন্যান্য জীবনহীন পদার্থ ঘটনার স্বাভাবিক স্রোতে পরিবর্তিত হয়, ক্ষয় পেয়ে কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেগুলি যা ছিল তা আর থাকে না, আবহাওয়া দীর্ণ পাথর আর পাথর নয়; যে ধাতু অক্সিজেন গ্রহণ করে সে ধাতু মরিচায় পরিণত হয়। কিন্তু জীবনহীন পদার্থের কাছে যা ধ্বংসের কারণ অ্যালবুমেনের কাছে তাই আবার অস্তিত্বের মূল বনিয়াদ। নিজ উপাদানসমূহের মধ্যে এই অবিরাম রূপান্তর, খাদ্যগ্রহণ ও

মলমূত্র ত্যাগের এই অবিরাম পর্যায়ক্রম যে মুহূর্ত থেকে কোন্ অ্যালবুমিনীয় পদার্থের মধ্যে শুরু হয়ে যায়, তখনই অ্যালবুমিনীয় পদার্থটিও শেষ হয়ে যায়, তার অবক্ষয় ঘটে অর্থাৎ মৃত্যু হয়। সুতরাং অ্যালবুমিনীয় পদার্থের অস্তিত্বের পদ্ধতি অর্থাৎ জীবন প্রথমত এই সত্য দ্বারা গঠিত যে প্রতি মুহূর্তে তা স্বয়ং আবার তা সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু; বাইরে থেকে পরিচালিত কোন প্রক্রিয়ার ফলে এরকম ঘটে না, যদিও জীবনহীন পদার্থের বেলায় এভাবেও ঘটতে পারে। বিপরীতভাবে, জীবন অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণ ও মলমূত্র ত্যাগ মারফৎ সংঘটিত বিপাক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া যা তার বাহক অ্যালবুমেনের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও সহজাত—জীবন ছাড়া অ্যালবুমিন থাকতে পারে না। সুতরাং, সেই অনুসারে, রসায়ন যদি কখনও কৃত্রিমভাবে অ্যালবুমিন তৈরী করতে পারে তা হলে সেই অ্যালবুমিনকে জীবনের দৃশ্যাবলী দেখাতেই হবে তা সে জীবন যত দুর্বলই হোক। রসায়ন ঐ একই সময়ে এই অ্যালবুমিনের উপযোগী সঠিক খাদ্যও আবিষ্কার করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকতে পারে।

অ্যালবুমিনের আবশ্যিক কর্মরূপে খাদ্যগ্রহণ ও মলমূত্র ত্যাগ মারফৎ সংঘটিত বিপাক থেকে এবং তার বিশেষ ধরনের নমনীয়তার থেকেই জীবনে প্রায় অন্য সমস্ত সরল উপাদানগুলির যাত্রা আরম্ভ: উত্তেজিতা যা আগে থেকেই অ্যালবুমিন ও তার খাদ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার অন্তর্গত; সংকোচনশীলতা যা খুব নিম্নস্তরেও খাদ্যগ্রহণ দ্বারা পরিদৃশ্যমান; বৃদ্ধির সম্ভাবনা—যার মধ্যে নিম্নতম রূপগুলিতে বিভাজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত; অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন যা না থাকলে খাদ্যগ্রহণ বা খাদ্য পরিপাক সম্ভব নয়।

জীবন সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞাটি স্বভাবতই অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, কারণ জীবনের সকল ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করার বদলে যেগুলি সবচেয়ে অভিন্ন ও সরল সেগুলির মধ্যেই সংজ্ঞাটিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে সকল সংজ্ঞারই মূল্য যৎসামান্য। জীবন কি সে সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে হলে জীবনের সর্বনিম্ন ধরন থেকে সর্বোচ্চ ধরন পর্যন্ত সকল ধরনের মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে এরকম সংজ্ঞা খুবই সুবিধাজনক, অনেক স্থানেই এগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না; তাছাড়া এগুলির অবশ্যম্ভাবী ত্রুটির কথা মনে রাখলে এগুলি কোন ক্ষতিও করতে পারে না।

কিন্তু হের ড্যুরিং-এর দিকে ফেরা যাক। পার্থিব জীববিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি

যখন বেকায়দায় পড়েন তখন কোথায় সান্ত্বনা পাবেন তা তিনি জানেন, নক্ষত্র-খচিত আকাশে তিনি আশ্রয় নেন।

> 'সংবেদনের অঙ্গ সংক্রান্ত একটি বিশেষ যন্ত্রই শুধু নয়, গোটা বিষয়গত পৃথিবী আরাম ও যন্ত্রণা উৎপাদনের উপযোগী। সেই কারণে আমরা ধরে নি যে, আরাম ও যন্ত্রণার মধ্যবর্তী প্রতিবিধানটি, অধিকন্তু তার যে ধরনের সঙ্গে আমরা পরিচিত ঠিক সেই ধরনটি একটি বিশ্বজনীন প্রতিবিধান—বিশ্বের বিভিন্ন পৃথিবীতে মোটের ওপর সম-ভাবাপন্ন আবেগ দ্বারাই তা রূপায়িত হবে।...এই সঙ্গতির তাৎপর্য কিন্তু সামান্য নয়, কারণ সংবেদনের বিশ্বের কাছে এটি হল চাবিকাঠি।...সুতরাং বিষয়গত পৃথিবীর তুলনায় বিষয়গত মহা-জাগতিক পৃথিবী আমাদের কাছে খুব বেশি অপরিচিত নয়। উভয় মণ্ডলের সংস্থানটিকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতিরূপ অনুসারে ধারণা করতে হবে এবং এর ভেতর দিয়ে চৈতন্যসংক্রান্ত এমন এক বিজ্ঞান শুরু হচ্ছে পৃথিবীর বাইরেও যার পরিধি বিস্তীর্ণ।'

যে মানুষের পকেটে সংবেদনের বিশ্বেরই চাবি রয়েছে, পার্থিব প্রকৃতি-বিজ্ঞানে কয়েকটি গুরুতর ভুল হলেই বা তার কী আসে যায়?

নয়

নৈতিকতা ও বিধি
শাশ্বত সত্য

যেসব নূতনত্বহীন আপ্তবচন, এক কথায় স্রেফ অর্থশূন্য বাজে কথার খিচুড়িকে চৈতন্যের উপাদান সংক্রান্ত দৃঢ়মূল বিজ্ঞানবলে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ধরে হের ড্যুরিং তাঁর পাঠকদের চিত্ত বিনোদন করেছেন, তার নমুনা দেব না। শুধু এই উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি:

'যিনি শুধু ভাষার সাহায্যে চিন্তা করতে পারেন, তিনি এখনও জানতে পারেন নি যে বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ চিন্তার অর্থ কি।'

এই ভিত্তি ধরলে, সবচেয়ে বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ চিন্তাকারী হল পশুরা, কারণ ভাষার অনধিকার প্রবেশ দ্বারা তাদের চিন্তা কখনও আচ্ছন্ন হয় না। যাই হোক, ড্যুরিঙ্গীয় চিন্তাসমূহ এবং যে ভাষায় সে-সব চিন্তা প্রকাশিত তার থেকে দেখা যায় যে এইসব চিন্তা কোন ভাষারই উপযোগী নয় এবং জার্মান ভাষাও এইসব চিন্তার উপযোগী নয়।

শেষকালে চতুর্থ অংশে এসে আমরা মুক্তি পেলাম; বাগাড়ম্বর বাদ দিলে এতে অন্তত নৈতিকতা ও বিধি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এমন কিছু পাওয়া যায় যা ধরাছোঁয়ার যোগ্য। এই উপলক্ষে একেবারে গোড়াতেই আমাদের অন্যান্য গ্রহ-তারায় পাড়ি দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে:

> 'যেসব মানবেতর প্রাণীর সক্রিয় বোধশক্তিকে সহজাত প্রবৃত্তি রূপে জীবনের অভিঘাতসমূহে সচেতন শৃঙ্খলা আনতে হয়, তাদের মধ্যে নৈতিকতার উপাদানগুলি "সুসঙ্গতরূপে" উপস্থিত থাকবেই।
> ...তাহলেও এইসব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহ সামান্য।...
> তা সত্ত্বেও এই ধারণাটি আমাদের দৃষ্টির পরিধিকে মঙ্গলজনকভাবে বিস্তারিত করে—যখন আমরা ভাবি যে আকাশের অন্যান্য গ্রহ-

তাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন নিশ্চয়ই এমন একটি ছকের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা……ব্যুৎপত্তিগতভাবে ক্রিয়াশীল প্রাণীর সাধারণ মৌলিক গঠনপদ্ধতিকে এড়াতে বা বাতিল করতে পারে না।'

যেসব ড্যারিঙ্গীয় সত্য সম্ভাব্য অন্য সমস্ত পৃথিবীতেও বলবৎ তা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রূপেই অধ্যায়ের গোড়ায় দেওয়া হয়েছে, শেষে দেওয়া হয় নি ; এবং তার যথেষ্ট কারণ আছে। নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে ড্যারিঙ্গীয় ধারণার বলবত্তা যদি প্রথমে সকল পৃথিবী সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আরও সহজে তাকে সকল কালের জন্য মঙ্গলজনকভাবে বিস্তারিত করা যায়। কিন্তু এখানেও আবার আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে শেষ ও চূড়ান্ত সত্য, তার কম কিছু নয়।

'ঠিক সাধারণ জ্ঞানের পৃথিবীর মতই' নৈতিকতার পৃথিবীতেও…… 'তার স্থায়ী নীতি ও সরল উপাদান আছে'। নৈতিক নীতিগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে 'ইতিহাসের ঊর্ধ্বে' এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আধুনিক বিভিন্নতাগুলিরও ঊর্ধ্বে'………। ক্রমবিকাশের পথে যেসব সত্যের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতর নৈতিক চৈতন্য, এবং বলতে গেলে, বিবেকও গড়ে ওঠে, সেগুলি—যতদূর পর্যন্ত সেগুলির চূড়ান্ত ভিত্তি বোঝা যায় ততদূর পর্যন্ত—এমন প্রামাণ্যতা ও বিস্তার দাবি করতে পারে যা অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন উপপাদ্য ও প্রয়োগের অনুরূপ। প্রকৃত সত্যগুলি অনপেক্ষরূপে অপরিবর্তনীয়……। সুতরাং জ্ঞানের সঠিকতা যে সময় দ্বারা ও বাস্তবতার পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এরূপ চিন্তা করা একেবারেই নির্বোধোচিত।' সুতরাং যখন আমাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং সাধারণ প্রজ্ঞানের যথোপযুক্ততা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশই রাখে না যে জ্ঞানের নীতিগুলি অনপেক্ষরূপে প্রামাণ্য। 'এমনকি অবিচল সন্দেহও দুর্বলতার এক অসুস্থ অবস্থা এবং আশাহীন বিভ্রান্তির অভিব্যক্তি মাত্র—যা তার শূন্যতার শৃঙ্খলাবদ্ধ চৈতন্যের ভেতর দিয়ে কোন একটা সুস্থির বস্তুর আকৃতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, আচার-আচরণ ও নীতিসমূহের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতা অবলম্বন করে দাঁড়ায় সাধারণ নীতির অস্বীকৃতিতে ; নৈতিক অনাচার ও অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন একবার মেনে নেওয়া হলে অস্বীকৃতি মনে করে যে তা সুসঙ্গত অভিঘাতের গুরুত্ব ও

কার্যকারিতা থেকে অনেক উর্ধ্বে'। এই কট্‌ সন্দেহবাদ যা কোন্‌বিশেষ মিথ্যা মতবাদের বিরুদ্ধে নয়, এবং সচেতন নৈতিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে মানবজাতির সামর্থ্যেরই বিরুদ্ধে, সেই সন্দেহবাদ শেষ পর্যন্ত একটি প্রকৃত শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, পর্যবসিত হয় এমন এক বস্তুতে যা বিশুদ্ধ নিহিলিজ্‌মের চাইতেও খারাপ।......এই সন্দেহবাদী অহঙ্কার করে যে ছিন্নভিন্ন নৈতিক ধারণাসমূহের চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনায়াসেই সে প্রভুত্ব করতে পারবে এবং নীতিহীন যথেচ্ছাচারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। এ অহঙ্কার খুবই ভ্রান্ত কারণ যুক্তির ভ্রান্তি আর সত্যের অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতার দিকে তাকালে শুধু এই উপমা থেকেই দেখানো যায় যে স্বাভাবিক অপারগতা ঘটলেই যাথার্থ্যে পৌঁছানো যাবে না এমন কোন কথা নেই।'

শেষ এবং চূড়ান্ত সত্য, চিন্তার সার্বভৌমত্ব জ্ঞানের পরমনিশ্চয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে হের ড্যুরিং এর বাগাড়ম্বরগুলি আমরা এতক্ষণ স্থিরভাবে সহ্য করেছি, কারণ এই পর্যন্ত পৌঁছালে তবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে পারে। বাস্তবের দর্শনের পৃথক পৃথক দৃঢ়োক্তিগুলির "সার্বভৌম প্রামাণ্যতা" ও "সত্যতার নিঃশর্ত দাবি" কতখানি—এখন পর্যন্ত সেটুকু অনুসন্ধান করাই যথেষ্ট ছিল; এখন আমরা এই প্রশ্নে পৌঁছাচ্ছি যে মানবিক জ্ঞানের কোন সৃষ্টি কখনও সার্বভৌম প্রামাণ্যতা পেতে পারে কিনা, সত্য সম্বন্ধে নিঃশর্ত দাবি করতে পারে কিনা, যদি পারে তাহলে সে সৃষ্টি কোনটি।

'মানবিক জ্ঞানের' কথা বলার সময় আকাশের অন্যান্য গ্রহতারার অধিবাসীদের অপমান করার ইচ্ছা আমার নেই, আমার ঐসব অধিবাসীদের জানার সৌভাগ্য হয় নি। শব্দটি শুধু এই কারণেই ব্যবহার করেছি যে পশুদেরও জ্ঞান আছে, যদিও তা কোন মতেই সার্বভৌম নয়। কুকুর তার প্রভুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে—সেই প্রভু যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাষণ্ডও হয় তবুও।

মানবিক চিন্তা কি সার্বভৌম? এর উত্তরে হ্যাঁ বা না বলবার আগে খোঁজ করতে হবে: মানবিক চিন্তা কি? তা কি ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা? না। কিন্তু কেবলমাত্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বহুকোটি মানুষের ব্যষ্টিগত চিন্তারূপেই এর অস্তিত্ব। তখন তাহলে আমি যদি বলি, ভবিষ্যতের মানুষসহ এই সমস্ত মানুষের মোট চিন্তা, যা আমার ধারণার অন্তর্গত, তা সার্বভৌম এবং বর্তমান পৃথিবীকে জানার মত ক্ষমতা রাখে—শুধু যদি মানবজাতি

যথেষ্ট কাল স্থায়ী হয় এবং তার অনুভূতিগ্রাহী অঙ্গ বা জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বারা তার জ্ঞানের ওপর কোন সীমা আরোপিত না হয়—তাহলে আমার কথাটা তুচ্ছ তো বটেই, তার ওপর বন্ধ্যাও বটে। কারণ এর সবচেয়ে সুফল হবে এই যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভরসা থাকবে খুবই কম, যেহেতু আমরা খুবসম্ভব সবেমাত্র মানবিক ইতিহাসের গোড়ায় পৌঁছেছি, আমরা যাদের জ্ঞানকে—প্রায়ই যথেষ্ট তাচ্ছিল্য সহকারে—সংশোধন করার সুযোগ পাই, তাদের তুলনায় ভবিষ্যৎ যে জনধারা আমাদের সংশোধন করবে, তাদের সংখ্যা সম্ভবত অনেক অনেক বেশী হবে।

হের ড্যুরিং নিজে একথার প্রয়োজন ঘোষণা করেছেন যে চেতনা তথা চিন্তা এবং জ্ঞানও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সত্তার পরম্পরার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারবে। এইসব ব্যক্তি যখন সুস্থমনা এবং সদাজাগ্রত তখন তাদের ওপর জোর করে কোন ধারণা চাপাতে পারে এমন কোন শক্তির কথা আমরা যেহেতু জানি না শুধু সেই কারণে আমরা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার ওপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করতে পারি। কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা দ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানের সার্বভৌম প্রামাণ্যতার বেলায় আমরা সবাই জানি যে এরকম কোন জিনিসের কথা উঠতে পারে না; আরও জানি, পূর্বতন সকল অভিজ্ঞতা ব্যতিক্রমহীন-ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে যতখানি সঠিক বা সংস্কারের ঊর্ধ্বে তারচেয়ে অনেকখানি বেশী পরিমাণ সংস্কারের যোগ্য।

অন্য কথায় বললে সার্বভৌমভাবে একেবারেই চিন্তা করে না এমন ধারা মানবিক সত্তার পরম্পরার মধ্যে দিয়েই চিন্তার সার্বভৌমত্ব আয়ত্ত হয়; যে জ্ঞান নিঃশর্তভাবে সত্যের দাবী করতে পারে, কতকগুলি আপেক্ষিক ভ্রান্তির পরম্পরার ভেতর দিয়েই সেই জ্ঞান আয়ত্ত হয়; অসীমকালব্যাপী মানবিক অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে না চললে, কি প্রথমটি কি দ্বিতীয়টি কোনটিই পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না।

ওপরে যে স্ববিরোধিতা দেখেছি এখানেও আবার তাই দেখছি—একদিকে মানবিক চিন্তার চরিত্র যাকে আবশ্যিকভাবেই পরম বলে ধারণা করা হয় আর অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে তার বাস্তবতা যে ব্যক্তিরা সকলেই শুধু সীমাবদ্ধভাবে চিন্তা করতে পারে। একমাত্র অসীম প্রগতির গতিপথেই এই স্ববিরোধিতা মিটতে পারে—অন্ততঃপক্ষে ব্যবহারিক দিক থেকে তার মধ্যে মানব জনধারার এক অসীম পরম্পরা পার হয়ে

যাবে। এই হিসাবে মানবিক চিন্তা যতখানি সার্বভৌম, ঠিক ততখানি আবার সার্বভৌম নয় এবং জ্ঞানের জন্য এই চিন্তার সামর্থ্যও যতখানি অসীম, ঠিক ততখানি সসীম। বিন্যাস, আহ্বান, সম্ভাবনা ও চূড়ান্ত ঐতিহাসিক লক্ষ্যের দিক থেকে এ-চিন্তা সার্বভৌম ও সীমাহীন; যেকোন বিশেষ মুহূর্তে বাস্তব উপলব্ধিতে এবং বাস্তবতায় এই চিন্তা সার্বভৌম নয় বরং সীমাবদ্ধ।

শাশ্বত সত্যের বেলায়ও ঠিক তাই। মানবজাতি যদি কখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে তাঁদের কাজ হবে শুধু শাশ্বত সত্য নিয়ে, কিংবা চিন্তার এমন সমস্ত ফলাফল নিয়ে যার প্রামাণ্যতা সার্বভৌম এবং যা সত্যের জন্য নিঃশর্ত দাবি রাখতে পারে, তাহলে মানবজাতি এমন এক বিন্দুতে পৌঁছে যাবে যেখানে বুদ্ধিগত পৃথিবীর সীমাহীনতা—তার বাস্তবতা ও সম্ভাবনার দুদিক দিয়েই—নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এইভাবে অগণনীয়কে গণনা করার সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হবে।

কিন্তু এমন কোন দৃঢ়মূল সত্য আছে কি যে সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা পাগলামীরই সামিল বলে মনে হয়? দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুটি সমকোণের সমান, প্যারিস শহর ফ্রান্সের মধ্যে, খেতে না পেলে ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যু হয় ইত্যাদি ইত্যাদি—এইগুলিই কী? তা সত্ত্বেও কি শাশ্বত সত্য আছে, শেষ ও চূড়ান্ত সত্য আছে?

নিশ্চয়ই আছে। জ্ঞানের গোটা জগৎকে 'আমরা ঐতিহ্যগত ধারায় তিনটি বড় বড় বিভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম বিভাগের মধ্যে রয়েছে সেইসব বিজ্ঞান যেগুলির কারবার জড় প্রকৃতি নিয়ে, যেগুলির ওপর কম বেশী পরিমাণে অঙ্কশাস্ত্র ব্যবহার করা চলে—গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন। সরল জিনিসের জন্যে বড় বড় কথা বলে যদি কেউ আনন্দ পান তাহলে জোর দিয়ে বলা যায় যে এইসব বিজ্ঞানের কতকগুলি ফলাফল হল শাশ্বত সত্য, শেষ ও চূড়ান্ত সত্য; সেই কারণে এই বিজ্ঞানগুলি **নিশ্চিত** বিজ্ঞানরূপে পরিচিত। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানের কম ফলাফলের বেলায়ই একথা খাটে। পরিবর্তনশীল মাত্রাগুলির (variable magnitude) প্রবর্তন এবং তাদের পরিবর্তনশীলতাকে অসীম ক্ষুদ্র ও অসীম বৃহৎ পর্যন্ত প্রসারিত করণের ফলে গণিতশাস্ত্র যা সাধারণত কঠোরভাবে নিয়মনিষ্ঠ, তার দুর্দিন আসে; জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলে বিরাট বিরাট কৃতিত্বের গতি উন্মুক্ত হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তির পথও খুলে যায়। যা কিছু

গাণিতিক' তারই অকাট্য প্রমাণ ও পরম প্রামাণ্যতার অনন্যোপূর্ব অবস্থা চিরকালের মত হারিয়ে যায়; বিতর্কের রাজ্য শুরু হয়, আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছাই যেখানে লোকে বিভাজন করে ও অংশ সমন্বয় করে বুঝেসুঝে নয়, করে একান্ত' বিশ্বাস থেকে, কারণ এখন পর্যন্ত এর থেকে সর্বদাই অভ্রান্ত ফল পাওয়া গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বলবিদ্যার অবস্থা আরও খারাপ, আর ভৌতবিদ্যা ও রসায়নে প্রকল্পগুলি (Hypothesis) মৌমাছির ঝাঁকের মত আক্রমণ করে চলেছে। আবশ্যিকভাবেই এটা ঘটবে। ভৌতবিজ্ঞানে আমরা অণুর গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করি, রসায়নে আলোচনা করি অণু থেকে পরমাণুর গঠন নিয়ে; আর আলোক তরঙ্গে হস্তক্ষেপের কথা যদি গল্প না হয়, তাহলে নিজের চোখে এইসব কৌতূহলের জিনিস কখনও দেখতে পাব তার ভরসা একেবারেই নেই। এক্ষেত্রে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে শেষ ও চূড়ান্ত সত্যগুলি খুবই বিরল হয়ে আসে।

ভূতত্ত্বের বেলায় অবস্থা আরও খারাপ; ভূতত্ত্বের প্রকৃতিই হল, যেসব প্রক্রিয়া শুধু আমাদের অবর্তমানেই নয়, সবরকম মানবিক সত্তার অবর্তমানেই ঘটেছে, তাই নিয়েই তাকে কারবার করতে হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শেষ ও চূড়ান্ত সত্য কুড়িয়ে বেড়ানো খুবই কঠিন ব্যাপার, ফসলও যৎসামান্য।

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ হল যে বিজ্ঞান জৈবদেহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক ও কারণতার সংখ্যা এত বেশী যে, প্রত্যেক প্রশ্নের সমাধান থেকে আরও বিস্তর প্রশ্ন তো উঠে পড়েই, তার ওপর প্রতিটি পৃথক সমস্যাকে বেশীর ভাগ সময়ে শুধু খণ্ডে খণ্ডে সমাধান করা যায়, যার জন্যে অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান লাগে এবং তা প্রায়ই চলতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে; তাছাড়া আন্তঃসম্পর্কগুলিকে প্রণালীবদ্ধভাবে উপস্থিত করার জন্যে শেষ ও চূড়ান্ত সত্যগুলিকে বারবার প্রচুর প্রকল্প দিয়ে ঘিরে ফেলা দরকার হয়। স্তন্যপায়ীদের শরীরের রক্ত সঞ্চালনের মত সরল বিষয়টি ঠিক-ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে গালেন থেকে মালপিঘি পর্যন্ত কত না অন্তর্বর্তী মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল, রক্ত কণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত যৎসামান্য, যেমন, কোন রোগের লক্ষণকে তার কারণের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধে নিয়ে আসার পক্ষে এখনও পর্যন্ত অজানা যোগসূত্রগুলি কত বেশী! আর প্রায়ই এমন সব আবিষ্কার ঘটে, যেমন কোষের আবিষ্কার, যার ফলে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শেষ ও চূড়ান্ত সত্যগুলিকে আমরা

সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করতে বাধ্য হই এবং গাদা গাদা সত্যকে চিরকালের মত ছাইগাদায় বিসর্জন দিই। কেউ যদি এখানে বাস্তবিকই খাঁটি ও অপরিবর্তনীয় সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে তাঁকে এই ধরনের নূতনত্বহীন কথা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে: যেমন—সকল মানুষই মরণশীল, স্ত্রীজাতি ও স্তন্য-পায়ীদের সকলেরই দুগ্ধ নিঃসরণের লালাগ্রন্থি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি তিনি একথাও জোর দিয়ে বলতে পারবেন না যে, উচ্চতর প্রাণীরা তাদের পাকস্থলী ও অন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য পরিপাক করে, মাথার সাহায্য করে না—কারণ মাথা যে স্নায়বিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র সে তৎপরতা পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য।

তৃতীয় অর্থাৎ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীতে শাশ্বত সত্যগুলির আরও দুর্দশা, এইসব বিজ্ঞানের কাজ হল মানবিক জীবনের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আইন ও সরকারের ধরন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, ধর্ম, শিল্পকলা ইত্যাদি রূপে সেগুলির মতাদর্শগত উপসৌধ এইসব বিষয়গুলিকে ঐতিহাসিক আনুপূর্বিকতায় এবং তদ-উৎপন্ন 'বর্তমান অবস্থায় অনুধাবন করা। জৈব প্রকৃতিতে আমরা অন্তত এমন কতকগুলি প্রক্রিয়ার ক্রম নিয়ে কাজ করছি যেগুলি—যতদূর পর্যন্ত আমাদের আশু পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক—মোটের ওপর সুনিয়মিতভাবে ফিরে ফিরে আসে, তবে তার পরিধি খুব বিস্তীর্ণ। আরিস্টটলের সময় থেকে এখন পর্যন্ত জৈব প্রজাতিগুলির মোটের উপর কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসে, তথাকথিত প্রস্তর যুগ নামে অভিহিত মানুষের আদিম অবস্থা পার হয়ে যাওয়ার পর, অবস্থা সমূহের পুনরাবৃত্তি নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। আর পুনরাবৃত্তি যখন ঘটে তখন কখনও ঠিক একই অবস্থায় ঘটে না। যেমন, সমস্ত সভ্য জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জমির অভিন্ন মালিকানার আদি অস্তিত্ব অথবা সে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পদ্ধতি। সুতরাং জীববিদ্যার চাইতেও মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান আরও অনগ্রসর। তার ওপর ব্যতিক্রম হিসাবে কোন যুগে যদি অস্তিত্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধরনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কটা জানা যায়, তবে সর্বক্ষেত্রেই তা ঘটে শুধু তখনই যখন এই ধরনগুলির জীবন প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে এসেছে এবং নিঃশেষ হওয়ার কাছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং জ্ঞান এখানে মূলত আপেক্ষিক কারণ কেবলমাত্র কোন বিশেষ যুগে এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় ধরন—যেগুলি স্বভাবতঃই উত্তরণশীল—সেগুলির আন্তঃসম্পর্ক ও ফলাফল অনুসন্ধান করার মধ্যেই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কেউ যদি এর মধ্যে শেষ ও চূড়ান্ত সত্য, বিশুদ্ধ ও পরম অপরিবর্তনীয় সত্য খুঁজে আনতে বার হন তাহলে তিনি সামান্যই ঘরে নিয়ে আসবেন, নিয়ে আসবেন শুধু অতি অকিঞ্চিৎকর, নূতনত্বহীন ও তুচ্ছ জিনিস—যথা, সাধারণভাবে বললে, মানুষ শ্রম না করে বাঁচতে পারে না, আজ পর্যন্ত তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শাসক ও শাসিতরূপে বিভক্ত; নেপোলিয়ান মারা যান ১৮২১ সালের ৫ই মে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য যে ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমরা প্রায়ই এমন সব সত্যের সাক্ষাৎ পাই যেগুলি শাশ্বত শেষ চূড়ান্ত ইত্যাদি বলে দাবী করা হয়। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, পাখিদের ঠোঁট আছে এই ধরনের বক্তব্যগুলিকে শুধু তাঁরাই শাশ্বত সত্য বলে ঘোষণা করেন যাঁদের উদ্দেশ্য হল, সাধারণভাবে শাশ্বত সত্যের অস্তিত্ব থেকে সিদ্ধান্ত টানা যে মানবেতিহাসের ক্ষেত্রেও শাশ্বত সত্য আছে, যেমন শাশ্বত নীতি, শাশ্বত ন্যায়বিচার ইত্যাদি; গণিতের উপপাদ্য ও প্রয়োগ-গুলির মত একই প্রামাণ্যতা ও পরিধি এই সব সত্যেও বর্তমান বলে দাবী করা হয়। আর তারপর নিশ্চিন্ত মনে বলা যায়, মানুষের এই বন্ধুটি প্রথম সুযোগেই বলে দেবেন যে, আগে যারা শাশ্বত সত্য রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর গাধা বা হাতুড়ে ছিলেন, সকলেই ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভ্রান্তি ও তাঁদের ভ্রমশীলতা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগামী এবং তার থেকেই তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সত্যতা ও ভ্রান্তিহীনতার অস্তিত্ব প্রমাণ হচ্ছে, আর তিনি যিনি এখন ভবিষ্যৎদ্রষ্টারূপে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর থলির মধ্যে একেবারে তৈরী শেষ ও চূড়ান্ত সত্য, শাশ্বত নীতি ও শাশ্বত ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে। এব্যাপার এত লক্ষবার ঘটেছে যে আমরা অবাক হয়ে ভাবি এখনো এমন লোক আছে একথা বিশ্বাস করে—অপরের সম্বন্ধে নয়, নিজেদের সম্বন্ধে। তা সত্ত্বেও আমাদের সামনে এমনিধারা অন্তত আর একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হাজির যিনি সুউচ্চ নৈতিক বিক্ষোভে জ্বলে ওঠেন যদি অন্য কেউ বলে শেষ ও চূড়ান্ত সত্য ঘোষণা করার মত ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষেরই নেই। এই রকম অস্বীকৃতি কিংবা শুধু সন্দেহই হচ্ছে দুর্বলতা, আশাহীন বিভ্রান্তি, শূন্যতা, কটু সন্দেহবাদিতা, বিশুদ্ধ নিহিলিজমের চেয়েও খারাপ বস্তু, চূড়ান্ত বিশৃংখলা এবং এমনই আরো সব মধুর বচন। সকল ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতই

সূক্ষ্মদর্শী ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিচারের বদলে পাওয়া যাচ্ছে সোজাসুজি নৈতিক নিন্দাবাদ।

যেসব বিজ্ঞানে মানবিক চিন্তার নিয়মকানুন, পর্যালোচনা করা হয়, অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও দ্বন্দ্ববাদ, সেগুলির কথাও আমরা ওপরে উল্লেখ করতে পারতাম। তবে এগুলিতেও শাশ্বত সত্যের অবস্থা কিছু ভাল নয়। হের ড্যুরিং ঘোষণা করেছেন, আসল দ্বন্দ্ববাদ একেবারে বাজে কথা; আর তর্কশাস্ত্রের ওপর যেসব বই লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার থেকে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে এক্ষেত্রেও কোন কোন লোক যতখানি বিশ্বাস করেন, তারচেয়ে অনেক কম পরিমাণ শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের বীজ বপন করা হয়েছে।

বলতে কি, আমরা বর্তমানে জ্ঞানের যে স্তরে পৌঁছেছি সে স্তর এবং তার আগের অন্য সমস্ত স্তরই যে মোটেই চূড়ান্ত নয়, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। এখনই বিরাটসংখ্যক বিচারবিবেচনা এই জ্ঞানের অন্তর্গত; কোন বিশেষ বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে অনুশীলনের দিক থেকে খুবই বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। যে-জ্ঞান আপন প্রকৃতিবশে হয় বহু পুরুষ-পরম্পরা পর্যন্ত আপেক্ষিক হয়ে থাকবে, শুধু ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হবে, আর না হয় সৃষ্টিক্রম, ভূতত্ত্ব ও মানবেতিহাসের মত যে জ্ঞানের মধ্যে সব সময়েই ফাঁক থেকে যাবে, এবং ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, সেই জ্ঞানকে যিনি বিশুদ্ধ, পরিবর্তনহীন, শেষ ও চূড়ান্ত সত্য দিয়ে মাপতে যান তিনি তার দ্বারা শুধু নিজের অজ্ঞতা ও রুচিবিকৃতি প্রমাণ করেন—এমন কি এই সবের পেছনকার আসল বস্তুট যদি এই উদাহরণটির মত ব্যক্তিগত ভ্রান্তি-হীনতার দাবী না রাখে তবুও। যেসব চিন্তাগত ধারণা বিপরীত মেরুতে চলাচল করে সেগুলির মতই সত্য এবং ভ্রান্তিরও অনপেক্ষ মূল্য শুধু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে—একথা আমরা এখনি দেখলাম, এমন কি হের ড্যুরিংও দেখতে পেতেন যদি দ্বন্দ্ববাদের প্রাথমিক উপাদানগুলির সঙ্গেও তাঁর কিছু মাত্র পরিচয় থাকত, কারণ দ্বন্দ্ববাদের কারবারই হল সমস্ত বিপরীত মেরুর অসম্পূর্ণতা নিয়ে। যে সংকীর্ণ ক্ষেত্রের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি, সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যবর্তী প্রতিবিধানকে যখনই আমরা তার বাইরে প্রয়োগ করি, তখনই তা আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, ফলে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির পক্ষে সেগুলি কোন কাজে লাগে না; আর ঐ ক্ষেত্রের বাইরে তাকে যদি পরম প্রমাণরূপে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের একেবারে হার

মানতে হবে : প্রতিবিধানের দুটি মেরুই তাদের বিপরীতে রূপান্তরিত হয়, সত্য হয় ভ্রান্তি আর ভ্রান্তি হয় সত্য। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত 'বয়েলের' সূত্রটি (Boyle's Law) ধরা যায়। নিয়ম অনুসারে, তাপমাত্রা যদি নিত্য থাকে তাহলে গ্যাসের ওপর যে চাপ পড়ে তার বিপরীতভাবে গ্যাসের ঘনমান পরিবর্তিত হয়। রেনো দেখতে পান যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। তিনি যদি বাস্তবতার দার্শনিক হতেন তাহলে তিনি বলতে পারতেন : বয়েলের সূত্র পরিবর্তনশীল, সুতরাং খাঁটি সত্য নয়, সুতরাং একেবারেই সত্য নয়, সুতরাং এটি একটি ভ্রান্তি। কিন্তু তা করলে বয়েলের সূত্রের ভুলের চাইতেও তা ভুল হত অনেক বেশি ; ভ্রান্তির বালিয়াড়ির মধ্যে তার সত্যের বালুকণা হারিয়ে যেত ; তাঁর মূল সঠিক সিদ্ধান্তটিকে তিনি এমন এক বিরাট ভ্রান্তিতে বিকৃত করতেন যার কাছে বয়েলের সূত্র আর সেই সূত্র সংলগ্ন ভ্রান্তিকণাটি মনে হত যেন সত্য। কিন্তু রেনো ছিলেন বিজ্ঞানের মানুষ, তাই এরকম ছেলেমানুষী না করে অনুসন্ধান চালিয়ে যান এবং আবিষ্কার করেন যে সাধারণভাবে বয়েলের সূত্রটি শুধু মোটামুটি সত্য—যেসব গ্যাসকে চাপ দ্বারা তরল করা যায় সেই সব গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপ যখন তরলীকরণ আরম্ভ হওয়ার বিন্দুতে পৌঁছায়, বিশেষ করে তখন বয়েলের সূত্র আর খাটে না। সুতরাং প্রমাণ হল, বয়েলের সূত্র শুধু সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সত্য। কিন্তু সেই সীমাগুলির মধ্যেও কি সূত্রটি চূড়ান্ত ও পরম সত্য ? কোন পদার্থবিদ্যাবিদই এ কথা বলবেন না। তিনি বলবেন, তাপ ও চাপের কতকগুলি সীমার মধ্যে এবং কতকগুলি গ্যাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে ; এমনকি এই অধিকতর সঙ্কুচিত সীমারেখার মধ্যেও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের ফলে আরও সংকীর্ণতর সীমাবদ্ধতা বা পরিবর্তিত সূত্রায়নের সম্ভাবনাও তিনি বাদ দেবেন না।* উদাহরণস্বরূপ

---

* উপরোক্ত কথাটি লেখার পর এখন সেটি সুনিশ্চিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। মেণ্ডেলিয়েফ ও বগুস্কির আরও সঠিক যন্ত্রপাতির দ্বারা অতি সম্প্রতি যেসব গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায় সমস্ত প্রকৃত গ্যাসই চাপ ও ঘনমানের মধ্যে চল সম্পর্ক প্রদর্শন করে ; হাইড্রোজেনের ওপর এখন পর্যন্ত যত রকম চাপই প্রয়োগ করা গেছে, দেখা গেছে যে সকল চাপেই প্রসারণের গুণাঙ্ক সদর্থক (অর্থাৎ চাপ-বৃদ্ধির তুলনায় ঘনমানের হ্রাস মাত্রা ছিল মন্থরতর); আবহাওয়ার বাতাস এবং অন্যান্য যেসব গ্যাস পরীক্ষা করা হয় তাদের প্রত্যেকের জন্যে চাপের একটি শূন্য বিন্দু রয়েছে, ফলে এই বিন্দুর নীচে চাপ দিলে তাদের গুণাঙ্কগুলি সদর্থক হয় আর ওপরে চাপ দিলে গুণাঙ্ক নঞর্থক হয়। সুতরাং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বয়েলের সূত্রটি এতদিন কাজে লাগলেও তার পরিপূরক হিসাবে এক গুচ্ছবিশেষ সূত্রও দরকার হবে। (এখন ১৮৮৫ সালে আমরা এও জানি যে 'প্রকৃত' গ্যাস বলে কোন গ্যাস নেই। তার সবগুলিকেই তরল করা গেছে।) এঙ্গেলস-এর টীকা।

পদার্থবিদ্যার মধ্যে শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের অবস্থা এই রকম। সুতরাং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক রচনায় সবসময়েই ভ্রান্তি ও সত্যের মত মতান্ধ নৈতিক বাক্য বাদ দেওয়া হয়, আর বাস্তবতার দর্শনের মত রচনায় এই সব বাক্য অনবরত দেখা যায়, সেগুলিতে রচনায় সার্বভৌম চিন্তার সার্বভৌম ফল রূপে আমাদের ওপর শূন্যগর্ভ বাগবিস্তারের প্রচেষ্টা চলে।

কিন্তু সরলমতি পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, হের ড্যুরিং কোথায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর বাস্তবতার দর্শনের অন্তর্বস্তু শেষ সত্য, এমন কি চূড়ান্ত সত্য? কোথায়? কেন, যেমন তাঁর নিজের প্রণালী সম্বন্ধে পানোন্মত্ত বন্দনার মধ্যে (পৃ ১৩)—যার কিয়দংশ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি। কিংবা পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ যেখানে তিনি বলেছেন: নৈতিক সত্যের চূড়ান্ত ভিত্তি যতদূর পর্যন্ত বোঝা যায় ততদূর পর্যন্ত সেগুলি গাণিতিক উপপাদ্যের মতই প্রামাণ্যতার দাবী রাখে। আর হের ড্যুরিং কি জোর দিয়ে বলেন নি যে তাঁর বাস্তবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং যেসব গবেষণা বস্তুসমূহের মূল পর্যন্ত পৌঁছায়, সেই সব গবেষণার সাহায্য নিয়ে তিনি এইসব চূড়ান্ত ভিত্তি তথা মূল প্রকল্প পর্যন্ত সবলে পথ কেটে গিয়েছেন এবং এইভাবে নৈতিক সত্যের ওপর শেষ ও চূড়ান্ত প্রামাণ্যতা অর্পণ করেছেন? কিংবা হের ড্যুরিং যদি আপনার জন্যে বা আপন যুগের জন্যে এই দাবী উপস্থিত না করেন, যদি তিনি শুধু এই কথাই বলতে চেয়ে থাকেন যে ঝাপ্সা, অন্ধকার ভবিষ্যতে হয়তো কোনদিন শেষ ও চূড়ান্ত সত্য নির্ণীত হতে পারে, এবং সেই কারণে যদি তিনি সেই একই কথা বলতে চেয়ে থাকেন, তবে শুধু আরও একটু বিভ্রান্তিকর উপায়ে—যেমন 'কটু সন্দেহবাদ', 'আশাহীন বিভ্রান্তি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা—তাহলে, সেক্ষেত্রে, হের ড্যুরিং, এত গোলমালই বা কেন, আর আপনাকে নিয়ে আমরা করবই বা কি?"

তাহলে সত্য আর ভ্রান্তি নিয়ে আমরা যদি বিশেষ অগ্রসর না হয়ে থাকি তবে ভাল আর মন্দ নিয়ে আরও কম অগ্রসর হতে পারব। এই স্ব-বিরোধিতা একান্তভাবে দেখা যায় নীতির রাজত্বে অর্থাৎ এমন রাজত্বে যা মানবেতিহাসের অন্তর্গত—আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই শেষ ও চূড়ান্ত সত্যের বীজ খুব অল্প পরিমাণে উপ্ত হয়েছে। জাতিতে জাতিতে, যুগে যুগে ভাল ও মন্দের ধারণা এত বিভিন্ন যে অনেক সময় সে ধারণাগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে যতই যা হোক, ভাল তো মন্দ নয় আর মন্দ

তো ভাল নয়; ভালকে যদি মন্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় তাহলে সেখানে সকল নৈতিকতার শেষ, যে যা খুশি করতে পারে। আপ্তবচন বাদ দিলে হের ডুরিং-এর মতও এই। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজে সেরে দেওয়া যায় না। ব্যাপার যদি এত সহজ হত তাহলে ভাল আর মন্দ নিয়ে কখনই এত তর্ক উঠত না, কি ভাল আর কি মন্দ তা সবাই জানত। কিন্তু এখন অবস্থাটা কি? কোন নৈতিকতা আজ আমাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে? প্রথমত খ্রিস্টীয় সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতা যা প্রাচীনতর ধর্মের যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত; এই নৈতিকতা আবার মূলত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নৈতিকতার মধ্যে বিভক্ত; এই দুটির প্রত্যেকটিরও উপবিভাগের অভাব নেই—জেসুইট-ক্যাথলিক ও গোঁড়া-প্রটেস্ট্যান্ট থেকে ঢিলেঢালা 'আলোকপ্রাপ্ত' নৈতিকতা পর্যন্ত। এগুলির পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি—আধুনিক-বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং তার পাশে ভবিষ্যতের সর্বহারা নৈতিকতাও। ফলে কেবলমাত্র অতি উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলিতেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে নৈতিক তত্ত্বের তিনটি বড় বড় গোষ্ঠী রয়েছে যেগুলি এক সঙ্গে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। তাহলে কোনটি সত্য? পরম ও চূড়ান্ত হিসাবে কোনটিই নয়, তবে সন্দেহ নাই, সেই নৈতিকতার মধ্যেই চিরস্থায়িত্বের সর্বাধিক উপাদানের সম্ভাবনা রয়েছে—বর্তমানে যে নৈতিকতা বর্তমানকে উচ্ছেদের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যৎকে রূপ দেয় অর্থাৎ সর্বহারার নৈতিকতা।

কিন্তু যখন আমরা দেখি যে আধুনিক সমাজের তিনটি শ্রেণী—সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণী—এদের প্রত্যেকেরই এক একটি নিজস্ব নৈতিকতা রয়েছে, তখন আমরা শুধু একটি সিদ্ধান্তই টানতে পারি, যথা: জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানুষেরা শেষ পর্যন্ত তাদের নীতিগত ধারণা সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণীগত অবস্থার বাস্তব সম্বন্ধ থেকে, যেসব অর্থনৈতিক সম্বন্ধের মধ্যে তারা উৎপাদন ও বিনিময় পরিচালনা করে সেইসব সম্বন্ধ থেকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অনেক কিছু আছে যা পূর্বোক্ত তিনটি নৈতিক তত্ত্বের মধ্যেই অভিন্ন। এটা কি অন্তত সেই নৈতিকতার অংশ নয় যে নৈতিকতা চিরকালের মত সুনির্দিষ্ট? এগুলি ঐতিহাসিক বিকাশের তিনটি বিভিন্ন স্তর এইসব নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে রূপ পেয়েছে। সেজন্য সেগুলির একটা অভিন্ন ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট রয়েছে এবং শুধু সেই কারণে সেগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবেই অনেকখানি অভিন্নতা থাকবে এমনকি তার চেয়েও

বেশি। অর্থনৈতিক বিকাশের অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ স্তরে নৈতিক তত্ত্বগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবেই কমবেশি মিল থাকতে হবে। যে মুহূর্ত থেকে অস্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তি-মালিকানা গড়ে উঠল তখনই যে যে সমাজে এই ব্যক্তি-মালিকানা উপস্থিত ছিল সেইসব সমাজকে এক সুরে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হল: চুরি করিবে না।[৫৩] তাই বলে কি এই নিষেধাজ্ঞা একটা চিরস্থায়ী নৈতিক নিষেধাজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছে? মোটেই না। যে সমাজে চুরি করার সমস্ত হেতু দূর করে দেওয়া হয়েছে, ফলে বড়জোর উন্মাদ লোকেরাই যে সমাজে চুরি করতে পারে সেখানে যদি কোন নীতিবাগীশ গম্ভীর স্বরে এই চিরন্তন সত্য ঘোষণার চেষ্টা করেন—চুরি করিবে না—সেই নীতি-বাগীশকে কতখানিই না ঠাট্টার পাত্র হয়ে দাঁড়াতে হবে।

নৈতিক পৃথিবীরও এমন সব স্থায়ী নীতি আছে যা জাতিগত বৈষম্য এবং ইতিহাসের ঊর্ধ্বে—এই অজুহাতে যে কোন নৈতিক গোঁড়ামীকে যদি চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত ও চির-অপরিবর্তনশীল নৈতিক নিয়ম বলে আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয় তবে আমরা সে রকম প্রতিটি চেষ্টাকেই প্রত্যাখ্যান করব। বরং বিপরীতভাবে আমরা এই মত পোষণ করি যে আজ পর্যন্ত সকল নৈতিক তত্ত্বই শেষ অবধি সমসাময়িক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সমূহের ফল। আজ পর্যন্ত সমাজ যখন শ্রেণীবিরোধের ভেতর দিয়ে চলেছে তখন নৈতিকতাও সব সময় শ্রেণী-নৈতিকতারূপে প্রকাশিত হয়েছে; এ নৈতিকতা হয় শাসকশ্রেণীর প্রভুত্ব ও স্বার্থের সাফাই দিয়েছে আর না হয়, যখন থেকে নিপীড়িত শ্রেণীর উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি এসেছে তখন থেকে এ নৈতিকতা এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের রূপ নিয়েছে, নিপীড়িতদের ভবিষ্যৎ-স্বার্থকে রূপ দিয়েছে। এই ধারার ভেতর দিয়ে মানবিক জ্ঞানের অপর সকল শাখার মতই নৈতিকতাতেও অগ্রগতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এখনো শ্রেণীগত নৈতিকতা অতিক্রম করি নি। যে প্রকৃত মানবিক নৈতিকতা শ্রেণী-বিরোধের ঊর্ধ্বে, শ্রেণী-বিরোধের স্মৃতিরও ঊর্ধ্বে সে নৈতিকতা শুধু সমাজের এমন স্তরেই সম্ভব যখন শ্রেণীগত বিরোধ তো অতিক্রান্ত হয়েছেই, এমন কি ব্যবহারিক জীবন থেকে তার স্মৃতিও মুছে গেছে। এখন বোঝা যাবে হের ড্যুরিংয়ের দাবীর স্পর্ধা কতখানি—প্রাচীন শ্রেণী সমাজের ভেতর থেকে, এবং একটা সামাজিক বিপ্লবের পূর্বাহ্নে তিনি ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন সমাজের ওপর এমন এক চিরস্থায়ী নৈতিকতা চাপিয়ে দিতে চান যা কালজয়ী

এবং বাস্তবতার পরিবর্তন থেকে মুক্ত। এমন কি যদি আমরা ধরে নেই (যা ধরা যায় কিনা এখনো জানি না) যে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামোটির মূল রূপ-রেখাগুলি অন্তত তাঁর জানা আছে—তবুও।

শেষকালে আর একটি আপ্তবচন—এটি 'মাটি থেকে ওপর পর্যন্ত মৌলিক' তবে তা বলে 'বস্তুসমূহের মূল পর্যন্ত' যেতে ছাড়ে নি।

> দুষ্টতার উৎপত্তি সম্বন্ধে, 'বিড়ালের ধরনটি এবং তার সঙ্গে যুক্ত দুষ্টতাটি যে পশুর আকারে দেখা যায়—এ তথ্যটি আর একটি অবস্থার সঙ্গে একই পর্যায়ে পড়ে, যথা মনুষ্য জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেও অনুরূপ ধরনের চরিত্র দেখা যায়।…সুতরাং দুষ্টতার মধ্যে কোন রহস্য নেই—যদি না একটি বিড়াল বা কোন শিকারী জন্তুর অস্তিত্বের মধ্যে কেউ রহস্যের গল্প খুঁজে পেতে চান।'

দুষ্টতা হচ্ছে—বিড়ালটা। সুতরাং শয়তানের শিংও নেই, চেরা খুরও নেই, আছে নখ আর সবুজ চোখ।

মেফিস্টোফিলিসকে কালো বিড়ালের বদলে কালো কুকুর রূপে[৫৪] উপস্থিত করে গয়েটে অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন। দুষ্টতা হল বিড়ালটা! এই হল নৈতিকতা, শুধু সমগ্র বিশ্বের জন্যেই নয়, বিড়ালদের জন্যেও।

দশ

নৈতিকতা ও নিয়মবিধি

সাম্য

অবস্থার গতিকে আমাদের একাধিকবার হের ড্যুরিং-এর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। ঐ পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর প্রতিটি শাখাকে আলাদা-আলাদাভাবে টুকরো টুকরো করে নিয়ে সেগুলিকে একেবারে সরলতম প্রাথমিক বস্তু বলে দাবি করা হয় এবং সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে হাজির করা হয়; আর এইভাবে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে কাজ চলে। এমনকি সমাজ জীবনের কোনো একটা সমস্যাকেও

> 'নির্দিষ্ট, সরল মৌলিক রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বতঃসিদ্ধভাবে সমাধান করতে হবে। যেমনভাবে আমরা গণিতের সরল…মূল রূপগুলিকে নিয়ে কাজ করে থাকি।'

আর এইভাবে ইতিহাস, নৈতিকতা ও নিয়মবিধির ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে যে-ফলাফল পাওয়া যাবে, তার সত্যতা গণিতের মতো নিশ্চিত বিধায় সেগুলিকে যথার্থ ও শাশ্বত সত্য বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

এটা অবশ্য সেই পুরানো ভাবাদর্শগত পদ্ধতিকেই নতুনভাবে বিবৃত করা হচ্ছে, যাকে বলা হয় পূর্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি, অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে বস্তুর ধারণা থেকে যৌক্তিক অনুমানে পৌঁছানোর পদ্ধতি। প্রথমে একটা বস্তু বা বিষয়ের ধারণা তৈরি করা হয় বস্তু বা বিষয় অনুযায়ী; তারপর সেটাকে উল্টেপাল্টে ঘোরানো হয় এবং তারপর বস্তুটিকে বিচার করা হয় তার ভাবমূর্তি দিয়ে, তখন গড়ে ওঠে বস্তুর ধারণা। তারপর ধারণার সঙ্গে বস্তুটিকে, বস্তুর সঙ্গে ধারণাকে নয়, খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়। হের ড্যুরিং চরম বিমূর্তকরণের মাধ্যমে সরলতম উপাদানগুলিতে পৌঁছিয়েছেন। এতে বিষয়বস্তুর কোনো অদলবদল হয় না। এইসব সরলতম উপাদান বড়জোর নিছক ভাবগত চরিত্রের। সুতরাং

বাস্তবতার দর্শন এখানে আবার বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ হিসাবেই প্রতিপন্ন হল, এখানেও বাস্তবতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হল খোদ বস্তুজগৎ থেকে নয়, শুধুমাত্র তার ধারণা থেকে।

আর এই ধরনের পণ্ডিত যখন নৈতিকতা ও নিয়মবিধি নির্মাণ করতে চান ধারণা থেকে অথবা 'সমাজে'র তথাকথিত সরলতম উপাদানগুলি থেকে, তাঁর পারিপার্শ্বিক জনগণের সামাজিক সম্পর্ক থেকে নয়, তখন এই নির্মাণ-কর্মের জন্যে আর কি উপাদান পাওয়া সম্ভব? উপাদানগুলি স্পষ্টতই দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমত, প্রকৃত উপাদানের সামান্য অবশেষ—তাঁর বিমূর্তকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেও যেগুলির অস্তিত্ব সম্ভব; দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজস্ব চেতনা থেকে আমাদের এই তত্ত্ববিদ যে উপাদান পুনরায় উপস্থিত করেন। আর তাঁর চেতনার মধ্যে তিনি কিসের সন্ধান পান? বেশির ভাগটাই পান নৈতিক ও আইন সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি, যা তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কমবেশি সঠিক অভিব্যক্তি (ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক, সমর্থনকারী বা বিরোধী); এই বিষয় সম্বন্ধে যে লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, হয়তো তা থেকেও ধারণাগুলি তিনি গ্রহণ করে থাকতে পারেন। কিছু ব্যক্তিগত মেজাজের বৈশিষ্ট্য থেকেও তাঁর এই ধারণা হতে পারে। আমাদের এই তত্ত্ববিদ যেভাবে খুশি এ-পাশ ও-পাশ করুন না কেন, ইতিহাসের যে-বাস্তবতাকে তিনি দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন, সেটাই আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং যখন তিনি ভাবেন যে নৈতিকতা ও নিয়মবিধি সংক্রান্ত মতবাদ চিরকালের মতো সারা দুনিয়ার জন্যে ছকে রাখছেন, তখন আসলে তিনি তাঁর সময়ের রক্ষণশীল কিংবা বিপ্লবী ঝোঁক-গুলিরই যেন ভাবমূর্তি তৈরি করছেন—যে ভাবমূর্তি বিকৃত রূপ নিয়েছে। কেননা সেটাকে তার আসল ভিত্তি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং সেটা অবতল আয়নার প্রতিবিম্বের মতো বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

এইভাবে হের ড্যুরিং সমাজকে তার সরলতম উপাদানে ব্যবচ্ছেদ করে দেখেন এবং সেটা করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসেন যে সরলতম সমাজে অন্ততপক্ষে দুটি লোক রয়েছে। এরপর তিনি এই দুটি লোককে নিয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে কাজে লেগে যান। আর মৌলিক নৈতিক স্বতঃসিদ্ধটি স্বভাবতই এইভাবে নিজেকে উপস্থিত করে:

'দুটো মানুষের ইচ্ছা যদি পরস্পরের একেবারে অনুরূপ হয়, তাহলে

প্রাথমিকভাবে একজন আর একজনের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনো কিছু চাইতে পারে না।' এটাই 'নৈতিক ন্যায় বিচারের মূল রূপটি চরিত্রায়িত করে', সেই সঙ্গে আইনসঙ্গত ন্যায়বিচারের রূপটিকেও, কেননা 'অধিকার সংক্রান্ত মৌল ধারণাগুলির বিকাশের জন্যে দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সরল ও প্রাথমিক সম্পর্কই আমাদের প্রয়োজন।'

দুটি মানুষ বা দুটি মানুষের ইচ্ছা যে একেবারে সমান বা পরস্পরের অনুরূপ হতে পারে না,—এটা স্বতঃসিদ্ধ তো নয়ই, পরন্তু বড় রকমের অতিরঞ্জন। প্রথমত, দুটি মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের ভেদ থাকতে পারে, এবং এই সহজ তথ্যটি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে (মুহূর্তের জন্যেও যদি আমরা এই ছেলেমানুষী দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করি), এরা দুটি পুরুষ নয়, একজন পুরুষ ও অপরজন নারী, যারা দুজন মিলে পরিবারে বাস করে, যেটা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত একটা সরলতম ও প্রাথমিক সংগঠন। কিন্তু হের ডুারিং-এর এতে কোনো মতেই পোষাবে না। কারণ প্রথমত, সমাজের দুই প্রতিষ্ঠাতাকে যতটা সম্ভব সমান করাতে হবে: এবং দ্বিতীয়ত, এমনকি হের ডুারিংও আদি পরিবার থেকে নারী-পুরুষের নৈতিক ও আইনী সাম্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। হয় এটা, নয় ওটা: ডুারিং-এর হাতের সামাজিক অণুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে পুরো সমাজটাকে গড়ে তুলতে হবে, যেটা আগে থেকেই সর্বনাশের পথে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, কারণ দুজন পুরুষ মিলে একটা শিশুসন্তানকে কখনই জগতে আনতে পারে না; অথবা তারা দুজন দুই পরিবারের কর্তা—এটাই আমাদের ধরে নিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে এই সরল ছকের সবটাই তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়; জনগণের মধ্যে সাম্যের বদলে বড়জোর এটা পরিবারের কর্তাদের সাম্য বলে প্রতিপন্ন হয় এবং যেহেতু নারীদের এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না, তাতে আরও প্রমাণিত হয় যে তারা পুরুষদের অধীনেই থাকবে।

এবার আমাদের পাঠকের কাছে একটা অপ্রীতিকর ঘোষণা করতে হবে: এখন থেকে বেশ খানিকটা সময় পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ঐ দুই বিখ্যাত পুরুষকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা সেই ভূমিকাই পালন করবে, যে-ভূমিকা এতদিন গ্রহান্তরের বাসিন্দারা পালন করে এসেছে এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চুকে গেছে বলেই আমরা ভেবেছিলাম। যখনই অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের

সমাধান করতে হবে, এই দুই পুরুষ তৎক্ষণাৎ আমাদের সামনে এসে হাজির হবে এবং চোখের পলকে 'স্বতঃসিদ্ধভাবে' ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দেবে। একটা চমকপ্রদ সৃজনশীল ও পদ্ধতি-নির্মাণকারী আবিষ্কার করেছেন, আমাদের এই বাস্তবতার দার্শনিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গেলে আমাদের বলতেই হবে যে এই দুই পুরুষ তাঁর আবিষ্কার নয়। তারা সমগ্র আঠারো শতকের সকলের সম্পত্তি। অসাম্য সম্বন্ধে রুশোর আলোচনাতে (১৭৫৪) [৫৫] এদের আগেই দেখা গিয়েছে; প্রসঙ্গত বলা যায় সেখানে তারা হের ড্যুরিং-এর বক্তব্যের উল্টোটাই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করেছে। অ্যাডাম স্মিথ থেকে রিকার্ডো পর্যন্ত অর্থনীতিবিদদের মতবাদে তারা একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।• কিন্তু এই দুজনের ক্ষেত্রে তারা মোটেই পরস্পরের সমান নয় কেননা দুজন দুই পেশার লোক—সাধারণত একজন হল শিকারি এবং অন্যজন হল জেলে, আর তারা দুজনে তাদের দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে। তাছাড়া, পুরো আঠারো শতক ধরে তারা প্রধানত একটা দৃষ্টান্ত হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। হের ড্যুরিং-এর মৌলিকত্ব এখানেই যে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক পদ্ধতি ও যাবতীয় ঐতিহাসিক রূপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'বস্তু ও মানুষ সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা' করার জন্যে এর চাইতে সরলীকরণ নিশ্চয়ই আর করা সম্ভব নয়।

দুজন মানুষ ও তাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সমান এবং দুজনের কেউই কারুর ওপর আধিপত্য করে না—এই মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে আমরা যে কোনো কয়েক জোড়া মানুষকে যদৃচ্ছভাবে বেছে নিতে পারি না। সেই দুজন দুনিয়ার সকল বাস্তবতা থেকে, সব রকমের জাতীয়, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক থেকে মুক্ত, তাদের কোনো লিঙ্গগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকবে না তারা হবে শুধু মানুষের ধারণা, আর তাহলে তারা নিশ্চয়ই 'সম্পূর্ণ সমান' বলে গণ্য হবে। সুতরাং তারা হল সেই ধরনের একটা পরিপূর্ণ মায়ামূর্তি যা হের ড্যুরিং-ই যেন যাদুমন্ত্রে উপস্থিত করেছেন, যিনি সর্বত্র গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন এবং 'আত্মা' বা 'প্রেত' সম্পর্কিত ঝোঁককে নিন্দাবাদ করেছেন। এই দুই মায়ামূর্তি অবশ্য তাদের সৃষ্টিকর্তার সব কথাই মেনে চলতে বাধ্য, আর ঠিক এই কারণেই তাদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে বাকি দুনিয়ার কোনো আগ্রহ নেই।

কিন্তু হের ড্যুরিং-এর স্বতঃসিদ্ধে পৌঁছবার কায়দাকে আমাদের আর একটু অনুসরণ করতে হবে। এই দুই পুরুষ পরস্পরের কাছ থেকে ইতিবাচক কিছু দাবি করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি একজন সেটা করে, এবং বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তাহলে অবিচারের পরিস্থিতি' সৃষ্টি হবে ; আর এই মৌলিক ছকটির সাহায্যে হের ড্যুরিং অবিচার, স্বৈরতন্ত্র, ক্রীতদাসত্ব—এক কথায় অতীতের নিন্দনীয় ইতিহাসটাই ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু এর আগে রুশোর যে প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তিনি দুজন লোককে, অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবেই, বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন : ক যেমন খ-কে বলপ্রয়োগ করে ক্রীতদাস করতে পারে না, কিন্তু খ-কে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে খ-এর ক ছাড়া গত্যন্তর নেই ; রুশোর এই ধারণা অবশ্য হের ড্যুরিং-এর পক্ষে বড়ই বস্তুতান্ত্রিক। এই একই বিষয়কে একটু অন্যভাবে উপস্থিত করা যাক। জাহাজডুবি হয়ে দুজন মানুষ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে সমাজ গড়ে তুলল। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ইচ্ছা একেবারে সমান এবং এটা দুজনেই স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তব দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট অসাম্য রয়েছে। ক-এর রয়েছে দৃঢ়তা ও কাজ করার শক্তি, খ-এর রয়েছে দোমনাভাব, সে অলস ও কোমল স্বভাবের মানুষ। ক চটপটে, খ বোকা। ক-এর পক্ষে খ-কে তার ইচ্ছার বশে আনতে, প্রথমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, অভ্যাসের জোরে কিন্তু সব সময়েই স্বেচ্ছাকৃতভাবে, কতদিন লাগবে? স্বেচ্ছাকৃত ভাবটা থাকুক কিংবা সেটা পদদলিতই হোক—দাসত্ব দাসত্বই থাকে। স্বেচ্ছাকৃতভাবে বশ্যতা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা পুরো মধ্যযুগ ধরেই জানা ছিল, জার্মানিতে ছিল তিরিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের কাল পর্যন্ত।[৫৬] ১৮০৬ ও ১৮০৭ সালে পরাজিত হওয়ার পর প্রুশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়ার পর এবং প্রভুদের দরকারের সময়, অসুখ-বিসুখ করলে ও বুড়ো বয়সে দেখা-শোনা করার ক্ষেত্রে মালিকদের দায়দায়িত্বের অবসান ঘটলে, কৃষকরা রাজার কাছে তাদের ভূমিদাসত্ব বজায় রাখার জন্যে আর্জি পেশ করে, তা না হলে বিপদে পড়লে তাদের দেখাশোনা করবে কে? সুতরাং দুটি মানুষের ছক অসাম্য ও বশ্যতার ক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই 'প্রযোজ্য', যতটা প্রযোজ্য সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে ; আর সমাজকে তুলে দেবার দায়িত্ব এড়াতে গেলে আমাদের এটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে তারা দুটি পরিবারের দুজন কর্তা, বংশানুক্রমিক বশ্যতা এই ধারণার মধ্যে গোড়া থেকেই রয়েছে।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে এখনকার মতো স্থগিত রাখা যাক। ধরে নেওয়া যাক যে হের ড্যুরিং-এর স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতিকে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং দুটি ইচ্ছার মধ্যে, 'সাধারণভাবে মানবিক সার্বভৌমত্বে'র এবং 'ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্বে'র আমরা উৎসাহী সমর্থক,—এই বিরাট বাগাড়ম্বরের তুলনায় স্টারনার-এর 'অহম্' ও তার আমিত্ব* নেহাৎই খর্বাকৃতি, যদিও স্টারনার এ ক্ষেত্রে তাঁর একটা ছোট্ট ভূমিকা দাবি করতে পারেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন সবাই একেবারেই সমান ও স্বাধীন? সবাই কি? না, ঠিক পুরোপুরি নয়।

> 'অনুমোদনযোগ্য নির্ভরশীলতা'র কয়েকটি উদাহরণও রয়েছে, কিন্তু এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে 'সেইসব যুক্তি অনুযায়ী, সেগুলিকে দুটি ইচ্ছার কার্যকলাপের মধ্যে অনুসন্ধান করা উচিত নয়, এগুলিকে অনুসন্ধান করতে হবে একটি তৃতীয় ক্ষেত্রে, যেমন শিশুদের মধ্যে, তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দুর্বলতার মধ্যে।'

যথার্থই বটে! নির্ভরশীলতার যুক্তি ঐ দুটি ইচ্ছার কার্যকলাপের মধ্যে অনুসন্ধান করা চলবে না! স্বভাবতই নয়, কারণ একজনের ইচ্ছার কার্যকলাপ বস্তুতপক্ষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে! আর এই তৃতীয় ক্ষেত্রটা কী? যে পদানততার বাস্তব সংকল্প জোরালো নয়! আমাদের বাস্তবতার দার্শনিক এবং বাস্তবতা থেকে এতদূরে সরে এসেছেন যে, মর্মবস্তুহীন বিমূর্ত শব্দের বদলে তিনি প্রকৃত মর্মবস্তুকে, এই ইচ্ছার যা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, গণ্য করছেন 'তৃতীয় ক্ষেত্র' হিসাবে। যাই হোক না কেন, আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অধিকারের সাম্যের একটা ব্যতিক্রম আছে। যার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, তার ক্ষেত্রে এটা কোনো কাজে আসবে না। এটা পিছু-হটার প্রথম দৃষ্টান্ত।

আরো এগোনো যাক।

> 'যেখানে একটি মানুষের মধ্যে পশু ও মানুষের মিশ্রণ ঘটেছে, সেখানে সম্পূর্ণ মানবিক গুণসম্পন্ন দ্বিতীয় একজন মানুষের কাছ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সম্পূর্ণ মানবিক গুণসম্পন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে যে রকম হয়, ঐ ব্যক্তির আচরণও কি সেই রকম হবে··· সুতরাং নৈতিকভাবে অসমান দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রতিপাদ্য,

---

* ম্যাকস স্টারনার-এর 'The Ego and His Own', লিপজিগ, ১৮৪৫-এ প্রকাশিত। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের 'দি জার্মান আইডিওলজি' বইয়ে স্টারনার-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। সম্পাদক।

যার মধ্যে একজনের খানিকটা জান্তব চরিত্র রয়েছে, সকল সম্পর্কের একেবারে মূল বৈশিষ্ট্যসূচক—এই পার্থক্য অনুসারে মানবগোষ্ঠী-গুলির মধ্যে নানা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে.।'

এখন পাঠক নিজেই দেখুন, এড়িয়ে যাবার অবড়জং কৌশল থেকে কী ধরনের দীর্ঘ বিতণ্ডা উঠছে। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ জান্তব মানুষের বিরুদ্ধে কতদূর যেতে পারে, কতটা তাকে আবিষ্কার করতে পারে, অটল নীতিবোধ থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুত না হয়ে তার বিরুদ্ধে কতটা কঠোর হতে পারে, এমনকি সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতি ও সেই সঙ্গে প্রতারণামূলক কৌশল প্রয়োগ করতে পারে—সেটা দেখাবার মতলবেই হের ড্যুরিং একজন জেসুইট পাদ্রির মতো কসরৎ দেখিয়ে যাচ্ছেন।

কাজেই যখন দুজন মানুষ 'নৈতিক দিক থেকে অসমান', সেখানে সমতা আর থাকতে পারে না। কিন্তু তাহলে নৈতিকভাবে একেবারে সমান দুজন মানুষকে কৌশলে সামনে হাজির করাটা কোনো কাজের কাজ নয়, কেননা এরকম দুজন মানুষ কখনও পাওয়া যাবে না, যারা নৈতিকভাবে একেবারে সমান। কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে অসমতা এইখানে: একজন মানবিক গুণ-সম্পন্ন মানুষ, আর অন্যজনের মধ্যে পশুত্বের বেশ রয়েছে। কিন্তু পশুজগৎ থেকেই মানুষের যখন উদ্ভব, তখন সেই মানুষ কোনো সময়েই নিজের জান্তব অস্তিত্ব একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, অতএব পশুত্ব বা মানবিকতা কতটুকু আছে সেটাই বিচার্য বিষয়। মানবজাতিকে পরিষ্কারভাবে দুটো আলাদা ভাগে বিভক্ত করার—একটি মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ আর অন্যটা জান্তব প্রকৃতির মানুষ, একটি ভাল অন্যটি মন্দ, একটি ভেড়া অন্যটি ছাগল—পরিচয় পাওয়া যায়, বাস্তবতার দর্শন ছাড়া, একমাত্র খ্রিস্ট ধর্মে, যেখানে বিশ্ববিধাতা যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই বিভাজন করে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতার দর্শনে এই বিশ্বের ন্যায়াধীশ কে?

ধরে নেওয়া যেতে পারে পদ্ধতিটা খ্রিস্ট ধর্মের রীতির মতোই হবে, যেখানে তাদের পার্থিব ছাগল-প্রতিবেশীদের তুলনায় পুণ্যবতী ভেড়ারাই বিশ্বের ন্যায়াধীশ হবার পদ অধিকার করে এবং নিকৃষ্টভাবে তাদের এই পদের কর্তব্য পালন করে। বাস্তবতার এই দার্শনিক সম্প্রদায় যদি কখনও বাস্তবে অবতীর্ণ হন, তাহলে তাঁরা নিশ্চিতভাবেই এক্ষেত্রে দেশের পুণ্যাত্মাদের কাছে নিজেদের অগ্রাধিকার ছেড়ে দেবেন না। তবে এতে আমাদের কিছু যায় আসে না;

আমাদের যাতে ঔৎসুক্য, সেটি হল যে মানুষের মধ্যে নৈতিক অসমতা থাকার ফলে সমতা আর একবার মিলিয়ে গেল—এই স্বীকৃতি। এটি পিছু হটার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

> 'একজন যদি সত্য ও বিজ্ঞান অনুসারে এবং আর একজন যদি কুসংস্কার বা আগে থেকে মন-গড়া ধারণা নিয়ে কাজ করে, তাহলে… পারস্পরিক হস্তক্ষেপ ঘটবেই ঘটবে…অযোগ্যতা, বর্বরতা অন্ন চারিত্রিক বিকৃতির একটি পর্যায়ে সংঘাত অনিবার্য…শিশু ও পাগলদের বিরুদ্ধেই যে শুধু শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে হয় তাই নয়। মানবজাতির যতরকমের গোষ্ঠী ও সংস্কৃতিবান শ্রেণী আছে তাদের ইচ্ছা পরাধীনতাকে একটা অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন করতে তুলতে পারে, যে ইচ্ছা বিকৃত বলেই শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু এই রকম ক্ষেত্রেও বিরোধী ইচ্ছার সমানাধিকার থাকবে এটাই স্বীকৃত; অথচ এর ক্ষতিকারক ও শত্রুভাবাপন্ন কার্যকলাপের বিকৃতি একটা সমতাবিধানের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাতে যদি বলপ্রয়োগ করা যায় তাহলে তার নিজের অন্যায় কাজের ফলই তাকে ভোগ করতে হয়।'

অতএব কেবলমাত্র নৈতিক নয়, পরন্তু মানসিক অসমতাও দুটি ইচ্ছার 'পূর্ণ সমতা'কে হটিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এবং এমন একটি নৈতিকতাকে এর দ্বারা সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে যাতে পশ্চাৎপদ জনগণের বিরুদ্ধে সভ্য দস্যু রাষ্ট্রগুলির কুখ্যাত কার্যকলাপ থেকে শুরু করে তুর্কিস্তানে রুশ অত্যাচার পর্যন্ত সব কিছুরই ন্যায্যতা সমর্থিত হতে পারে।[৫৭] ১৮৭৩ সালের গ্রীষ্মকালে জেনারেল কাউফমান 'পুরানো ককেসীয় কায়দায়' নির্দেশ জারি করে ইয়োমুদ-এর তাতার উপজাতির বিরুদ্ধে আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন, তাদের তাঁবু জ্বালিয়ে দিতে হুকুম করেছিলেন এবং তাঁদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে বলেছিলেন। তিনিও ঘোষণা করেছিলেন যে ইয়োমুদদের ইচ্ছা যেহেতু বিকৃত, তাই এই শত্রুভাবাপন্ন ইচ্ছাকে দমন করতে হবে, যাতে সাধারণ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়; তাঁর মতে এটি অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে তাঁর অবলম্বিত পন্থাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট এবং যে ব্যক্তি লক্ষ্যসাধনে ইচ্ছুক, পন্থাটা তাকেই বাৎলাতে

হবে। তিনি শুধু এই কথাই বলেন নি যে সমতা স্থাপনের জন্যে তাদের হত্যা করে তিনি ইয়োমুদদের ইচ্ছার সমানাধিকারকে স্বীকার করেছেন,—তাদের অপমান করার জন্যে এতটা নিষ্ঠুর তিনি হতে পারেন না। পুনরায় দেখা যাচ্ছে এই বিরোধে মনোনীত ব্যক্তিই স্থির করেন কোনটা অন্ধ বিশ্বাস, কোনটা কুসংস্কার, কোনটা নৃশংসতা আর কোনটা চরিত্রগত বিকৃতি এবং সমতা স্থাপনের জন্যে কখন জবরদস্তি চালানো ও পদানত করা প্রয়োজন। এঁরাই দাবি করেন যে সত্য ও বিজ্ঞান অনুসারে তাঁরা চলেন; সুতরাং এঁরাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার দার্শনিক। সুতরাং এখন মানবতার অর্থ দাঁড়ালো বল-প্রয়োগের দ্বারা সমতা স্থাপন; আর দমন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছার সমানাধিকার প্রথম ইচ্ছা স্বীকার করে নেয়। এটা পিছুহটার তৃতীয় দৃষ্টান্ত—যা ইতিমধ্যেই অপমানজনক পলায়নে পর্যবসিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিরোধী ইচ্ছার সমানাধিকার রয়েছে বলপ্রয়োগের দ্বারা সমতা স্থাপনের মধ্যে—এই কথাটা হেগেলীয় তত্ত্বের বিকৃতিমাত্র, যাতে বলা হয়েছে যে শাস্তি পাবার অধিকার রয়েছে অপরাধীর:

> 'শাস্তি পাওয়াটা অপরাধীর অধিকার বলে মনে করা হয়, কাজেই শাস্তি পেলে সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মানই পায়। (Philosophy of Right, পৃ ১০০, টীকা)।

এই বলেই আমরা আলোচনা শেষ করতে পারি। হের ড্যুরিং স্বতঃসিদ্ধভাবে সমতাকে, তাঁর সাধারণ মানবিক সার্বভৌমত্বকে এবং এই ধরনের আরও কিছুকে, যেভাবে টুকরো টুকরো করে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁকে অনুসরণ করা অনাবশ্যক; তাঁর দুটি পুরুষকে দিয়ে তিনি কিভাবে একটা সমাজ দাঁড় করিয়েছেন সেটা লক্ষ্য করাও অনাবশ্যক; রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যে তাঁর তৃতীয় একজন ব্যক্তির প্রয়োজন। কেননা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ছাড়া সংখ্যাধিক্যের দ্বারা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় এবং এইগুলি ছাড়া আর একইভাবে সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর শাসন ছাড়া কোনো রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না; এবং তারপর কিভাবে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে নিজেকে নিয়ে যান, যেখানে তিনি ভবিষ্যতের সৌখিন সামাজিক রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করেন, যেখানে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁকে দেখার সম্মান আমাদের জুটবে—এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা শোনার আর দরকার নেই। যতক্ষণ দুটি ইচ্ছা আসলে কোনো কিছুই

ইচ্ছা করে না, ততক্ষণই ইচ্ছা দুটি সমান হতে পারে—এটা আমরা ভাল করেই লক্ষ্য করেছি ; যখনই মানুষের ইচ্ছা হিসাবে তাদের অস্তিত্ব থাকে না, এবং আসল ব্যক্তিগত ইচ্ছাতে পরিণত হয়, রূপান্তরিত হয় দুটি বাস্তব জনগণের ইচ্ছায়, তখনই সমতার অবসান ঘটে ; একদিকে, শৈশব, পাগলামি, তথাকথিত পাশবিকতা, অনুমিত কুসংস্কার, কল্পিত অক্ষমতা এবং অন্যদিকে, উদ্ভট মানবতাবোধ আর সত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান—এসব বিষয়ও আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি ;—অতএব দুটি ইচ্ছার গুণগত এবং সেগুলির সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধির মধ্যে যা কিছু প্রভেদ—এক ধরনের ব্যবহারিক বৈষম্যের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে—যে-বৈষম্য অন্যজনকে পদানত করতে সক্ষম হয়। হের ড্যুরিং নিজেই যখন তাঁর সমতার ইমারতকে আগাগোড়া ধ্বসিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর কাছে আমরা আর কী আশা করতে পারি ?

কিন্তু যদিও আমরা সমতা সম্পর্কিত আলোচনাতে হের ড্যুরিং-এর ওপর-ওপর, তালগোল পাকানো ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছি, তার থেকে এটা মনে করা ঠিক নয় যে আমরা ঐ ধারণাটির সঙ্গেই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি—যে ধারণাটি রুশোর দৌলতে তাত্ত্বিক এবং মহান ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ও তার পরে প্রায়োগিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে এবং আজও প্রায় প্রতিটি দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রচার-কার্যে যথেষ্ট কাজে লাগে। এর বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, সেটা প্রলেতারীয় আন্দোলনের পক্ষেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সকল মানুষের মধ্যেই একটা সাধারণ উপাদান আছে এবং সেই অর্থে সকল মানুষই সমান—এটা খুব পুরানো ধারণা, কিন্তু সাম্যের জন্যে আজকের দাবি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ; সেটা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষে মানুষে সাম্য, যার উদ্ভব ঘটছে মানুষী অস্তিত্বের সর্বজনীন উপাদান থেকে, সমস্ত মানুষের জন্যে, কিংবা অন্ততপক্ষে কোনো রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক অথবা কোনো সমাজের সমস্ত সদস্যের জন্যে সমান রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার দাবি থেকে। আপেক্ষিক সাম্যের ধারণা থেকে রাষ্ট্র ও সমাজে মানুষের সমান অধিকার থাকবে—এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, এমনকি এই সিদ্ধান্তটি স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রতিভাত হতে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, আদিম মানবগোষ্ঠীর কাছে সকলের সমানাধিকারটা বড়জোর ঐ গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল ; ক্রীতদাস

ও গোষ্ঠীবহির্ভূত মানুষরা স্বভাবতই এই সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। গ্রীক ও রোমান পুরুষদের মধ্যে সমানাধিকারের চাইতে অসম অধিকারের প্রাধান্যই ছিল বেশি। গ্রীক ও বর্বরদের, স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাসদের, নাগরিক ও যাযাবরদের, রোমান নাগরিক ও অধীন প্রজাদের মধ্যে (সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করলে) সমান রাজনৈতিক মর্যাদা বজায় থাকবে— এটা প্রাচীনদের কাছে স্বভাবতই বাতুলতা বলে মনে হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যে এইসব বিভেদ ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে, কেবল রয়ে যায় স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাসদের প্রভেদ এবং এইভাবে তাদের মধ্যে, অন্তত স্বাধীন মানুষদের মধ্যে সমানাধিকার বজায় থাকে, যার ভিত্তিতে রচিত হয় রোমান আইন—আমরা যাকে জানি ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক আইন হিসাবে। কিন্তু যতদিন স্বাধীন মানুষ ও দাসদের প্রভেদজনিত বৈপরীত্য বজায় ছিল, ততদিন সমগ্র মানবজাতির সমতা বলে আইনগত কোনো সিদ্ধান্তে আসার কথা উঠতেই পারে নি; উত্তর আমেরিকান ইউনিয়নের যেসব দাস মালিকানাধীন রাষ্ট্রে দাসদের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়, সম্প্রতিকালে সেখানেও আমরা এটা লক্ষ্য করেছি।

খ্রিস্ট ধর্ম শুধু একটা বিষয়ই জানত যে সব মানুষই সমান: সবাই আদি পাপের মধ্যে সমানভাবে জন্মগ্রহণ করেছে; দাস ও নিপীড়িতদের ধর্ম হিসাবে এর চরিত্র ঐ বক্তব্যের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। এটা ছাড়া বড়জোর বিশেষ বাছাই করা লোকদের মধ্যে সমতা খ্রিস্ট ধর্ম মেনে নিয়েছিল, যা অবশ্য একমাত্র গোড়ার দিকেই বলা হতো। সর্বজনীন মালিকানার যে-চিহ্ন এই নতুন ধর্মের প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ হচ্ছে সমাজচ্যুতদের সংহতি, কোনো আসল সমতার ধারণা নয়। যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রভেদ কায়েম হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জায়মান খ্রিস্টীয় সমতার অবসান ঘটে।

পশ্চিম ইউরোপ জার্মানদের কবলিত হওয়ার পর বহু শতাব্দীর জন্যে সাম্যের ধ্যানধারণা অবলুপ্ত হয়, এমন একটা জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা ক্রমশ গড়ে ওঠে যা ইতিপূর্বে কখনও ছিল না। কিন্তু একই সঙ্গে এই অভিযান পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপকে ইতিহাসের বিকাশ ধারার মধ্যে নিয়ে আসে, এই প্রথম একটা ঘন সন্নিবিষ্ট এলাকা গড়ে তোলে; এবং এই এলাকার মধ্যেই এই প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হয়, যারা পরস্পরকে

প্রভাবিত করে এবং পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এইভাবে এই অভিযান এমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের সমানাধিকার ও মানবিক অধিকারের প্রশ্ন পরবর্তীকালে উত্থাপন করা সম্ভব হয়।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের গর্ভে এমন এক শ্রেণীর ভ্রূণাবস্থা দেখা দেয়, যারা পরবর্তী বিকাশের ধারায় সমানাধিকারের আধুনিক দাবির পতাকাবাহী হয়ে উঠবে: সেই শ্রেণী হলো বুর্জোয়ারা। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে হলেও, বুর্জোয়ারা প্রধানত হস্তশিল্প এবং সামন্ত-সমাজের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়কে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে নিয়ে যায়; এই সময়ে, পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে সমুদ্রপারের মহাদেশ ও দেশগুলির আবিষ্কার তাদের সামনে ব্যাপক পরিধিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ইউরোপের চৌহদ্দির বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য ইতিপূর্বে শুধু ইতালি ও লেভান্ত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা এই সময়ে আমেরিকা ও ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে এবং গুরুত্বের দিক থেকে সেটা শীঘ্রই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে অতিক্রম করে যায়। আমেরিকার সোনা ও রূপা ইউরোপের বাজার ছেয়ে ফেলে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি ফাটল, ছিদ্র ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন একটা ভাঙনের শক্তি হয়ে ওঠে। হস্তশিল্প আর ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মেটাতে পারে না; বেশির ভাগ অগ্রসর দেশে এর বদলে গড়ে উঠতে থাকে কারখানা।

কিন্তু সমাজের আর্থনীতিক জীবনে এই বিরাট বিপ্লবের পাশাপাশি রাজনৈতিক কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে থাকে সামন্ততান্ত্রিক অথচ সমাজ ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠতে থাকে বুর্জোয়া চরিত্রসম্পন্ন। বড়ো আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, চালাতে হলে স্বাধীন পণ্য-মালিকদের প্রয়োজন, যারা তাদের গতিবিধির ক্ষেত্রে অবাধ ও সমানাধিকার প্রাপ্ত; যারা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্ততপক্ষে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে, সমান আইনের ভিত্তিতে পণ্য বিনিময় করতে পারবে। হস্তশিল্প থেকে কারখানা-ভিত্তিক উৎপাদনে যেতে গেলে স্বাধীন শ্রমিকের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন—যারা একদিকে, গিল্ড-এর বাঁধন থেকে মুক্ত, অন্যদিকে, শ্রমের উপকরণ থেকেও মুক্ত, ইচ্ছামতো নিজেদের শ্রম-শক্তিকে ব্যবহারে সক্ষম, যারা শ্রম-শক্তি বিক্রির শর্তে

কারখানা মালিকের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যাদের মালিকের সঙ্গে সমান অধিকার থাকে। "শেষ অবধি প্রয়োজন হচ্ছে মনুষ্য শ্রমের মধ্যে সমতা ও সমান মর্যাদা, কেননা এটা মনুষ্য শ্রম,"[৫৮] আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল্যমানের মধ্যে এর একটা অচেতন কিন্তু স্পষ্টতম রূপ পরিস্ফুট হয়েছে—যে-মূল্যমানের তত্ত্ব অনুযায়ী একটা পণ্যের মূল্য পরিমাপ করা হয় পণ্যটির অন্তর্নিহিত সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারা।*

কিন্তু যেখানে আর্থনীতিক সম্পর্কগুলির জন্যে প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা ও সমানাধিকার, সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গিল্ড-এর বিধিনিষেধ ও বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে এগুলির বিরোধিতা করে। স্থানীয় সুযোগসুবিধাগুলি, বৈষম্যমূলক কর ও নানারকম বিশেষ আইন শুধুমাত্র বিদেশী ও উপনিবেশে বসবাসকারীদের বাণিজ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছিল না, পরন্তু প্রায়শই সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সর্বপ্রকার জাতির পক্ষেই মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছিল; সর্বক্ষেত্রেই ও প্রতিবারই গিল্ড-এর বিশেষ সুবিধাগুলি কারখানা বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বুর্জোয়া প্রতিযোগীদের সামনে পথ কোথাও পরিষ্কার হচ্ছিল না এবং সমান সুযোগ মিলছিল না—অথচ এটাই ছিল প্রধান ও ক্রমবর্ধমান দাবি।

সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তির এবং সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমানাধিকার স্থাপনের দাবি সমাজের আর্থনীতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাবিগুলি ব্যাপকতর হয়ে উঠতে বাধ্য। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের স্বার্থে ঐসব দাবি উত্থাপিত হলেও, সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের জন্যে ঐ একই সমানাধিকারের দাবি উত্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়; কৃষক সম্প্রদায় তাদের দাসত্ববন্ধনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, কমবেশি মাত্রায়, শ্রম-সময়ের বেশি অংশটাই সামন্তপ্রভুদের কাছে বিনা খেসারতেই নিয়োগ করতে বাধ্য হতো; উপরন্তু নানা রকমের অজস্র কর তাদের দিতে হতো সামন্ত প্রভু ও রাষ্ট্রকে। অন্যদিকে, সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুযোগসুবিধা দূর করা, ভূস্বামীদের করছাড় প্রথার বিলোপসাধন এবং পৃথক পৃথক এস্টেটের রাজনৈতিক সুবিধাগুলি বিলোপ করার দাবি উত্থাপিত হওয়াও অনিবার্য ছিল।

---

* মার্কসই প্রথম তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে, বুর্জোয়া সমাজের আর্থনীতিক অবস্থা থেকে সাম্যের আধুনিক ধারণা কী করে এসেছে তা দেখান। (এঙ্গেলসের টীকা)।

আর যেহেতু জনগণ রোমান সাম্রাজ্যের মতো কোনো সাম্রাজ্যে বসবাস করছিল না, তারা ছিল পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী, যে রাষ্ট্রগুলি ছিল পরস্পরের সঙ্গে সমান সমান এবং মোটামুটি একই বুর্জোয়া বিকাশের স্তরে অবস্থিত, তাই এটা স্বাভাবিক ছিল যে সমতার দাবি রাষ্ট্রবিশেষের সীমা অতিক্রম করে একটা সাধারণ চরিত্র অর্জন করবে এবং স্বাধীনতা ও সমতা ঘোষিত হবে মানবাধিকার হিসাবে। আর এই মানবাধিকারগুলি বিশেষ করে বুর্জোয়া চরিত্রের, যা আমেরিকান সংবিধানে প্রথম স্বীকৃতি পায়; অথচ একই সঙ্গে আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বও বজায় থাকে: শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধাগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয় আর বর্ণগত সুবিধাগুলি আইনের মঞ্জুরি পায়।

তবে বুর্জোয়ারা যখন সামন্ততন্ত্রের অধীনে বারগার অবস্থা থেকে মুক্তি পায়, যখন মধ্যযুগের এই গোষ্ঠীটি একটা আধুনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়, তখন থেকে সব সময়েই বুর্জোয়াদের পাশাপাশি অবধারিতভাবে গড়ে উঠতে থাকে প্রলেতারিয়েত। আর ঠিক একইভাবে সমতার জন্যে বুর্জোয়াদের দাবির সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সমতার দাবিও উত্থাপিত হয়। ঠিক যখন থেকে শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধাগুলি বিলোপ করার জন্যে বুর্জোয়াদের দাবিগুলি উত্থাপিত হয়েছে, তখন থেকেই খোদ শ্রেণীগুলিকেই বিলুপ্ত করার জন্যে প্রলেতারিয়েতের দাবিও দেখা দিয়েছে—প্রথমে এটা দেখা দেয় ধর্মীয় চেহারায়, যার ঝোঁক ছিল খ্রিস্ট ধর্মের আদি রূপের দিকে এবং পরে বুর্জোয়াদের সমানাধিকারের তত্ত্ব থেকে এটা সমর্থন সংগ্রহ করতে থাকে। প্রলেতারিয়েত তখন বুর্জোয়াদের এই কথাগুলিকে বিশ্বাস করে: কেবল আপাতদৃষ্টিতে সমতা থাকলেই চলবে না, কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করলেই চলবে না, পরন্তু তাকে বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। তাকে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে হবে। আর বিশেষ করে যেহেতু ফরাসি বুর্জোয়ারা তাদের মহান বিপ্লব থেকে নাগরিকদের সাম্যের দাবি সামনে এনেছে, তেমনি ফরাসি প্রলেতারিয়েতও সমান তালে সামাজিক ও আর্থনীতিক সাম্যের দাবি তুলেছে এবং বিশেষ করে ফরাসি প্রলেতারিয়েতের রণধ্বনি হয়ে উঠেছে সাম্যের দাবি।

কাজে কাজেই ফরাসি প্রলেতারিয়েত যখন সাম্যের দাবি তোলে, তখন তার দুটো অর্থ থাকে। হয় এটা নগ্ন সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ধনী ও

গরীবের, সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের, ভূরিভোজী আর ক্ষুধাতুরদের মধ্যে বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া; যেমনটি ঘটেছিল একেবারে গোড়ায়—যেমন কৃষক যুদ্ধে। এইভাবে দেখলে এটা হচ্ছে সহজাত বিপ্লবী প্রবণতার একটা সহজ-সরল অভিব্যক্তি এবং একমাত্র এর মধ্যেই এর যাকিছু যৌক্তিকতা। অথবা অন্যদিকে, এই দাবি উঠেছে সমতার জন্যে বুর্জোয়াদের দাবির প্রতিক্রিয়ারূপে; তবে এই দাবি বুর্জোয়াদের দাবির চাইতে কমবেশি সঠিক ও আরও সুদূরপ্রসারী এবং পুঁজিপতিদের নিজেদের বক্তব্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জাগ্রত করার জন্যে বিক্ষোভ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে; আর এই দাবির উত্থান-পতন বুর্জোয়া সাম্যের ধারণার সঙ্গে একতালে বাঁধা। উভয় ক্ষেত্রেই সাম্যের জন্যে প্রলেতারিয়েতের দাবির আসল মর্মবস্তু হচ্ছে **শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধন**। সাম্যের জন্যে এর চেয়ে বেশি যা কিছু দাবি, সেটা স্বভাবতই অবাস্তবতার পর্যায়ে পড়ে। আমরা এর উদাহরণ দিয়েছি এবং যখন আমরা হের ড্যুরিং-এর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কাল্পনিক চিন্তাধারা বিচার করব, তখন এ সম্বন্ধে আরও অনেক বাড়তি উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সুতরাং সমতার ধারণা, বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়, দুই চেহারাতেই দেখা দিয়েছে ইতিহাসের ধারার মধ্যে দিয়ে। এদের উদ্ভবের পিছনে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা ছিল, ঐ অবস্থারও আবার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। কাজেই এটা আর যাই হোক না কেন, কিছুতেই চিরন্তন সত্য নয়। আর আজ যদি জনসাধারণ এটাকে যেকোনো অর্থেই মেনে নিয়ে থাকে—মার্কসের ভাষায় যদি এটা 'ইতিমধ্যেই বদ্ধমূল প্রচলিত সংস্কারে পরিণত হয়ে থাকে',[৯] তাহলেও সেটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের পর্যায়ে পড়ে না; এটা সেই আঠারো শতকের ধারণাগুলির সাধারণ বিচ্ছুরণ মাত্র এবং তারই ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতা। অতএব হের ড্যুরিং যদি বেশি আবোলতাবোল বকে তাঁর দুই বিখ্যাত পুরুষের সাম্যভিত্তিক আর্থনীতিক সম্পর্ককে চালিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে তার কারণ হচ্ছে প্রচলিত সংস্কারের কাছে এটা বেশ স্বাভাবিক বলেই প্রতিভাত হয়েছে। হের ড্যুরিং তাঁর দর্শনকে **প্রাকৃতিক** আখ্যা দিয়েছেন, কেননা যেসব ঘটনা তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছে, শুধু তা থেকেই এটা নির্গত। কিন্তু সেগুলি কেন তাঁর কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, এই প্রশ্ন তিনি অবশ্য করেন নি।

এগারো

নৈতিকতা ও নিয়মবিধি, স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা

> 'এখানে রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলির ভিত্তি হচ্ছে সুগভীর বিশেষ ধরনের গবেষণা ···এই তথ্য থেকে আমাদের এগুতে হবে যে, আমরা এখানে পাচ্ছি··· আইন ও রাজনীতির সিদ্ধান্তগুলি আর তারই সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা। আমার প্রাথমিক বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ছিল ব্যবহারশাস্ত্র (jurisprudence) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিন বছর অধ্যয়নের সময় আমি এই কাজে ব্যয় করেছি তাই নয়, পরন্তু আদালতে আরও তিন বছর প্র্যাকটিস্ (আইন ব্যবসা) করার সময়ে আমি এটার বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তুর আরও গভীরে প্রবেশ করার জন্য এ সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়েই গেছি ; এবং নিশ্চয়ই ব্যক্তি-মানুষের আইনগত সম্পর্কের এবং তজ্জনিত আইনগত যা কিছু অপ্রতুলতা রয়েছে, তাকে একটা আস্থার সঙ্গে উপস্থিত করতে পারতাম না, যদি এই বিষয়ের যাবতীয় দুর্বলতা ও সবলতার দিকগুলি আমার জানা না থাকতো।'

একজন মানুষ যিনি নিজের সম্পর্কে এই রকমের সাফাই গাইতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই একেবারে শুরু থেকেই অন্যদের কাছে আস্থাভাজন হওয়ার কথা, বিশেষ করে—

> 'হের মার্কসের স্বীকৃত একটা অবহেলিত আইনগত পড়াশুনার তুলনায় তো বটেই।'

আর এটা লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না যে এতটা জোর'লো

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আইনী সম্পর্কগুলির সমালোচনা আমাদের শুধু এইটুকু বলেই দিয়ে ক্ষান্ত হয় যে,

> 'ব্যবহারশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চরিত্র বেশিদূর এগোয় নি, দেওয়ানী আইন-কানুন অন্যায্য কারণ শক্তির পরে ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে এ মেনে নেয় এবং ফৌজদারি আইনের স্বাভাবিক ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশোধ—'

এই ধরনের বক্তব্যের মোদ্দা যেটুকু নতুন কথা সেটা হলো একে 'স্বাভাবিক ভিত্তি'র মোড়কে একটা রহস্যজনক চেহারা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি ঐ তিনটি বিখ্যাত পুরুষের কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যার মধ্যে একজন অন্যদের ক্ষমতার জোরে দাবিয়ে রাখে, যেটা হের ড্যুরিং বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে খোঁজ করে দেখেছেন যে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষটি হিংসার ও অন্যকে দমন করার ব্যাপারটা প্রথম চালু করেছে কিনা।

যাই হোক আমাদের আত্মবিশ্বাসী ব্যবহারজীবীর বিশেষভাবে খুঁটিয়ে পড়াশুনা এবং তারপর তিন বছর ধরে আদালতে প্র্যাকটিস্ করা থেকে তাঁর যে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে, তার আরও একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক।

> হের ড্যুরিং লাসালে সম্পর্কে আমাদের বলেছেন যে, একটা ক্যাসবাক্স চুরি করতে প্ররোচিত করার জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু কোনোভাবেই আদালতের দ্বারা তাঁকে কোনো শাস্তি দেওয়াটা রেকর্ড করা সম্ভব হলো না। কারণ প্রমাণাভাবে তথাকথিত মুক্তিদান তখনও সম্ভব ছিল,—এটা যেন অর্ধেক মুক্তিদান।

লাসালের যে মামলার এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হয় কোলোন[৬০] শহরের বিচারালয়ে যেখানে সারা রাইন প্রদেশের মতোই ফরাসি ফৌজদারি আইনের চল ছিল। প্রুশিয়ার ল্যাণ্ডরেখ্‌ট (প্রুশিয়ার আইন) একমাত্র রাজনৈতিক অপরাধের ও অন্যান্য অপরাধের জন্য ব্যতিক্রম হিসাবেই প্রয়োজিত হতো, কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৮ সালেই এর বিশেষ অবস্থাতে কাম্পহাউসেনের দ্বারা এটা তুলে দেওয়া হলো। প্রুশিয়ান ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর সংজ্ঞা অনুসারে অপরাধ উস্কে দেওয়ার জন্য যে ঢিলেঢালা আইনের ধারা চালু ছিল, অপরাধ করার জন্য প্রচেষ্টার কথা তো বাদই দিলাম,

সে সম্পর্কে ফরাসি আইনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফরাসি আইনে কার্যত হাতেনাতে অপরাধ করার জন্য প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দিলে এবং 'কিছু দাতব্য করে, কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কর্তৃত্বের অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে' (কোডে পেনাল ৬০ ধারা)[৬১] যদি অপরাধ করানো হয় তাহলে সেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। প্রুশিয়ার ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা এর মধ্যে ছিল, হের ড্যুরিং-এর মতোই তীক্ষ্ণভাবে বর্ণিত ফরাসি কোডের সঙ্গে ভাসাভাসা অস্পষ্ট ল্যাণ্ডরেখ্‌টের আসল প্রভেদটুকু ধরতে পারে নি এবং লাসালেকে পক্ষপাতদুষ্ট মামলায় জড়িয়ে ফেলে ও বিশ্রীভাবে পরাজিত হয়। যিনি আজকের ফরাসি আইন একেবারেই জানেন না, কেবলমাত্র সেইরকম একজন মানুষই জোর করে বলতে পারেন যে ফরাসি ফৌজদারি আইনের ধারা সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে প্রুশিয়ার ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর এই অর্ধ মুক্তিদান অনুমোদন করতে পারে, ফরাসি ফৌজদারি আইনে কাউকে হয় দোষী নয় নির্দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, এর মাঝামাঝি কিছু নয়।

অতএব আমাদের বলতেই হবে যে হের ড্যুরিং লাসালের বিরুদ্ধে 'এই ধরনের চমৎকার ঐতিহাসিক বর্ণনা' দিতে পারতেন না, যদি তাঁর কাছে নেপোলিয়নের কোড[৬২] থাকতো। অতএব একটা তথ্য হিসাবে আমরা বলবো যে আজকের ফরাসি আইন একমাত্র আধুনিক দেওয়ানি বিধি যেটা মহান ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক সাফল্যের পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাকে আইনের কাঠামোতে রূপ দিয়েছে, যেটা হের ড্যুরিং-এর কাছে একেবারে অজানা।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জুরির বিচারের যে পদ্ধতি ফরাসি মডেল অনুযায়ী সারা ইউরোপে গৃহীত হয়, তার সমালোচনায় আমাদের শেখানো হয়েছে :

> 'হ্যাঁ, এই ধারণার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হওয়া সম্ভব যে, (ইতিহাসে যা নজিরবিহীন নয়) যেখানে মতভেদ দেখা দেয়, সেখানে অপরাধ সাব্যস্ত করা একটা নিখুঁত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়,...এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর বৌদ্ধিক চিন্তা-পদ্ধতি কিন্তু পরম্পরাগতভাবে যে কাঠামো চলে আসছে, তার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, কেননা তাদের পক্ষে এটা খুবই ভালো—এটা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি।'

পুনরায় দেখা যাচ্ছে হের ড্যুরিং জানেন না যে ইংলণ্ডের কমন ল-তে অর্থাৎ যে অলিখিত আইন স্মরণাতীতকাল ধরে, অন্ততপক্ষে চতুর্দশ শতক থেকে চলে আসছে, তাতে কেবলমাত্র ফৌজদারি মামলায় নয়, দেওয়ানি মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রেও জুরিদের মতৈক্য অপরিহার্য ছিল। তাহলে গুরুত্বব্যঞ্জক ও প্রগাঢ়তম চিন্তা-পদ্ধতি, যা হের" ড্যুরিং-এর মতে আজকের দুনিয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী সেটার ইংল্যাণ্ডে আইনগত সম্মতি ছিল মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলি থেকেই এবং ইংল্যাণ্ড থেকে তাকে আয়ারল্যাণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংল্যাণ্ডের সকল উপনিবেশে আনা হয়েছিল। অথচ অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিশেষজ্ঞের মতো পড়াশুনা করেও হের ড্যুরিং-এর কাছে এসবের ক্ষীণতম রেশও পৌঁছায় নি! সুতরাং যে এলাকাতে জুরিদের মতৈক্যের ভিত্তিতে রায় দেবার প্রয়োজন ছিল, সেটা প্রুশিয়ার ল্যাণ্ডরেখ্ট-এর চাইতে শুধু বৃহত্তরই নয়, পরন্তু জুরিরা যেসব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইসব ক্ষেত্রের সমগ্র এলাকার চাইতেও ব্যাপকতর। শুধু আধুনিক ফরাসি আইনই যে হের ড্যুরিং-এর একেবারে অজানা তাই নয়, তিনি জার্মানির আইন সম্বন্ধেও সমানভাবে অজ্ঞ; যেটা বর্তমান কাল পর্যন্ত রোমান কর্তৃত্ব ব্যতিরেকেই গড়ে উঠেছে এবং সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে যে ইংরেজ আইন, তিনি সেটারও কিছু জানেন না। আর কেন হের ড্যুরিং এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? কারণ:

> 'জার্মান ভূমিতে ক্লাসিক্যাল রোমান আইনজ্ঞরা যে বিশুদ্ধ ধারণার প্রবর্তন করেছেন, তার কাছে' ইংরেজ মার্কা বিচার সংক্রান্ত চিন্তাধারাটি কোনোভাবেই দাঁড়াতে পারে না—

এটাই বলতে চান হের ড্যুরিং। তিনি আরও বলছেন:

> 'আমাদের ভাষার স্বাভাবিক গঠন বিন্যাসের তুলনায়, ইংরেজি-ভাষী জগতের লোকেরা কি ধরনের জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করে?'

এর উত্তরে আমরা স্পিনোজার ভাষায় বলতে পারি 'অজ্ঞতা কোনো যুক্তি হতে পারে না'।[৬৩]

তিন বছর ধরে, তিনি একাগ্রচিত্তে করপাস জুরিস-এর[৬৪] বিশেষজ্ঞের মতো তাত্ত্বিক অনুশীলন চালিয়েছেন এবং আরও তিন বছর অভিজাত প্রুশিয়ান ল্যাণ্ডরেখ্ট-এ প্রায়োগিক দিক থেকে সেটার চর্চা করেছেন—এসব সত্ত্বেও হের ড্যুরিং সম্পর্কে আমরা এছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসছে পারছি

না। পুরাতো প্রুশিয়াতে একজন জেলা জজ অথবা আইনজীবীর পক্ষে এই জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ ও যথেষ্ট। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন সারা দুনিয়ার ও সর্বকালের জন্যে আইনের দর্শন প্রণয়নের দায়িত্ব নেন, তখন অন্তত তাঁর ফরাসি, ইংরেজ ও আমেরিকান আইনব্যবস্থার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা উচিত ; এই জাতিগুলি, জার্মানির একটা ক্ষুদ্র কোণে যেখানে প্রুশিয়ান ল্যাণ্ড-রেখ্‌ট প্রচলিত, তার তুলনায় ইতিহাসে একেবারে ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

> 'যেসব স্থানীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় আইন যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন দিকে পরস্পরের বিপরীতমুখে ধাবিত হয়, কখনও সাধারণ আইন হিসাবে, কখনও লিখিত আইনরূপে, প্রায়শই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে বিধির মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলে—এই বিশৃঙ্খলা ও বিরোধের ছক থেকে,—যেখানে সাধারণ নীতিগুলির লঙ্ঘন করে বিশেষ নীতিগুলি, কখনও বিশেষ নীতিগুলি লঙ্ঘন করে সাধারণ নীতিকে—সেখানে ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো ধারণা কেউ অর্জন করতে সক্ষম হবে না।'

কিন্তু এই বিভ্রান্তি কোথায় রয়েছে? পুনরায় দেখা যাচ্ছে বিভ্রান্তি রয়েছে সেখানে—যেখানে প্রুশিয়ান ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর প্রভাব বিদ্যমান, যেখানে এই ল্যাণ্ডরেখ্‌টের পাশাপাশি, তার ওপরে অথবা নীচে স্থানীয় ও প্রাদেশিক বিধিগুলি রয়েছে, যেখানে রয়েছে আপেক্ষিক বৈধতাসম্পন্ন সাধারণ আইন ও অন্যান্য আজেবাজে জিনিস এবং এগুলির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্যে পেশাদার আইনজীবীরা আর্তনাদ করছেন এবং তার প্রতিধ্বনি করছেন হের ড্যুরিং এত সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁকে তাঁর প্রিয় প্রুশিয়ার বাইরে যেতে হবে না—তিনি রাইন অবধি এলেই বুঝে ফেলবেন যে গত সত্তর বছরে এইসবের আর অস্তিত্ব নেই। অন্য সভ্য দেশের কথা এক্ষেত্রে ওঠেই না, কেননা সেখানে এই মান্ধাতার আমলের অবস্থা বহুদিন আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও বলছেন :

> 'অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে কলেজিয়া কিংবা জনকর্তৃত্বমূলক অন্যান্য সংস্থার গোপন, সুতরাং পরিচয়হীন যৌথ সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব ঢেকে রাখা হয়, যার ফলে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আড়ালে পড়ে যায়।'

আর একটা অংশে বলা হচ্ছে :

'আমাদের আজকের অবস্থাতে যদি কেউ যৌথ সংস্থার মাধ্যমে কাজ করার অজুহাতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে ও ঢেকে রাখতে চায় তাহলে সেটাকে আশ্চর্যজনক ও অত্যন্ত কঠোর দাবি বলেই গণ্য করা হবে।'

সম্ভবত এই তথ্যটি হের ড্যুরিং-এর কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হবে যে ইংরেজ আইনের আওতায় বিচারকমণ্ডলীর প্রতিটি সদস্যকে প্রকাশ্য আদালতে আলাদা আলাদাভাবে রায় দিতে হয় এবং ঐ রায়ের আইনগত ভিত্তিটিও বিবৃত করতে হয় ; যেসব প্রশাসনিক যৌথ সংস্থা নির্বাচিত নয় এবং কোনো কাজকর্ম পরিচালনা করে না কিংবা প্রকাশ্যে ভোট দেয় না—সেগুলি প্রধানত প্রুশীয় সংস্থা আর বেশির ভাগ দেশে তাদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ; সুতরাং একমাত্র প্রুশিয়াতেই তাঁর দাবি আশ্চর্যজনক ও অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হতে পারে।

অনুরূপভাবে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও মৃতদেহ সমাহিত করার বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ—প্রধান প্রধান সভ্য দেশগুলির মধ্যে একমাত্র প্রুশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সিভিল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানেও আর প্রযোজ্য নয়।[৬৫] হের ড্যুরিং 'শৌখিন সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থার দ্বারাই একমাত্র যা করতে পারেন, বিসমার্ক কিন্তু সেটাই ইতিমধ্যে সাধারণ আইনের মারফত করে দিয়েছেন।

'আইনজীবীদের নিজেদের পেশাগত কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকার জন্যে তাঁর নালিশ' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য ; আর এই নালিশকে 'প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের' কাজকর্মের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এটার বৈশিষ্ট্য প্রুশীয় ধরনের শোক বা পরিতাপের মতো। আর ইহুদিদের প্রতি তাঁর ঘৃণা, যেটা তিনি একটা হাস্যকর বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যান এবং যে কোনো অবস্থাতেই তাকে প্রকাশ করে ফেলেন—সেটাই যদি বিশেষ করে প্রুশীয় ধরনের নাও হয়, তা হলেও এল্‌ব নদীর পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। ঐ একই বাস্তবতার দার্শনিক, যাঁর সকল রকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতি সর্বাত্মক ঘৃণা আছে, তিনি নিজেই এতটা ব্যক্তিগত খেয়ালে ডুবে আছেন যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে চালু যে প্রতিকূল ধারণা, যেটা মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি থেকে এসেছে, তাকে তিনি 'স্বাভাবিক যুক্তিভিত্তিক'

'স্বাভাবিক বিচার' বলে অভিহিত করেন এবং গগনস্পর্শী দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে 'সমাজতন্ত্রই একমাত্র শক্তি যা খানিকটা জোরালো ইহুদি মিশ্রণ যুক্ত জনপ্রিয় ধরনের বিরোধিতা করতে সক্ষম' (জোরালো ইহুদি মিশ্রণ! কী অদ্ভুত 'স্বাভাবিক' জার্মান!)।

যথেষ্ট হয়েছে। পুরানো প্রুশিয়ার একজন সাধারণ ব্যবহারজীবীর যতটুকু ব্যবসায়িক জ্ঞান থাকে তারই ভিত্তিতে বড়জোর এই ধরনের বাগাড়ম্বর-পূর্ণ হামবড়াই করা যায়। আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে স্তরে হের ড্যুরিং সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে ক্রমাগত মতামত প্রকাশ করে থাকেন, সেটা প্রুশিয়ান ল্যাণ্ডরেখ্‌ট যেখানে আধিপত্য করে তার সঙ্গেই 'খাপ খায়'। যে রোমান আইনের সঙ্গে প্রতিটি আইনের ছাত্রেরই, এমনকি ইংলণ্ডেও, যথেষ্ট পরিচয় আছে, সেই আইন ছাড়া তাঁর আইনের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে একমাত্র প্রুশিয়া'র ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উন্নত পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনের এই ধারাগুলি এমন একটি জার্মান ভাষাতে লেখা হয়েছে যাতে হের ড্যুরিং শিক্ষিত হয়েছেন বলে মনে হয়; নৈতিকতার পালিশ, আইনগত ধোঁয়াটে ভাব ও অসংলগ্নতা এবং বেত মেরে দৈহিক পীড়ন করার যে ব্যবস্থা রয়েছে—তার সবটাই প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের। এর বাইরে যা কিছু আছে—আধুনিক সিভিল ফরাসি আইন এবং ইংরেজ আইনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকারী বিশেষ ব্যবস্থাগুলি, যেটা ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যত্র অজ্ঞাত—হের ড্যুরিং মনে করেন এ-সবই অশুভ। যে দর্শন 'কোনো আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত দিগন্তের অস্তিত্ব মানে না, তার বদলে তার শক্তিগুলি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে বাইরের ও অন্তর-প্রকৃতির স্বর্গমর্তকে প্রকাশ করে দেয়'—তার আসল দিগন্ত হচ্ছে: পুরানো প্রুশিয়ার[৬৬] ছয়টি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের সীমানা, উপরন্তু ভূমির অন্যান্য কিছু অংশ, যেখানে ঐ অভিজাত ল্যাণ্ডরেখ্‌ট-এর চল আছে; আর এই দিগন্তের বাইরে ঐ স্বর্গের বা মর্তের, তাদের বাইরের বা অন্তরের প্রকৃতি কিছুকেই প্রকাশ করে না, কেবল বাকি দুনিয়াতে কী ঘটছে, সে সম্বন্ধে একটা স্থূল অজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছার, মানুষের মনোগত দায়িত্বের এবং নিয়মানু-বর্তিতা ও স্বাধীনতার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন বাদ দিয়ে নৈতিকতা ও আইনের আলোচনা করা যায় না। আর বাস্তবতার দর্শনেরও এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা নয়, দুটো সমাধান রয়েছে।

'স্বাধীনতা সংক্রান্ত সকল ভ্রান্ত তত্ত্ব বর্জন করতে একদিকে যৌক্তিক বিচার ও অন্যদিকে সহজাত প্রেরণার মধ্যেকার যে-সম্পর্ক, বলতে গেলে, এইগুলিকে একটা শক্তির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে, সেই সম্পর্কিত চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ধরনের গতিময়তার সম্বন্ধে মৌলিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং যে সমস্ত ঘটনা এখনও ঘটে নি সেগুলিকে আগে থেকে হিসাব করে এবং যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাধারণ চরিত্র ও গুরুত্ব বুঝে নিতে হবে। এই-ভাবে অন্তর্মুক্তির সম্বন্ধে অর্থহীন যেসব প্রতারণা হাজার হাজার বছর ধরে জনগণকে গেলানো হয়েছে এবং তারা সেগুলি চর্বণ করে চলেছে, এইসবকে একেবারে শুধু নির্মূলই করা যাবে না, তার পরিবর্তে ইতিবাচক কিছু দিতে হবে যাকে জীবনের বাস্তব নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা যাবে।'

এইভাবে দেখলে স্বাধীনতার তাৎপর্য হচ্ছে যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিহীন সহজাত প্রেরণার—ডান-বামের টানাপোড়েন এবং শক্তির এই বিপরীত টানাপোড়েনে আসলে গতিটা হয় তির্যক রেখাসম্পন্ন। তাহলে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ালো বিচারবুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির, যুক্তি ও যুক্তি-হীনতার মধ্যেকার গড়—জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়: প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার মাত্রা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'ব্যক্তিগত সমীকরণ'-এর সাহায্যে নির্ধারণযোগ্য।[৬] কিন্তু কয়েকটি পৃষ্ঠা পরেই আমরা দেখছি:

'স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব স্থির করি, যার অর্থ আমাদের সহজাত ও অর্জিত বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সচেতন উদ্দেশ্যগুলিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের সব উদ্দেশ্যই প্রাকৃতিক নিয়মের অনিবার্যতা নিয়ে কাজ করে, যদি সম্ভাব্য বিপরীত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত থাকে। কিন্তু ঠিক এই অপরিহার্য বাধ্যবাধকতাগুলির ওপর নির্ভর করেই আমরা নৈতিক মানদণ্ডগুলি প্রয়োগ করি।'

স্বাধীনতার এই দ্বিতীয় সংজ্ঞা, যার দ্বারা প্রথমটিকে একেবারে ধরাশায়ী করে দেওয়া হয়েছে, সেটা হেগেলীয় ধারণার চরম স্থূল রূপ ছাড়া কিছুই নয়। হেগেলই প্রথম স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সম্পর্কটিকে সঠিকভাবে

বিবৃত করেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতা হচ্ছে এই নিয়মানুবর্তিতার স্বীকৃতি। 'নিয়মানুবর্তিতা যে-পর্যন্ত উপলব্ধিতে না আসছে, সে-পর্যন্ত এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন।'[৬৮] প্রাকৃতিক নিয়মের কবল থেকে স্বাধীনতার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এইসব নিয়মের জ্ঞান এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই নিয়মগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজে লাগানোর অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা। বহিঃপ্রকৃতি এবং মানুষের দৈহিক ও মানসিক অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে যে-নিয়মগুলি— তাদের সবগুলির ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এই দুই ধরনের নিয়ম আমরা পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক করে রাখতে পারি একমাত্র চিন্তা-জগতে, বাস্তব ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং বিষয়বস্তুর জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছাড়া, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার আর কোনো অর্থ নেই। অতএব একটা নির্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে একজন মানুষের বিচার যতই স্বাধীন হবে, ততই এই বিচারের মর্মবস্তু নির্ধারিত হবে নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা; আর যেখানে অজ্ঞতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা বিভিন্ন ও স্वবিরোধী সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যদৃচ্ছভাবে কোনো একটিকে বেছে নেয়, সেখানে স্বভাবতই এটা দেখতে পাওয়া যায় যে সেটা স্বাধীন নয় এবং যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহলে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের এবং বহিঃপ্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যার ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান; সুতরাং স্বভাবতই এর উদ্ভব ঘটেছে ইতিহাসের ধারায়। যে মানুষরা প্রথম পশুজগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল, তারা সমস্ত মূলগত ব্যাপারে পশুদের মতোই পরাধীন ছিল। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিটি অগ্রগামী পদক্ষেপ তাদের স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মানবেতিহাসের সূত্রপাতেই এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে যান্ত্রিক গতিকে তাপশক্তিতে পরিবর্তিত করা যায়: ঘর্ষণের মাধ্যমে যেমন আগুন জ্বালানো যায়; এই বিকাশ যতদূর পর্যন্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় তাপশক্তিকে যান্ত্রিক গতিতে পরিবর্তিত করা সম্ভব: বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যার দৃষ্টান্ত।

সামাজিক জগতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যত বড় বিপ্লবই সাধন করুক না কেন, যার অর্ধেকও এখনও সমাপ্ত হয় নি, এটা সন্দেহাতীত যে মানবজাতির মুক্তির ক্ষেত্রে ঘর্ষণজাত অগ্নির আবিষ্কার অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন জ্বালাতে পেরে মানুষ প্রথম প্রকৃতির শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পেরেছিল এবং এইভাবে পশুজগৎ থেকে চির-

কালের মতো নিজেকে আলাদা করে এনেছিল। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কখনই মানুষের বিকাশে এত বড় উল্লম্ফনমূলক অগ্রগতি ঘটাতে পারবে না, তার ওপর নির্ভরশীল উৎপাদিকা শক্তির গুরুত্ব আমাদের চোখে যতই প্রতিভাত হোক না কেন। একমাত্র এই উৎপাদিকা শক্তিগুলিই এমন একটা সমাজব্যবস্থার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যেখানে আর শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না এবং যেখানে এই সর্বপ্রথম মানুষের প্রকৃত মুক্তির কথা বলা যাবে; যেখানে প্রকৃতির জ্ঞাত নিয়মগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথা চিন্তা করা সম্ভব হবে। কিন্তু মানুষের সমগ্র ইতিহাস এখনও অল্পদিনের মাত্র এবং আমাদের আজকের মতামতকে একেবারে অকাট্য বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করাটা যে কত হাস্যকর হবে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় এই সামান্য তথ্য থেকে যে আমাদের সমগ্র অতীত ইতিহাস হচ্ছে যান্ত্রিক গতির রূপান্তরের ব্যবহারিক আবিষ্কার থেকে তাপের যান্ত্রিক গতিকে রূপান্তরের সময় পর্যন্ত যুগের ইতিহাস।

এটা ঠিক যে হের ড্যুরিং ইতিহাসকে দেখেন অন্যভাবে। সাধারণভাবে, ভ্রান্তি, অজ্ঞানতা, বর্বরতা তথা হিংসা ও আধিপত্য স্থাপনের অতীত কাহিনীর বিবরণ বলে ইতিহাস বাস্তবতার দার্শনিকের কাছে ঘৃণ্য বিষয়বস্তু; তবে খুঁটিয়ে বিচার করলে একে দুটো কালপর্বে ভাগ করা যায়; যথা, (ক) বস্তুর আত্মসম অবস্থা থেকে ফরাসি বিপ্লব অবধি; (খ) ফরাসি বিপ্লব থেকে হের ড্যুরিং;

> উনবিংশ শতাব্দীর 'মর্মবস্তু এখনও মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, বাস্তবিকই মননশীল বিচারের দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় আরও বেশি (!)।' তবুও এর গর্ভে রয়েছে সমাজবাদ এবং তার মধ্যেই রয়েছে 'আরও শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা যা ফরাসি বিপ্লবের অগ্রদূতরা এবং নায়করা কল্পনাও করতে পারেন নি।'

সমগ্র অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে বাস্তবতার দর্শনের ঘৃণাটির এইভাবে কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে:

> 'যে মূল দলিলগুলির সাহায্যে অতীতের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে দেখে নেওয়া সহজ হয়, সেই ইতিহাস এবং এই পর্যন্ত মানুষের গঠন আগামী হাজার হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর…। সমগ্র মানবজাতি বয়সে এখনও যথেষ্ট তরুণ এবং আগামী দিনে যখন হাজার হাজার বছরের

পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ বছর বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার সামনে আসবে, তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিণত বিচারবুদ্ধির শৈশব হয়ে দাঁড়াবে একটা স্বয়ং-প্রতিভাত সিদ্ধান্ত-সূত্র, যা আমাদের পটভূমিতে অবিসংবাদী। আমাদের যুগ তখন সুপ্রাচীন অতীতের মর্যাদা পাবে।'

শেষ বাক্যটির 'স্বাভাবিক ভাষাগত বিন্যাস' সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করে আমরা শুধু দুটি বিষয়ের উল্লেখ করবো। প্রথমত, এই 'সুপ্রাচীন অতীতে'র ব্যাপারটা ভবিষ্যতের সকল প্রজন্মের কাছেই ইতিহাসের একটা আকর্ষণীয় যুগ হিসাবেই টিকে থাকবে; কারণ পরের সব রকম উন্নততর বিকাশের ভিত্তিভূমি এখানে রয়েছে, কেননা পশুজগৎ থেকে আলাদা করে এনে মানুষ গড়বার কাজ শুরু হয় এইখান থেকে এবং সেই যুগের আসল মর্মবস্তু হচ্ছে নানা বাধা অতিক্রম করায় সংঘবদ্ধ মানবজাতি ভবিষ্যতে আর কখনও ঐসব বাধার সম্মুখীন হবে না, আর দ্বিতীয়ত, এই সুপ্রাচীন অতীত যুগের সমাপ্তির তুলনায় ভবিষ্যৎ ইতিহাসের যে-কোনো কালপর্ব এইসব বাধাবিঘ্নের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না, এইসব কালপর্ব অন্য ধরনের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক সাফল্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে—এইসব প্রশ্ন যেভাবেই হোক এই সময় তুলে আমাদের অত্যন্ত 'পশ্চাৎপদ' ও 'অধঃপতিত' শতাব্দীর বুদ্ধিগতভাবে অপরিপক্ব বালসুলভ অবস্থায়' আবিষ্কৃত চূড়ান্ত সত্য, অপরিবর্তনীয় সত্য ও গভীরগামী ধ্যানধারণার আকারে আগামী হাজার হাজার বছরের নিয়মকানুন স্থির করে দেওয়ার জন্যে সুপ্রাচীন অতীত ইতিহাসের শেষ পর্বটি বাছাই করা খুবই আশ্চর্যজনক। ডাগনারের প্রতিভা ছাড়া দর্শনের ক্ষেত্রে একজন ডাগনার পূর্বতন ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিকাশ সম্পর্কে যে সকল নিন্দাসূচক বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছেন, সেগুলি এর চূড়ান্ত পরিণতি—তথাকথিত বাস্তবতার দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—সেটা তিনি দেখতে পান নি।

এই নতুন গভীরে প্রোথিত বিজ্ঞানের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের বিশিষ্টতাবিধান এবং জীবনের মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত অংশটি। এই অংশে পুরো তিনটি পরিচ্ছেদ ধরে আপ্তবাক্যের মামুলি বুকনি বুদবুদের মতো ভেসে উঠে বাধাবন্ধহীন ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। দুঃখের বিষয়, সামান্য কয়েকটি নমুনা দেখিয়েই আমাদের থামতে হবে।

'সবরকম সংবেদনের সুগভীর মর্ম, সুতরাং জীবনের সমস্ত বিষয়ীমুখী

রূপ নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার প্রভেদের ওপর…কিন্তু পরিপূর্ণ (!) জীবনের জন্যে বিশেষ অসুবিধা ছাড়াই (!) এটা দেখানো যেতে পারে যে সেটাকে আরও ভালোভাবে উপভোগ করা যায় এবং তার জন্যে নির্ধারক উদ্দীপক বিষয়ের বিকাশ ঘটাতে হবে একটা বিশেষ অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে নয়, পরন্তু জীবনের অবস্থান্তর ঘটিয়ে …বলা যেতে পারে স্থায়ী জাড্যের মোটামুটি সমান অবস্থা বজায় থাকার জন্যে, যা নাকি ভারসাম্যের একই অবস্থা অব্যাহত রাখে, তা এর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অস্তিত্ব বিচারের পক্ষে এর গুরুত্ব নেই বললেই চলে…একটা অভ্যাস এবং বলতে গেলে একটা প্রচলিত রীতি এটাকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ও উদ্বেগহীন করে তোলে, যার সঙ্গে জড়ত্বের সামান্যই পার্থক্য। বড়োজোর একঘেঁয়েমির পীড়নও এর মধ্যে প্রবেশ করে এক ধরনের নেতিবাচক জীবন-স্পন্দন হিসাবে…স্রোতোহীন বদ্ধ জীবন ব্যক্তি ও জাতির সব রকমের আবেগ এবং বাঁচবার আগ্রহকে নির্বাপিত করে দেয়। কিন্তু এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় আমাদের প্রভেদের সূত্রটির সাহায্যে।'

যে দ্রুততার সঙ্গে হের ড্যুরিং তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটা যাবতীয় বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে যায়। একই স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করতে থাকলে অথবা একই ধরনের উদ্দীপক যদি অনবরত প্রয়োগ করা যায় তাহলে প্রতিটি স্নায়ুই অথবা প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রই যে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর সেই কারণে সাধারণ অবস্থাতে স্নায়ুকে উত্তেজিত করাটা মাঝে মাঝে থামাতে হয় ও তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হয়—বহু বছর ধরে এটা শারীরবিদ্যার যে কোনো পাঠ্যপুস্তকেই লেখা হয়ে আসছে এবং নেহাৎ স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা জানে। এটা এই প্রথম বাস্তবতার দর্শনের ভাষাতে তর্জমা করা হলো। সকল স্নায়বিক উত্তেজনার গভীরতর মর্ম নিহিত রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার প্রকারভেদে—পর্বতের মতো সুপ্রাচীন এই মামুলি বক্তব্যকে রহস্যময় সূত্রে রূপান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আবার রূপান্তরিত করা হলো 'আমাদের প্রভেদের সূত্রে।' আর এই প্রভেদের সূত্রটি অনেকগুলি ধারাবাহিক ঘটনাকে 'একেবারে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে।' এটা আসলে বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্বর চিত্রিত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ছাড়া আর

কিছুই নয়। এমনকি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও এটা বোঝাবার দরকার হয় না। এই তথাকথিত প্রভেদের সূত্রটির উল্লেখ বিষয়টির ছিটেফোঁটাও বুঝতে সাহায্য করে না।

কিন্তু গভীরে প্রোথিত 'আমাদের প্রভেদের সূত্রটি'র সম্বন্ধে এটাই সব কথা নয়।

> 'জীবনে বয়সের পারম্পর্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভব আমাদের কাছে একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হাজির করে, যার দ্বারা আমাদের প্রভেদের সূত্রকে ব্যাখ্যা করা যায়…শিশু, বালক, যুবক ও বয়স্ক মানুষ জীবনের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় জীবনবোধের যে তীব্রতা অনুভব করে, জীবনের একটা স্তরে আবদ্ধ হয়ে গেলে উপলব্ধির সেই তীব্রতা আর বোধ করে না।'

কিন্তু এটাও সব নয়।

> 'আমরা যদি এই ঘটনাটিকে বিচারের মধ্যে আনি যে যা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত বা সম্পাদিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির মধ্যে আর কোনো আকর্ষণ থাকে না, তাহলে আমাদের প্রভেদের সূত্রটিকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।'

এখন পাঠক নিজেই এটা কল্পনা করে নিতে পারেন যে উপরোক্ত বক্তব্যের সূচনায় বাক্যগুলির গভীরতা ও অন্তর্গূঢ়তার মধ্যে কী ধরনের রহস্যময় একঘেয়ে কথাবার্তা বলা রয়েছে। হের ড্যুরিং তাঁর বইয়ের শেষে জয়োল্লাসে ঘোষণা করেছেন:

> 'জীবনের মূল্য-বিচার ও তার উন্নতিবিধানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের উভয় ক্ষেত্রেই প্রভেদের সূত্রটির ভূমিকা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।'

তাঁর পাঠকের বুদ্ধির গভীরতা সম্বন্ধে হের ড্যুরিং-এর ধারণার ক্ষেত্রেও এটা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য: পাঠক নেহাৎই বোকা কিংবা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন— এটাই তিনি ধরে নিয়েছেন।

জীবনের একান্ত ব্যবহারিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমাদের কাছে এইভাবে বলা হয়েছে:

> 'যে পদ্ধতিতে জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ঔৎসুক্য সক্রিয় রাখা সম্ভব

হয় (স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্যে এবং যারা সেই রকম হতে চায়, তাদের পক্ষে উপযুক্ত এই কর্তব্যটি!), সেই পদ্ধতি হচ্ছে বিশেষ ও বলতে গেলে, প্রাথমিক ঔৎসুক্যগুলিকে, যাদের নিয়ে সামগ্রিক ঔৎসুক্যগুলি গঠিত, স্বাভাবিক কাল-পর্বগুলি অনুযায়ী বিকাশ ঘটতে দেওয়া অথবা তাদের পারম্পর্য বজায় থাকতে দেওয়া। একই সঙ্গে, একই অবস্থার জন্যে পর্বগুলির পারম্পর্যকে ব্যবহার করা যায়—নিম্নতর এবং সহজে তুষ্টিযোগ্য উদ্দীপকের বদলে উচ্চস্তরের ও অধিকতর স্থায়ীভাবে কার্যকর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, যাতে ঔৎসুক্যহীন যে কোনো ধরনের ফারাক এড়িয়ে যাওয়া যায়। তবে এটা নিশ্চিত করার প্রয়োজন আছে য স্বাভাবিক উত্তেজনাগুলি অথবা সামাজিক অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধারায় উদ্ভূত উত্তেজনাগুলি যেন যদৃচ্ছভাবে পুঞ্জীভূত না হয়। কিংবা এখানে যেন জবরদস্তি না ঘটে—অথবা বিপরীত বিকৃতিকে যেন সামান্যতম উদ্দীপনায় শান্ত করা না হয় এবং এইভাবে, যে বাসনাকে চরিতার্থ করা সম্ভব, তার বিকাশে যেন প্রতিবন্ধকতা না করা হয়। এই রকম ও আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখাটাই হচ্ছে সমস্ত সুষম ও শোভন গতিশীলতার ভিত্তি। যে কোনো অবস্থার উত্তেজনার ক্ষেত্রে প্রকৃতি-নির্ধারিত যে-কালপর্ব থাকে, তার বাইরে ঐ উত্তেজনাকে দীর্ঘায়ত করার মীমাংসাতীত সমস্যাটি সমাধানে কেউ যেন ব্রতী না হয়।'

যে সাদাসিদে মানুষটি স্থূল পাণ্ডিত্য জাহির করার এই ধরনের মহাজ্ঞানী ব্যক্তির ভাসা ভাসা নীরস মন্তব্যকে দৈববাণীসুলভ 'জীবনের পরীক্ষা'র মানদণ্ড বলে মেনে নেবে, তার পক্ষে 'ঔৎসুক্যহীন ফাঁকগুলি' নিয়ে কোনো অভিযোগ করা সাজে না। সুখভোগের আয়োজন আর সেগুলির ঠিক মতো গোছগাছ করতেই তার সবটুকু সময় লেগে যাবে এবং সুখভোগ করার জন্যে আর কোনো সময় সে পাবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই আমাদের সারা জীবন কেটে যাবে। শুধু দুটি বিষয়ই হের ড্যুরিং আমাদের নিষেধ করতে চান :

> প্রথমত, 'ধূমপান করার নোংরা অভ্যাস' ; দ্বিতীয়ত, সেই ধরনের পানীয় ও খাদ্য যা আমাদের 'বিরক্তি উৎপাদন করে অথবা সূক্ষ্ম রুচির কাছে সাধারণভাবে আপত্তিকর!'

তাঁর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হের ড্যুরিং কিন্তু মদ চোলাই সম্বন্ধে সোল্লাসে এমন সব কাব্যিক মন্তব্য করেন যাতে এটা মনে করা অসম্ভব যে কড়া মাদক পানীয়কে তিনি এর মধ্যে ধরেছেন ; কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে মদ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রয়োগ করতে চান কেবলমাত্র আঙুর রস থেকে প্রস্তুত সুরা ও বিয়ারের ক্ষেত্রে। আর এর সঙ্গে মাংস খাওয়াটা নিষিদ্ধ করতে পারলেই হলো ; তাহলে তিনি বাস্তবতার দর্শনকে প্রয়াত গুস্তাভ স্ট্রুভের সাফল্যের উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন, যেটা আসলে নিছক ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত পর্যায়।

আর বাকি লোকজনের ক্ষেত্রে মাদক পানীয় সম্পর্কে হের ড্যুরিং খানিকটা উদার হলেও হতে পারেন। যে মানুষ তার নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী গতি ও স্থিতির মধ্যে সেতুটি খুঁজে পাচ্ছে না, সেই হতভাগ্য মানুষটি সম্বন্ধে তাঁর একটু প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত, কেননা সে দু'এক ঢোক বেশি গিলে ফেলেছে বলেই স্থিতি ও গতির মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

বারো

ডায়ালেকটিকস

পরিমাণ ও গুণ

> 'সত্তার মৌলিক তর্কশাস্ত্রগত ধর্মগুলির প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে দ্বন্দ্ব বর্জন করা। দ্বন্দ্ব এমন একটা বর্গ (category) যা চিন্তা-সমষ্টির অংশ, কিন্তু কখনই বাস্তবতার অংশ নয়। বস্তুর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, অথবা অন্যভাবে বললে, দ্বন্দ্বকে বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করাটা অযৌক্তিকতারই পরাকাষ্ঠামাত্র … পরস্পরের তুলনায় বিপরীত দিকে গতিশীল দ্বন্দ্ব বস্তুতপক্ষে জগৎ ও তার প্রাণীকুলের যাবতীয় কর্মতৎপরতার মৌলিক রূপ। কিন্তু মৌলিক পদার্থ ও ব্যক্তিমানুষের শক্তিগুলির পরস্পর-বিরোধী গতির সঙ্গে অযৌক্তিক দ্বন্দ্বের ধারণার বিন্দুমাত্র মিল নেই।… তর্কশাস্ত্রের রহস্যময়তা থেকে সাধারণত যে কুয়াশার উদ্ভব হয়, সেটা আমরা পরিষ্কার করতে পেরেছি—বাস্তবক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের প্রকৃত অবাস্তবতার সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থিত করে এবং দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্ব-প্রকল্পের বিকল্প হিসাবে কিম্ভূতকিমাকার কাঠের পুতুল দ্বন্দ্বের ডায়ালেকটিকস-এর সম্মানে এখানে-ওখানে যে পূজার্চনা করা হয়, তার অসারতা দেখিয়ে একাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।'

দর্শন সম্পর্কে আলোচনায় ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছু বলা হয় নি। অন্যদিকে, তাঁর সমালোচনামূলক ইতিহাসে দ্বন্দ্বের ডায়ালেকটিকস এবং তার সঙ্গে বিশেষত হেগেলকে একেবারে অন্যভাবে বিচার করা হয়েছে।

> 'হেগেলীয় ন্যায়শাস্ত্র অথবা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক শক্তির তত্ত্ব অনুযায়ী দ্বন্দ্বকে চিন্তার ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে পাওয়া যাবে না, চিন্তাকে তার প্রকৃতির

দিক থেকে একমাত্র আত্মমুখী ও সচেতন শক্তিরূপে উপলব্ধি করতে হবে, পরন্তু দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বলতে গেলে দৈহিক চেহারাতে ধরা যাবে, যার ফলে অবাস্তবতা একটা অসম্ভব চিন্তা-সমষ্টি হিসাবে টিকে থাকতে পারে না, হয়ে দাঁড়ায় একটা বাস্তব শক্তি। অবাস্তবতার বাস্তবতাটি যৌক্তিক ও অযৌক্তিকের হেগেলীয় তর্কশাস্ত্রের প্রথম সূত্র···একটা বস্তু যতই দ্বন্দ্বাত্মক হবে ততই সেটা সত্য হবে। অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, যতই সেটা অবাস্তব হবে ততই সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। এই সাধারণ সূত্রটিই, যেটা এমনকি সদ্য আবিষ্কৃতও নয়, পরন্তু বাইবেলের ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে ধার করা, তথা-কথিত ডায়ালেকটিকস নীতির নগ্ন রূপ।'

এই দুটি উদ্ধৃত অংশের মধ্যে চিন্তার বিষয়বস্তুটিকে এককথায় এইভাবে বলে দেওয়া যায় যে দ্বন্দ্ব আর অবাস্তবতা একই ব্যাপার (দ্বন্দ্ব = অবাস্তবতা), সুতরাং সেটা বাস্তব জগতে থাকতে পারে না। যে মানুষের অঙ্কের ব্যাপারে বেশ খানিকটা জ্ঞান আছে, সেই এই বক্তব্যকে সেই রকমই স্বতঃপ্রমাণিত বলে ধরে নিতে পারে, যাতে একটা সরল রেখা কখনই বক্র রেখা হতে পারে না এবং একটি বক্র রেখা কখনই সরল রেখা হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির দিক থেকে সব রকমের প্রতিবাদ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ অবস্থায় ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে সরল রেখাকে বক্র রেখার সঙ্গে এক করে দেখা হয় এবং তা থেকে এমন ফল পাওয়া যায় যা সাধারণ বুদ্ধি, সরল রেখা ও বক্র রেখাগুলির মধ্যে অভিন্নতার অবাস্তবতার ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও, কখনও অর্জন করতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের ডায়ালেকটিকস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে, সেই পটভূমিতে বিচার করলে হের ড্যুরিং-এর অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষও একটিমাত্র মত জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করা এবং কিছুটা গালিগালাজপূর্ণ বিশেষণ ব্যবহার করা ছাড়াও অন্য কিছু যুক্তির সাহায্যে আক্রমণ করার দায়িত্ব বোধ করতেন।

এটা ঠিকই যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বস্তুসমূহকে স্থিতিশীল, প্রাণহীন, প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পাশাপাশি অস্তিত্ববান ও পরপর অবস্থিত হিসাবে বিচার করি, ততক্ষণে আমরা তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখাতে পাই না।

আমরা তাদের মধ্যে দেখি যে তাদের সকলের মধ্যেই সাধারণ কয়েকটি গুণ রয়েছে, যার মধ্যে কিছুটা প্রভেদ আছে, এমনকি পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকে না। পর্যবেক্ষণের এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা সাধারণ, আধিবিদ্যক চিন্তার পদ্ধতি গ্রহণ করে এগোতে পারি। কিন্তু যখনই বস্তুসমূহকে তাদের পরিবর্তন, তাদের জীবন, পরস্পরের ওপর তাদের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করি, তখনই বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় একেবারে অন্যরকম। তখনই আমাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। গতিটাই একটা দ্বন্দ্ব : এমনকি সরল যান্ত্রিক স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হতে পারে যখন কোনো বস্তু একই মুহূর্তে দুটি পৃথক স্থানে থাকে, একই স্থানে তার স্থিতি রয়েছেও বটে, আবার নেইও বটে। দ্বন্দ্বের ক্রমাগত উদ্ভব ও দ্বন্দ্বের যুগপৎ নিষ্পত্তিই হচ্ছে প্রকৃত গতি।

তাহলে এখানে আমাদের দ্বন্দ্বটি 'বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার মধ্যে বাস্তবভাবেই বিদ্যমান এবং বলতে গেলে, সেটাকে বাস্তব রূপেই দেখতে পাওয়া যাবে।' আর হের ড্যুরিং-এর কি বলবার আছে? তিনি জোর দিয়ে বলছেন :

> এখনও পর্যন্ত 'কঠোরভাবে স্থিতি ও গতির মধ্যে যৌক্তিক বলবিদ্যায় কোনো রকম সেতুর অস্তিত্ব নেই''।

পাঠক তাহলে এখন দেখতে পারেন হের ড্যুরিং-এর এই বক্তব্যের পিছনে কী লুকিয়ে রয়েছে—সেটা এছাড়া আর কিছুই নয় : যে মন আধিবিদ্যকভাবে চিন্তা করে, সে স্থিতির ধারণা থেকে গতির ধারণায় পৌছতে একেবারেই অক্ষম, কেননা যে দ্বন্দ্বের কথা আগে বলা হয়েছে, সেটা তার পথরোধ করে। এই রকম মনের কাছে গতি একেবারেই দুর্বোধ্য, কারণ তাতে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এবং গতির দুর্বোধ্যতার কথা জোর করে বলতে গিয়ে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, আর এইভাবে মেনে নিতে হয় যে বস্তুর প্রক্রিয়াগুলির মধ্যেই দ্বন্দ্ব রয়েছে, উপরন্তু এ একটা বাস্তব শক্তি।

যদি সরল যান্ত্রিক (গতির) স্থান পরিবর্তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে বস্তুর উচ্চতর পর্যায়ের, বিশেষ করে, জীবজগৎ ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। আমরা আরো দেখেছি প্রাণ বলতে সঠিকভাবে মুখ্যত এটাই বোঝায় যে একই মুহূর্তে এ একটা জৈবসত্তা, আবার

অন্য কিছুও বটে। সুতরাং প্রাণও একটা দ্বন্দ্ব, যা বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত উপাদান, যা অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করে ও নিজের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটায়; আর যখনই সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, প্রাণও তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়, মৃত্যুর পদক্ষেপ ঘটে। তেমনি আমরা এটাও দেখেছি যে চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একদিকে, মানুষের জ্ঞান আহরণের সহজাত অপরিসীম ক্ষমতা এবং অন্য দিকে, বাহ্যত সীমাবদ্ধ মানুষ ও সীমায়িত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতার বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে আমরা দেখেছি, যা অন্ততপক্ষে আমাদের কাছে ব্যবহারিকভাবে, প্রজন্মগুলির অন্তহীন ধারাবাহিকতার মধ্যে, অনিঃশেষ অগ্রগতির মধ্যে এর সমাধান খুঁজে পায়।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে উচ্চতর পর্যায়ের গণিতের অন্যতম মূল সূত্রটি নিহিত রয়েছে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যে বিশেষ একটি অবস্থায় সরল ও বক্র-রেখা একই হতে পারে। সরলরেখাগুলি আমাদের চোখের সামনেই পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে, তারা তাদের ছেদ-বিন্দু থেকে পাঁচ বা ছয় সেন্টি-মিটার দূরে গেলেই দেখা যাবে যে তারা সমান্তরাল হয়ে যায়, অর্থাৎ অসীম অবধি তাদের টেনে নিয়ে গেলেও তারা আর কখনও মিলিত হবে না। অথচ এদের নিয়ে এবং এরচেয়ে বেশি দ্বন্দ্বকে নিয়ে কাজ করেও এমন ফল পাওয়া যায়, যেটা শুধু সঠিক নয়, পরন্তু নিম্নতর গণিতে সেটাকে কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু নিম্নতর গণিতেও অনেক দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে যখন 'ক'-এর বর্গমূল (বা অন্যান্য গাণিতিক হারের মূল-এর) হচ্ছে আসলে 'ক'-এর একটি ঘাত; অথচ $ক^{\frac{১}{২}} = \sqrt{ক}$। যে কোনো ঋণাত্মক রাশি অন্য কিছুর বর্গফল যে হতে পারে, এ একটা দ্বন্দ্ব, কেননা প্রতিটি ঋণাত্মক রাশিকে সেই রাশি দিয়ে গুণ করলে একটি ঋণাত্মক বর্গমূল পাওয়া যাবে। ঋণাত্মক একক সংখ্যা তাহলে শুধুমাত্র একটা দ্বন্দ্ব নয়, পরন্তু একটা অবাস্তব দ্বন্দ্ব, একটা মনগড়া ব্যাপার। অথচ $\sqrt{-1}$ অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক গাণিতিক পদ্ধতির অনিবার্য ফল। তাছাড়া, নিম্নতর বা উচ্চতর গণিতের হাল কোথায় দাঁড়াত, যদি তাকে $\sqrt{-1}$ ছাড়া কাজ করতে হতো?

চল রাশি (Variable quantities) নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গণিতকে ডায়ালেকটিক্স-এর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয় এবং ডায়ালেকটিকপন্থী দার্শনিক

দেকার্তেই যে এই অগ্রগতি সূচিত করতে পেরেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই তাৎপর্য-পূর্ণ। চলরাশির গণিত ও ধ্রুবরাশির (constant quantities) গণিতের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক সেইরকম, যে রকম সম্পর্ক ডায়ালেকটিক চিন্তা ও আধিবিদ্যক চিন্তার মধ্যে সাধারণভাবে রয়েছে। কিন্তু তাতে বহু গণিতজ্ঞকে শুধুমাত্র গণিতের ক্ষেত্রেই ডায়ালেকটিকসকে স্বীকার করে নিতে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ডায়ালেকটিক পন্থায় প্রাপ্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে পুরানো, সীমায়িত আধিবিদ্যক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে যেতে বাধে না।

শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ-প্রকল্প সম্বন্ধে কিছু বাক্য প্রয়োগ করা ছাড়া হের ড্যুরিং যদি এই বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত কিছু বলতেন, তাহলে আমরা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর বক্তব্যের বিচার করতে পারতাম। এইটুকু সমাধা করে ফেলে, এই দ্বন্দ্ব কিভাবে কাজ করছে তা তিনি তাঁর বিশ্ব-প্রকল্পে কিংবা তাঁর প্রাকৃতিক দর্শনে একবারও আমাদের দেখান নি—এটা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে হের ড্যুরিং 'পৃথিবী ও প্রাণীদের জীবনযাত্রাতে যাবতীয় কার্যকলাপের মৌলিক রূপ' নিয়ে ইতিবাচক কিছুই বলতে পারেন না। কেউ যখন হেগেলের 'স্বরূপ-তত্ত্ব'কে বিপরীত দিকে ধাবমান অথচ দ্বন্দ্বহীন—এই রকম নীরস মামুলি বক্তব্যে পর্যবসিত করেন, তখন সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে এই ধরনের মামুলি বক্তব্যের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া।

মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে হের ড্যুরিং-এর আর একবার ডায়ালেকটিকবিরোধী বিদ্বেষ প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে:

> 'স্বাভাবিক ও বোধগম্য যুক্তির অভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে দ্বান্দ্বিক আভরণ ও গোলকধাঁধা এবং আরবী নকশার কুজ্ঝটিকা ...এমনকি যে অংশটুকু ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও আমাদের এই নীতিই প্রয়োগ করতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং সাধারণভাবে (!) একটা সুপরিচিত দার্শনিক ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী একের মধ্যে বহুকে এবং বহুর মধ্যে একত্বকে অনুসন্ধান করতে হবে। সুতরাং এই মিশ্র ও ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সবই এক।'

সুপরিচিত দার্শনিক ধারণা সম্বন্ধে এই অন্তর্দৃষ্টি থাকার ফলে হের ড্যুরিং জোরের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন: মার্কসের আর্থনীতিক দার্শনিক-

তার কী 'পরিণতি' ঘটবে, 'ক্যাপিটালে'র পরবর্তী খণ্ডগুলিতে কী কী থাকবে ; আর এটা তিনি বলে দেন নিম্নোক্ত ঘোষণার ঠিক সাত লাইন পরেই :

> 'সাদামাটা মনুষ্য-ভাষায় বলতে গেলে দুটি (শেষের)[৬৯] খণ্ডে কী থাকবে সেটা বুঝে ওঠা বাস্তবিকই অসম্ভব।'

অবশ্য এই প্রথমই হের ড্যুরিং-এর লেখাগুলি আমাদের কাছে 'জিনিসপত্র' বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা নয়—যে 'জিনিসপত্রে'র মধ্যে দ্বন্দ্ব নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিদ্যমান এবং বলতে গেলে দৈহিক রূপে সেটাকে দেখা সম্ভব। এটা তাঁর বিজয়োল্লাসকে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে কোনো প্রতিবন্ধক হয় না :

> 'তা সত্ত্বেও বিকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়যুক্তি অবধারিতভাবেই জয়লাভ করবে।... যাঁর জোরালো বিচার-ক্ষমতার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনিই বিকৃত চিন্তা ও আঙ্গিকের এই শ্রেষ্ঠত্বের ভড়ং ও ডায়ালেকটিক জঞ্জালে প্রলুব্ধ হবেন না। ডায়ালেকটিক মূঢ়তার শেষ ধ্বংসাবশেষ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁকা দেবার এই পন্থা...তার বিভ্রান্তিকর প্রভাব হারাবে এবং কাউকে তখন আর বিশ্বাস করতে হবে না যে কোনো গভীর জ্ঞানের অংশবিশেষ পাবার জন্যে নিজেকে পীড়িত করতে হবে ; নিগূঢ় বিষয়গুলির সারসত্তা থেকে এটুকুই প্রকাশ পায় যে সেগুলি একেবারে মামুলি ধরনের না হলেও, নিছক সাদামাটা তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত...অভ্রান্ত যুক্তিসম্মত পদ্ধতির প্রতি ব্যভিচার না করে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক নীতি অনুসারে (মার্কসীয়) কুজ্ঝটিকার উপস্থাপনা একেবারেই অসম্ভব।' হের ড্যুরিং-এর মতে মার্কসীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'তাঁর (মার্কসের) বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্যে ডায়ালেকটিক ভেল্কিবাজি' ও এই ধরনের আরও কিছু।

মার্কসের গবেষণার আর্থনীতিক ফলাফল সঠিক কি বেঠিক, তা নিয়ে আমরা এখানে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না ; মার্কসের ব্যবহৃত ডায়ালেকটিক পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমাদের যা কিছু বক্তব্য। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা একেবারে নিশ্চিত : 'ক্যাপিটাল'-এর বেশির ভাগ পাঠকই এই প্রথম হের ড্যুরিং থেকে জানতে পারবেন তাঁরা যা পড়েছেন তার প্রকৃত অর্থ কী। আর তার মধ্যে হের ড্যুরিং নিজেও নিশ্চয়ই একজন। যিনি ১৮৬৭ সালে,*

*সংযোজনী ৩, নং ৩। সম্পাদক।

তাঁর মতো চিন্তাশক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব, বইটির অপেক্ষাকৃত সেইরকম যুক্তিসঙ্গত সমালোচনাই করেছিলেন ; আর এটা করতে গিয়ে তিনি ড্যুরিঙ্গীয় ভাষাতে মার্কসের যুক্তিকে ভাষান্তর করে নেন নি, এখন যা তিনি অপরিহার্য বলে মনে করছেন। যদিও তখনও তিনি হেগেলীয় ডায়ালেকটিকসকে মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস-এর সঙ্গে এক করে দেখার মতো ভুল করেছিলেন, তবুও ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ও তার প্রায়োগিক ফলাফলের মধ্যেকার পার্থক্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি এবং তখনও তাঁর এই বোধশক্তি খোয়া যায় নি যে প্রথমোক্তকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে শেষোক্তকে খণ্ডন করা যায় না।

যাই হোক, হের ড্যুরিং-এর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বক্তব্য হচ্ছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'শেষ অবধি সবই একটি বিষয়ে পর্যবসিত হয়।' সুতরাং, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী, মার্কসের কাছে পুঁজিপতি ও মজুরি শ্রমিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিগুলি 'একই ব্যাপার'—আর তাহলে শেষ পর্যন্ত মার্কস ও হের ড্যুরিং 'একই ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান।' এই ধরনের পুরোদস্তুর অর্থহীন বক্তব্যকে একমাত্র এইভাবেই বোঝানো সম্ভব যে যদি আমরা ধরে নিই ডায়ালেকটিকস শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্র হের ড্যুরিং কয়েকটা পাঁচমেশালী ও ভ্রান্ত ধারণার জন্যে একটা মানসিক দায়িত্বহীনতার পর্যায়ে চলে যান, যার ফলে তাঁর কথা ও কাজ শেষ পর্যন্ত 'একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।'

হের ড্যুরিং 'যাকে আমার মহান পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক চিত্রণ' বলেন, এখানে আমরা তারই নমুনা পাচ্ছি :

> 'বর্গ ও জাতিরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের সংক্ষিপ্ত বিচার এবং খুঁটিনাটি উদ্‌ঘাটন করে হিউম যাকে শিক্ষিত জনতা বলেছিলেন, তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে না ; উচ্চতর ও মহত্তর পদ্ধতিতে এই ধরনের বিচার সামগ্রিক সত্যের স্বার্থের সঙ্গে এবং গিল্ডের বন্ধনমুক্ত জনগণের প্রতি কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।'

মহান পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক চিত্রণ এবং বর্গ ও জাতি রূপের সমস্যার সংক্ষিপ্ত সমাধান নিশ্চয়ই হের ড্যুরিং-এর পক্ষে বড় সুবিধাজনক কারণ এই পদ্ধতিতে খুঁটিনাটি সকল জ্ঞাত তথ্যকে তাঁর পক্ষে অবহেলা করা এবং সে-

গুলিকে শূন্যের সঙ্গে সমীকরণ করা সম্ভব হয়; যাতে কোনো কিছু প্রমাণ করার চাইতে কেবলমাত্র সাধারণ বক্তব্য আওড়ে গেলেই হয়, মতামত জাহির করে নিন্দাবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেই চলে। এই পদ্ধতির আরও সুবিধা হচ্ছে এতে বিরোধীপক্ষকে যথার্থভাবে দাঁড়াবার কোনো জায়গা দেওয়া হয় না; তার ফলে মহান ভঙ্গিতে ঐ ধরনের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা ছাড়া, সাধারণ বক্তব্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া এবং শেষ পর্যন্ত হের ড্যুরিং-এর প্রতি তাঁরই নিন্দাবাদ ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া বিরোধীপক্ষ জবাব দেওয়ার আর কোনো উপায় খুঁজে পায় না। এক কথায় কথা কাটাকাটির মধ্যে নেমে পড়তে হয়, যেটা অনেকের পক্ষেই রুচিসম্মত নয়। কাজেই ব্যতিক্রম হিসাবে হের ড্যুরিং যখন কখনও কখনও উচ্চতর ও অভিজাত ভঙ্গি ছেড়ে দিয়ে অন্ততপক্ষে মার্কসীয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রক নীতির দুটি উদাহরণ দেন, তখন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারি।

> 'পরিমাণ গুণে পরিণত হয়, সুতরাং প্রতিটি অগ্রগতি একটা আয়তনে পৌঁছলে, শুধুমাত্র এই পরিমাণগত বৃদ্ধির মাধ্যমেই পুঁজিতে পরিণত হয়—এইভাবে এই বিভ্রান্তিকর, ধোঁয়াটে হেগেলীয় ধারণার উল্লেখ কী হাস্যকর।'

হের ড্যুরিং কর্তৃক এই ধরনের 'সংশোধিত' উপস্থাপনা বেশ বেখাপ্পা বলেই মনে হয়। দেখা যাক, মূল লেখাতে মার্কস কী বলেছেন। ৩১৩ পৃষ্ঠায় (ক্যাপিটাল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ) স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজি এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার গবেষণার ভিত্তিতে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে 'যে কোনো পরিমাণ অর্থ অথবা মূল্যই ইচ্ছামতো পুঁজিতে রূপান্তরযোগ্য নয়। এই রূপান্তর সাধন করতে হলে বস্তুতপক্ষে একটা ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ অথবা বিনিময় মূল্য—অর্থের বা পণ্যের মালিক কোনো ব্যক্তির কাছে আছে বলে ধরে নিতে হবে।'* কারখানার কোনো বিভাগে রোজ ৮ ঘণ্টা কর্মরত মজুরের উদাহরণ মার্কস দিয়েছেন। এই মজুর তার নিজের জন্যে অর্থাৎ তার মজুরির মূল্য সৃষ্টির জন্যে রোজ আট ঘণ্টা কাজ করে এবং পরবর্তী চার ঘণ্টা কাজ করে পুঁজিপতির জন্যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনে, যা কিনা অতি শীঘ্রই পুঁজিপতির পকেটে চলে যায়। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিজের জীবনধারণের ও তার একজন মজুরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, ১৯৭৪, পৃ ২৯১। সম্পাদক।

পরিমাণে রূপান্তরিত হয়। যেমন, বহু মানুষের সহযোগিতা, বহু শক্তির একক শক্তিতে রূপান্তর, মার্কসের ভাষায়, এমন একটি 'নতুন শক্তি' সৃষ্টি করে, যা পৃথক পৃথক শক্তির সমষ্টিগত রূপ থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন।*

উপরন্তু, পূর্ণ সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে হের ড্যুরিং যে-বাক্যাংশটুকুর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দাঁড় করিয়েছেন, মার্কস ঐ বাক্যাংশে এই পাদটীকা যোগ করেছিলেন: 'আধুনিক রসায়নে লরেঁ ও গেরহার্ড প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে যে আণবিক তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন, সেটা অন্য কোনো সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।'** কিন্তু হের ড্যুরিং-এর এতে কি যায় আসে? তিনি জানতেন যে:

> 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিন্তা-পদ্ধতি যে বিশিষ্ট শিক্ষামূলক উপাদান যোগায়, মার্কস ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লাসালের মতো ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে তার অভাব দেখা যায়; তাঁরা আধা-বিজ্ঞান ও একটু দার্শনিক প্যাঁচের সামান্য উপকরণ দিয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্যকে জোড়াতালি দিতে চান।'

হের ড্যুরিং-এর কাছে 'বলবিদ্যা, ভৌতবিদ্যা ও রসায়নের সঠিক জ্ঞানের সাফল্যের' ভিত্তি কী, তা আমরা আগেই দেখেছি। যাই হোক, তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে মার্কসের পাদটীকাকে আমাদের আরও একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

এখানে যেটার উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা হলো কারবন যৌগগুলির সমগোত্রীয় বস্তুদের কথা, যার অনেকগুলিই আমাদের জানা এবং যাদের প্রত্যেকটির গঠনের নিজস্ব বীজগাণিতিক ফর্মুলা আছে। যেমন, রসায়নে আমরা কারবনের একটা পরমাণুকে বোঝাই C লিখে, হাইড্রোজেনকে লিখি H দিয়ে, অক্সিজেনকে লিখি O দিয়ে এবং প্রতিটি যৌগের অন্তর্ভুক্ত কারবন পরমাণুর সংখ্যা চিহ্নিত করি n দিয়ে। তাহলে এই ধরনের কয়েকটি শ্রেণীর আণবিক সূত্রকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

C_nH_{2n+2} —সাধারণ প্যারাফিনগুলির (মোম) শ্রেণী।

$C_nH_{2n+2}O$ —প্রাথমিক অ্যালকোহলগুলির শ্রেণী।

$C_nH_{2n}O_2$—একক্ষারী ফ্যাটি অ্যাসিডের শ্রেণী।

দৃষ্টান্ত হিসাবে এই শ্রেণীগুলির শেষোক্তটিকে নেওয়া যাক এবং পরপর

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, ১৯৭৪, পৃ ৩০৯। সম্পাদক।

** পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৯২। সম্পাদক।

$n=1$, $n=2$, $n=3$ ইত্যাদি সংখ্যা আমরা বসাতে পারি। তাহলে আমরা নিম্নলিখিত ফলাফল পাব (আইসোমার বা সমাবয়বীগুলিকে বাদ দিয়ে):

CH_2O_2—ফরমিক অ্যাসিড, স্ফুটনাংক ১০০°, গলনাংক ১° ।

$C_2H_4O_2$—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, স্ফুটনাংক ১১৮°, গলনাংক ১৭° ।

$C_3H_6O_2$—প্রোপিওনিক অ্যাসিড, স্ফুটনাংক ১৪০°, গলনাংক— ।

$C_4H_8O_2$—বুটারিক অ্যাসিড, স্ফুটনাংক ১৬২°, গলনাংক— ।

$C_5H_{10}O_2$—ভ্যালেরিয়ানিক অ্যাসিড, স্ফুটনাংক ১৭৫°, গলনাংক— ।

এবং এইভাবে $C_{30}H_{60}O_2$, মেলিসিক অ্যাসিড পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে—এই অ্যাসিড একমাত্র ৮০° গলে এবং এর কোনো স্ফুটনাংক নেই। কারণ একে বাষ্প করতে হলে এর গঠন ভেঙে যাবে।

তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলি গুণগতভাবে ভিন্ন বস্তুর সন্ধান পাচ্ছি, যেগুলি তৈরি হয়েছে সব সময়েই সমানুপাতিক হারে পদার্থের সরল পরিমাণগত বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে। সেইসব ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, যেখানে যৌগটির সব উপাদানের পরিমাণ সমানুপাতিক। যেমন, সাধারণ প্যারাফিন বা মোমের ক্ষেত্রে, C_nH_{2n+2}-এর সর্বনিম্ন হচ্ছে মিথেন CH_4, এ একটি গ্যাস; যতদূর জানা গিয়েছে তাতে এই সিরিজের সর্বোচ্চ হচ্ছে হেকসডেকান, $C_{16}H_{34}$ একটি কঠিন পদার্থ, বর্ণহীন, স্ফটিকাকৃতি, যেটা ২১° ডিগ্রিতে গলে যায় এবং ২৭৮° বাষ্প হয়ে যায়। দুই শ্রেণীর প্রতিটি নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় আণবিক ফর্মুলায় CH_2 অর্থাৎ কারবনের একটি পরমাণুর সঙ্গে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু যোগ করার ফলে এবং আণবিক ফর্মুলাতে পরিমাণগত পরিবর্তন সবসময়েই গুণগতভাবে ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করে।

অবশ্য এই শ্রেণীগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ; বস্তুতপক্ষে সমগ্র রসায়নে, বিভিন্ন নাইট্রোজেন অকসাইড ও ফসফরাস অথবা সালফারের বিভিন্ন নাইট্রোজেন অকসাইড এবং অ্যাসিডেও কী করে 'পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটে' সেটা দেখতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ায় এই তথাকথিত বিভ্রান্তিকর ও ধোঁয়াটে হেগেলীয় ধারণা, বলতে গেলে, মূর্ত রূপেই হাজির হয়—হের ড্যুরিং ছাড়া আর কেউ এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও ধোঁয়াটে অবস্থার মধ্যে পড়েন নি। আর মার্কসই যদি প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন এবং হের ড্যুরিং যদি কিছু না

বুঝেই (তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই এই নজিরবিহীন অপমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে ছেড়ে দিতেন না) এই বক্তব্যটি পাঠ করে থাকেন, তা হলে মার্কস না ড্যুরিং দুজনের মধ্যে কে 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের চিন্তা-পদ্ধতির বিশিষ্ট আধুনিক শিক্ষামূলক উপাদানে' দুর্বল, কে 'রসায়নের…প্রধান সাফল্যগুলি' সম্পর্কে অনবহিত, সেটা বোঝার জন্যে এই আলোচনাটুকুই যথেষ্ট, তার জন্যে হের ড্যুরিং-এর বিখ্যাত প্রকৃতির দর্শনের দিকেও নজর দেওয়ার দরকার হয় না।

পরিশেষে, পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তনের প্রমাণ দেওয়ার জন্যে আমরা আর একজনকে সাক্ষী মানব—তিনি নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন ফরাসি অশ্বারোহীদের সঙ্গে, যারা ঘোড়সওয়ার হিসাবে খারাপ কিন্তু শৃংখলাবদ্ধ, যুদ্ধরত ম্যামলুকদের তুলনা করেছেন, যারা সম্মুখ-সমরে তাদের সময়কার শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অভাব ছিল শৃঙ্খলার। নেপোলিয়ন বলছেন :

> 'দুজন ম্যামলুক নিশ্চয়ই তিনজন ফরাসির চেয়ে অনেক দড়; ১০০ ম্যামলুকের সমান ছিল ১০০ ফরাসি, ৩০০ ফরাসি সাধারণত ৩০০ জন ম্যামলুককে হারিয়ে দিতে পারত এবং ১০০ ফরাসি সৈন্য নিশ্চিতভাবেই ১৫০০ ম্যামলুককে পরাস্ত করতে পারত।'

ঠিক মার্কসের কাছে যেমন একটি নির্দিষ্ট কিন্তু পরিবর্তনশীল ন্যূনতম বিনিময় মূল্যের অংকের প্রয়োজন ছিল তাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে, তেমনি নেপোলিয়নের কাছে এমন একটা ন্যূনতম সংখ্যক অশ্বারোহীর প্রয়োজন ছিল, যাদের (তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক, তাদের মতোই সাহসী অপর একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করতে) আগুয়ান ও শ্রেষ্ঠতর করে তোলার জন্যে উপযুক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এ থেকেই হের ড্যুরিং-এর কাছে কিছু কি প্রমাণ করা যায়? ইউরোপের সঙ্গে যুদ্ধে কি নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন নি? তাঁর কি একের পর এক পরাজয় ঘটেনি? আর সেটা কী কারণে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিভ্রান্তিকর, ধোঁয়াটে হেগেলীয় ধারণাকে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর রণকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন।

তেরো

ডায়ালেকটিকস

নিরাকরণের নিরাকরণ

'ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি (ইংলণ্ডে পুঁজির তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের উদ্ভব-বৃত্তান্ত) মার্কসের বইয়ের অন্যসব কিছুর অপেক্ষা ভালো হতো যদি পাণ্ডিত্যের ঘাটতি পূরণের জন্যে ডায়ালেকটিক দণ্ডটির ওপর একে দাঁড় না করানো হতো। আর কিছু ভালো ও স্পষ্টতর উপাদানের অভাবে, অতীতের গর্ভ থেকে ভবিষ্যতকে বার করার জন্যে হেগেলীয় নিরাকরণের নিরাকরণকে এখানে ধাত্রীর মতো ব্যবহার করা হয়েছে। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র অবসান, যেটা ওপরে বর্ণিত পথে ষোড়শ শতক থেকে কাজ করে যাচ্ছে, সেটাই হলো প্রথম নিরাকরণ। সেটার পর আসবে দ্বিতীয় নিরাকরণ, যার চরিত্র হবে নিরাকরণের নিরাকরণ; কাজেই 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'কে পুনরুদ্ধার করতে হবে, তবে উচ্চতর পর্যায়ে, জমি ও উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ওপর সর্বসাধারণের মালিকানার ভিত্তিতে। হের মার্কস একে বলেছেন নতুন ধরনের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' তথা 'সামাজিক সম্পত্তি' এবং এর মধ্যে পাওয়া যায় হেগেলীয় উচ্চতর পর্যায়ের ঐক্য, যেখানে দ্বন্দ্বের যেন নিরসন ঘটেছে, অর্থাৎ যেখানে হেগেলীয় বাক্যস্রোতের ভেল্কি-বাজিতে দ্বন্দ্বের নিরাকরণ ঘটে আবার সেটা রক্ষিতও হয়।...তার ফলে আত্মসাৎকারীদের বিলুপ্তি ঘটা যেন বস্তুগত বাহ্য সম্পর্কগুলির মধ্যেকার ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। নিরাকরণের নিরাকরণের মতো হেগেলীয় শব্দের মারপ্যাঁচের ওপর ভরসা করে কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে জমি ও পুঁজির সাধারণ

মালিকানার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো কঠিন হবে।...অবশ্য মার্কসের অস্পষ্ট দো-আঁশলা ধ্যানধারণা তাঁদের কাছে মোটেই অদ্ভুত মনে হবে না, যাঁরা জানেন ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস থেকে কী ধরনের অর্থহীন বিষয়বস্তু বানানো যেতে পারে কিংবা কী ধরনের অর্থহীন বিষয় ওর থেকে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত হয়। যে পাঠক এই রকম কূট চালাকির সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে হেগেলের প্রথম নিরাকরণ হলো স্বর্গ থেকে পতনের ধর্মীয় শিক্ষার ধারণা আর তাঁর দ্বিতীয়টি হলো একটা উচ্চতর পর্যায়ের ঐক্য যা ঐ পতনজনিত পাপ থেকে মুক্তির অবস্থায় নিয়ে যায়। ধর্মকাহিনী থেকে গৃহীত এই অর্থহীন উপমার ওপর ভিত্তি করে তথ্যের যুক্তিধারা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।...হের মার্কস মনের আনন্দে তাঁর সম্পত্তির, যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক, ধোঁয়াটে জগতে থেকে যান এবং তাঁর সুদক্ষ অনুগামীদের হাতে ছেড়ে দেন ডায়ালেটিক রহস্য সমাধানের দায়িত্ব।'

হের ড্যুরিং-এর দৌড় এই পর্যন্তই।

সুতরাং, সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা, জমি ও শ্রমোৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণের ওপর সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করার জন্যে হেগেলের নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত উদাহরণটি হাজির করা ছাড়া মার্কসের অন্য কোনো উপায় নেই: আর যেহেতু ধর্ম থেকে ধার করা এইসব অর্থহীন উপমার ওপরে তিনি তাঁর সমাজবাদের তত্ত্বকে খাড়া করেছেন, তাই তাঁকে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে যে ভবিষ্যৎ সমাজে এমন মালিকানা দেখা দেবে যা কিনা হেগেল-কথিত অবলিত দ্বন্দ্বের উচ্চতর ঐক্যের মতো একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক।

নিরাকরণের নিরাকরণকে এখনকার মতো মুলতুবি রেখে 'মালিকানা, যা 'একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক', সেই প্রশ্নটির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। হের ড্যুরিং একে 'ধোঁয়াটে জগৎ' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি যে সে ব্যাপারে বাস্তবিকই সঠিক, সেটা একটু আশ্চর্যের কথা বটে। তবে দুর্ভাগ্যের কথা, মার্কস নয়, হের ড্যুরিং নিজেই এই ধোঁয়াটে জগতে রয়েছেন। 'পাগলের প্রলাপ' বকার হেগেলীয় পদ্ধতিকে তিনি এমন নিপুণ-

ভাবে নাড়াচাড়া করেছেন, যাতে 'ক্যাপিটাল'-এর অসমাপ্ত খণ্ডগুলিতে নিশ্চিতভাবে কী থাকবে, তাও তিনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন, তেমনি এখানেও তিনি হেগেলকে অনুসরণ করে সম্পত্তির উচ্চতর ঐক্যের কথা অনায়াসেই মার্কসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন—যদিও এই সম্বন্ধে একটি কথাও মার্কসে নেই।

মার্কস বলেছেন: 'এটা নিরাকরণের নিরাকরণ। কিন্তু পুঁজিবাদী যুগের সঞ্চিত সম্পদের অর্থাৎ স্বাধীন শ্রমিকদের সহযোগিতা এবং জমি ও শ্রমোৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণের ওপর তাদের সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তিগত শ্রম থেকে উদ্ভূত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর-প্রক্রিয়াটি, স্বাভাবিকভাবেই বাস্তবে সামাজিক উৎপাদনভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরের তুলনায়, অনেক বেশি দীর্ঘমেয়াদি, কষ্টসাধ্য ও কঠোর প্রক্রিয়া।'* মার্কস এটাই বলেছেন, সম্পত্তি-দখলকারীদের উচ্ছেদ করার পর যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সেটাকে তা'হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু জমি ও শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতেই সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে উঠবে। যে সোজা কথার সোজা অর্থ বোঝে, সে এতে বুঝবে যে সামাজিক মালিকানা প্রসারিত করা হচ্ছে জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের ওপর আর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের ওপর। এবং এটাকে এমনকি ছয় বছরের বালকের কাছেও বোধগম্য করার জন্যে মার্কস ভাবী সমাজ সম্বন্ধে ৫৬ পৃষ্ঠাতে লিখছেন 'স্বাধীন ব্যক্তিমানুষদের' সমাজ, যেখানে সাধারণ মালিকাধীন উৎপাদনের উপকরণগুলি নিয়ে তারা কাজ করে, যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির মিলিত শ্রম-শক্তি সমাজের সম্মিলিত শ্রমশক্তি হিসাবে সচেতনভাবে কাজে লাগানো হয়', অর্থাৎ এই সমাজ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠিত। তিনি তারপর আরও বলেছেন: 'আমাদের জনসমষ্টির মোট উৎপাদনটা হচ্ছে সামাজিক। এই উৎপাদনের একটা অংশ নতুন করে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে কাজে লাগে এবং তারপরও সেটা সামাজিক থাকে। কিন্তু তার আর একটা অংশ সমাজের মানুষেরা জীবনধারণের জন্যে ভোগ-ব্যবহারে লাগায়। অতএব

পরিণত হয়, তাদের উৎপাদনের উপকরণ পরিণত হয় পুঁজিতে, যখনই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তখন থেকেই শ্রমের আরও সামাজিকতা বিধান হয় এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ভিন্ন চেহারা পায়, সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকদের উচ্ছেদ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। 'এখন যাকে উৎখাত করতে হবে সে আর নিজের জন্যে কর্মরত শ্রমিক নয়, সে হলো বহু শ্রমিকের শোষক পুঁজিপতি। এই উচ্ছেদসাধন সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে, পুঁজির কেন্দ্রীকরণে। এক-একজন পুঁজিপতি বহু পুঁজিপতির সর্বনাশ সাধন করে। এই কেন্দ্রীকরণ বা অল্প কয়েকজন পুঁজিপতির দ্বারা বহু পুঁজিপতির উচ্ছেদ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান আকারে সম্প্রসারিত হয় শ্রমপদ্ধতির সমবায় রূপ, সচেতনভাবে বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রয়োগ, নিয়মমাফিক যৌথ ভূমিকর্ষণ, শ্রমের যন্ত্রপাতির কেবলমাত্র সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমযন্ত্রে রূপান্তর, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে যৌথ সামাজিক শ্রমের উৎপাদন-উপকরণরূপে ব্যবহার করে সেগুলির সাশ্রয়। পরিবর্তনের এই পদ্ধতির সকল সুবিধার একচেটিয়া অধিকারী বড় বড় পুঁজিপতির সংখ্যা নিরন্তর হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় প্রভূত দুরবস্থা, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অবনতি, শোষণ ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ। এই শ্রেণী জনসংখ্যায় নিয়ত বর্ধমান এবং খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থার দ্বারাই সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত। যে-উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল এবং তারই ছত্রছায়ায় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে, সেটাই আজ হয়ে উঠেছে উৎপাদন পদ্ধতির অন্তরায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীকরণের এবং শ্রমের সামাজিকতাবিধান অবশেষে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে সেগুলি তাদের পুঁজিবাদী কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে ওঠে। এই কাঠামো খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসে। উচ্ছেদকারীরা উচ্ছন্নে যায়।'*

এবারে আমি পাঠককে জিজ্ঞাসা করব : এর মধ্যে কোথায় ডায়ালেকটিকীয় প্যাঁচ, গোলকধাঁধা ও উদ্ভট ধ্যানধারণা রয়েছে, কোথায় রয়েছে সেই তালগোলপাকানো ও ভ্রান্ত চিন্তা যাতে শেষ পর্যন্ত সবই একই বিষয়ে পর্যবসিত হয়? তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্যে কোথায় সেই হেগেলীয় বিশ্বনিয়ন্ত্রক

* ক্যাপিটাল, পৃ ৭১৪-১৫। সম্পাদক।

নীতির রহস্যময় ডায়ালেকটিক জঞ্জাল ও ধাঁধা—যেগুলি ছাড়া, .হর ড্যুরিং-এর মতে, মার্কস তাঁর চিন্তাকে সঠিক রূপ দিতে অক্ষম? মার্কস কেবলমাত্র ইতিহাস থেকে এবং এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখাচ্ছেন যে ঠিক যেমন আগেকার দিনে ছোট ছোট শিল্প নিজস্ব বিকাশের গতিতেই অনিবার্যভাবে তার ধ্বংসের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল, অর্থাৎ ছোট মালিকরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন ঠিক সেই রকমভাবেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই তার ধ্বংসের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের এই প্রক্রিয়াটি যদি একই সঙ্গে ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়াও হয়ে থাকে, তাহলে সেটা, হের ড্যুরিং-এর পক্ষে যতই বিরক্তিকর হোক, মার্কসের দোষ নয়।

ঠিক এইখানে এসেই ইতিহাস ও অর্থনীতি থেকে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করার পর মার্কস বলেছেন: 'পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পদ আত্মসাৎ করার পদ্ধতি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে মালিকের শ্রম-ভিত্তিক পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। পুঁজিবাদী উৎপাদন, প্রকৃতির একটি অমোঘ প্রক্রিয়ার মতোই, তার নিজের নিরাকরণের জনক। এটাই হচ্ছে নিরাকরণের নিরাকরণ'* ও এই ধরনের কাছাকাছি বিষয় (ওপরে উদ্ধৃত)।

অতএব এই প্রক্রিয়াকে নিরাকরণের নিরাকরণরূপে চিহ্নিত করে মার্কস প্রমাণ করতে চাননি যে এই প্রক্রিয়া ইতিহাসে অনিবার্য ছিল। বরঞ্চ উল্টোটাই: আসলে প্রক্রিয়াটা ইতিপূর্বেই আংশিকভাবে ঘটে গিয়েছিল এবং আংশিকভাবে ভবিষ্যতেও ঘটতে বাধ্য—ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণ করার পরই তিনি একে এমন একটা প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা একটা নির্দিষ্ট ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী বিকাশ লাভ করতে থাকে। এটাই তাঁর প্রতিপাদ্য। সুতরাং যখন তিনি বলেন যে অতীতের গর্ভ থেকে ভবিষ্যৎকে জন্ম দেবার ধাত্রীরূপে কাজ করার জন্যে এখানে নিরাকরণের নিরাকরণকে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা নিরাকরণের নিরাকরণের ওপর আস্থার ভিত্তিতেই জমি ও পুঁজির সাধারণ মালিকানার (যেটা ড্যুরিঙ্গীয় দ্বন্দ্বেরই বাস্তব চেহারা মাত্র) প্রয়োজনীয়তা মার্কস সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন—তখন হের ড্যুরিং তথ্যের নিছক বিকৃতি ঘটান।

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭১৫।

পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এই নিরাকরণের নিরাকরণ যতই ফিরে ফিরে আসবে, ততই এই প্রক্রিয়া আরও নিখুঁত রূপ নিতে থাকবে।

বেশির ভাগ পতঙ্গের জীবনেও এই প্রক্রিয়া ঐ ঘরের দানার মতোই একই ধারায় চলে। যেমন, ডিমের নিরাকরণের ফলে ডিম থেকে প্রজাপতির জন্ম হয়, কয়েকটি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে সেটা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, তারপর নারী-পুরুষের মিলন ঘটে এবং মিলনের সমাপ্তি ও স্ত্রী-প্রজাপতিটির অসংখ্য ডিম প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ তাদের নিরাকরণ হয়। অন্যান্য গাছপালা ও প্রাণীদের জীবন-চক্রটি যে এমন সহজ-সরল নয় এবং মৃত্যুর পূর্বে তারা যে একবার নয়, বহুবার বীজ, ডিম বা সন্তান প্রসব করে— এই মুহূর্তে আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে আমাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জীবজগতের উভয় ক্ষেত্রেই নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়াটি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে। তাছাড়া সমগ্র ভূবিদ্যা হলো নিরাকরণের নিরাকরণে ধারাবাহিক ফল, পুরানো শিলার পর্যায়ক্রমিক ভাঙন এবং নতুন শিলার ধারাবাহিক গঠন ও পুঞ্জীভবন। প্রথমে তরল পদার্থগুলির শীতল হওয়ার মধ্যে দিয়ে যে আদিম ভূত্বক সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল ও আবহমণ্ডলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙে যায়। আর সেই টুকরো টুকরো ভাঙা স্তূপগুলি সমুদ্রের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে মহাসাগরীয় তলদেশ আলোড়নে উত্থিত হওয়ায় ঐসব প্রাথমিক স্তরগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পায়, ঋতু বদলের পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কারবন ডাই-অকসাইডের অ্যাসিডের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসা গলিত শিলাপুঞ্জ—যেগুলি ঐসব স্তর ভেঙে ভূপৃষ্ঠে চলে এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত শীতল হয়ে গিয়েছিল—তাদের ওপরও ঐসব প্রভাব কাজ করে। এইভাবে কোটি কোটি বছর ধরে গঠিত হয়েছিল নতুন নতুন স্তর এবং পালাক্রমে সেগুলির বেশির ভাগটাই আবার ধ্বংস হয়ে যায়, তারাই আবার সঞ্চিত রেখে যায় নতুন স্তর গঠনের উপাদান। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলটি বেশ ইতিবাচক হয়েছে। এর ফলে এমন মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে যা বহু রকমের রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ এবং যান্ত্রিক ভাঙনের ফল। প্রচুর পরিমাণে ও নানা জাতের গাছপালার সৃষ্টি এই কারণেই সম্ভব হয়েছে।

গণিতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার। বীজগণিতের যেকোনো সংখ্যা

ধরা যাক : যেমন, a, এটাকে যদি নিরাকরণ করা যায় তাহলে আমরা পাব $-a$ (ঋণাত্মক a)। আমরা যদি এই নিরাকরণকে আবার নিরাকরণ করি $-a$-কে $-a$ দিয়ে গুণ করে, তাহলে পাব a^2, অর্থাৎ গোড়াকার ধনাত্মক রাশিকে ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু উচ্চস্তরে, তার দ্বিঘাতে। এক্ষেত্রে আমরা একই a^2কে ধনাত্মক a কে a দিয়ে গুণ করেও পেতে পারি, তাতে কোনো হেরফের হয় না। কারণ a^2-এর মধ্যে নিরাকরণের নিরাকরণ এত নিশ্চিতভাবে রয়েছে যে শেষোক্তের সবসময়েই দুটো বর্গমূল থাকে, যথা ধনাত্মক a ও ঋণাত্মক a। আর নিরাকরণের নিরাকরণকে যেকোনো প্রকারেই ঝেড়ে ফেলা অসম্ভব, বর্গের ঋণাত্মক মূল, যেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, গ্রহণ করে যখন আমরা দ্বিঘাতের সমীকরণে আসি।

উচ্চতর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, হের ড্যুরিং নিজেই যাদের গণিতের উচ্চতর কার্যক্রম বলে ঘোষণা করেছেন, সেই 'অতি ক্ষুদ্র পরিমাণের রাশিদের যোগফল' করলে এই নিরাকরণের নিরাকরণকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়; এবং সাধারণ ভাষাতে তাদের বলা হয় ডিফারেনসিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। এই ধরনের ক্যালকুলাসকে কি করে ব্যবহার করা হয়? উদাহরণস্বরূপ, একটা বিশেষ বিচার্য বিষয়ে আমার কাছে দুটি চল (variable) রাশি রয়েছে x ও y; এই দুটির মধ্যে কোনো একটি রাশি পরিবর্তিত হলে, অন্যটিও নির্ধারিত অনুপাতে বদলাবে। x ও y-কে আমি তফাৎ করছি, অর্থাৎ আমি x ও y-কে যেকোনো আসল রাশির তুলনায় এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধরে বিচার করছি যে উক্ত রাশির তুলনায় তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, x ও y-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া, বলতে গেলে, আর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এ বিষয়টা হয়ে দাঁড়ায় একটা পরিমাণগত অনুপাত মাত্র। যাতে কিন্তু কোনো পরিমাণের অস্তিত্ব নেই, অতএব $\frac{dx}{dy}$, যেটা হলো x ও y-এর ডিফারেনসিয়াল-এর অনুপাত $= \frac{0}{0}$, যেখানে $\frac{0}{0}$ কে ধরা হচ্ছে $\frac{x}{y}$-এর প্রকাশ হিসাবে। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে দুটি রাশির মধ্যে অনুপাত যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, সেখানে অদৃশ্য হওয়ার মুহূর্তে তাদের ধরলে একটা দ্বন্দ্ব পাওয়া যাবে; তবে যেমন গত দুশো বছর ধরে সমগ্র গণিতশাস্ত্র আমাদের যেভাবে বিব্রত করেছে, তার চেয়ে এটা আর বেশি বিব্রত করবে না এবং এখন x ও y কে নিরাকরণ করা ছাড়া আমি বেশি আর কী করেছি?

যদিও এমনভাবে করিনি যাতে তাদের নিয়ে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। অধিবিদ্যাবিদরা যেভাবে নিরাকরণ করে থাকেন, সেভাবে আমি করিনি, তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যা করা উচিত, তাই করেছি। x ও y-এর পরিবর্তে তাহলে আমি পাচ্ছি তাদের নিরাকরণ dx ও dy—আমার সামনে যে সূত্র বা সমীকরণ রয়েছে তাতে। তাহলে আমি এই সূত্রগুলি নিয়ে কাজ করে যেতে পারি, dx ও dyকে প্রকৃত রাশি বলে ধরে নিতে পারি। যদিও সেগুলি কয়েকটা বিশেষ নিয়মের অধীন এবং একটা বিশেষ অবস্থাতে আমি ঐ নিরাকরণকে নিরাকরণ করি, অর্থাৎ ডিফারেনসিয়াল ফরমুলাকে পূর্ণরূপ দিই এবং dx ও dy-র স্থলে পুনরায় x ও y নামের প্রকৃত রাশিগুলি পাই এবং তাতে আমি শুরুতে যেখানে ছিলাম, সেখানে থাকি না। কিন্তু যে পদ্ধতির সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান আমি করতে পারলাম, সেটাকে সাধারণ জ্যামিতি ও বীজগণিতের সাহায্যে করতে হলে বোধহয় গলদঘর্ম হতে হতো।

ইতিহাসেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। সভ্য মানবগোষ্ঠীর সকলেই জমির মালিকানা স্বত্ব দিয়ে শুরু করেছিল। আদিম স্তর পার হবার পর, কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সাধারণ মালিকানা উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে ওঠে। এর উচ্ছেদ ঘটে, নিরাকরণ হয় এবং ছোট বড় অনেকগুলি মধ্যবর্তী স্তর পেরিয়ে এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কৃষি উৎপাদনকে একটা উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, তখন এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই আবার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে, ছোট বড় ভূ সম্পত্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-ব্যাপারটি ঘটেছে। তাকেও যে আবার নিরাকরণ করতে হবে, তাকে আবার সাধারণ স্বত্বের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে—এ দাবি স্বভাবতই উঠে থাকে। কিন্তু এই দাবি থেকে এটা বোঝায় না যে আদিম অধিবাসীদের সেই সাধারণ স্বত্বকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, বরঞ্চ বোঝায় যে অনেক বেশি উচ্চ স্তরের ও আরও বিকশিত সাধারণ স্বত্ব কায়েম করতে হবে, যেটা মোটেই উৎপাদনের প্রতিবন্ধক না হয়ে উৎপাদনের ওপর থেকে এই প্রথম সকল বাধা অপসারিত করবে এবং আধুনিক রাসায়নিক আবিষ্কার ও যন্ত্রবিদ্যার উদ্ভাবনাগুলিকে যাতে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করবে।

অথবা আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রাচীনকালের দর্শন ছিল

আদিম ধরনের, প্রকৃতি-নির্ভর বস্তুবাদ। সেদিক থেকে দেখলে মনের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক কী সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারা এই দর্শনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই প্রশ্নে পরিষ্কার একটা অবস্থাতে আসবার জন্যে আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত—এই রকম একটা মতবাদ খাড়া করতে হয়; এর থেকে আসে আত্মার অবিনশ্বরতা এবং শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদ। সুতরাং এইভাবে ভাববাদ প্রাচীন বস্তুবাদকে খণ্ডন (বা নিরাকরণ) করে। কিন্তু দর্শনের আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদও আর সমর্থনযোগ্য থাকল না এবং আধুনিক বস্তুবাদ তাকে খণ্ডন (বা নিরাকরণ) করলো। এই আধুনিক বস্তুবাদ, এই নিরাকরণের নিরাকরণ শুধুমাত্র পুরানোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, পরন্তু বিগত দু হাজার বছর ধরে দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সেই সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে, তার যাবতীয় চিন্তা-সম্পদ এই প্রাচীন বস্তুবাদের স্থায়ী বনিয়াদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এটা আর দর্শনই থাকল না, হয়ে দাঁড়াল একটা বিশ্ববীক্ষা, যার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাকে প্রয়োগ করতে হবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত বিজ্ঞানগুলির বিজ্ঞানে নয়, পরন্তু আসল বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে। কাজেই দর্শন এখানে 'খণ্ডিত হচ্ছে' অর্থাৎ সেটা 'বিলুপ্ত হচ্ছে আবার রক্ষিত'ও হচ্ছে; তার রূপটি বিলুপ্তি হচ্ছে কিন্তু তার প্রকৃত মর্মবস্তুটি বজায় থাকছে। অতএব হের ড্যুরিং যেখানে কেবলমাত্র 'কথার মারপ্যাচ' দেখছেন, সেখানে খুঁটিয়ে দেখলে প্রকৃত মর্মবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

এমনকি সাম্য সম্পর্কে রুশোর মতবাদও—ড্যুরিং যার ক্ষীণ বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র—জগৎ সমক্ষে প্রকাশ পেত না, যদি হেগেলীয় নিরাকরণের নিরাকরণ তাকে ধাত্রীর মতো সাহায্য না করত—যদিও হেগেল জন্মাবার কুড়ি বছর পূর্বে এই মতবাদ সৃষ্টি হয়।[৭২] আর এ সম্বন্ধে কোনো রকমভাবে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, এই মতবাদ প্রথম উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ডায়ালেকটিক জন্মচিহ্ন জাঁকালোভাবেই প্রকাশ পায়। একেবারে প্রাকৃতিক ও বর্বর অবস্থায় সব মানুষই ছিল সমান; এবং রুশো যেহেতু ভাষাকেও প্রাকৃতিক অবস্থার বিকৃতি বলে মনে করেন, সেহেতু একটা প্রজাতির সীমানার মধ্যে পশুদের সাম্যকে পশু-মানুষদের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করার পক্ষে নিশ্চয়ই তাঁর যুক্তি আছে; সম্প্রতি হাইকেল এই পশু-মানুষদের 'আলালি' বা বাকশক্তিহীন[৭৩] বলে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সাম্যাবস্থায় এই পশু-মানুষদের

একটা গুণ ছিল, যেটা তাদের অন্য পশুদের অপেক্ষা বেশি সুবিধা দিয়েছিল : এই গুণটি হচ্ছে উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষমতা। 'তারা নিজেদের আরও উৎকর্ষবিধান করতে পারত ; আর এটাই তাদের অসাম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব রুশো অসাম্যের উদ্ভবকেই প্রগতি বলে গণ্য করলেন। কিন্তু এই প্রগতির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল : একই সঙ্গে এটা পশ্চাদ্‌গতিও বটে।

> 'আরও প্রগতি (প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে) হলে যেন মনে হলো ব্যক্তিমানুষের উৎকর্ষ অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অনেকগুলি পদক্ষেপ, কিন্তু আসলে এগুলি ছিল নৃগোষ্ঠীর অবক্ষয়ের দিকে যাত্রা…ধাতুবিদ্যা ও কৃষি—এই দুটি ব্যবহারিক শিল্পের আবিষ্কার হওয়াতে এই মহান বিপ্লব সাধিত হলো' (আদিম অরণ্য রূপান্তরিত হলো কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু সম্পত্তির মাধ্যমে এর সঙ্গেই এসে গেল দারিদ্র্য ও দাসত্ব)। 'কবির কাছে এটা ছিল সোনা ও রূপো কিন্তু দার্শনিকের কাছে এর তাৎপর্য ছিল লোহা ও সাম্য, যেটা মানুষদের সভ্য করেছে কিন্তু মানবজাতিকে করেছে ধ্বংস।

সভ্যতার প্রতিটি নতুন অগ্রগমন একই সঙ্গে অসাম্যের দিকে নতুন অগ্রগমনও বটে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, সেগুলির সবই তাদের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

> 'জনগণ সম্পর্কিত সকল আইনের এ একটা মৌলিক সূত্র এবং একটা অকাট্য সত্য যে জনগণ তাদের পরিচালনকর্তা মনোনীত করেছিল নিজেদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্যে, দাসত্বে আবদ্ধ করতে নয়।'

তা সত্ত্বেও এই পরিচালকরা অবধারিতভাবেই জনগণের পীড়নকারী হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নকে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়, যখন অসাম্য আবার তার বিপরীতে পর্যবসিত হয় আর সাম্যের কারণ হয়ে ওঠে : স্বৈরাচারীর কাছে সবাই সমান—সমানভাবে নগণ্য।

> 'এখানে অসাম্যের চরম অবস্থা, সেই শেষ অবস্থা যেখানে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় এবং যে বিন্দু থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সেখানে গিয়ে পৌঁছাই ; এখানে সকল ব্যক্তি-মানুষই আবার সমান হয়ে যায়, শুধু এই কারণেই যে তারা সমানভাবে নগণ্য এবং

প্রভুর ইচ্ছা ছাড়া প্রজাদের জন্যে আর কোনো আইন নেই।' কিন্তু স্বৈরাচারী উৎপীড়ক ততক্ষণ পর্যন্তই প্রভু, যতক্ষণ সে বলপ্রয়োগ করতে পারে, কাজেই 'তাকে যখন হটিয়ে দেওয়া হয়', তখন সে আর 'তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে নালিশ করতে পারে না···একমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং একমাত্র বলপ্রয়োগ করেই তাকে উৎখাত করা যায়; এইভাবে সব কিছুই তার স্বাভাবিক পথে চলে।'

আর এইভাবে অসাম্য আবার সাম্যে পরিণত হয়; কিন্তু আগের মতো বাকশক্তিহীন আদিম মানুষের স্বাভাবিক সাম্যে নয়, পরন্তু সামাজিক চুক্তির উচ্চতর সাম্যে। নিপীড়নকারীরাই নিপীড়িত হয়। এটাই হলো নিরাকরণের নিরাকরণ।

অতএব রুশোর মধ্যে আমরা যে শুধু এমন চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাই যা মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এ বিকশিত চিন্তার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই নয়, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মার্কস-ব্যবহৃত ঠিক একই ধরনের ডায়ালেকটিক বক্তব্যের সবটাই আমরা এখানে পেয়ে যাই: যেসব প্রক্রিয়া প্রকৃতিগতভাবে দ্বন্দ্বাত্মক, তাদের মধ্যেই একটা স্ববিরোধ বর্তমান; একটা চূড়ান্ত অবস্থা তার বিপরীত অবস্থাতে পরিণত হয়; এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটির নির্যাস দাঁড়ায় নিরাকরণের নিরাকরণ। যদিও ১৭৫৪ সালে রুশোর পক্ষে হেগেলীয় পরিভাষায় কথা বলা সম্ভব ছিল না, তবুও এটা নিশ্চিত যে হেগেলের জন্মের ষোল বছর আগেই তিনি হেগেলীয় মহামারী, দ্বন্দ্বের ডায়ালেকটিকস, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক নীতি, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর হের ড্যুরিং যখন রুশোর সাম্যতত্ত্বের অগভীর ভাষ্য সম্বল করে তাঁর দুই বিজয়ীকে নিয়ে কাজ শুরু করলেন, তখন তিনি নিজেই এমন একটি ঢালু জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে তাঁর পক্ষে নিরাকরণের নিরাকরণের কবলে অসহায়ভাবে ঢলে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। যে পরিবেশে সেই দুই পুরুষের বিকাশ ঘটেছিল, সেই পরিবেশকে তিনি তাঁর 'ফিলসফি'র ২৭১ পৃষ্ঠায় 'আদিম' অবস্থা আখ্যা দিয়ে দেন। এটাকে তিনি আদর্শ অবস্থাও বলেছেন। এই আদিম অবস্থা কিন্তু ২৭৯ পৃষ্ঠা অনুসারে অনিবার্যভাবেই 'দস্যুবৃত্তির ব্যবস্থা'তে পর্যবসিত হয়—যেটা হলো প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু এখন বাস্তবতার দর্শনের দৌলতে আমরা দস্যুবৃত্তির ব্যবস্থাকে তুলে দেবার পর্যায় অবধি চলে গিয়েছি

এবং তার স্থলে সাম্যের ভিত্তিতে আর্থনীতিক কমিউন প্রতিষ্ঠা করতে পারব, যেটা হের ড্যুরিং আবিষ্কার করেছেন—এটা হচ্ছে নিরাকরণের নিরাকরণ, উচ্চতর পর্যায়ে সাম্য। কি চমৎকার দৃশ্য এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করার পক্ষে এটা কি সুন্দরভাবে সাহায্য করছে: হের ড্যুরিং-এর মতো মহাপণ্ডিত নিজেই নিরাকরণের নিরাকরণের মতো গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছেন!

তাহলে নিরাকরণের নিরাকরণ বলতে কী বোঝায়? প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে এ একটা অত্যন্ত সাধারণ নিয়ম এবং এই কারণেই এটা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নিয়ম। এ এমন একটা নিয়ম যাকে আমরা দেখেছি—প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে, ভূবিদ্যায়, গণিতে, ইতিহাস ও দর্শনে প্রয়োগ করা যায়—এ এমন একটা নিয়ম যেটাকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেও হের ড্যুরিং নিজের অজ্ঞাতসারেই এবং তাঁর নিজস্ব কায়দায় অনুসরণ করতে বাধ্য হন। এটা স্পষ্ট যে একটা যবের দানার অংকুরোদ্গম থেকে ফলন্ত গাছটির নির্দিষ্ট বিকাশ ধারাকে আমি নিরাকরণের নিরাকরণ হিসাবে আখ্যাত করছি না। যেহেতু ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসও নিরাকরণের নিরাকরণ, তাই আমি যদি এই প্রসঙ্গে ঐ ধরনের কোনো কথা বলি তাহলে এইরকম অর্থহীন উক্তি করা হবে যে যব গাছের জীবন-চক্রটি হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, আর সেই দিক থেকে এটাই সমাজতন্ত্র। আসলে কিন্তু ঠিক এটাই অধিবিদ্যাবিদরা ডায়ালেকটিকস-এর ওপর চাপাতে চান। আমরা যখন বলি যে এই সকল প্রক্রিয়াই হচ্ছে নিরাকরণের নিরাকরণ, তখন আমরা সেগুলিকে গতির এই নিয়মটির মধ্যে নিয়ে আসি এবং ঠিক এই কারণেই আমি প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে হিসাবের মধ্যে আনি না। প্রকৃতি জগৎ, মানব সমাজ ও চিন্তার গতিপ্রকৃতি ও বিকাশের সাধারণ নিয়মসমূহের বিজ্ঞান ছাড়া ডায়ালেকটিকস আর কিছুই নয়।

কিন্তু কেউ আপত্তি তুলতে পারেন: এক্ষেত্রে যে নিরাকরণ ঘটছে সেটা আসল নিরাকরণ নয়: একটা যবের দানাকে যখন আমি পিষে ফেলি, একটা পোকাকে যখন পা দিয়ে মাড়িয়ে দিই অথবা একটা ধনাত্মক রাশি a-কে যখন বাতিল করি এবং এই ধরনের অন্যান্য কিছু করি, তখন আমি নিরাকরণই করি। অথবা আমি যখন বলি গোলাপটি গোলাপ নয়, তখন গোলাপটি গোলাপ—এই বাক্যটিকে বাতিল করি; এবং এই বাতিল

বাক্যটিকে আবার বাতিল করে আমি যদি বলি: গোলাপ আসলে একটি গোলাপই, তখন আমার কথার অর্থ কী দাঁড়ায়?

বস্তুতপক্ষে, ডায়ালেকটিকসের বিরুদ্ধে অধিবিদ্যাবিদদের এই ধরনের যুক্তিই প্রধান এবং তাঁরা এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাপদ্ধতিরই যোগ্য। ডায়ালেকটিকসে নিরাকরণের অর্থ শুধু 'না' বলা নয়, অথবা কোনো কিছুর অনস্তিত্ব ঘোষণা করাও নয় কিংবা কোনো কিছুকে ইচ্ছামতো ধ্বংস করাও নয়। বহুদিন আগে স্পিনোজা বলেছিলেন: Omnis determinatio est negito—প্রতিটি সীমাবদ্ধতা অথবা নির্ধারণ একই সঙ্গে নিরাকরণও বটে।[৭৪] এই ধরনের নিরাকরণ এখানে নির্ধারিত হচ্ছে প্রথমত প্রক্রিয়াটির সাধারণ চরিত্র এবং দ্বিতীয়ত তাঁর বিশেষ চরিত্রের দ্বারা। আমি শুধু নিরাকরণ করতে পারি না, সেই নিরাকরণকে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষণও করি। সুতরাং আমাকে প্রথম নিরাকরণ এমনভাবে করতে হবে, যাতে দ্বিতীয়টা টিকে থাকে অথবা তার সম্ভাবনা বজায় থাকে। এটা কী করে সম্ভব হয়? এটা প্রতিটি ঘটনার বিশেষ চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। আমি যদি একটা যবের দানাকে চূর্ণ করি অথবা একটা পতঙ্গকে পিষে ফেলি, তাহলে আমি কাজের প্রথম অংশটা করলাম, কিন্তু কাজের দ্বিতীয় অংশটা সম্পন্ন করা অসম্ভব করে ফেললাম। সুতরাং প্রতিটি বিষয় বা বস্তুকে এমন একটা বিশেষ পদ্ধতিতে নিরাকরণ করতে হবে, যাতে ঐ বিষয় বা বস্তুটির পরবর্তী বিকাশ সম্ভব হয়, আর সব রকমের ধারণা বা মতামত সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ইনফিনিটেসিম্যাল ক্যালকুলাসে এমন ধরনের নিরাকরণের কাঠামোটাই পাওয়া যায়, যেটা ঋণাত্মক বর্গমূল থেকে ধনাত্মক ঘাত প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত ধরন থেকে ভিন্ন প্রকারের। অন্যসব বিষয়ের মতো এটাকেও আয়ত্ত করা দরকার। যব গাছ ও ইনফিনিটেসিম্যাল ক্যালকুলাস উভয়েই যে নিরাকরণের নিরাকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—শুধুমাত্র এই জ্ঞানের সাহায্যেই সফলভাবে যব চাষ অথবা গাণিতিক অন্তরকলন ও সমাকলন করা যায় না; অথবা বেহালার তারগুলির হ্রস্ব দৈর্ঘ্য অনুসারে স্বরের যে তারতম্য ঘটে শুধুমাত্র সেই নিয়মটা জানলেই আমার পক্ষে বেহালা বাজানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু এটা পরিষ্কার যে একবার a লেখা ও পরে আবার তাকে কেটে দেবার বালকোচিত খেলা অথবা গোলাপকে একবার গোলাপ নামে অভিহিত করে

পরক্ষণেই সেটাকে আবার না-করা—এই ধরনের নিরাকরণের নিরাকরণে কিছুই ঘটে না, কেবল যে-ব্যক্তি এই ক্লান্তিকর প্রয়াস চালিয়ে যায়, সে যে হাবাগোবা, সেটাই প্রমাণিত হয়। অথচ অধিবিদ্যাবিদরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে নিরাকরণের নিরাকরণকে কার্যে পরিণত করতে হলে এটাই নাকি সঠিক উপায়।

সুতরাং হের ড্যুরিং যখন জোরের সঙ্গে বলেন যে নিরাকরণের নিরাকরণ হচ্ছে ধর্ম-জগৎ থেকে ধার করা এবং মানুষের পতন ও তার উদ্ধার সংক্রান্ত কাহিনী থেকে হেগেল-উদ্ভাবিত একটা স্থূল উপমা মাত্র—তখন বুঝতে হবে তিনিই ব্যাপারটাকে আমাদের কাছে রহস্যময় করে তুলছেন। ডায়ালেকটিকস কী সেটা জানাবার অনেক আগেই মানুষ ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে চিন্তা করা শুরু করেছে, ঠিক যেমন গদ্য শব্দটার অস্তিত্বের অনেক পূর্বেই মানুষ গদ্যে কথা বলেছে। মানুষের উপলব্ধিতে ধরা পড়বার আগেই নিরাকরণের নিরাকরণ নিয়মটি প্রকৃতি ও ইতিহাসে এবং আমাদের মগজেও অচেতনভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, হেগেলই প্রথম একে স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করেন। আর হের ড্যুরিং যদি একান্তে বা নিভৃতে নিজেনিজেই এটাকে নিয়ে কাজ করতে চান এবং এই নামটি তিনি যদি সহ্য করতে না পারেন, তাহলে তিনি নিজেই একটা ভালো নাম খুঁজে বার করুন না কেন। কিন্তু যদি চিন্তা থেকে এই প্রক্রিয়াকে নির্বাসিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাঁকে বলব দয়া করে আগে এটাকে প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করুন এবং এমন একটা গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করুন যেখানে—a (ঋণাত্মক a)-কে —a দিয়ে গুণ করে $+a^2$ পাওয়া যাবে না এবং যেখানে অন্তরকলন ও সমাকলন নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য।

চৌদ্দ

উপসংহার

দর্শনের আলোচনা শেষ হলো। 'কোর্স'-এ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব জল্পনা আছে, সেগুলি বিচার করা যাবে সমাজবাদে হের ড্যুরিং-এর বিপ্লব নিয়ে আলোচনার সময়। হের ড্যুরিং আমাদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? সব কিছুই, আর কোন্ কোন্ প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছেন? কোনোটাই না। 'দর্শনের বাস্তব উপাদান, যেগুলি সেই অনুসারে প্রকৃতি ও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য', 'বিশ্বের সম্পর্কে একেবারে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা', 'পদ্ধতি-সৃষ্টিকারী মতামত' এবং হের ড্যুরিংয়ের অন্য যেসব কীর্তিকে বাগাড়ম্বর করে দুনিয়ার সামনে হাজির করা হয়েছে, যখনই আমরা সেগুলি যাচাই করতে গিয়েছি, তখনই দেখা গিয়েছে সেগুলি নিছক হাতুড়ে তত্ত্ব। যে বিশ্ব-প্রকল্পবাদ 'চিন্তার গভীরতা থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে সত্তার মৌলিক রূপগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে'—দেখা গিয়েছে তার সবগুলিই হেগেলীয় তর্কবিদ্যার বিকৃত নকল। বিশ্ব প্রকল্পবাদের মধ্যে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাটি রয়েছে যে এইসব 'মৌলিক রূপ' অথবা তর্কবিদ্যার বর্গগুলি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ও বিশ্বের বাইরে কোথায়ও একটা রহস্যময় জীবন অতিবাহিত করেছে এবং পার্থিব ক্ষেত্রে এগুলিকে 'প্রয়োগ করতে হবে'। প্রকৃতির দর্শন এমন এক সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে, যার শুরুতে রয়েছে এক 'আত্মসম বস্তুর অবস্থা'—যেটা এমনি এক অবস্থা যাকে উপলব্ধি করতে পারা যায় বস্তু ও গতির সম্পর্কের মধ্যে এক চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে; উপরন্তু এটা এমন এক অবস্থা, যাকে বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অনুমান করতে হয়, একমাত্র তিনি বস্তুর এই অবস্থাতে গতির সঞ্চার করতে পারেন। জীবজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করতে গিয়ে বাস্তবতার দর্শন বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক

নির্বাচন সংক্রান্ত ডারউইনের মতবাদকে 'মানবজাতির বিরুদ্ধে এক হিংস্র আক্রমণের নমুনা' হিসাবে প্রথমেই বরবাদ করে দিয়েছে। এবং তারপর উভয়কেই আবার পিছনের দরজা দিয়ে এই বলে ফিরিয়ে এনেছে যে এগুলি প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল শক্তি, যদিও গৌণ পর্যায়ের। তাছাড়া, আজকের দিনে যখন জনবোধ্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালাকে আর কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না, সেই সময়ে বাস্তবতার দর্শন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে যা 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের' মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় না। নৈতিকতা ও আইনের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দর্শন ইতিপূর্বে হেগেলের অগভীর ভাষ্য উপস্থিত করে তার যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল, রুশোকে বিকৃত করার ক্ষেত্রেও তার চাইতে ভিন্নতর কিছু হয় নি; আর তার যাবতীয় প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এই দর্শন ব্যবহারশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, যা পুরানো প্রাশিয়ার অত্যন্ত সাধারণ ব্যবহারজীবীদের মধ্যেও কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। যে দর্শন 'নিছক কোনো আপাত দিগন্তের সত্যতা' মেনে নিতে পারে না, তাকে আইনগত ব্যাপারে এমন একটা বাস্তব দিগন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, যে-দিগন্তের এলাকা প্রাশিয়ার 'ল্যাণ্ডরেখ্‌ট'-এর এক্তিয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির স্বর্গ-মর্ত' কে তার প্রবল বিপ্লবী ঝটিকায় আমাদের সামনে উদঘাটিত করবে বলে যে-দর্শন আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, আমরা এখনও তার প্রতীক্ষায় আছি; ঠিক যেমন আমরা প্রতীক্ষা করে আছি সেই 'শেষ ও চরম সত্যে'র এবং 'একান্ত মৌল' ভিত্তির জন্যে। 'জগৎ সম্বন্ধে বিষয়ীমুখী সীমায়িত ধারণা'র সমস্ত প্রবণতাকে যে দার্শনিক বর্জন করেন', অথচ এখানে দেখা যায় যে তাঁর অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, তাঁর আধিবিদ্যক চিন্তা-পদ্ধতির সংকীর্ণ গঠন ও তাঁর সীমাহীন আত্মম্ভরিতাই শুধু তাঁকে বিষয়ীমুখীভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলেনি, তাঁর স্বকীয় ছেলেমানুষী খেয়ালিপনাও তাঁকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণার মধ্যে আটকে ফেলেছে। তামাক, বিড়াল ও ইহুদিদের প্রতি তাঁর বিরূপতা প্রদর্শন না করে, ইহুদি সমেত সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বৈধ এমন সর্বজনীন নিয়ম ঘোষণা না করে, তিনি তাঁর বাস্তবতার দর্শনকে উপস্থিত করতে পারেন না। অন্য লোকেরা যা কখনও বলে নি এবং যেগুলি হের ড্যুরিং-এর নিজস্ব উদ্ভাবনা, সেগুলিকে বারবার অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর 'যথার্থ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি' প্রতিপন্ন করেন। জীবনের মূল্য কী,

কী করে জীবনকে ভালোভাবে উপভোগ করা যায় ইত্যাদি স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর পণ্ডিতী বাগাড়ম্বর এতই অমার্জিত অসভ্যতায় পরিপূর্ণ যে তার থেকেই বোঝা যায় গ্যোয়েটের ফাউস্টের প্রতি তাঁর রাগের কারণ। বাস্তবতার রাশভারি দার্শনিক ভাগনারকে নায়ক না করে অনৈতিক ফাউস্টকেই যে গ্যোয়েটে তাঁর নায়ক করেছেন, এটা নিশ্চয়ই গ্যোয়েটের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

এক কথায়, হেগেল যাকে বলতেন 'জার্মানির হবু আলোকপ্রাপ্তদের দুর্বলতম অবশেষ'—প্রমাণিত হলো বাস্তবতার দর্শন মোটের ওপর সেররকম বস্তুই। এ এমন একটা অবশেষ যার তারল্য ও মামুলি স্বচ্ছতার মধ্যে রহস্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরের টুকরোগুলি মিশ্রিত হয়ে এর চরিত্রকে আরও গুরুভার ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। আর বইটা যখন আমরা শেষ করে এনেছি, তখন দেখা যাচ্ছে শুরুতে আমাদের যতটা জ্ঞান ছিল, এখনও ততটুকুও রয়ে গিয়েছে; এবং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে 'এই নতুন চিন্তা-পদ্ধতি' এবং 'পদ্ধতি-সৃষ্টিকারী ধারণাগুলি' নিশ্চয়ই আমাদের কাছে বিচিত্র প্রকৃতির অদ্ভুতরকম অর্থহীন বক্তব্য উপস্থিত করেছে, তবুও আমরা এইসবের মধ্যে এমন একটা লাইনও পাইনি, যার থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। আর এই ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজের মেধা ও পণ্যকে ঢাকঢোল পিটিয়ে হকারদের মতো বাজারে হাজির করেছেন এবং যার বড় বড় কথার পিছনে কিছুই, একেবারে কোনোকিছুই নেই—সেই ব্যক্তিটিই কিনা ফিক্টে, শেলিং ও হেগেলের মতো মানুষদের ভণ্ড পণ্ডিত বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন; অথচ এঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রতিভাবান ব্যক্তিও হের ড্যুরিং-এর তুলনায় বিরাট প্রতিভাধর মানুষ। ভণ্ড পণ্ডিতই বটে? কিন্তু সেটা কার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য?

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

এক

বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

ব্যাপকতম অর্থে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হচ্ছে মানবসমাজে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপকরণগুলি উৎপাদন ও বিনিময়ের নির্ধারক নিয়মগুলির বিজ্ঞান। উৎপাদন ও বিনিময় দুটো পৃথক বিষয়। বিনিময় ছাড়াও উৎপাদন হতে পারে কিন্তু বিনিময় যেখানে স্বভাবতই উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়, সেখানে উৎপাদন ছাড়া বিনিময় হতে পারে না। এই দুটি সামাজিক কর্মের প্রত্যেকটিই বাইরের প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেটা বহুলাংশে এদের নিজস্ব ব্যাপার এবং ঠিক এই কারণেই এদের প্রত্যেকটির বহুলাংশে নিজস্ব নিয়ম আছে। কিন্তু অন্যদিকে, এরা পরস্পরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে যাতে তাদের অর্থনীতির গ্রাফের রেখাংশ বলে অভিহিত করা যায়।

যে যে অবস্থাতে মানুষ উৎপাদন ও বিনিময় করে, সেটা দেশ ভেদে ভিন্ন হয় এবং একটি দেশের মধ্যেই সেটা আবার পুরুষানুক্রমে বদলে যায়। কাজেই সকল দেশের পক্ষে এবং ইতিহাসের প্রতিটি যুগে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এক রকম হতে পারে না। তীর-ধনুক ও পাথরের অস্ত্র এবং বর্বর জাতির মানুষের মধ্যে বিনিময়ের যে সামান্য প্রথা প্রচলিত ছিল, তার থেকে হাজার অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট স্টিম-ইঞ্জিন, যন্ত্রচালিত তাঁত, রেলপথ ও ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের যুগের মধ্যে একটা বিপুল কালগত ব্যবধান রয়েছে। তিয়েরা দেল ফুয়েগোর বাসিন্দারা যেমন গণ-উৎপাদন ও বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পর্যায়ে পৌঁছায় নি, তেমনি বিল তৈরি কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জের আর্থিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাও তাদের হয়নি। আজকের ইংল্যাণ্ডে যে ধরনের নিয়মকানুন চালু রয়েছে, কেউ যদি তিয়েরা দেল ফুয়েগোর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে তার আওতায় নিয়ে আসতে চাইতেন, তাহলে সেটা একেবারে তুচ্ছ, মামুলি ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই দাঁড়াত না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হচ্ছে **ইতিহাস ভিত্তিক** বিজ্ঞান। এর আলোচ্য বিষয়বস্তু

ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ অনবরত পরিবর্তনশীল ; উৎপাদন ও বিনিময়ের বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে যেসব বিশেষ নিয়ম রয়েছে, সেগুলিকে প্রথম অনুসন্ধান করাই এর কাজ এবং যখন সেই অনুসন্ধান শেষ হবে, একমাত্র তখনই উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম সাধারণভাবে প্রযোজ্য, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সঙ্গে এটাও নিশ্চয় বলা চলে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের ক্ষেত্রে যে-নিয়মগুলি বৈধ, সেগুলি সেইসব ঐতিহাসিক যুগের ক্ষেত্রেও বৈধ—যে যুগগুলিতে এইসব উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনগুলির প্রাধান্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ধাতুমুদ্রার প্রবর্তনের ফলে এমন কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হয়, যা সেইসব দেশ ও যুগে বৈধ হয়ে থেকেছে, যেখানে ধাতুমুদ্রাই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।

একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতি এবং সেই সমাজ উদ্ভবের ঐতিহাসিক অবস্থা তার উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন পদ্ধতিকে নির্ধারণ করে। জমির সাধারণ-মালিকানাবিশিষ্ট উপজাতীয় বা গ্রামীণ গোষ্ঠী সমাজের অথবা তার সুপরিচিত লক্ষণযুক্ত অবশেষগুলিকে সঙ্গে নিয়েই সমস্ত সভ্য জাতি ইতিহাসে প্রবেশ করে। এইরকম সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের সমবণ্টন বেশ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। যেখানে গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনের মধ্যে বণ্টনের অসাম্য প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে বোঝা যায় যে গোষ্ঠীটির মধ্যে ইতিপূর্বেই ভাঙন শুরু হয়েছে।

বড়ো ও ছোটো আকারের কৃষিব্যবস্থা তাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী নানা ধরনের বণ্টন পদ্ধতি গড়ে তোলে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে বৃহদাকার কৃষিতে সব সময়েই এমন ধরনের বণ্টন পদ্ধতি দেখা দেয়, যা ক্ষুদ্রাকার কৃষি থেকে একেবারে ভিন্ন ; তেমনি বৃহদাকার কৃষি—দাস-মালিক ও দাস, সামন্ত-প্রভু ও ভূমিদাস, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে এক শ্রেণী শত্রুতার ভিত্তি তৈরি করে কিংবা শ্রেণী বিরোধের সৃষ্টি করে, কিন্তু ক্ষুদ্রাকার কৃষি—কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনিবার্যভাবে কোনো শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি করে না। বরঞ্চ বলা যায় এই ধরনের পার্থক্য যদি বর্তমান থাকে, তাহলে তার থেকে ক্ষুদ্রাকার আর্থব্যবস্থার ভাঙনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যে দেশে প্রাকৃতিক আর্থব্যবস্থা সর্বব্যাপক অথবা প্রধান ভূমিকা নিয়ে বজায় ছিল, সেখানে ধাতুমুদ্রার প্রচলন ও ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কম-

বেশি দ্রুতগতিতে আগেকার বন্টনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে, আর এটা এমনভাবে ঘটে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বন্টনের অসাম্য এবং সেই কারণে ধনী ও গরীবের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ক্রমশই প্রকটতর হতে থাকে।

মধ্যযুগের অঞ্চলভিত্তিক গিল্ড্-নিয়ন্ত্রিত হস্তশিল্প-উৎপাদন বৃহৎ পুঁজিপতি ও জীবনভোর মজুরি-শ্রমিকদের উদ্ভব ঠেকিয়ে রেখেছিল। ঠিক যেমন আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প, এযুগের ঋণ-ব্যবস্থা এবং এদের বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিনিময়ের রূপ—অবাধ প্রতিযোগিতা—অনিবার্যভাবেই ঐ দুটি শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু বন্টন পদ্ধতিতে বৈষম্য দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীভেদ দেখা দেয়। সমাজ সুবিধাভোগী ও সুবিধা-বঞ্চিত, শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত—এইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়; আর একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি নির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে (যেমন, প্রাচ্যের সেচ ব্যবস্থা) এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রথমে যে রাষ্ট্র পত্তন করেছিল, এই পর্যায় থেকে (অর্থাৎ শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ার পর থেকে—অনুবাদক) সেটা হয়ে দাঁড়ায় পদানত শ্রেণীর বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষা ও কর্তৃত্ব করার জবরদস্তিমূলক হাতিয়ার।

বন্টন-পদ্ধতি কিন্তু কেবলমাত্র উৎপাদন ও বিনিময়ের একটা নিষ্ক্রিয় ফলাফল নয়; বন্টন নিজের দিক থেকে এই দুটির ক্ষেত্রেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উৎপাদনের প্রতিটি নতুন পদ্ধতি অথবা বিনিময়ের ধরন প্রথমে তাদের পুরানো কাঠামো এবং তাদের উপযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই শুধু বাধা পায় না, বন্টনের পুরানো পদ্ধতিও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে; একমাত্র দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এটা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বন্টন-পদ্ধতি অর্জন করে। কিন্তু উৎপাদন ও বিনিময়ের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি যতই গতিশীল হয়, ততই তার বিকাশ ঘটে ও পূর্ণতা আসে, বন্টন-পদ্ধতি ততই দ্রুততার সঙ্গে পূর্বতন পর্যায়কে অতিক্রম করে যায়, এবং এতদিনকার প্রচলিত উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির সঙ্গে তার সংঘাত সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালের যে আদিম গোষ্ঠীগুলির কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলি ভারতে ও স্লাভজাতি-গুলির মধ্যে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে টিকে ছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পত্তিগত অসাম্য দেখা দেয় এবং তার ফলে এইসব গোষ্ঠীগত সমাজে ভাঙন সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন, যার বয়স এখনও তিনশো বছর অতিক্রম করেনি এবং আধুনিক শিল্প পত্তন হওয়ার পরই, অর্থাৎ মাত্র গত একশো বছরের মধ্যে যার প্রাধান্য কায়েম হয়েছে, বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য গড়ে তুলেছে ; তার একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে ; আর অন্যদিকে, বড়ো বড়ো শহরে জমায়েত ঘটেছে সম্পত্তিহীন মানুষের—যেটা শেষ অবধি এই উৎপাদন পদ্ধতির অনিবার্য পতন ডেকে আনবে।

প্রতিটি কালপর্বে বণ্টন-পদ্ধতি এবং সামাজিক অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যেকার যোগসূত্রটি এত বেশি পরিমাণে বস্তু-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে যে সেটা সবসময়েই জনগণের সহজাত প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। যতদিন পর্যন্ত কোনো উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ধারা ঊর্ধ্বগামী থাকে, ততদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিও এটাকে সাগ্রহে সমর্থন জানায়, যারা এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বণ্টনব্যবস্থা থেকে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রথম যুগে ইংরেজ শ্রমিকরা ঠিক এই কাজই করেছে। আর সেই সময়ে সমাজের পক্ষে এই উৎপাদন পদ্ধতি স্বাভাবিকই ছিল এবং বণ্টন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোনো অসন্তুষ্টি দেখা দেয়নি ; এই সময়ে বণ্টনব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব আপত্তি উঠেছিল, সেগুলি দেখা দিয়েছিল খোদ শাসক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই (সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ের, ওয়েন) এবং শোষিত জনগণের মধ্যে তাতে কোনো সাড়া জাগে নি। একমাত্র যখন এই উৎপাদন পদ্ধতি বেশ খানিকটা অবনতির দিকে যেতে থাকে, যখন এটা তার জীবনের অর্ধেকটা পার হয়ে যায়, যখন এর অস্তিত্বের ভিত্তির একটা বড়ো অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তার উত্তরাধিকারী দরজায় এসে করাঘাত করতে থাকে—একমাত্র তখনই বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অসাম্য অন্যায্য বলে মনে হয়, একমাত্র তখনই, এতদিনকার সুকৃতির বিরুদ্ধে তথাকথিত শাশ্বত ন্যায়ের দাবি উত্থাপিত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, নৈতিকতা ও ন্যায়-বিচারের প্রতি এই দাবি আমাদের এক ইঞ্চিও এগিয়ে নিয়ে যায় না ; নৈতিক ঘৃণা যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, আর্থনীতিক বিজ্ঞানে সেটা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না, শুধুমাত্র একটা ব্যাধির লক্ষণ বলে প্রতিভাত হয়। আর্থনীতিক বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে এটা দেখিয়ে দেওয়া যে সাম্প্রতিককালে যেসব সামাজিক বিকৃতি দেখা দিয়েছে, সেগুলি প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির

অবশ্যম্ভাবী ফলাফল মাত্র। কিন্তু এগুলি একই সঙ্গে এই উৎপাদন পদ্ধতির ভাঙনের ইঙ্গিতবাহী ; আর্থনীতিক বিজ্ঞানকে এটাও উদ্ঘাটন করতে হবে যে ভাঙনের সম্মুখীন আর্থনীতিক রূপের মধ্যে উৎপাদন ও বিনিময়ের ভাবী নতুন সংগঠনের উপাদান জন্ম নিচ্ছে, যেগুলি ঐসব বিকৃতির অবসান ঘটাবে। এইসব বিকৃতির বিরুদ্ধে যে-ক্রোধ কবির জন্ম দেয়[৭৫] তা একান্তভাবেই ন্যায়সঙ্গত, এবং শাসকশ্রেণীর সেবায় রত শান্তি-সুষমার যেসব প্রচারক এই বিকৃতিকে অস্বীকার করেছে বা প্রলেপ মাখিয়ে হাজির করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণও একান্ত ন্যায়সঙ্গত ; কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রেই এই ক্রোধের দ্বারা কিছুই যে প্রমাণিত হয় না, সেটা এই তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে অতীত ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই এই ধরনের ক্রোধ প্রকাশের জন্যে বিষয়বস্তুর অভাব হয় নি।

যে পরিস্থিতি ও কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন মানবসমাজ উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছে এবং এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন করেছে—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হচ্ছে সেইসব পরিস্থিতি ও কাঠামোর বিজ্ঞান—এই ব্যাপকতর অর্থে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জন্ম এখনও হয়নি। এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে যে আর্থনীতিক বিজ্ঞান আছে, সেটা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। এই বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার অবশেষগুলির সমালোচনা দিয়ে ; পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা সেগুলির অবসানের অনিবার্যতা দেখিয়ে এবং তারপর ইতিবাচক দিক থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিনিময়ের ধরনগুলির নিয়মসমূহ প্রতিপন্ন করে, অর্থাৎ যে দিকগুলি সমাজের সাধারণ লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, সেগুলি প্রতিপন্ন করে এবং এই বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির নিয়মগুলির বিভিন্ন নেতিবাচক দিক উদ্ঘাটন করে এবং সেই সঙ্গে এটা প্রতিপন্ন করে যে এই উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজের বিকাশের তাগিদে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে তার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই সমালোচনা এটা প্রমাণ করে যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিনিময়ের রূপগুলি উৎপাদন-বিকাশের পথে ক্রমশই এক অসহনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এইসব রূপের দ্বারা নির্ধারিত বণ্টন-পদ্ধতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা প্রতিদিনই আরও বেশি মাত্রায়

অসহনীয় হয়ে উঠছে—ক্রমাগত হ্রাসমান ও ক্রমাগত ধনশালী হয়ে-ওঠা পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সংখ্যাগতভাবে ক্রমবর্ধমান সম্পত্তিহীন মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ প্রতিদিন তীব্রতর হয়ে উঠছে; সামগ্রিকভাবে এই শ্রমিকদের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে; এবং শেষ পর্যন্ত এই সমালোচনা এটাও প্রতিপন্ন করে যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে যে বিপুল উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং যে শক্তিকে এই পদ্ধতি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, সেটা এখন অন্য একটা সমাজের কর্তৃত্বে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে—যে সমাজ পরিকল্পনাভিত্তিক সমবায়মূলক কাজের জন্যে সংগঠিত এবং যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সমস্ত মানুষের জীবনধারণের উপকরণ সরবরাহ এবং তাদের ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সুনিশ্চিত করা।

বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সমালোচনা সম্পূর্ণ করার জন্যে কেবলমাত্র উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের পুঁজিবাদী রূপের সঙ্গে পরিচিত থাকাই যথেষ্ট ছিল না। ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন সমাজে উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের যে রূপগুলি ছিল অথবা অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদী রূপের পাশাপাশি যেসব রূপ এখনও টিকে রয়েছে, অন্ততপক্ষে সেগুলির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ পরীক্ষা ও তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আজ পর্যন্ত একমাত্র মার্কসই একটা সাধারণ রূপরেখায় এই ধরনের অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচারের কাজ সমাধা করেছেন; আর সেই কারণে, প্রাক্-বুর্জোয়া তাত্ত্বিক অর্থনীতি সম্বন্ধে যতটুকু প্রতিপাদিত হয়েছে, তার জন্যে আমরা একান্তভাবে মার্কসের গবেষণার কাছে ঋণী।

যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে সামান্য কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তির চিন্তায় এটা প্রথম রূপ নেয়, তবুও সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি মূলত অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি; প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদরা ও অ্যাডাম স্মিথ সুস্পষ্টভাবে এটাকে সূত্রবদ্ধ করেন। এবং এটা তৎকালীন এনলাইটেন্‌মেন্ট পর্বের ফরাসি দার্শনিকদের কীর্তির পর্যায়ভুক্ত, যে কীর্তির মধ্যে ঐ যুগের যাবতীয় দোষগুণও বর্তমান। ঐ দার্শনিকদের সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি তা ঐ সময়ের অর্থনীতিবিদদের ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁদের কাছে এই নতুন বিজ্ঞানটি ঐ যুগের অবস্থা ও প্রয়োজনের অভিব্যক্তি ছিল না, ছিল শাশ্বত যুক্তির প্রকাশ; এই বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়মগুলি ঐ সব কাজকর্মের ইতিহাস-নির্ধারিত রূপের নিয়ম হিসাবে তাঁদের কাছে ধরা

পড়েনি, তাঁরা এগুলিকে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম হিসাবেই গণ্য করেছিলেন ; তাঁদের কাছে এই নিয়মগুলি ছিল মানব-প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ল যে এই মানুষ সেই যুগের সম্পত্তিবান সাধারণ নগরবাসী, যারা বুর্জোয়ায় পরিণত হতে চলেছে এবং সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্র গড়ে উঠেছে।

এখন যখন আমরা 'সমালোচনামূলক ভিত্তি' এবং হের ড্যুরিং ও তাঁর দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছি, তখন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে তিনি কিভাবে পর্যালোচনা করবেন, সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করা আমাদের পক্ষে কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। দর্শন সম্বন্ধে শুধু তাঁর অর্থহীন বাগবিস্তারই নয় (তাঁর প্রকৃতির দর্শনে যেমন দেখা গিয়েছে), তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিকৃত রূপ। তাঁর কাছে এটা বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম হিসাবে পরিগণিত হয়নি, তাঁর কাছে এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম, শাশ্বত সত্য। তাঁর কাছে নীতিবোধ ও আইনকানুনের মতো সামাজিক বিষয়গুলি কোনো যুগের বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সেই দুই বিখ্যাত ব্যক্তির দ্বারা, যার মধ্যে একজন অন্যজনকে নিপীড়ন করে অথবা করে না—যদিও শেষোক্ত অবস্থাটা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এখনও আসে নি। কাজেই আমরা যদি বলি যে হের ড্যুরিং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ও পরম সত্যে, প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মে এবং একেবারে শূন্যগর্ভ ও নিষ্ফল পুনরাবৃত্তিমূলক স্বতঃসিদ্ধে পর্যবসিত করবেন, তাহলে খুব ভুল করব না ; তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর যতটুকু জানা আছে, তার সবটুকু ইতিবাচক বিষয়বস্তুই তিনি পিছনের দরজা দিয়ে আমদানি করবেন ; আর বণ্টনব্যবস্থা যে উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যে থেকেই সামাজিক ঘটনা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে, সেটা তিনি দেখবেন না, চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে এটাকে তিনি তাঁর সেই দুই বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন। আর যেহেতু এই সবই আমাদের কাছে পরিচিত চালাকি মাত্র, তাই এই সংক্রান্ত আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

বস্তুত দুইয়ের পৃষ্ঠাতে[৬] হের ড্যুরিং আমাদের বলছেন যে,

> তাঁর দর্শনে যে সব বিষয় 'প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে', সে সবের সঙ্গে তাঁর অর্থনীতির যোগসূত্র রয়েছে, এবং 'কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে

এটা উচ্চস্তরের সত্যগুলির ওপর নির্ভরশীল, যে সব সত্য উন্নত গবেষণার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে'।

সর্বক্ষেত্রেই নিজের সম্পর্কে সেই একই রকম লাগামহীন আত্মপ্রশংসা—হের ড্যুরিং যা প্রতিপন্ন করেছেন ও প্রচার (ausgemacht)* করেছেন, সর্বক্ষেত্রেই হের ড্যুরিং তার ঢাক পেটান। হ্যাঁ, প্রচার করেছেন ঠিকই, যে-প্রচারে আমরা দিশেহারা—আবার আর এক অর্থে এ যেন একটা নিভন্ত মোমবাতিকে নিঃশেষ করার চেষ্টা।*

এর ঠিক পরেই আমরা দেখতে পাই :

> 'সমস্ত অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী একেবারে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির।'—কাজেই আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকই আছে। 'কিন্তু পরাধীনতা ও গোষ্ঠী জীবনের যে সব রাজনৈতিক কাঠামোর অভিজ্ঞতার ফলাফল এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম অর্জন করেছে, যথাযথ পদ্ধতিতে ঐ সব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে যদি অনুসন্ধান চালানো হয়', একমাত্র তা হলেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি থেকে অতীত ইতিহাসকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। 'দাসপ্রথা ও মজুরি-দাসত্বের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যমজ ভাইয়ের মতো যুক্ত বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক সম্পত্তিকে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সাংবিধানিক রূপ হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং এতদিন পর্যন্ত ঐগুলি এমন একটা কাঠামো গঠন করেছে, একমাত্র যার মধ্যেই প্রকৃতির আর্থনীতিক নিয়মাবলীর ফলাফল নিজেদের ব্যক্ত করতে পেরেছে।'

এই বাক্যটি হচ্ছে একটি আগমনী ঘোষণা, যা ভাগনারের অপেরাতে আগাগোড়া অনুরণিত হয়। এটা সেই বিখ্যাত দুই ব্যক্তির প্রবেশ ঘোষণা করছে। কিন্তু এট। তার চেয়েও কিছু বেশি : এটা হের ড্যুরিং-এর বইয়ের প্রধান বক্তব্য। আইনকানুনের ক্ষেত্রে হের ড্যুরিং রুশোর সাম্যবাদের বক্তব্যটিকে সমাজবাদের ভাষায় অক্ষম তর্জমা করে আমাদের সামনে হাজির করা ছাড়া বেশি কিছু করতে পারেন নি, প্যারীর শ্রমিকদের সস্তা পানশালায় এর থেকে অনেক উচ্চস্তরের বক্তব্য যে-কেউ শুনতে পারেন। তিনি এখন রাষ্ট্রের

---

* জার্মান ভাষাতে এ একটা শব্দের খেলা, Ausmachen শব্দটি তর্জমা করা কঠিন। এর অর্থ সম্পূর্ণতাদান, আবার আর এক অর্থ নিঃশেষ করা ফেলা। সম্পাদক।

হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ বলপ্রয়োগে প্রকৃতির চিরন্তন আর্থনীতিক নিয়মগুলির যে বিকৃতি ঘটে, তাই নিয়ে অর্থনীতিবিদদের শোকের অক্ষম সমাজবাদী তর্জমাই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আর এই ব্যাপারে হের ডুরিং সমাজবাদীদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই একটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন। জাতিনির্বিশেষে প্রতিটি সমাজবাদী শ্রমিকই বেশ ভালো করেই জানেন যে বলপ্রয়োগ শোষণের কারণ নয়, এটা শোষণকে টিকিয়ে রাখে মাত্র; পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের মধ্যে সম্পর্কটাই হচ্ছে শোষণের ভিত্তি এবং এই সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতি নির্ভর, বলপ্রয়োগজাত নয়।

> এরপর আমাদের আরও বলা হচ্ছে যে সমস্ত আর্থনীতিক প্রশ্নেই 'দুটি প্রক্রিয়া—উৎপাদন ও বণ্টন—লক্ষ্য করা যায়।' আর হাল্কা কথা বলার জন্যে কুখ্যাত সেই জে. বি. সেই একটা তৃতীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ ভোগের কথা বলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর অনুগামীদের মতোই অর্থবহ কিছু বলতে পারেন নি; তিনি শুধু এইটুকুই বলেছেন যে বিনিময় বা সঞ্চালন শুধু উৎপাদনেরই একটা বিভাগ এবং শেষ উপভোগকারী বা ক্রেতার কাছে দ্রব্যসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে সব কাজ করা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কাজই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন ও সঞ্চালন পরস্পর-নির্ভর, অথচ মূলত দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে ফেলে এবং এই বিভ্রান্তি এড়ানোর চেষ্টা শুধুমাত্র 'বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে'—নির্লজ্জের মতো এই রকম দাবি করে হের ড্যুরিং শুধু এটাই প্রতিপন্ন করছেন যে গত পঞ্চাশ বছরে সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, হয় তিনি সেটা জানেন না অথবা সেটা তাঁর বোধগম্য হয় নি। আর সত্যিই তাঁর বইয়ের বাকি অংশে এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এটাই সব নয়। উৎপাদন ও বিনিময়কে শুধুমাত্র উৎপাদনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, তিনি বণ্টনকে উৎপাদনের পাশাপাশি, দ্বিতীয়, একেবারে সম্পূর্ণ বাইরের প্রক্রিয়া হিসাবে রেখেছেন, যার সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে নির্ধারক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বণ্টন সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট সমাজের এবং যে ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে ঐ সমাজের জন্ম, তার উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্কের অনিবার্য ফল। যখন আমরা এইসব সম্পর্ক ও অবস্থাগুলি জানতে পারি, তখন আমরা নিশ্চিতভাবেই ঐ সমাজে প্রচলিত বণ্টনের ব্যবস্থা নিরূপণ

করতে পারি। কিন্তু এটাও আমরা সহজেই দেখতে পাই যে নীতিবোধ, আইনকানুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে-সূত্রগুলি হের ড্যুরিং 'প্রতিষ্ঠা' করেছেন, সেগুলির প্রতি যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে না চান, তাহলে তাঁকে এই প্রাথমিক আর্থনীতিক বক্তব্যটি অস্বীকার করতেই হবে, বিশেষ করে তাঁর সেই অপরিহার্য দুই ব্যক্তিকে যদি অর্থনীতির মধ্যেই চোরাই চালান করতেই হয়। আর বন্টনকে যদি একবার উৎপাদন ও বিনিময় থেকে খোশ মেজাজে আলাদা করে ফেলা যায়, তাহলে এই বিরাট ঘটনাটি সহজেই ঘটানো সম্ভব।

কিভাবে হের ড্যুরিং নীতিবোধ ও আইনের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন, সেটা প্রথমে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি প্রথমে একজন মানুষকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং বলেছিলেন:

> 'নিঃসঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া অথবা যার অর্থ অন্য মানুষের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কহীন, সেই মানুষের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না; সেই রকম মানুষের করণীয় সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না। তিনি কী করতে চান—সেটাই একমাত্র প্রশ্ন।'

কিন্তু এই যে মানুষ, যাকে একেবারে নিঃসঙ্গ ধরা হচ্ছে এবং যার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেই মানুষটি স্বর্গোদ্যানের দুর্ভাগা 'আদিম ইহুদি আদম' ছাড়া আর কে হতে পারে, যেখানে তার পাপ করবার কোনো অবস্থা নেই, কারণ সেটা করবার মতো কোনো সুযোগ সেখানে নেই?

তা সত্ত্বেও বাস্তবতার দার্শনিক এই আদমকে পাপ করার অবস্থাতে পড়তেই হবে। এই আদমের পাশে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় আর একজন আদম, ঢেউ খেলানো অলকগুচ্ছ নিয়ে কোনো ইভ নয়। সঙ্গে সঙ্গে আদম বাধ্যবাধকতায় আটকে পড়ে এবং সেটা ছিন্ন করে। তার নিজের ভাইকে সমান অধিকার দিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে সে তাকে নিজের অধীনে এনে ফেলে, নিজের দাসে পরিণত করে এবং এই প্রথম পাপের ফলেই, মানুষকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার আদিম পাপের জন্যেই আজ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা দুঃখকষ্টময় হয়ে রয়েছে। ঠিক এই কারণেই হের ড্যুরিং মনে করেন পৃথিবীর ইতিহাসটার এক কানাকড়িও মূল্য নেই।

প্রসঙ্গত, হের ড্যুরিং মনে করেন যে আদিম পাপ ও পাপমোচনের পৌরাণিক কাহিনীর নকল হিসাবে 'নিরাকরণের নিরাকরণকে' আখ্যাত করে নিরাকরণের নিরাকরণকে যথেষ্ট নিন্দা করতে পেরেছেন। কিন্তু সেই

একই কাহিনীর যে নবতম ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমরা কী বলব ? (কেননা বশংবদ পত্রপত্রিকার[77] একটা কথা ব্যবহার করে বলা যায়, পাপমোচন সম্বন্ধেও আমাদের যথাসময়ে 'আসল ব্যাপারে আসতে হবে')। আমরা যেটুকু বলতে পারি তা হচ্ছে যে-প্রাচীন সেমেটিক উপজাতীয় লোককাহিনী অনুযায়ী সেই মানব ও মানবী তাদের নিষ্পাপ অবস্থা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করেছিল, আমাদের কাছে সেই কাহিনীটাই পছন্দসই আর দুটি মানুষকে নিয়ে আদিম পাপ ঘটানোর অবিসংবাদী গৌরব হের ডুরিং পেতে পারেন।

এবারে দেখা যাক কিভাবে তিনি এই আদিম পাপকে অর্থনীতির ভাষায় রূপান্তরিত করছেন :

> 'রবিনসন ক্রুশো তার নিজের ক্ষমতার জোরেই একা প্রকৃতির মুখোমুখি হয় এবং তার সম্পদে ভাগ বসাবার মতো আর কেউ ছিল না—এই রবিনসন ক্রুশোর ধারণা থেকে আমরা উৎপাদন সম্বন্ধে একটা যথাযথ জ্ঞানের ছক পেতে পারি……বণ্টনের ধারণায় যা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যার পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে দুটি মানুষের জ্ঞানগত ছক, এই মানুষেরা তাদের আর্থিক শক্তিকে একত্রিত করে এবং তাদের নিজ নিজ অংশ সম্বন্ধে কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছায়। বস্তুতপক্ষে এই সরল দ্বৈততা ছাড়া বণ্টনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি চিত্রিত করতে এবং যৌক্তিক ধারায় তাদের গোড়াকার নিয়মগুলি অনুশীলন করতে আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই।…সমপর্যায়ে থেকে সমবায়মূলক কাজ এখানে যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি সম্ভব এক পক্ষকে সম্পূর্ণ অধীনস্থ করে বিভিন্ন শক্তির একীকরণ, এই এক পক্ষ তখন একজন দাসের মতো অথবা নিছক একটা যন্ত্র হিসাবে আর্থনীতিক কাজকর্ম করতে বাধ্য হয়, আর যন্ত্রের মতোই তার রক্ষণাবেক্ষণ চলে।…একদিকে সাম্য ও অস্তিত্বনাশের অবস্থা এবং অন্যদিকে সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব ও একান্তভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ—এই দুইয়ের মধ্যে অনেকগুলি স্তর রয়েছে, যেগুলি বিশ্ব ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। এখানে একটি একান্ত পূর্বশর্ত হচ্ছে সমগ্র ইতিহাসে ন্যায় ও অন্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা।'…এবং সিদ্ধান্তে

আসার ক্ষেত্রে বণ্টনের সমগ্র প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ায় বণ্টনের আর্থনীতিক অধিকারের' প্রশ্ন।

এতক্ষণে হের ড্যুরিং আবার তাঁর পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে পেলেন। তাঁর সেই দুই ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি তাঁর যুগকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু এই ত্রিমূর্তির আড়ালে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে—একজন অনামা ব্যক্তি।

'পুঁজি উদ্বৃত্ত শ্রমের উদ্ভব ঘটায় নি। যেখানে সমাজের কোনো একটি অংশ উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়, সেখানেই উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের জীবন ধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার জন্যে, মুক্ত কিংবা বদ্ধ, যে কোনো ধরনের শ্রমিকই তার নিজের ভরনপোষণের জন্যে যেটুকু শ্রম-সময়ের দরকার, তার সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রম-সময় যোগ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে এই মালিক এথেন্সের অভিজাতবর্গ, ইত্রুস্কীয় ধর্মাধিপতি, রোমের নাগরিক, নরম্যাণ্ডির ব্যারন, আমেরিকার দাসমালিক ও ওয়ালেচের ভূম্যধিকারী, আজকের জমিদার অথবা পুঁজিপতি, যেই হোক না কেন।' (মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, ২য় সংস্করণ, পৃ ২২৭)*

হের ড্যুরিং যখন সব রকমের উৎপাদনে শোষণের মূল চেহারা, বিশেষ করে শ্রেণী-বিরোধযুক্ত সমাজে, এইভাবে জানতে পারলেন, তখন তাঁর কাজ হলো তাঁর সেই দুই ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে নিয়োগ করা এবং তাতে তাঁর বাস্তবতার অর্থনীতির সুগভীর ভিত্তি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই 'পদ্ধতি-নির্মাণকারী ধারণা' রূপায়িত করতে তিনি আর একটুও ইতঃস্তত করেন নি। এখানে আসল বিষয় হচ্ছে ক্ষতিপূরণহীন শ্রম—শ্রমিকের নিজের ভরনপোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত শ্রম। সেই আদম যাকে এখানে রবিনসন ক্রুশো বলা হচ্ছে, সে তার দ্বিতীয় আদম তৈরি করল—ম্যান ফ্রাইডে নামে চাকরকে—যে তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে বাধ্য। কিন্তু যতটুকু তার ভরনপোষণের জন্যে প্রয়োজন, তার থেকে বেশি পরিশ্রম ম্যান ফ্রাইডেকে করতে হয় কেন? এ প্রশ্নের জবাবও মার্কস ধাপে ধাপে দিয়েছেন। কিন্তু দুটি মানুষের পক্ষে এই জবাব যথেষ্ট ক্লান্তিকর। ব্যাপারটা এক মুহূর্তেই মীমাংসা করে দেওয়া যায়: ক্রুশো ফ্রাইডেকে 'নিপীড়ন' করে। তাকে বাধ্য করে 'দাস অথবা যন্ত্রের মতো আর্থনীতিক

কাজকর্ম চালিয়ে যেতে', অথচ তাকে টিকিয়ে রাখে 'যন্ত্রের মতো'। এই ধরনের শেষতম 'সৃষ্টিশীল কাজে'র মধ্যে দিয়ে হের ড্যুরিং এক ঢিলে দুই পাখি মারেন। প্রথমত, তিনি এযাবৎকাল ধরে প্রচলিত বণ্টন-ব্যবস্থার নানারূপ, তাদের পার্থক্য ও তাদের উৎপত্তির কারণগুলি ব্যাখ্যা করার অসুবিধা এড়াতে পেরেছেন ; তাঁর কাছে সমস্ত ধরনের বণ্টনই তুচ্ছ ব্যাপার, কেননা সেগুলির ভিত্তি হচ্ছে নিপীড়ন, বলপ্রয়োগ। এটা নিয়ে আমাদের শীঘ্রই আলোচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এইভাবে তিনি বণ্টনের সমগ্র তত্ত্বকে অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে নৈতিকতা ও আইনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্র থেকে কমবেশি দোদুল্যমান মতবাদ ও ভাবাবেগের জগতে স্থানান্তরিত করেন। কাজেই তাঁর কোনো কিছুর অনুসন্ধান অথবা প্রমাণ করবার দরকার পড়ে না ; নিজের ইচ্ছামতো তিনি একে বাতিল করে দিয়ে ঘোষণা করতে পারেন যে শ্রমজাত দ্রব্যগুলির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হবে উৎপাদনের বাস্তব কারণ অনুযায়ী নয়, নিয়ন্ত্রিত হবে হের ড্যুরিং-এর কাছে যা ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ—সেই মানদণ্ড অনুসারে। কিন্তু হের ড্যুরিং-এর কাছে যেটা ন্যায্য বলে মনে হয় সেটা কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়। কাজেই সেটা মোটেই সত্য নয়। কেননা হের ড্যুরিং-এর মতে প্রকৃত সত্য 'সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়'। ১৮৬৮ সালে হের ড্যুরিং তাঁর 'দি ফেট অব মাই মেমোরেণ্ডাম অন দি সোস্যাল প্রবলেম ফর দি প্রুশিয়ান মিনিস্ট্রি অব স্টেট' বইতে লিখেছিলেন যে

> 'সমস্ত উন্নত সভ্যতার প্রবণতা হচ্ছে সম্পত্তির উপর ক্রমাগত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা এবং আধুনিক সভ্যতার মর্ম ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপরই, সার্বভৌমত্বের অধিকার ও এলাকা সংক্রান্ত বিভ্রান্তির ওপর নয়।'

• আর তাছাড়া তিনি তখন কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না

> 'জীবিকা অর্জনের ভিন্ন উপায়ে মজুরি-শ্রমের রূপান্তর কিভাবে মানব চরিত্রের নিয়ম ও সমাজ-দেহের স্বাভাবিক আবশ্যিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।'

কাজেই ১৮৬৮ সালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মজুরি-শ্রম নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত ছিল ; আর ১৮৭৬ সালে এ দুটোই হয়েছে বলপ্রয়োগ ও 'দস্যুবৃত্তি' থেকে উদ্ভূত, কাজেই সেগুলি অন্যায্য। যেহেতু আমরা বলতে পারি না যে কী অবস্থাতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এই পরাক্রমশালী ও আবেগপ্রবন প্রতিভার

কাছে সেটা ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক বলে মনে হয়েছে, তাই সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি বিবেচনার ক্ষেত্রে ন্যায্য অন্যায্যের প্রশ্নে হের ড্যুরিং-এর ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, মনোগত ধারণার ওপর নির্ভর না করে প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ নিয়মগুলির ওপর নির্ভর করাই উপযুক্ত কাজ হবে।

যদি দারিদ্র ও বিলাসের নিদারুণ বৈপরীত্যভরা শ্রমজাত দ্রব্যের বর্তমান বন্টন পদ্ধতিটির আসন্ন উচ্ছেদের ক্ষেত্রে—এই বন্টন পদ্ধতিটি অন্যায়, এবং ন্যায়ই জয়যুক্ত হবে—এর বেশি কোনো উপলব্ধি না থাকে, তাহলে অবস্থা খুব খারাপই বলতে হবে এবং এই কাজে আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। মধ্য যুগের যেসব মরমী সাধক ভাবী সহস্র বর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরাও শ্রেণী বিরোধের অন্যায্যতা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর পূর্বে, আধুনিক ইতিহাসের সূচনায়, টমাস মুনজের শ্রেণী বিরোধের কথা জগতের কাছে ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবে ঠিক ঐ কথাটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—তারপর সেটা মিলিয়ে যায়। এবং আজ যদি শ্রেণীবৈষম্য ও জাতিগত পার্থক্য দূর করার আহ্বান আসে, যেটা ১৮৩০ সাল অবধি শ্রমজীবী ও নির্যাতীত জনসাধারণকে বিশেষ নাড়া দেয়নি, আজ যদি সেই আহ্বান লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়, যে ধারায় ও তীব্রতায় প্রতিটি দেশে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটছে, সেই রকম ধারা ও তীব্রতায় এই আহ্বান যদি একের পর এক দেশকে আলোড়িত করে এবং একটি প্রজন্মের অর্জিত শক্তি যদি এই আহ্বানের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সকল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে নিকট-ভবিষ্যতে নিজেদের বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে থাকে—তাহলে তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে আধুনিক বৃহদাকার শিল্প একদিকে এমন ধরনের প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসাবে গড়ে তুলেছে, যে-শ্রেণী ইতিহাসে এই প্রথম বিশেষ কোনো শ্রেণী-সংগঠন অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা অবসানের দাবির বদলে সমস্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের অবসানের দাবি তুলতে সক্ষম। আর এই শ্রেণীর অবস্থান এমনই যে চীনা কুলিদের স্তরে নেমে যাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেও এরা এই দাবিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেই। অন্যদিকে, এই বৃহদাকার শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে, যে শ্রেণী যাবতীয় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও জীবনধারণের উপকরণের একচেটে মালিক; কিন্তু প্রতিটি ফাটকাবাজির তেজি পর্যায়ে এবং তার পরবর্তী মন্দার মধ্যে দিয়ে এটা

প্রমাণিত হয়েছে যে উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা এর আর নেই, এই শক্তিগুলির বিকাশ এই শ্রেণীর ক্ষমতার সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, এই শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত সমাজ একটা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতো ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে—যে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আটকে যাওয়া সেফটি ভাল্‌ভটিকে খোলার ক্ষমতা ড্রাইভারের আর নেই। অন্যভাবে বলা যায়, এর কারণ হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি যে উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্টি করেছে এবং পণ্যসামগ্রীর যে বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—এই উভয়েরই উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গেই প্রবল বিরোধ ঘটছে এবং এই বিরোধ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সমগ্র আধুনিক সমাজকে যদি ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটাতেই হবে, যে বিপ্লব অবসান ঘটাবে যাবতীয় শ্রেণীগত পার্থক্যের। এই স্পষ্ট বাস্তব ঘটনাটি কমবেশি স্বচ্ছ রূপে, অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে শোষিত সর্বহারাদের চেতনাকে প্রভাবিত করছে—এই ঘটনার ওপরই আধুনিক সমাজবাদের বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যয়টি নির্ভরশীল, কোনো শৌখিন দার্শনিকের ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত ধারণার ওপর নয়।

দুই

বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব

'আমার পদ্ধতিতে সাধারণ রাজনীতির সঙ্গে আর্থনীতিক নিয়মের রূপগুলি এত নির্দিষ্টভাবে ও সেই সঙ্গে এত মৌলিক উপায়ে নির্ধারিত যে এ সম্বন্ধে অনুশীলনের জন্যে এই বিষয়টির বিশেষ উল্লেখ মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির গঠন ইতিহাসের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিষয় এবং আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার নজিরগুলি এর ফল মাত্র কিংবা কয়েকটি বিশেষ ঘটনা, আর তাই এগুলি গৌণ বিষয়। কয়েকটি নবতর সমাজবাদী মতবাদে সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্কের প্রতীয়মান সাদৃশ্যকে তাদের মৌলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে; এইসব মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী আর্থনীতিক অবস্থার অধীন এবং তারা যেন আর্থনীতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। ওটা সত্য যে গৌণ অর্থাৎ দ্বিতীয় ধরনের ফলাফলগুলির নিজস্ব অস্তিত্ব আছে এবং আজকের দিনে এটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিক বিষয়ের সন্ধান করতে হবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে, অপ্রত্যক্ষ আর্থনীতিক ক্ষমতার মধ্যে নয়।'

এই ধারণাটা আর এক জায়গাতে বেশ ভালো করে বলা আছে, যেখানে হের ড্যুরিং

'শুরু করছেন সেই সূত্র থেকে 'যাতে বলা হচ্ছে রাজনৈতিক সম্পর্ক হলো আর্থনীতিক অবস্থার নির্ধারক কারণ এবং এর বিপরীত সম্পর্কটি হলো গৌণ অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থার একটা প্রতিক্রিয়া··· যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তিকে তার নিজস্ব প্রয়োজনে প্রারম্ভ-সূত্র

হিসাবে গণ্য না করে, নিছক পেট-ভরাবার উপায় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, ততক্ষণ এটা ব্যক্তি-বিশেষের মনের মধ্যে সঞ্চিত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তারাজি মাত্র, তা ঐ ব্যক্তিকে সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী হিসাবে যতই চরমপন্থী বলে মনে হোক না কেন।'

এটাই হলো হের ড্যুরিং-এর তত্ত্ব। এটাতে এবং আরও অনেক বক্তব্যের মধ্যে এই তত্ত্বটি প্রায় অনুশাসন জারি করার মতোই হাজির করা হয়েছে। তাঁর তিনটি মোটা বইয়ের কোথায়ও এই তত্ত্বটি প্রমাণিত কিংবা এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডনের বিন্দুমাত্র প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। এমনকি ঐসব যুক্তি যদি বুনো জামের[৭৯] মতো সস্তাও হয়, তাহলেও হের ড্যুরিং তার দু'চারটিও আমাদের দেবেন না। কেননা রবিনসন ক্রুশো যখন ফ্রাইডেকে তাঁর দাসে পরিণত করেছিলেন, সেই বিখ্যাত আদিম পাপের মধ্যেই সমগ্র বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সেটা ছিল বলপ্রয়োগের ঘটনা, সুতরাং একটা রাজনৈতিক কাজ। আর যেহেতু এই দাসত্ব-বন্ধন ছিল সবকিছুর শুরু এবং সমগ্র অতীত ইতিহাসের গোড়ার কথা এবং তাই এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল অবিচারজনিত আদিম পাপ; পরবর্তীকালে এটার তীব্রতা একটু হ্রাস পায় এবং 'আর্থনীতিক নির্ভরতার অপ্রত্যক্ষ রূপে পরিণত হয়'; এবং যেহেতু বর্তমান যুগ পর্যন্ত 'বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত' সম্পত্তি তার অধিকার বজায় রেখেছে, তাই দাসত্ব বন্ধনের আদি ঘটনাটিই অনুরূপভাবে তার ভিত্তি; সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে রাজনৈতিক কারণ অর্থাৎ বলপ্রয়োগের ঘটনা অনুযায়ী যাবতীয় আর্থনীতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়, সে নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীল।

আমাদের এখন একথা বলতেই হয় যে একমাত্র হের ড্যুরিং-এর মতো একজন আত্মম্ভরী ব্যক্তির পক্ষেই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দারুণ 'মৌলিক' বলে মনে করা সম্ভব, অথচ আসলে যা মোটেই মৌলিক নয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রের বৃহৎ কর্মকাণ্ড ইতিহাসে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে—এটা তো লিখিত ইতিহাসের মতোই পুরানো, এবং এই কারণেই মঞ্চের কোলাহলপূর্ণ দৃশ্যপটের অন্তরালে, নেপথ্যে, ধীরস্থিরভাবে জনগণের সত্যিকারের যে প্রগতিশীল বিবর্তন ঘটেছে, তার উপাদান এত কম রক্ষিত হয়েছে। এই ধারণাটি অতীতে ঐতিহাসিকদের যাবতীয় ভাবনাচিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে এবং এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত করেছেন রেস্টোরেশন যুগের[৮০] ফরাসি

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা ; আর এ সম্বন্ধে 'মৌলিক' কথাটা নিশ্চয়ই এই যে এসব হের ড্যুরিং-এর কিছুই জানা নেই।

তাছাড়া আমরা যদি উপস্থিত ধরে নিই যে সকল অতীত ইতিহাস মানুষের হাতে মানুষের দাসত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে, তা হলেও আমরা বিষয়টার একেবারে গোড়ায় যেতে পারছি না। কারণ তখন প্রশ্নটা দাঁড়াবে : ক্রুশো তাহলে কী করে ফ্রাইডেকে দাস করতে পারলেন ? শুধু একটু মজা লোটবার জন্যে ? নিশ্চয়ই তা নয়। বরঞ্চ আমরা দেখছি যে ফ্রাইডেকে 'একজন দাসরূপে কিংবা একটি যন্ত্র হিসাবে আর্থনীতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং যন্ত্র হিসাবেই তার রক্ষণাবেক্ষণ চলছে'। ক্রুশো ফ্রাইডেকে দাসে পরিণত করেছেন তাঁর নিজের স্বার্থে কাজ করাবার জন্যে। আর তিনি কি-ভাবে ফ্রাইডের শ্রম থেকে নিজের জন্যে লাভ আদায় করে নিতে পারলেন ? ফ্রাইডেকে কর্মক্ষম রাখার জন্যে ক্রুশো তাকে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী দেন, ফ্রাইডে যদি তার শ্রমের মাধ্যমে তার চাইতে বেশি দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে —একমাত্র তাহলেই ক্রুশো লাভবান হতে পারেন। সুতরাং ফ্রাইডে হের ড্যুরিং-এর স্পষ্ট নির্দেশটি অমান্য করে তার দাসত্ব থেকে উদ্ভূত 'রাজনৈতিক শক্তিকে নিজস্ব প্রয়োজনের সূচনা হিসাবে গণ্য' না করে নিছক 'পেট-ভরাবার উপায় হিসাবে গণ্য করেছে'। তাহলে সে এখন দেখুক কী করে সে তার প্রভু এবং শিক্ষক ড্যুরিং-এর সঙ্গে চলবে।

হের ড্যুরিং যে ছেলেমানুষী উদাহরণটি উপস্থিত করেছেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে 'ইতিহাসের দিক থেকে প্রধান কথা হচ্ছে' বলপ্রয়োগ ; অথচ ঐ উদাহরণটিতে প্রমাণিত হয় যে বলপ্রয়োগ একটি উপায় মাত্র, আর লক্ষ্যটি হচ্ছে আর্থনীতিক সুবিধা আদায়। লক্ষ্য অর্জনের উপায়ের চাইতে লক্ষ্য 'যত বেশি মৌলিক', ইতিহাসে আর্থনীতিক সম্পর্কের এদিকটি রাজনৈতিক সম্পর্কের চাইতে তত বেশি মৌলিক। তাহলে এই উদাহরণটির সাহায্যে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতটাই প্রমাণিত হয়। আর ক্রুশো ও ফ্রাইডে সম্পর্কে যে কথাটা প্রযোজ্য. বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রভুত্ব ও অধীনতার সকল ঘটনার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। গুরুগম্ভীর কথাটা ব্যবহার করে বলতে হয় অধীনতা সব সময়েই 'পেট-ভরাবার' ব্যাপার (পেট-ভরাবার ব্যাপারটিকে ব্যাপকার্থে ধরলে) হয়েই থেকেছে, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি কখনও, কোথাও 'তার নিজস্ব প্রয়োজনে' প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এটা কল্পনা করতে একজন হের ড্যুরিং-এর দরকার হয় যে রাষ্ট্রীয় কর হচ্ছে 'গৌণ বা দ্বিতীয় ধরনের ফল' অথবা বর্তমান শাসক-বুর্জোয়া অথবা শাসিত-প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শক্তি-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে 'তার নিজস্ব প্রয়োজনে' এবং শাসক-বুর্জোয়াদের 'পেট-ভরাবার উপায়' হিসাবে নয়, অর্থাৎ এর উদ্ভব ঘটেছে মুনাফা অর্জন ও পুঁজি সঞ্চয়ের জন্যে নয়।

যাই হোক আবার সেই পুরানো দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। 'তরোয়াল হাতে' ক্রুশো ফ্রাইডেকে তাঁর দাস করে ফেলেন। কিন্তু এটা করতে হলে তরোয়াল ছাড়া ক্রুশোর আরও কিছু প্রয়োজন। সকলেই কিন্তু দাসকে ব্যবহার করতে পারে না। দাসকে ব্যবহার করার জন্যে দুই ধরনের জিনিস থাকা দরকার: প্রথমত, দাসের শ্রমকে কাজে লাগাবার জন্যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ; এবং দ্বিতীয়ত, দাসের জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম দ্রব্যসামগ্রী। কাজেই দাসপ্রথা সম্ভব হওয়ার পূর্বে উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছতেই হয় এবং বণ্টনের দিক থেকে কিছুটা অসাম্য নিশ্চয়ই দেখা দেয়। আর সমাজে দাসপ্রথাকে প্রধান উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিণত হতে হলে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ সংগ্রহের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। জমির সাধারণ মালিকানাবিশিষ্ট আদিম গোষ্ঠী সমাজে দাসপ্রথার অস্তিত্ব হয় ছিল না, অথবা সেটার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌণ। রোমে গোড়ার দিকের কৃষক-অধ্যুষিত শহরেও এই ব্যবস্থাই ছিল; কিন্তু রোম যখন হয়ে উঠল 'বিশ্ব নগরী' এবং ইতালিতে জমির মালিকানা যখন মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতে ক্রমশ চলে যেতে থাকল, তখন কৃষক সম্প্রদায়কে বসানো হলো। যদি পারসিক যুদ্ধের সময় করিন্থে দাসদের সংখ্যা ৪৬০,০০০ এবং অজিনাতে ৪৭০,০০০ হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে প্রতিটি স্বাধীন নাগরিক[৮১] পিছু দাসের সংখ্যা ছিল ১০ জন; এর পিছনে 'বলপ্রয়োগ' ছাড়াও আরও যে কারণ ছিল তা হচ্ছে যথেষ্ট উন্নত শিল্প ও হস্তশিল্পের অস্তিত্ব এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা ইংল্যাণ্ডের তুলো-শিল্পের মতো অতটা বলপ্রয়োগ-নির্ভর ছিল না; যে সকল জেলাতে তুলো উৎপন্ন হতো না কিংবা সীমান্ত রাজ্যগুলির তুলনায় যেখানে তুলো উৎপাদন-কারী রাজ্যগুলির জন্যে দাস সৃষ্টি করা হতো না, সেখানে বলপ্রয়োগ ছাড়াই দাসপ্রথার মৃত্যু ঘটে। তার একমাত্র কারণ হলো এই প্রথা আর লাভজনক হচ্ছিল না।

কাজেই বর্তমানকালে সম্পত্তি যে অবস্থায় আছে, সেটাকে বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক বলে অভিহিত করে যখন এইভাবে চিহ্নিত করা হয় যে এটা হচ্ছে

> 'সেই ধরনের প্রভুত্ব যার মূলে জীবিকানির্বাহের প্রকৃতিগত উপকরণগুলি থেকে সহযোগী মানুষদের বঞ্চিত করার ব্যাপারটাই শুধু নেই, তার চেয়েও গুরুতর বিষয়টি রয়েছে, আর তা হচ্ছে দাসসুলভ কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করা।'

হের ড্যুরিং সমগ্র সম্পর্কটাকে উল্টো করে দাঁড় করিয়েছেন। একজন মানুষকে একেবারে অনুগতভাবে কাজ করতে একমাত্র ওখনই বাধ্য করা যায়, যখন তার মালিকের হাতে শ্রমের হাতিয়ারগুলি থাকে, একমাত্র এইসব হাতিয়ারের সাহায্যেই মালিক দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ লোকটিকে তার কাজে লাগাতে পারে , আর দাসপ্রথার ক্ষেত্রে, এছাড়াও, জীবনধারণের উপকরণগুলি মালিকের হাতে থাকা প্রয়োজন, যাতে মালিক দাসকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই এমন পরিমাণ সম্পত্তি হাতে থাকা প্রয়োজন যা গড়পড়তা সম্পত্তির পরিমাণের চাইতে বেশি। এই সম্পত্তিটা এলো কি ভাবে? যেভাবেই আসুক এটা পরিষ্কার যে এটা গায়ের জোরে অপহরণ করা হয়েছে। কাজেই বলপ্রয়োগ এর ভিত্তি হতে পারে, তবে এটাকে কিছুতেই অনিবার্য বলা যায় না। এটা শ্রমলব্ধ হতে পারে, চুরি করাও হয়ে থাকতে পারে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য বা প্রতারণার মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে এটার অপহরণ করার অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই যে এটা শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনোভাবেই ইতিহাসে ডাকাতি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়নি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এর অস্তিত্ব আগেই ছিল, যদিও কয়েকটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপে, সমস্ত সভ্য মানুষের সুপ্রাচীন আদিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। প্রথমে বিদেশীদের সঙ্গে লেনদেনের মধ্যে দিয়ে পণ্যরূপে এগুলির উদ্ভব ঘটে ঐসব গোষ্ঠীর মধ্যে। গোষ্ঠীগুলির উৎপন্ন দ্রব্য যত বেশি পরিমাণে পণ্যের রূপ নেয়, অর্থাৎ উৎপাদকদের নিজেদের ব্যবহারের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী যত কম উৎপন্ন হতে থাকে এবং যত বেশি সেগুলি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়, এবং আদিম স্বাভাবিক শ্রম-বিভাগের বদলে বিনিময় যতই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসারিত হতে থাকে, ততই গোষ্ঠীভুক্ত পৃথক পৃথক ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় এবং ততই প্রাচীন সর্বজনীন

ভূ-সম্পত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ততই দ্রুতহারে গোষ্ঠীতে ভাঙন সৃষ্টি হয় ও তার রূপান্তর ঘটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতসম্পন্ন কৃষকদের গ্রামে। কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরতন্ত্র এবং বিজয়ী যাযাবর জাতীয় লোকদের নানা ধরনের শাসন এই পুরানো গোষ্ঠীগুলিকে ভাঙতে পারে নি ; বৃহদাকার শিল্প-জাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে তাদের আদিম কুটির শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সেগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে তেমন বলপ্রয়োগের দরকার হয় না ; মোজেল ও হসভাল্ড-এ গ্রামীণ গোষ্ঠীর সাধারণ মালিকানাধীন জমি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া এখনও চলছে, তার মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকরা তাদের নিজেদের সুবিধার্থেই এটা বুঝতে পারে যে জমির সাধারণ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োজন।৮২ 'এমনকি প্রাচীন ভূস্বামীতন্ত্রের গড়ন, যেটা কেল্ট, জার্মান ও ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে ছিল, সেটাও গড়ে উঠেছিল জমির সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে, আর প্রথমে তাতে কোনো বলপ্রয়োগের ব্যাপার ছিল না, ছিল স্বেচ্ছাকৃত ব্যবস্থা, এবং গোষ্ঠীগত রীতি-নীতির ওপর ভিত্তি করেই সেটা গড়ে উঠেছিল। সর্বত্রই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটেছে উৎপাদন ও বিনিময়ের পরিবর্তিত সম্পর্কের ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রসারে ; সুতরাং এটা আর্থ-নীতিক কারণগুলিরই পরিণতি। এখানে বলপ্রয়োগের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুতপক্ষে, এটা বেশ পরিষ্কার যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব আগে থেকে না থাকলে, কোনো চোর-ডাকাতের পক্ষে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়, কাজেই বলপ্রয়োগ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু তার উদ্ভব ঘটাতে পারে না।

'মানুষকে দাসসুলভ কাজে আবদ্ধ রাখার' যা একেবারে আধুনিক রূপ—সেই মজুরি-শ্রমকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা বলপ্রয়োগ কিংবা বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক সম্পত্তি—কোনোটাকেই ব্যবহার করতে পারি না। প্রাচীন গোষ্ঠীগুলির ভাঙনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রমজাত দ্রব্যগুলির পণ্যে রূপান্তরের, সেগুলি উৎপাদকদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার বদলে সেগুলিকে বিনিময়ের জন্যে ব্যবহারের ভূমিকার কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কস অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে—হের ড্যুরিং যে সম্পর্কে সামান্যতম উল্লেখও সচেতনভাবেই

এড়িয়ে গিয়েছেন—দেখিয়েছেন যে বিকাশের একটা বিশেষ অবস্থায় পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে পরিণত হয়, এবং এই অবস্থাতে 'উৎপাদন ও পণ্য-সঞ্চালন-ভিত্তিক নিয়মগুলি, যা কিনা ভোগদখল বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ম, তাদের অন্তর্নিহিত ও অপ্রতিরোধ্য দ্বান্দ্বিকতায় একেবারে বিপরীতে পর্যবসিত হয়। একেবারে প্রথমে আমরা যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই সমতুল্য জিনিসের বিনিময় এখন এমনভাবে পাল্টে যায় যে সুস্পষ্ট বিনিময় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এর কারণ হলো প্রথমত, শ্রমশক্তির জন্যে যে পুঁজির বিনিময় ঘটে, সেটা অন্যদের শ্রমজাত ফলের একটা অংশ, যেটাকে সমতুল্য কিছু না দিয়েই আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, এই পুঁজির উৎপাদককে শুধু এর পূরণ করলেই চলবে না, একটা উদ্বৃত্তও এর সঙ্গে তাকে যোগ করতে হবে···প্রথমে আমাদের কাছে মনে হয়েছিল সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে মানুষের নিজস্ব শ্রম···কিন্তু এখন (মার্কসের বিশ্লেষণের শেষে, দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি হলো অপরের শ্রম মুফতে আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে পুঁজি-পতিদের অধিকার এবং শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের শ্রমজাত ফসল ভোগ করার অসম্ভাব্যতা। শ্রম থেকে সম্পত্তির বিচ্ছিন্নতা এমন এক নিয়মের অনিবার্য পরিণতি, যে-নিয়মটির আপাত উদ্ভব ঘটেছে তাদের (শ্রম ও সম্পত্তির) অভিন্নতার মধ্যে থেকে।'* অন্য কথায় বলতে গেলে আমরা যদি দস্যুতা, বলপ্রয়োগ ও ঠকানোর সকল সম্ভাবনাকেই বরবাদ করি, আমরা যদি ধরেও নিই যে সকল রকমের ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মালিকের নিজস্ব শ্রমের ফল এবং যদি পুরো প্রক্রিয়াতে কেবলমাত্র সম-পরিমাণ মূল্যের সঙ্গে সম-পরিমাণ মূল্যের বিনিময় হয়েছে, তাহলেও উৎপাদন ও বিনিময়ের অগ্রগতি আমাদের অনিবার্যভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে পৌঁছে দেয়—পৌঁছে দেয় এমন একটা পর্যায়ে যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ও জীবনধারণের দ্রব্যসামগ্রী সংখ্যাগতভাবে ছোট একটা শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পত্তিহীন প্রলেতারীয় শ্রেণী শোচনীয়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, যেখানে উৎপাদনে পর্যায়ক্রমে তেজীভাব ও বাণিজ্যিক সঙ্কট দেখা দেখা দেয়, যেখানে উৎপাদনের বর্তমান নৈরাজ্য অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে সমগ্র-ভাবে আর্থনীতিক কারণগুলির সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়; এই কাজে দস্যুতা, বলপ্রয়োগ এবং কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সাহায্য

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, ১৯৭৪, পৃ ৫৭৪। সম্পাদক

গ্রহণের প্রয়োজন নেই। 'সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগ'—প্রকৃত ঘটনাবলীর ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতা গোপন করার মতলবেই একজন দাম্ভিকের উক্তি ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

এই ধরনের বিকাশ-ধারাকে,—ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিবর্তনের ইতিহাস বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যদি 'আর্থনীতিক অবস্থার নির্ধারক কারণ হতো রাজনৈতিক অবস্থা', তাহলে আধুনিক বুর্জোয়ারা সামন্ত-তন্ত্রের মধ্যে থেকে সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে পারত না, তারা হতো সামন্ততন্ত্রের স্বেচ্ছাজাত আদুরে দুলাল, সবাই জানেন যে বিপরীতটাই ঘটেছিল। প্রথম দিকে, নানা ধরনের ভূমিদাস ও অপরাধীদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত একটা নিপীড়িত গোষ্ঠী হিসাবে বার্গাররা (শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়) শাসক সামন্ত অভিজাতদের কর দিতে বাধ্য ছিল; তারপর তারা অভিজাতদের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রামে একের পর এক সাফল্য লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়: ফরাসি দেশে অভিজাতদের সরাসরি উৎখাত করা হয়; ইংল্যাণ্ডে অভিজাতদের ক্রমশ বুর্জোয়ায় রূপান্তর ঘটিয়ে এবং তাদের নিজেদের আলংকারিক প্রধানে পরিণত করা হয়। আর কিভাবে তারা এটা করেছিল? শুধুমাত্র 'আর্থনীতিক অবস্থা'তে একটা বদল ঘটিয়ে, সেটা আগে হোক বা পরে হোক, স্বেচ্ছায় হোক অথবা সংঘাতের ফলে হোক, রাজনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রাম আসলে গ্রামের বিরুদ্ধে শহরের সংগ্রাম, ভূস্বামীত্বের বিরুদ্ধে শিল্পের সংগ্রাম, প্রকৃতি-ভিত্তিক আর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুদ্রা-ভিত্তিক আর্থব্যবস্থার সংগ্রাম; আর এই সংগ্রামে আর্থনীতিক ক্ষমতাই ছিল বুর্জোয়াদের হাতে মোক্ষম অস্ত্র, শিল্প-বিকাশের মাধ্যমে এই ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়; প্রথমে হস্তশিল্প, তারপর কারখানাভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে এই ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। এই সংগ্রামের সমগ্র কালপর্ব জুড়ে রাজনৈতিক শক্তি অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষেই ছিল, এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল সেই সময়েই, যখন একটি সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে আর একটি সম্প্রদায়কে চেপে রাখার উদ্দেশ্যে রাজা, অভিজাতদের বিরুদ্ধে বার্গারদের লড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে তখনও রাজনৈতিকভাবে শক্তি-হীন বুর্জোয়ারা তাদের ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক ক্ষমতার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে, তখনই রাজা অভিজাতদের সঙ্গে তার পূর্বতন মৈত্রী-সম্পর্ক

পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কাজের পরিণতি ঘটে বুর্জোয়া বিপ্লবে, প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে ফরাসি দেশে। ফরাসি দেশের 'রাজনৈতিক অবস্থা' অপরিবর্তিত ছিল কিন্তু 'আর্থনীতিক অবস্থা' তাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। রাজনৈতিক মর্যাদার বিচারে অভিজাতরাই ছিল সর্বেসর্বা, বার্গারদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বার্গাররা তখন রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হয়ে উঠেছে, আর অভিজাতরা তাদের যাবতীয় সামাজিক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; এই অবস্থায় তারা শুধু সেইসব রাজস্বই আদায় করত, যেগুলি তাদের বিলুপ্তপ্রায় সামাজিক দায়দায়িত্ব হিসাবে প্রাপ্য। এটাই সব নয়। সব দিক থেকে বুর্জোয়া উৎপাদন তখনও মধ্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কবলিত রয়েছে, আর এই উৎপাদন, শুধু কলকারখানাভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও, পুরানো ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে; গিল্ডের হাজার রকমের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শুল্ক-প্রাচীর এই উৎপাদনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে, যেগুলি বুর্জোয়া উৎপাদনের পক্ষে কন্টকস্বরূপ, প্রতিবন্ধক।

বুর্জোয়া বিপ্লব এই অবস্থার অবসান ঘটায়। কিন্তু হের ড্যুরিং-এর ধারণা মতো আর্থনীতিক অবস্থাকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বৃথা প্রচেষ্টা বুর্জোয়ারা চালিয়ে আসছিল; বরঞ্চ বিপরীত কাজের মধ্যে দিয়েই এর অবসান ঘটেছে— পুরানো রাজনৈতিক আবর্জনা সাফ করে এবং নতুন 'আর্থনীতিক অবস্থা'র অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় এমন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করার মাধ্যমেই এই কাজ সমাধা হয়েছে। আর এই রাজনৈতিক ও আইনগত আবহাওয়াতে, যা তাদের পক্ষে বেশ মানানসই ছিল, আর্থনীতিক অবস্থা এমন চমৎকারভাবে বিকশিত হয়েছিল যে ১৭৮৯ সালে অভিজাত সম্প্রদায় যে অবস্থান দখল করেছিল, বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই তার কাছাকাছি চলে আসে: এরপর বুর্জোয়ারা যে সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমশই অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকও হয়ে উঠেছে; তারা উৎপাদনী কাজকর্ম থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আগেকার অভিজাতদের মতোই নিছক একটা খাজনা আদায়কারী শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে; এবং তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে, আর একটা নতুন শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি

করেছে—কোনোরকম বলপ্রয়োগ ছাড়াই এবং বিশুদ্ধ আর্থনীতিক উপায়ে। তাছাড়া, এই শ্রেণী ত'র কার্যকলাপের এই পরিণতি কোনোভাবেই চায় নি—বরঞ্চ বুর্জোয়াদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এই পরিণতি ঘটেছে। বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহ বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে এবং যেন প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মেই সমগ্র বুর্জোয়া সমাজ ধ্বংস বা বিপ্লবের দিকে ছুটে চলেছে। আর এখন যদি বুর্জোয়ারা ধ্বংসোন্মুখ 'আর্থনীতিক অবস্থা'কে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগের আবেদন জানায়, তাহলে বুঝতে হবে তারা হের ড্যুরিং-এর মতো একই বিভ্রান্তিতে ভুগছে—আর সেই বিভ্রান্তিটা হচ্ছে: 'আর্থনীতিক অবস্থার নির্ধারক কারণ হলো রাজনৈতিক পরিস্থিতি'; এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ঠিক হের ড্যুরিং-এর মতো তারাও মনে করছে যে 'প্রধান', 'প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে' ব্যবহার করে তারা এইসব 'গৌণ পর্যায়ের ঘটনাবলী' অর্থাৎ আর্থনীতিক অবস্থা ও তার অনিবার্য বিকাশ ধারাকে পুনর্গঠিত করতে পারবে; সুতরাং তারা এটাও মনে করছে যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও এই ইঞ্জিন-চালিত আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশ্ব-বাণিজ্য ও আধুনিক দুনিয়ার ব্যাংকিং ও ঋণ-পদ্ধতিকে ক্রুপের বন্দুক ও মাউজার রাইফেল দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে!

তিন

বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব

(পরবর্তী অংশ)

এবারে হের ড্যুরিং-এর সর্বশক্তিমান 'বলপ্রয়োগে'র ব্যাপারটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যায়। ক্রুশো ফ্রাইডেকে দাস করেছিলেন 'হাতে তরোয়াল নিয়ে'। কোথা থেকে তিনি এই তরোয়াল পেলেন? রবিনসন ক্রুশোর কাহিনীর কাল্পনিক দ্বীপের গাছে তরোয়াল ফলতো বলে আমাদের জানা নেই এবং হের ড্যুরিংও এর কোনো হদিশ দেন নি। আমরা যদি ধরে নিই যে ক্রুশো নিজের জন্যে তরোয়াল সংগ্রহ করেছিলেন, তাহলে এটাই আমরা কল্পনা করতে পারি যে এক সুন্দর সকালে ফ্রাইডেও গুলিভরা রিভলভার হাতে নিয়ে হাজির হয়েছিল। আর তখনই 'বলপ্রয়োগের' সম্পর্কটা একেবারে উল্টে যায়। তখন ফ্রাইডে হুকুম করে আর ক্রুশোকে দাসের মতো সেই হুকুম মেনে নিতে হয়। রবিনসন ক্রুশো ও ফ্রাইডের গল্পে আমাদের বারবার ফিরে আসতে হচ্ছে বলে পাঠক-পাঠিকার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি; এ একটা শিশুপাঠ্য কাহিনী, যার বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—কিন্তু আমরা আর কী করতে পারি? ড্যুরিং-এর স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতিকে বিবেকবুদ্ধি-মতো আমাদের ব্যবহার করতেই হচ্ছে এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের যদি নিছক ছেলেমানুষীর স্তরে নেমে যেতে হয়, তাহলে সেটা আমাদের ত্রুটি নয়। তাহলে দেখা গেল রিভলভার তরোয়ালকে হারিয়ে দেবে; সুতরাং এই ঘটনা শিশুসুলভ স্বতঃসিদ্ধবাদীকেও এটা বুঝিয়ে দেবে যে (বলপ্রয়োগ শুধু ইচ্ছার ব্যাপার নয়, বলপ্রয়োগ করতে হলে তার একটা বাস্তব প্রাথমিক ভিত্তি, অর্থাৎ হাতিয়ার থাকা প্রয়োজন) উন্নত উপাদানের কাছে অনুন্নত উপাদান পরাজিত হয়, যার অর্থ হলো বলপ্রয়োগের জন্যে আরও নিখুঁত হাতিয়ার দরকার, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় অস্ত্র, বলপ্রয়োগের উন্নত হাতিয়ার

অনুন্নত হাতিয়ারের উৎপাদককে পরাজিত করে ; এক কথায় বলা যেতে পারে বলপ্রয়োগের সাফল্য অস্ত্র উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল এবং সেটা আবার সাধারণভা ব উৎপাদন-নির্ভর—সুতরাং 'আর্থনীতিক ক্ষমতা' 'আর্থনীতিক অবস্থা'-নির্ভর—অর্থাৎ বলপ্রয়োগকারীর হাতে যেসব বৈষয়িক উপকরণ থাকে, সেইগুলির ওপর বলপ্রয়োগ নির্ভর করে।

আজকের দিনে বলপ্রয়োগ বা শক্তি হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী, আর আমর জানি এই দুটো বাহিনী কিরকম 'সাংঘাতিক ব্যয়সাপেক্ষ'। কিন্তু বলপ্রয়োগ তো কোনো ধনদৌলত সৃষ্টি করে না ; যে ধনদৌলত সৃষ্টি হয়েছে বড়োজোর সেটাই সে নিয়ে নিতে পারে ; আর তাতে কোনো সুবিধা হয় না —যথেষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ফরাসি মিলিয়ার্ড এর৮৩ ক্ষেত্রে এটাই আমরা বুঝেছি। সুতরাং শেষ অবধি আর্থনীতিক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করতে হয় ; তাহলে আবার দেখা যাচ্ছে আর্থনীতিক অবস্থাই বলপ্রয়োগের নির্ধারক শক্তি, আর এই শক্তিই বলপ্রয়োগের হাতিয়ারগুলির সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়। এমনকি সেটাও সব নয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর চাইতে আর কোনো কিছুই আর্থনীতিক ভিত্তির ওপর এতটা নির্ভরশীল নয়। অস্ত্রসম্ভার, সেনাবাহিনীর গঠন, তার সংগঠন, রণকৌশল, রণনীতি সর্বোপরি নির্ভর করে উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্দিষ্ট স্তরের ওপর। প্রতিভাবান সেনানায়কদের 'মনের সৃষ্টি'র এখানে কোনো বিপ্লবী ভূমিকা নেই, উন্নততর অস্ত্রের উদ্ভাবনা এবং মনুষ্য-শক্তি হিসাবে সৈন্যদের মধ্যে পরিবর্তনই এখানে আসল কথা ; প্রতিভাবান সেনা-নায়করা যে ভূমিকাটি বড়োজোর পালন করেন তা হচ্ছে নতুন অস্ত্রপাতি ও যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ পদ্ধতির সামঞ্জস্যবিধান।

চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে আরব জগৎ থেকে বারুদের আমদানি হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, এবং প্রতিটি স্কুলের ছেলেও আজ জানে এর ফলে যুদ্ধ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। বারুদ ও বন্দুক-কামানের প্রবর্তন কোনো বলপ্রয়োগের ব্যাপার ছিল না, এটা শিল্পের ক্ষেত্রে এক অগ্র-গমন, অর্থাৎ আর্থনীতিক অগ্রগমন। উৎপাদনেই ব্যবহৃত হোক অথবা ধ্বংসাত্মক কাজেই লাগুক, শিল্প শিল্পই থেকে যায়। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবর্তনের ফলে যুদ্ধ পরিচালনাতেই শুধু বৈপ্লবিক রদবদল ঘটে নি, প্রভুত্ব স্থাপন ও আধিপত্য কায়েম করার রাজনৈতিক সম্পর্কও এর ফলে দারুণভাবে পাল্টে

গিয়েছে। বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্যে শিল্প ও অর্থ দুটিরই প্রয়োজন এবং এই দুটিই ছিল শহরের বার্গারদের হাতে, সুতরাং গোড়া থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল সামন্ত-অভিজাতদের বিরুদ্ধে শহরের এবং শহরের সমর্থনপুষ্ট উদীয়মান গণতন্ত্রের হাতিয়ার। সামন্ত-প্রভুদের যেসব দুর্গ এতদিন দুর্ভেদ্য ছিল, এই সময়ে বার্গারদের কামানের মুখে সেগুলির পতন ঘটল এবং বার্গার-দের আরকুইবাস (সেকেলে বন্দুক) থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেট নাইটদের বর্ম ভেদ করে ফেলল। অভিজাত সামন্ত-প্রভুদের বর্ম-পরিহিত অশ্বারোহী বাহিনীর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে অবসান ঘটল তাদের আধিপত্যের; বুর্জোয়া-দের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী হয়ে উঠতে লাগল চূড়ান্ত ধরনের অস্ত্র; গোলন্দাজ বাহিনীর বিকাশের ফলে সামরিক বাহিনী তার সংগঠনে একটা নতুন ও সম্পূর্ণ শিল্পভিত্তিক বিভাগ—ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—গড়ে তুলতে বাধ্য হলো।

আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি হয়েছে খুবই ধীরে। প্রথমে কামান-বন্দুকের নানা অংশ ছিল জবড়জং গোছের এবং খুঁটিনাটির দিক থেকে অনেক অগ্রগতি ঘটলেও গাদাবন্দুক তখনও একটা পরিপাট্যহীন স্থূল ধরনের অস্ত্রই ছিল। পদাতিক বাহিনীর ব্যবহার্য আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করতে তিনশো বছরেরও বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী না আসা পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীর জন্যে বেয়নেট-বসানো গাদাবন্দুকের বারুদ ভরার নলের প্রচলন হয় নি। এই ধরনের বন্দুকই শেষপর্যন্ত বর্শাধারী পদাতিকদের অপসারণ করে। তখনকার পদাতিক সৈন্যরা ছিল রাজ-রাজড়াদের ভাড়াটে লোকজন; সমাজের অত্যন্ত নিবীর্য অংশকে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হতো; তাদের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হতো, তাদের ওপর কোনো ভরসা করা হতো না এবং তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় ছিল ডাণ্ডা; তাদের ওপর জবরদস্তি চালিয়ে যুদ্ধে আনা হতো বলে প্রায়শই তারা হয়ে পড়ত বিক্ষুব্ধ যুদ্ধবন্দী। একমাত্র যে ধরনের রণকৌশলে এইসব সৈন্যের পক্ষে নতুন অস্ত্রাদি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল তা হচ্ছে সারিবদ্ধভাবে সৈন্য সাজানোর পদ্ধতি, যেটা দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের আমলে সবচেয়ে উন্নত রূপ নেয়। একটা সৈন্যবাহিনীর পুরো পদাতিক বিভাগকে তিনটি শাখাতে বিভক্ত করে রাখা হতো, সুদীর্ঘ, চতুর্ভুজাকার ফাঁকা ক্ষেত্রের চারপাশে সাজানো হতো এবং গোটা বাহিনীটাই যুদ্ধে যেতো এইভাবে। বড়োজোর দুটো শাখার কোনোটা

সামনে এগোতে পারত অথবা একটু পিছিয়ে থাকত। এই জবড়জং সৈন্যপুঞ্জ একমাত্র অতি সমতল ক্ষেত্রেই চলতে পারত, তাও আবার অত্যন্ত ধীর গতিতে (মিনিটে ৭৫টি পদক্ষেপ) ; যুদ্ধের মধ্যে সৈন্য সাজানোতে কোনো-রকম রদবদল ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং পদাতিক বাহিনী একবার যুদ্ধে নামলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যেত এক ধাক্কায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ধরনের ধীরগতিসম্পন্ন জবড়জং বাহিনী বিদ্রোহী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়, বিদ্রোহীরা পারদর্শী না হলেও বন্দুক চালাতে ভালভাবেই জানত ; তারা লড়ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জন্যে। সুতরাং ভাড়াটে সৈন্যদের মতো তারা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় নি ; তারা সার-বেঁধে পরিষ্কার, সমতল ভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হয় নি, যাতে ইংরেজরা তাদের আক্রমণের সুযোগ পায়। তারা এসেছিল তাদের বাহিনী নিয়ে, তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদকারী বন্দুকধারীদের দ্রুতগতিশীল বাহিনীর সাহায্যে বনের আড়াল থেকে লড়াই চালিয়েছিল। এখানে সারিবদ্ধ সেনাবাহিনী অকেজো হয়ে পড়ে এবং অদৃশ্য ও নাগালের বাইরের শত্রুর কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে হাতাহাতি করাটা নতুন করে প্রবর্তিত হয়—এ একটা নতুন ধরনের রণকৌশল, যা মানুষের যুদ্ধোপকরণে পরিবর্তনের পরিণতি। আমেরিকার বিপ্লবে যেটা শুরু হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব তাকে, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও, সম্পূর্ণ করে। ফরাসি বিপ্লবেও কোয়ালিশনের সুশিক্ষিত ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল প্রশিক্ষণহীন গণসেনাবাহিনী—গোটা জাতিই এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই গণবাহিনীকে পারী শহর রক্ষা করতে হয়, অর্থাৎ রক্ষা করতে হয় একটা বিশেষ এলাকাকে, আর এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে গণযুদ্ধে জয়লাভ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে হাতাহাতি লড়াইই যথেষ্ট ছিল না ; যুদ্ধের এমন একটা পদ্ধতি বার করার প্রয়োজন ছিল যাতে বিপুল জনগণকে কাজে লাগানো যায় ; আর তার ফলেই ব্যূহ গঠনের এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ব্যূহ গঠনের ফলে স্বল্প-প্রশিক্ষিত বাহিনীও বেশ সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, গতিও বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট (মিনিটে একশো কিংবা তার চেয়েও বেশি পদক্ষেপ) ; এতে আগেকার দিনের সার বেঁধে চলার আঁটোসাঁটো চেহারাটা পাল্টানো গেল ; যেকোনো জমির ওপরেই, এমনকি যে ধরনের জমিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অত্যন্ত অসুবিধাজনক,

সেখানে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ চালানো সম্ভব হলো ; এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্যদের যেকোনোভাবে সাজানো গেলো এবং বন্দুকধারীদের বিক্ষিপ্ত বাহিনীগুলির আক্রমণে শত্রু-সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখা, দুর্বল করে ফেলা আর গণসৈন্যের সংরক্ষিত বাহিনী যাতে চূড়ান্ত মুহূর্তে শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে তার ব্যবস্থা হলো। খণ্ডযুদ্ধ, ব্যূহ গঠন এবং সমস্ত ধরনের সৈন্য নিয়ে গঠিত পৃথক পৃথক বিভাগ বা সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে সম্মিলিত পরিকল্পনাভিত্তিক এই নতুন যুদ্ধবিদ্যাকে রণকৌশল ও রণনৈতিক দিক থেকে নেপোলিয়ন চূড়ান্ত রূপ দেন। ফরাসি বিপ্লবের সৈন্যদের পরিবর্তিত চরিত্রই এই ধরনের যুদ্ধ-পদ্ধতিকে অপরিহার্য করে তুলেছিল। তাছাড়া এর পিছনে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পূর্বশর্ত ছিল ; প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্রে কামান বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গ্রিবিউভাল-এর তৈরি হাল্কা গাড়ি, যার সাহায্যে কামান-গুলিকে দ্রুতগতিতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়, তখন এটার খুবই প্রয়োজন ছিল ; বন্দুকের কুঁদো, যা এতদিন ধরে ছিল সোজা, সেটা এখন তেরছা ধরনের হলো। ফ্রান্সে ১৭৭৭ সালে প্রবর্তিত এই ধরনের বন্দুকের আদল নেওয়া হয় শিকারে ব্যবহৃত বন্দুক থেকে, এবং এই বন্দুক কোনো মানুষকে গুলি করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছিল। বন্দুকের এই উন্নতি ছাড়া পুরানো অস্ত্রে খণ্ডযুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না।

সকল লোককে অস্ত্রসজ্জিত করার নিয়মটি শীঘ্রই পর্যবসিত হলো বাধ্যতা-মূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে (ধনীরা অর্থের বিনিময়ে সামরিক বাহিনীতে নিজেদের বদলে অন্য লোক পাঠিয়ে অব্যাহতি পেল) এবং ইউ-রোপের অধিকাংশ বড় বড় রাষ্ট্রে এই প্রথা চালু হয়ে গেল। একমাত্র প্রুশিয়া তার 'লাণ্ডভেহ্‌র' ব্যবস্থার[৮৪] মাধ্যমে গোটা জাতির সামরিক শক্তিকে অনেকখানি সংহত করার চেষ্টা করেছিল। প্রুশিয়াই ছিল প্রথম রাষ্ট্র যে তার পুরো পদাতিক বাহিনীকে মুখ দিয়ে বারুদ ভরার রাইফেলের বদলে সর্বাধুনিক অস্ত্র—পিছন থেকে বারুদ ভরার রাইফেলের সাহায্যে সুসজ্জিত করে তোলে। ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে মুখ দিয়ে বারুদ ভরার রাইফেল উন্নত রূপ নেয় এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সালে প্রুশিয়ার সাফল্যের পিছনে এই দুটি উদ্ভাবনার[৮৫] ভূমিকা ছিল।

ফরাসি-জার্মান যুদ্ধেই প্রথম দুই পক্ষের সৈন্যরা পিছন দিয়ে বারুদ ভরার রাইফেল এবং মসৃণ ছিদ্রযুক্ত পুরানো আমলের গাদা বন্দুক নিয়ে একই রকম-

ভাবে সৈন্য সাজিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আগেকার থেকে তফাৎটা এই ছিল যে প্রুশিয়রা তাদের কোম্পানির জন্যে ব্যূহ রচনার পদ্ধতি প্রবর্তন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে নতুন কায়দায় ব্যূহ রচনা করা।। কিন্তু ১৮ আগস্ট'৮৬ সাঁ প্রিভাতে প্রুশিয়ার বাহিনী যখন কোম্পানি নিয়ে ব্যূহ গঠনের পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তখন তাদের যে পাঁচটি বাহিনী প্রধানত যুদ্ধ করেছিল, তাদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (১৭৬ জন অফিসার ও ৫,১১৪ জন সৈন্য) দুই ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পরাজিত হয়। সেই সময় থেকে কোম্পানি নিয়ে ব্যূহ গঠনও সারিবদ্ধভাবে সৈন্যসজ্জার মতো অচল বলে প্রমাণিত হয়; ঘন-সন্নিবিষ্ট বাহিনীকে শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের মুখে ঠেলে দেবার সমস্ত ধারণা পরিত্যক্ত হয় এবং জার্মান পক্ষ পরবর্তী সকল যুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ চালাবার মতো ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট বাহিনীর সাহায্যে লড়াই চালায়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যূহ-গুলি প্রবল বর্ষণের মুখে নিজেরাই আলাদা হয়ে গিয়ে যুদ্ধ চালাতো, যদিও নির্দেশ বিরুদ্ধ বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটার বিরোধী ছিল। আর ঠিক একইভাবে, শত্রুপক্ষের রাইফেলের সামনে সৈন্যদের একমাত্র গতিবিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পিছন দিকে দৌড়। আবার দেখা গেল যে অফিসারদের তুলনায় সৈন্যরা অনেক বেশি চালাকচতুর; পিছন থেকে বারুদভরা রাইফেলের সামনে কী করে লড়তে হয়, একমাত্র তারাই নিজেদের সহজাত বুদ্ধিতে সেটা বার করতে পেরেছিল, যার কার্যকারিতা এখনও বজায় আছে।

ফরাসি-জার্মান যুদ্ধ একটা সুদূরপ্রসারী পালাবদলের সূচনা করে। প্রথমত, ব্যবহৃত অস্ত্রগুলির উৎকর্ষ এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে সেগুলির আর বৈপ্লবিক উৎকর্ষসাধন সম্ভব নয়। একবার যখন সৈন্যদের হাতে এমন বন্দুক থাকে যার সাহায্যে চিনতে পারা যায় এমন বাহিনীকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আঘাত করা সম্ভব এবং যে-রাইফেল পৃথক পৃথক মানুষকে গুলি করার পক্ষেও অনুরূপ কার্যকর, আবার যাতে গুলি ভরতে নিশানা করার চাইতেও কম সময় লাগে, এই রকম অবস্থাতে স্থলবাহিনীর রণকৌশলে আরও উন্নতি বিধানের গুরুত্ব বিশেষ কিছু থাকে না। সুতরাং বিভিন্ন মূলগত বিষয়ে এই ধারায় অগ্র-গতির যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় মহাদেশের সকল শক্তিকেই বাধ্য হয়ে প্রুশিয়ার 'লাণ্ডভেহ্‌র' পদ্ধতি কঠোরতরভাবে চালু করতে হয়, আর তার ফলে এমন এক সামরিক বোঝা

তাদের কাঁধে চাপে যা কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই সময়ে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে পরিণত হয়; আর জনগণের কাজ হয়ে দাঁড়ায় সৈন্য যোগান দেওয়া ও রসদ সরবরাহ করা। সমরবাদ তার দাপট চালিয়ে ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু সমরবাদ তার নিজের মধ্যেই বহন করছে আত্মবিনাশের বীজ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা একদিকে যেমন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, গোলন্দাজবাহিনী ইত্যাদি খাতে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থব্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এইভাবে আর্থিক বিপর্যয়কে দ্রুত ডেকে আনছে; আবার অন্যদিকে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাও অনিবার্য করে তুলছে এই প্রতিযোগিতা, আর এইভাবে শেষ পর্যন্ত জনগণকে অস্ত্র ব্যবহারে পারঙ্গম করে তুলছে। সুতরাং একটা বিশেষ মুহূর্তে সমরনায়কদের বিরুদ্ধে জনগণের ইচ্ছা জয়যুক্ত করে তুলতে জনগণকে সক্ষম করছে। শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষকরা যখন তাদের নিজেদের অভিপ্রায় নিয়ে দাঁড়াবে, তখনই ঘনিয়ে আসবে এই মুহূর্তটি। এই অবস্থাতে রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনী রূপান্তরিত হবে জনগণের সেনাবাহিনীতে; রাজন্যদের ক্ষমতার যন্ত্র কাজ করতে অস্বীকার করবে এবং সমরবাদের বিপর্যয় ঘটবে তার নিজস্ব বিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে। ১৮৪৮-এর বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেটা করে উঠতে পারে নি—কারণ সেটা ছিল বুর্জোয়া, প্রলেতারীয় নয়, অর্থাৎ খেটেখাওয়া জনসাধারণের মধ্যে এমন অভিপ্রায় জাগাতে পারে নি, যার মর্মবস্তু তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—সমাজতন্ত্র নিশ্চিতভাবে সেই কাজটিই সমাধা করবে। আর এর তাৎপর্য দাঁড়াবে সমরবাদ ও সেই সঙ্গে যাবতীয় সেনাবাহিনী ভিতর থেকে বিদীর্ণ হওয়া।

আধুনিক স্থলবাহিনীর ইতিহাসের এটাই হলো প্রথম নৈতিক শিক্ষা। দ্বিতীয় নৈতিক শিক্ষা, যেটা আমাদের আবার হের ড্যুরিং-এর প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সেটা হলো সৈন্যবাহিনীর পুরো সংগঠন ও লড়াই করার প্রণালী আর জয়-পরাজয়—এই সবকিছুই বৈষয়িক অর্থাৎ আর্থনীতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল: মনুষ্য উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের ওপর, সুতরাং জনসংখ্যা, উৎকর্ষ ও কারিগরি বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। একমাত্র আমেরিকানদের মতো শিকারী জাতির লোকেরাই খণ্ডযুদ্ধের কৌশল নতুন করে আবিষ্কার করে—

নিছক আর্থনীতিক কারণেই পুরানো রাজ্যগুলির সেই একই ইয়াংকিরা কৃষক, শিল্পপতি, নাবিক ও ব্যবসায়ীতে নিজেদের রূপান্তরিত করেছে ; এখন তারা আর আদিম অরণ্যে খণ্ডযুদ্ধ করে বেড়ায় না, পরন্তু এমন ফটকাবাজিতে ব্যাপৃত থাকে, যেখানে বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে তারা অনুরূপ অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

একমাত্র ফরাসি বিপ্লবের মতো বিপ্লবের পক্ষেই, যাতে বুর্জোয়া ও বিশেষত কৃষকদের আর্থনীতিক মুক্তি সাধিত হয়েছে, সম্ভব হয় জনগণের সৈন্যবাহিনী গঠন করা এবং সেই সঙ্গে অবাধে সৈন্য চলাচল করিয়ে পুরানো সারিবদ্ধ বাহিনীকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া—যে সারিবদ্ধ বাহিনী ছিল স্বৈরতন্ত্রের রক্ষাকারী জোরালো শক্তি। আর আমরা একের পর এক ঘটনায় দেখেছি কারিগরি অগ্রগতি সামরিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আসলে যা প্রযুক্ত হয়েছিলও, তৎক্ষণাৎ এবং প্রায় জোর করেই যুদ্ধ-বিদ্যায় পরিবর্তন, এমনকি বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়, আর বাস্তবিকই তা ঘটে সেনানায়কদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। আজকের দিনে যেকোনো করিৎকর্মা নন-কমিশন্‌ড অফিসারও হের ড্যুরিংকে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারেন যুদ্ধ-পরিচালনা কী বিপুল পরিমাণে নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তি এবং সেনাদের নিজস্ব পশ্চাদ্‌বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর। সংক্ষেপে বলা যায়, সবসময়ে ও সর্বত্র আর্থনীতিক অবস্থা ও আর্থনীতিক ক্ষমতার হাতিয়ারগুলি 'বলপ্রয়োগ'কে বিজয়ী হতে সাহায্য করে। অন্যথায় বলপ্রয়োগ নিরুপায় হয়ে পড়ে। আর যারাই যুদ্ধ ব্যবস্থাকে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ড্যুরিঙ্গীয় নীতির ভিত্তিতে সংস্কারের চেষ্টা করে, পরাজয় ছাড়া তাদের আর কিছুই জুটবে না।*

স্থল থেকে সমুদ্রে গেলেও আমরা দেখব যে গত কুড়ি বছরের মধ্যেই সেখানে আরও ব্যাপকতর বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে[৮৮] ব্যবহৃত যুদ্ধ-জাহাজগুলি ছিল ৬০ থেকে ১০০টি কামান-যুক্ত কাঠের দোতলা বা তিনতলা জাহাজ ; এদের তখনও চালানো হতো পালের ওপর নির্ভর করেই এবং খুব

---

* প্রুশিয়ার সমরকর্তারা এটা ইতিমধ্যেই ভালো করে জেনেছেন। সামরিক কর্তাদের একজন ক্যাপ্টেন হের ম্যাকস জানস বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এক বক্তৃতায় বলেছেন : 'যুদ্ধ পরিচালনার ভিত্তি হচ্ছে মূলত সাধারণ মানুষের আর্থনীতিক জীবনধারা।' (কোলনিসে সাইটুং, ২০ এপ্রিল, ১৮৭৬, পৃ ৩)। ৮৭ এঙ্গেলসের টীকা।

অল্পশক্তিবিশিষ্ট বাষ্পীয় ইঞ্জিন তাতে লাগানো থাকত। যুদ্ধজাহাজের এই কামানগুলির বেশির ভাগই ছিল ৩২ পাউণ্ডের, যাদের ওজন ছিল মোটামুটি ৫০ সেন্টনার*। যুদ্ধের শেষ দিকে দেখা দিয়েছিল লোহাঢাকা ভাসমান ব্যাটারি; সেগুলি ছিল স্থূল ধরনের, নিশ্চল দৈত্যের মতো, তবে তখনকার কামানের মুখে সেগুলি ছিল অপরাজেয়; শীঘ্রই যুদ্ধজাহাজকে লোহার পাতে ভালো করে মোড়া হতে লাগলো; প্রথমে লোহার পাতগুলি পাতলা, চার ইঞ্চির বেশি পুরু হলেই সেগুলিকে খুব ভারি পাত বলে মনে করা হতো। কিন্তু শীঘ্রই গোলা বারুদের উন্নতি এই লোহার পাতের উৎকর্ষকে ছাড়িয়ে গেল; লোহার পাতের ঘনত্বের শক্তি যত বাড়তে লাগল, ততই উদ্ভাবিত হতে লাগল নতুন ধরনের ভারিভারি কামান, যা ঐ মোটা পাতকে সহজেই ভেদ করতে পারে। এইভাবে আমরা এখন জাহাজ মোড়ার এমন পাত পেয়েছি, যেটা একদিকে ১০, ১২, ১৪ ও ২৪ ইঞ্চি পুরু (ইতালি এমন পাত তৈরি করতে চেয়েছে যা হবে তিন ফুট পুরু) এবং অন্যদিকে এমনসব কামান তৈরি হয়েছে যেগুলির ওজন ২৫, ৩৫, ৮০ এমনকি ১০০ টন এবং যা প্রয়োজনমতো ৩০০, ৪০০, ১,৭০০ এমনকি ২,০০০ পাউণ্ডের গোলা ছুঁড়তে পারবে এত দূরত্বে যা আগে ভাবাও যায় নি। আজকের দিনের স্ক্রু-চালিত যুদ্ধজাহাজ একটা বর্মাচ্ছাদিত বিরাট স্টিমার, যেটা ৮,০০০ থেকে ৯,০০০ টন অবধি জলকে দাবিয়ে (বা সরিয়ে) রাখতে পারে এবং ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন, যাতে ঘোরানো অস্ত্র ছোঁড়বার ব্যবস্থা রয়েছে এবং যাতে চার অথবা খুব বেশি হলেও ছয়টি বড়ো বড়ো কামান থাকে, আর যার সূঁচালো অগ্রভাগ জলের তলায় এমনভাবে ঢোকানো আছে যাতে শত্রুপক্ষের রণতরীকে আঘাত করা যায়। এ একাই একটা দৈত্যাকার যন্ত্র, যেখানে বাষ্পশক্তি শুধু যে জাহাজটাকে দুরন্ত গতিতে চালিয়ে নিয়ে যায় তাই না, জাহাজ চালাবার গিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে, নোঙর ওঠায়-নামায়, কামান রাখার চূড়াকে ঘোরায়, কামানের জায়গাকে পরিবর্তন করে, তাতে গোলা ভরে দেয়, জল বার করে, নৌকো-গুলিকে ওপরে তোলে আবার জলে নামায়; এর মধ্যে অনেকগুলি নৌকো আবার বাষ্পচালিত; বাষ্পশক্তি এইরকম আরও অনেক কিছু করে। আর লোহার পাতে মোড়া জাহাজ ও কামানের গোলার শক্তির মধ্যে এমন এক প্রতিযোগিতা চলেছে যে আজকালকার দিনে একটা জাহাজ সমুদ্রে ভাসাবার

* ৫০ কিলোগ্রামে ১ জার্মান সেন্ট্নার, অর্থাৎ মেট্রিক সেন্ট্নার-এর অর্ধেক। সম্পাদক।

পূর্বেই সেটা প্রায় অকেজো হয়ে যাচ্ছে; আধুনিক কালের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। আজকের যুদ্ধজাহাজ শুধুমাত্র আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের একটা সৃষ্টি নয়, পরন্তু এট্য আধুনিক শিল্পজাত ভাসমান কারখানার নিদর্শনও বটে, যার উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটে। যেসব দেশের বৃহদায়তন শিল্প সবচেয়ে উন্নত, তারাই এই ধরনের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী। তুরস্কের সমস্ত, রাশিয়ার প্রায় সব এবং জার্মানির বেশির ভাগ বর্মাচ্ছাদিত যুদ্ধজাহাজই ইংলণ্ডে নির্মিত হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় লোহার পাতই সেফিল্ডের বাইরে তৈরি হয় নি বললেই চলে; ইউরোপের এমন বড়ো তিনটি ইস্পাত কারখানার দুটি (উল্উইচ ও এলস্উইক) রয়েছে ইংলণ্ডে আর তৃতীয়টি (ক্রুপ) রয়েছে জার্মানিতে। সেদিক থেকে কোনো সন্দেহ নেই যে 'প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শক্তি', যা হের ড্যুরিং-এর মতে 'আর্থনীতিক অবস্থার চূড়ান্ত কারণ', তা উল্টো দিকে আর্থনীতিক অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই নৌযুদ্ধে বলপ্রয়োগের হাতিয়ার যে-যুদ্ধজাহাজ, শুধু তার নির্মাণশিল্পই নয়, তার পরিচালনাও আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের একটি শাখায় পরিণত হয়েছে। আর এইরকম হওয়াতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র, কারণ একটা জাহাজের জন্যে রাষ্ট্রকে যা ব্যয় করতে হয়, আগে ছোট একটা নৌবাহিনী তৈরি করতে সেই পরিমাণ ব্যয় করতে হতো; রাষ্ট্রকে এটাও মেনে নিতে হয় যে এই ধরনের প্রচুর অর্থব্যয় করে একটা জাহাজ জলে ভাসাবার পূর্বেই সেটা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেটা কোনো কাজেই আসছে না; আর রাষ্ট্র নিশ্চয়ই হের ড্যুরিং-এর এটা দেখে বিরক্ত বোধ করে যে 'প্রত্যক্ষভাবে বলপ্রয়োগকারী' ব্যক্তি ক্যাপটেনের চাইতে 'আর্থনীতিক অবস্থা'র মানুষটির অর্থাৎ জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারটির গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের অবশ্য বিরক্ত হবার কোনো কারণ নেই যখন আমরা দেখি যে লোহার পাতে মোড়া জাহাজ আর কামানের মধ্যেকার এই প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইয়ে যুদ্ধজাহাজের গঠন এমন উৎকর্ষ অর্জন করেছে, যা একই সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ ও যুদ্ধে অব্যবহার্য,* আর এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৌযুদ্ধের

* নৌযুদ্ধে আধুনিক শিল্পের সর্বাধুনিক উৎপাদন হচ্ছে স্বয়ংচালিত টরপেডো। সেটা এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাবে বলে মনে হয়। এতে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে সর্বাপেক্ষা ছোট টরপেডো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের চেয়ে অনেক বেশি উন্নততর হবে। (মনে রাখা দরকার এটা লেখা হয়েছিল ১৮৭৮ সালে)৮৯। এঙ্গেলসের টীকা।

ক্ষেত্রেও গতির অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলিকে প্রকট করে তুলছে, যে-নিয়ম অনুসারে অন্য কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার মতো, সমরবাদও তার বিকাশের পরিণতিস্বরূপ নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে।

তাহলে এখানেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই কথাটা কোনোক্রমেই সত্যি নয় যে 'প্রাথমিক উপাদানটিকে খুঁজতে হবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে, অপ্রত্যক্ষ আর্থনীতিক শক্তির মধ্যে নয়'। এই বক্তব্যের বিপরীতটাই সত্যি। আসলে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে 'প্রাথমিক' উপাদান বলতে কী বোঝায়? এর আর্থনীতিক ক্ষমতা, বৃহদাকার শিল্পক্ষমতার উপাদানগুলিকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণের অধিকার, নৌযুদ্ধের রাজনৈতিক শক্তি, যা আধুনিক যুদ্ধজাহাজ-নির্ভর, সেটা মোটেই 'প্রত্যক্ষ' কোনো শক্তি নয়, পরন্তু সেটা আর্থনীতিক ক্ষমতার মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়, যে-ক্ষমতার পিছনে থাকে অতি উন্নত ধাতুবিদ্যা, দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চ উৎপাদনশীল কয়লাখনি।

কিন্তু এসবের দরকার কী? আমরা যদি হের ড্যুরিংকে পরবর্তী কোনো নৌযুদ্ধে সর্বাধিনায়কের পদে বসাই, তাহলে আর্থনীতিক অবস্থার দাস সব রকমের অস্ত্রসজ্জিত জাহাজগুলিকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। আর এর জন্যে টরপেডো কিংবা অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্রের তাঁর প্রয়োজন হবে না। শুধু 'প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগে'র মাধ্যমেই তিনি একাজ সমাধা করবেন।

চার

বলপ্রয়োগ-তত্ত্ব

(শেষ অংশ)

সাধারণভাবে বলতে গেলে (!), 'একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বস্তুত-পক্ষে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই (প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই !) মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো না কোনো ধরনের দাস-শ্রম কিংবা বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের সাহায্যে মানুষকে পদানত না করে ব্যাপক অঞ্চলে কৃষিকার্যের উদ্ভব হতে পারে নি। জিনিসপত্রের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মানুষের ওপর মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাস, ভূমিদাস কিংবা পরোক্ষভাবে পরাধীন মানুষদের ওপর একজন বৃহৎ ভূস্বামীর প্রভুত্বের ধারণা বাদ দিয়ে ঐ ভূস্বামীর অস্তিত্ব কিভাবে কল্পনা করা সম্ভব? কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রয়াস, বড়োজোর তার পরিবারবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য, সেটা বড়ো আকারের কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে কী তাৎপর্য বহন করে বা করতে পারে? ভূমির ব্যবহার কিংবা ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক ক্ষমতার অতিরিক্ত মাত্রার ওপর আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের প্রসার ঘটানো অতীত ইতিহাসে একমাত্র সম্ভব হয়েছিল ভূমির ওপর আধিপত্য কায়েম করার পূর্বে কিংবা একই সঙ্গে মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পরে। পরের যুগের ইতিহাসে এই দাসত্ব-বন্ধন অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে।...আজকের অবস্থাতে মজুরি-শ্রমের প্রবর্তনের দ্বারা এই দাসত্বকে সভ্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেটা মোটামুটি পুলিসী ব্যবস্থার দ্বারাই বহাল আছে। এইভাবে এই মজুরি-শ্রম সমকালীন সমাজের সম্পত্তির সেই ধরনের

বাস্তব সম্ভাবনার পরিচায়ক যাতে বিস্তৃত ভূমিক্ষেত্রের ওপর এবং (!) ব্যাপক ভূ-সম্পত্তির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা নিশ্চয়ই বলবার প্রয়োজন নেই যে অন্যসব ধরনের বন্টনযোগ্য সম্পদকে অনুরূপভাবে ইতিহাসের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং মানুষের ওপর মানুষের পরোক্ষ নির্ভরতাকে, যা এখন আর্থনীতিক-ভাবে সবচেয়ে বিকশিত অবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য, তার নিজস্ব প্রকৃতির সাহায্যে বোঝা যাবে না, ব্যাখ্যাও করা যাবে না ; আগের যুগের প্রত্যক্ষ পরাধীনতা ও ভোগদখলের খানিকটা রূপান্তরিত ঐতিহ্য হিসাবেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে।'

এটাই হের ড্যুরিং বলেছেন।

বক্তব্য : প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের আগে মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রমাণ : দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মানুষজন ছাড়া ব্যাপক জমিতে চাষাবাদ কোথায়ও সম্ভব হয় নি।

প্রমাণের প্রমাণ : দাসত্বে বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ ছাড়া বড়ো বড়ো ভূস্বামীর উদ্ভব কী করে সম্ভব ? কারণ বড়ো ভূস্বামী, এমনকি তার পরিবারবর্গকে নিয়েও, দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সাহায্য ছাড়া তার ভূ-সম্পত্তির সামান্য অংশই চাষাবাদ করতে পারে।

কাজেই প্রকৃতিকে বশে আনার আগেই মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার করতে হয়েছিল—এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হের ড্যুরিং কোনোরকম মাথা না ঘামিয়ে 'প্রকৃতি'কে 'ব্যাপক ভূ-সম্পত্তি'তে পরিণত করেছেন এবং এই ভূ-সম্পত্তিকে—যার মালিকানার কোনো ঠিক নেই—তৎক্ষণাৎ আবার সেই বড়ো ভূ-স্বামীর ভূসম্পত্তিতে পরিণত করছেন, যে ভূস্বামী স্বভাবতই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মানুষজন ছাড়া কাজ করতে পারে না।

প্রথমত, 'প্রকৃতির ওপর আধিপত্য' এবং 'ভূসম্পত্তির চাষাবাদ' এক বস্তু নয়। শিল্পক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য অন্য উপায়ে এবং কৃষির চেয়ে অনেক ব্যাপক আকারে করা হয় ; কৃষি এখনও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল, আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কৃষির নেই।

দ্বিতীয়ত, ব্যাপক আকারের চাষের ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের আবদ্ধ রাখি, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় : কার ভূ-সম্পত্তি এটা ? আর তখন আমরা সভ্য

মানুষদের অতীতের ইতিহাসে দেখতে পাই আদিম জনগোষ্ঠী ও গ্রামীণ গোষ্ঠী-সমাজকে, যেখানে জমির মালিকানা সর্বজনীন—হের ড্যুরিং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাতসাফাইয়ের কায়দায়, তাঁর ভাষায় যা 'প্রাকৃতিক ডায়ালেকটিকস'[১০] যাদের 'বৃহৎ ভূ-সম্পত্তির মালিকত্ব' বলেছেন, তাদের দেখতে পাই না। ভারতবর্ষ থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত এই ধরনের বৃহৎ ভূ-সম্পত্তিতে প্রথম চাষাবাদ করত ঐধরনের আদিম জনগোষ্ঠী ও গ্রামীণ গোষ্ঠী সমাজগুলির লোকজন; কখনও কখনও কৃষি জমি চাষ করা হতো যৌথভাবে, গোষ্ঠীর মানুষদের জন্যে আর কখনও বা গোষ্ঠী-নির্দিষ্ট পরিবারের জন্যে জমি সাময়িকভাবে বরাদ্দ করে দিত; বনভূমি ও পশুচারণ ক্ষেত্র সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যেই নির্দিষ্ট করা থাকত। 'রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে' হের ড্যুরিং এর 'অনুপুঙ্খ বিশেষ অধ্যয়ন' থেকে এটা আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি এসবের কিছুই জানেন না; সমস্ত জার্মান আইনের ভিত্তিস্বরূপ জার্মান মার্ক[১১]-এর আদি সংবিধান সংক্রান্ত মাউরের-এর যুগান্তকারী গ্রন্থাদি সম্বন্ধে এবং প্রধানত মাউরের-এর দ্বারা উৎসাহিত ক্রমবর্ধমান রচনাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা তাঁর লেখাপত্রের সর্বত্র প্রকাশমান; মাউরের ও তাঁর পরবর্তী রচনাদিতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে জমির ওপর সর্বজনীন মালিকানা প্রচলিত ছিল এবং এই ধরনের মালিকানার বিভিন্ন কাঠামো ও সেগুলির ভাঙনও ঐসব রচনায় দেখানো হয়েছে। ফরাসি ও ইংরেজ আইন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্রে হের ড্যুরিং যেমন 'তাঁর অজ্ঞতা নিজেই অর্জন করেছিলেন'[১২], যার পরিমাণ বড়ো কম নয়, তেমনি জার্মান আইন সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা বিপুলতর। এই ক্ষেত্রে যে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি নিজেই কিন্তু প্রায় সেই অধ্যাপকদের বিশ বছর আগেকার জ্ঞানের স্তরে রয়ে গিয়েছেন।

হের ড্যুরিং যখন বলেন যে বড়ো আকারের ভূসম্পত্তি চাষের জন্যে ভূস্বামী ও দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ লোকজনের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় নিছক 'যদৃচ্ছ সৃষ্টি ও কল্পনা'। সমগ্র প্রাচ্যে যেখানে গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজ অথবা রাষ্ট্র জমির মালিক, সেখানকার বিভিন্ন ভাষায় ভূস্বামী বা জমিদার কথাটি পাওয়া যাবে না; এই ব্যাপারে তিনি ইংরেজ আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন। জমির মালিক কে?—এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্যে ঐ আইনজ্ঞদের প্রয়াস সেই রকমই ব্যর্থ হয়েছে—রাতের প্রহরী

কে ছিল, তা জানার জন্যে ক্লস-শ্লেৎস-শ্লেৎস-লোবেনস্টাইন-ইবাস'ভাল্ডে'র প্রয়াত প্রিন্স হেনরিকের[১৩] প্রয়াস যে রকম ব্যর্থ হয়েছিল। তুর্কিরাই তাদের বিজিত দেশগুলিতে প্রথম এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানার পত্তন করে। সুপ্রাচীন মহাকাব্যের যুগে গ্রীকরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে; তাদের মধ্যে এমন এক ধরনের সামাজিক ভূমি-সম্পর্ক প্রচলিত ছিল যা স্পষ্টতই এক সুদীর্ঘ, অজ্ঞতাপূর্ব প্রাক্-ইতিহাসের সৃষ্টি, এমন কি সেখানেই প্রধানত স্বাধীন কৃষকরাই চাষ-আবাদ করত। অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায় ও উপজাতীয় প্রধানদের বড়ো বড়ো জোত এর ব্যতিক্রম ছিল; তাছাড়া এই ধরনের জোত অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রধানত কৃষকরাই ইতালিকে কৃষির অধীনে নিয়ে আসে; রোম প্রজাতন্ত্রের শেষ অবস্থায় যখন বড়ো বড়ো এস্টেট তথা বৃহৎ ভূস্বামীতন্ত্র ছোট কৃষকদের উৎখাত করে সেখানে দাসদের কাজে লাগায়, তখন তারাও জমি চাষ তুলে দিয়ে পশুপালন করতে শুরু করে। প্লিনি আগেই বলে গিয়েছেন এর ফলে ইতালি ধ্বংসের পথে যায় (লাতিফুন্দিয়া ইতালিয়াম পেরদিয়াদেরি)।[১৪] মধ্যযুগে ইউরোপের সর্বত্র কৃষকদের ছোট জোতের প্রাধান্য ছিল (বিশেষ করে পতিত জমিতে চাষাবাদ প্রচলনের ক্ষেত্রে); এবং এইসব কৃষক কোনো সামন্তপ্রভুকে খাজনা দিত কিনা, আর দিলেও কত দিত—আমাদের বর্তমান আলোচনায় সে সব প্রশ্ন গুরুত্বহীন। ফ্রিসল্যাণ্ড, লোয়ার স্যাক্সনি, ফ্লাণ্ডার্স ও লোয়ার রাইনের যেসব উপনিবেশবাদী এল্‌ব-এর পূর্বাঞ্চলের জমি স্লাভদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কৃষির পত্তন করেছিল, তারা স্বাধীন কৃষক হিসাবেই এই কাজ করে এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক খাজনার শর্তে এইসব জমি ভোগদখলের অধিকার পায়, এটা আদৌ কোনো 'জবরদস্তিমূলক বেগার খাটুনি'র ব্যাপার ছিল না।

উত্তর আমেরিকার ব্যাপকতম অঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু করে স্বাধীন কৃষকরাই আর দক্ষিণাঞ্চলের বৃহৎ জমিদাররা দাসদের দিয়ে চাষ করিয়ে এবং লোভীর মতো ভূমিকর্ষণের মাধ্যমে জমির উৎপাদিকা ক্ষমতা এমনভাবে নিঃশেষ করে ফেলে যার ফলে ফারগাছ ছাড়া আর কিছু জন্মানো অসম্ভব হয়ে পড়ে—তাই তুলোর চাষ ক্রমশ পশ্চিমাঞ্চলে সরে যায়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে কৃত্রিমভাবে ভূস্বামী-অভিজাতগোষ্ঠী সৃষ্টির যাবতীয় চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। সংক্ষেপে, আমরা যদি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও আধা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপনিবেশগুলিকে বাদ দিই, যেখানে ইউরোপিয়ানদের পক্ষে

জলবায়ুর জন্যে কৃষিতে শ্রম করা সম্ভব নয়, তাহলে পরে বৃহৎ ভূস্বামীরা তাদের দাস বা ভূমিদাসদের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং জমিতে কৃষিকাজ করেছে—এই বক্তব্য নেহাৎ অসার কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। আসলে এর বিপরীত প্রক্রিয়াটাই সত্য। প্রাচীনকালে ইতালির মতো দেশে, যেখানে বৃহৎ ভূস্বামীর উদ্ভব ঘটেছিল, সেখানে এই ভূস্বামী পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনে নি, বরং কৃষকদের চাষ-করা জমিকে পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করেছিল; আর তার ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে লোকজন উৎখাত হয় ও গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির দাম বাড়লে এবং বিশেষ করে কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় অসার জমি চাষযোগ্য হয়ে ওঠার পর থেকেই বৃহৎ ভূস্বামীরা পতিত ও ঘাসে ঢাকা জমিকে কৃষির আওতায় আনার জন্যে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেয়। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি—উভয় দেশেই কৃষকদের কাছ থেকে সর্বসাধারণের জমি প্রধানত গায়ের জোরে গ্রাস করেই এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এর আরও একটা দিক ছিল। ইংল্যাণ্ডে সর্বসাধারণের প্রতি একর জমিকে চাষোপযুক্ত করার বিনিময়ে বৃহৎ ভূস্বামীরা স্কটল্যাণ্ডের কমপক্ষে তিন একরের মতো চাষের জমিকে মেষচারণ ভূমিতে পরিণত করে এবং শেষ পর্যন্ত সেই জমিতে লোভনীয় মৃগয়া ক্ষেত্র গড়ে তোলে।

আমরা এখানে হের ড্যুরিং-এর একমাত্র এই ঘোষণাটি নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি যে বড়ো আকারের ভূমিখণ্ডকে চাষের আওতায় আনা এবং বস্তুতপক্ষে এখানকার সমগ্র কর্ষিত ভূমিতে কৃষির পত্তন বৃহৎ ভূস্বামীবর্গ ও তাদের দাসত্ববদ্ধ লোকজনের মাধ্যমে ছাড়া 'কখনও ও কোথায়ও' ঘটে নি—ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি, এই ঘোষণাটি প্রকৃতপক্ষেই ইতিহাস সম্বন্ধে নজিরবিহীন অজ্ঞতার পরিচায়ক। সুতরাং আমাদের পক্ষে এটা সবসময়েই পরীক্ষা না করলেও চলবে যে যেসব অঞ্চলকে পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে চাষযোগ্য করে তোলা হয়, তার কতটা বিভিন্ন যুগে দাসদের দিয়ে (গ্রীসের পূর্ণ বিকাশের যুগে) অথবা ভূমিদাসদের দিয়ে (মধ্যযুগীয় জমিদারি প্রথায়) চাষ করানো হতো; অথবা বিভিন্ন যুগে বৃহৎ ভূস্বামীদের সামাজিক ভূমিকা কী ছিল।

হের ড্যুরিং তাঁর কল্পনার এই সৃষ্টি আমাদের কাছে তুলে ধরার পর—তাঁর সুকৌশলী সিদ্ধান্ত অথবা ইতিহাসের বিকৃতিসাধন, এর মধ্যে কোনটাকে

আমরা তারিফ করব তা ঠিক বুঝতে পারছি না—তিনি বিজয়গর্বে ঘোষণা করেছেন :

> 'এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে সমস্ত ধরনের ধনসম্পত্তি বণ্টনকে ব্যাখ্যা করতে হবে ইতিহাসের ধারায় অনুরূপভাবে।'

এটা করতে অবশ্য তাঁকে, যেমন পুঁজির উদ্ভব কী করে হলো—সে সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করার ঝামেলা পোহাতে হয় না।

তিনি যদি প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের ভিত্তি হিসাবে মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্যের কথা বলতে গিয়ে সাধারণভাবে এটাই বলতে চেয়ে থাকেন যে আমাদের বর্তমান সমগ্র আর্থনীতিক ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পে বর্তমানে অর্জিত বিকাশের স্তর এমন একটা সামাজিক ইতিহাসের ফল যার উদ্ভব ঘটেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে, প্রভুত্ব ও অধীনতামূলক সম্পর্কের ব্যবস্থায়—তাহলে তিনি এমন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন যা বহু আগেই, 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সর্বজনবিদিত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রেণী-গুলির উৎপত্তি ও আধিপত্যভিত্তিক সম্পর্কের উদ্ভবকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব, আর এই ক্ষেত্রে হের ড্যুরিং-এর একমাত্র জবাব যদি হয় 'বল-প্রয়োগ', তাহলে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই থেকে যাচ্ছি। শাসিত ও শোষিতরা সব সময়েই শাসক ও শোষকদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি, সুতরাং পূর্বোক্তদের হাতেই আসল ক্ষমতা থাকে—নিছক এই তথ্যটিই বলপ্রয়োগের সমগ্র তত্ত্বকে নাকচ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে প্রভুত্ব ও আধিপত্যভিত্তিক সম্পর্কের বিষয়টিকে এখনও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এইসব সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে দু'ভাবে।

পশুজগৎ থেকে মুক্তিলাভ করেই—কথাটির সংকীর্ণ অর্থে—মানুষ ইতিহাসে পদার্পণ করেছে : মানুষ তখনও অর্ধ-পশু, বর্বর প্রকৃতির শক্তির কাছে অসহায় এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ ; কাজেই পশুদের মতোই একেবারে নিরুপায় এবং মানুষের উৎপাদনী ক্ষমতা তখন পশুদের চেয়ে সামান্য বেশি। তখন তাদের জীবনধারণের অবস্থার একটা সমতা ছিল এবং পরিবারের কর্তাদের সামাজিক অবস্থাও ছিল এক ধরনের সমতাভিত্তিক— অন্ততপক্ষে সামাজিক শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব ছিল না; পরবর্তীকালের সভ্য জাতিসমূহের আদিম কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এই ধরনের প্রতিটি

গোষ্ঠীর মধ্যে গোড়া থেকেই এমন কতকগুলি সাধারণ করণীয় দেখা দেয় যা সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করতে হয় নানা ব্যক্তির হাতে, যদিও সমগ্র গোষ্ঠীই ছিল এদের নিয়ন্ত্রক: এই দায়িত্বগুলি হচ্ছে গোষ্ঠীগত বিরোধের নিষ্পত্তি; ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা; বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ; এবং একেবারে আদিম অবস্থায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা। প্রাচীনতম জার্মান মার্ক থেকে একালের ভারতবর্ষ পর্যন্ত সর্ব-কালের আদিম গোষ্ঠীদের মধ্যে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব ব্যক্তির হাতে স্বভাবতই খানিকটা কর্তৃত্ব থাকে এবং এদের মাধ্যমেই রাষ্ট্র-ক্ষমতার সূচনা হয়। উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে; জন-সংখ্যার ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব একদিকে সর্বজনীন স্বার্থ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ—বৃহত্তর সংগঠনে এইসব গোষ্ঠীর মিলন জন্ম দেয় নতুন শ্রম-বিভাগের, গড়ে তোলে সর্বজনীন স্বার্থরক্ষা এবং পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের নিষ্পত্তিকল্পে বিভিন্ন সংস্থা। এইসব সংস্থা সমগ্র গোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত, তাই প্রতিটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সম্বন্ধে তাদের একটা বিশেষ অবস্থান ছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা ঐসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াত; এরা অনতিবিলম্বেই স্বাধীন হয়ে ওঠে, খানিকটা বংশানুক্রমিকভাবে কর্মপরিচালনার মধ্যে দিয়ে, যে জগতে সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ঘটে, সেখানে যা খুবই স্বাভাবিক; এবং স্বাধীন হয়ে ওঠার অপর কারণ হচ্ছে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সমাজ সম্বন্ধে সামাজিক ভূমিকার এই স্বাধীনতা কালে কালে বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের ওপর প্রভুত্বে পরিণত হয়েছে, প্রথমে যে দাস ছিল সে অনুকূল পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রভু হয়ে উঠল, পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে দাঁড়াল প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রী কিংবা প্রাদেশিক শাসক, কোনো গ্রীক উপজাতির শাসক, কেল্টিক কৌমের গোষ্ঠীপতি এবং এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে সে কতটা বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিগত শাসকরা কিভাবে একটা শ্রেণীরূপে ঐক্যবদ্ধ হয়—সেইসব বিষয় এখানে আমাদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে শুধু এইটুকুই প্রতিপন্ন করতে চাই যে সামাজিক ভূমিকাই সর্বত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তি-ভূমি হিসাবে কাজ করেছে; এবং রাজনৈতিক আধিপত্য ততদিনই টিকে থাকতে পেরেছে যতদিন সে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম

থেকেছে। যত সংখ্যক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উত্থান-পতনই ঘটুক ,না কেন, তাদের সকলেই এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন ছিল যে তাদের বিশেষ কাজ হচ্ছে নদীর উপত্যকায় যৌথভাবে সেচ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, কেননা এছাড়া ঐ অঞ্চলে কোনো কৃষিকাজ সম্ভব নয়। বিদগ্ধ ইংরেজ শাসকদেরই ভারতবর্ষে এই কাজটির দিকে নজর পড়ে নি। তারা সেচখাল ও জলাধারগুলিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দিয়েছিল এবং বারংবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, সম্প্রতিকালে তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে অন্তত‌পক্ষে যে কাজটুকু করলে, তাদের শাসন পূর্ববর্তী শাসকদের শাসনের মতোই বৈধতা পেতো, সেই কাজটিকে তারা অবহেলা করেছে।

কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী-গঠনের এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আর একটি প্রক্রিয়াও ঘটছিল। উন্নতি সাধনের একটা বিশেষ পর্যায়ে কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে যে স্বাভাবিক শ্রম-বিভাগ দেখা দেয়, সেখানে এক বা একাধিক বাইরের লোককে মেহনতের জন্যে নেওয়া সম্ভব হয়। এটা বিশেষ করে সেই সকল দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যেখানে জমিতে পুরানো ধরনের যৌথ মালিকানায় ভাঙন ধরেছিল অথবা আগেকার যৌথ চাষের বদলে বিভিন্ন পরিবার টুকরো টুকরো জমি আলাদাভাবে চাষ করতে শুরু করেছিল। উৎপাদন এতদূর পর্যন্ত উন্নত হয়েছিল যে একজন মানুষ নিজস্ব শ্রমশক্তির সাহায্যে যা উৎপন্ন করতে পারে, সেটা তার নিছক জীবনধারণের চাইতে বেশি; অতিরিক্ত মেহনতকারীদের রক্ষণাবেক্ষণের মতো সম্পদও তখন সমাজে সৃষ্টি হচ্ছিল; অনুরূপভাবে এই মেহনতকারীদের কাজে লাগাবার উপকরণও পাওয়া যাচ্ছিল; শ্রম-শক্তির একটা মুল্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খোদ গোষ্ঠীটি এবং যে বৃহত্তর গোষ্ঠীর এ অন্তর্ভুক্ত, তারা কোনোরকম প্রাপ্তিযোগ্য বাড়তি মেহনতকারী সৃষ্টি করতে পারছিল না। অন্যদিকে, যুদ্ধের মাধ্যমেই এই ধরনের মেহনতকারী পাওয়া যাচ্ছিল, আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর যুগপৎ অস্তিত্ব ও পাশাপাশি সহাবস্থানের মতো যুদ্ধও ছিল একটা প্রাচীন ঘটনা।

যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে কী করা হবে, গোষ্ঠীগুলি এতদিন তা বুঝে উঠতে পারে নি আর তাই সোজাসুজি তাদের খতম করে দিত; আরও আগের যুগে তাদের খেয়ে ফেলত। কিন্তু 'আর্থনীতিক' স্তর এই সময়ে যে-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তাতে এই বন্দীরা মূল্যবান হয়ে ওঠে, তাই তাদের বাঁচিয়ে রেখে তাদের শ্রমকে কাজে লাগানো হতে লাগল। এইভাবে আর্থনীতিক

পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার বদলে, বলপ্রয়োগকে আর্থনীতিক পরিস্থিতির কাজে ব্যবহার করা হলো। উদ্ভব ঘটল দাসপ্রথার। পুরানো গোষ্ঠী-সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে যেসব জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছিল, দাসপ্রথা তাদের মধ্যে দ্রুত উৎপাদনের প্রধান রূপ হয়ে উঠল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে উঠেছিল তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই দাসপ্রথাই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রথম বৃহদাকারে শ্রম-বিভাগ, আর সেই সঙ্গে প্রাচীন জগতের গৌরব গ্রীক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। দাসপ্রথা ব্যতীত গ্রীক রাষ্ট্র, গ্রীক শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জন্ম হতে পারত না, সম্ভব হতো না রোম সাম্রাজ্য। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রোম সামাজ্য যে-ভিত্তি গড়ে তুলেছিল, সেটা ছাড়া অসম্ভব ছিল আধুনিক ইউরোপের জন্ম। আমাদের এটা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের সমগ্র আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতি ঘটার পূর্বে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যেখানে দাসপ্রথা ছিল অনিবার্য ও সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থা। একদিক থেকে এটা বলা চলে যে প্রাচীনকালের দাসপ্রথা ছাড়া আধুনিক সমাজবাদেরও জন্ম হতে পারতো না।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা এবং সাধারণভাবে এই প্রথাকে কটুকাটব্য করা ও এই ধরনের জঘন্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল নৈতিক ঘৃণা উজাড় করে দেওয়া খুবই সহজ কাজ। দুঃখের বিষয় এসবের অর্থ সর্বজনবিদিত; এর থেকে শুধু এটাই বোঝা যায় যে এইসব সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত আমাদের মানসিকতার সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু কিভাবে এইসব প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছিল, কেনইবা সেগুলি টিকে ছিল আর ইতিহাসে তাদের ভূমিকাইবা ছিল কী—সে সম্বন্ধে ওপরের বক্তব্য আমাদের কোনরকম হদিস দিতে পারে না। আর এইসব প্রশ্নকে আমরা যখন বিচার করতে বসি, তখন আমাদের এটা বলতেই হয় যে তা যতই স্ববিরোধী ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত হোক না কেন, তখনকার পরিস্থিতিতে দাসপ্রথার প্রবর্তন ছিল একটা বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপ। কারণ মানুষ যে পশু থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং তার ফলে বর্বরতার পর্যায় থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্যে তাকেও অবলম্বন করতে হয়েছে বর্বর ও প্রায় পাশবিক পদ্ধতি—এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। প্রাচীন গোষ্ঠীসমাজ যেসব জায়গায় টিকে থেকেছে, সেইসব জায়গায় এই

গোষ্ঠীসমাজগুলি হাজার হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রের স্থূলতম রূপ, প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষ থেকে রুশদেশ পর্যন্ত এটাই ঘটেছে। যেসব জায়গায় এই গোষ্ঠীসমাজগুলি ভেঙে গিয়েছিল, একমাত্র সেইসব জায়গাতেই মানুষের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে; তাদের আর্থনীতিক অগ্রগতির পরবর্তী ধাপ হয়েছে দাস-শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশ। আর এটা সুস্পষ্ট যে যতদিন পর্যন্ত মানুষের শ্রম জীবন-ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের চাইতে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত কিছু উৎপাদন করতে পারেনি, ততদিন উৎপাদিকা শক্তির কোনোরকম বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার, রাষ্ট্র ও আইনের বিকাশ কিংবা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব ছিল একমাত্র অধিকতর শ্রম-বিভাগের মাধ্যমেই। একদিকে সহজ-সরল শ্রমে নিযুক্ত আপামর জনসাধারণ এবং অন্যদিকে শ্রমের পরিচালক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি কাজের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তিবর্গের এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিরাট শ্রম-বিভাগের ফলে এর উপযোগী বনিয়াদ গড়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে শ্রম-বিভাগের সবচেয়ে সরল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপ ছিল দাসপ্রথা। প্রাচীন জগতের ইতিহাসের পটভূমিতে, বিশেষ করে গ্রীসদেশের পরিস্থিতিতে, একমাত্র দাসপ্রথার মাধ্যমেই শ্রেণীবিরোধ ভিত্তিক একটি সমাজের অগ্রগতি হওয়া সম্ভব ছিল। দাসদের পক্ষেও এ একটা অগ্রগতি। এই সময়ে যুদ্ধবন্দীদের, যাদের মধ্যে থেকে দাস সংগ্রহ করা হতো, আগেকার মতো খতম না করে বা আরও আগের যুগের মতো আগুনে ঝলসিয়ে খেয়ে না ফেলে, অন্তত প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হতো।

এখানে আমরা এটুকু সংযোজন করতে পারি যে শোষক ও শোষিত, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যেকার ঐতিহাসিক বিরোধগুলি আজ পর্যন্ত সেই একই মনুষ্য শ্রমের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যতদিন পর্যন্ত শ্রমজীবী জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ব্যাপৃত ছিল যার ফলে শ্রমের তত্ত্বাবধান, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি বিষয়ের মতো সমাজের সাধারণ কাজগুলির দিকে নজর দেবার জন্যে তাদের হাতে অতিরিক্ত কোনো সময় ছিল না, ততদিন পর্যন্ত এইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্যে দৈহিক মেহনত থেকে মুক্ত একটা বিশেষ শ্রেণীর অস্তিত্ব সব সময়েই প্রয়োজন ছিল;

আর এই শ্রেণীটি তার নিজের সুবিধার জন্যে মেহনতি জনগণের কাঁধে ক্রমশই বেশি পরিমাণে মেহনতের বোঝা চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করে নি। একমাত্র আধুনিক শিল্পের দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বিপুল অগ্রগতিই সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রমের ভাগ-বাঁটোয়ারা করা সম্ভব করে তুলেছে, এবং এইভাবে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের শ্রমের সময় এতটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যার ফলে সমাজের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় ধরনের সাধারণ কাজকর্মে অংশ নেবার মতো যথেষ্ট অবসর তাদের সবার হাতে থেকে যায়। সুতরাং একমাত্র বর্তমান সময়েই প্রতিটি শাসক ও শোষক শ্রেণী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, আর সত্যি সত্যিই তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ; একমাত্র বর্তমান সময়েই তাদের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, তা তারা যতই 'প্রত্যক্ষ ক্ষমতা'র অধিকারী হোক না কেন।

সুতরাং দাসপ্রথার ভিত্তিতে গ্রীকসভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে হের ড্যুরিং যখন তার নিন্দাবাদ করেন, তখন তিনি ঐ একই বিচারের মানদণ্ডে গ্রীকদেরও নিন্দা করতে পারেন, কারণ তাদেরও স্টিম ইঞ্জিন অথবা বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ছিল না। আর যখন তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে আমাদের কালের মজুরি-বন্ধনকে তার নিজস্ব চরিত্রের দিক থেকে ব্যাখ্যা (অর্থাৎ আধুনিক সমাজের আর্থনীতিক নিয়মের সাহায্যে) করার পরিবর্তে দাসপ্রথার খানিকটা রূপান্তরিত ও সহনশীল দায়ভাগ হিসাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তখন তার দু'রকম অর্থ হতে পারে : হয় মজুরি-শ্রম ও দাসপ্রথা উভয়ই দাসত্ব ও শ্রেণী-প্রভুত্বের নিছক রূপ-ভেদ মাত্র, যা একটা শিশুও জানে, অথবা মজুরি-শ্রমটাই কাল্পনিক। ঐ একই মানদণ্ডে আমরা একথাও বলতে পারি যে মজুরি-শ্রমকে নরমাংস ভক্ষণের কম হিংস্ররূপ হিসাবেই শুধু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ এটা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে পরাজিত শত্রুদের সদ্ব্যবহার করার এটাই ছিল সর্বজনীন আদিম রূপ।

সুতরাং আর্থনীতিক বিকাশের তুলনায় ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ভূমিকা কী ছিল তা এখন পরিষ্কার। প্রথমত, সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত আর্থনীতিক ও সামাজিক কর্তব্য-নির্ভর, আদিম গোষ্ঠীসমাজের বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে সমাজের মানুষরা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এই (রাজনৈতিক) ক্ষমতা এবং এইভাবে সমাজের সাধারণ কাজকর্মের পরিচালকের ভূমিকা থেকে তারা ক্রমশই বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন সমাজের তুলনায় নিজেকে স্বাধীন করে তুলেছে এবং সমাজের সেবক থেকে নিজেকে প্রভুতে পরিণত করেছে, তখন দুটি ভিন্ন ধারায় তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব। হয় তাকে কাজ করতে হবে স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের অর্থে ও ধারায়, এক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয় না, আর্থনীতিক বিকাশ দ্রুততরই হয়। অথবা এটা হয়ে দাঁড়ায় আর্থনীতিক বিকাশের প্রতিবন্ধক : এই ক্ষেত্রে, সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা আর্থনীতিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমগুলি হচ্ছে পররাজ্য বিজয়ের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এইসব ক্ষেত্রে বর্বরজাতির বিজেতারা একটা দেশের জন-সংখ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অথবা বিতাড়িত করেছে এবং উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ধ্বংসসাধন ঘটিয়েছে কিংবা ধ্বংস হতে দিয়েছে, কারণ এইসব উৎপাদিকা শক্তির ব্যবহার তারা জানত না। মূর-অধ্যুষিত স্পেনে খ্রিস্টানরা এটাই করেছিল—যে সেচ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে মূরদের অত্যন্ত উন্নত কৃষি ও উদ্যানগুলি গড়ে উঠেছিল, সেই সেচ ব্যবস্থার বেশির ভাগটাই খ্রিস্টানরা ধ্বংস করে দেয়। বর্বরতর জাতিদের প্রতিটি বিজয় আর্থনীতিক বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করেছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে অসংখ্য উৎপাদিকা শক্তিকে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে বিজয় স্থায়ী হয়েছে, তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই অধিকতর বর্বর বিজেতাকে জয়লাভের পর খাপখাইয়ে নিতে হয়েছে উন্নততর 'আর্থনীতিক অবস্থা'র সঙ্গে; বিজিতরা তাদের নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে, আর অধিকাংশ সময়েই বিজিতদের ভাষা পর্যন্ত তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু দেশজয়ের ঘটনা ছাড়া যেখানে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রক্ষমতা সেই দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে (একটা নির্দিষ্ট স্তরে অতীতকালের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে), তখন সব সময়েই এই বিরোধের অবসান ঘটেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার পতনের ভিতর দিয়ে। আর্থনীতিক বিকাশের ধারা অপ্রতিহত গতিতে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে তার পথ করে নিয়েছে—এর সর্বাধুনিক ও অত্যন্ত চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হিসাবে মহান ফরাসি বিপ্লবের কথা আমরা এর আগেই উল্লেখ করেছি। হের ড্যুরিং-এর তত্ত্ব অনুযায়ী যদি কোনো দেশের আর্থনীতিক অবস্থা ও তার সংশ্লিষ্ট আর্থনীতিক কাঠামো নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপরই নির্ভরশীল হতো, তাহলে এটা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে কেন তাঁর 'জমকালো

সেনাবাহিনী'[২৫] সত্ত্বেও চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৪৮ সালের পর রেল, স্টিম ইঞ্জিন এবং তাঁর দেশে তখন সবে যা গড়ে উঠছিল সেই বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে মধ্যযুগীয় গিল্ড ও অন্যান্য রোম্যান্টিক কিম্ভূতকিমাকার বিষয়কে জোড়া দিতে পারেননি ; অথবা কেন আরও বেশি শক্তির অধিকারী রুশ দেশের জার শুধু যে তাঁর ঋণ শোধ দিতে পারছেন না তাই নয়, উপরন্তু পশ্চিম ইউরোপের 'আর্থব্যবস্থা' থেকে ক্রমাগত ধার না নিয়ে তাঁর নিজের 'ক্ষমতা'ও বজায় রাখতে পারছেন না।

হের ড্যুরিং-এর কাছে বলপ্রয়োগই চরম অশুভ ব্যাপার ; তাঁর মতে বলপ্রয়োগের প্রথম কাজটিই হচ্ছে আদিম পাপ ; তাঁর সমগ্র ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এই আদিম পাপের দ্বারা কলংকিত সমগ্র পরবর্তী ইতিহাসের জন্যে পরিতাপের, এই নারকীয় শক্তি ও বলপ্রয়োগের দ্বারা যাবতীয় সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মগুলির জঘন্য বিকৃতির শোকাবহ ফিরিস্তি। এই বলপ্রয়োগ অবশ্য ইতিহাসে একটা ভিন্নতর ভূমিকা, বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে ; মার্কসের ভাষায় একটি নতুনের জন্মসম্ভাবনায় পরিপূর্ণ প্রতিটি পুরানো সমাজের ধাত্রী হচ্ছে এই বলপ্রয়োগ ;* অর্থাৎ এই হাতিয়ারের সাহায্যেই সামাজিক আন্দোলন তার পথ পরিষ্কার করে নেয় এবং মৃত, জড়ীভূত রাজনৈতিক কাঠামোগুলিকে ভেঙে চুরমার করে ফেলে—এ সম্পর্কে হের ড্যুরিং একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি। অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ও আর্তনাদের পর তিনি শোষণমূলক আর্থব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্যে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হতেও পারে বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ একটা দুঃখজনক ব্যাপার, কারণ বলপ্রয়োগের ফলে তার ব্যবহারকারীর নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। প্রত্যেকটি বিজয়ী বিপ্লব যে অপরিমেয় নৈতিক ও আত্মিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, তার পরেও তিনি এই কথা বলতে পারলেন ! আর বললেন জার্মানিতে,—যেখানে জনগণের উপর শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ চেপে বসবে এবং ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের গ্লানির ফলে জার্মানির জাতীয় চেতনার মধ্যে যে বশ্যতার মানসিকতা ঢুকে গিয়েছে, এই সংঘর্ষ সেই মানসিকতাকে অন্ততপক্ষে মুছে দিতে পারবে। এটা হচ্ছে একান্তভাবেই ধর্মযাজকের মনোবৃত্তি—ভোঁতা, নীরস ও বন্ধ্যা এবং এই মনোবৃত্তিই ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবী পার্টির ওপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে চাইছে।

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৭০৩। সম্পাদক।

পাঁচ

মূল্য-মানের তত্ত্ব

প্রায় একশো বছর আগে লাইপজিগ-এ একটি বই প্রকাশিত হয় এবং উনিশ শতকের সূচনাকালের মধ্যেই তার তিরিশটি সংস্করণ বাজারে বেরোয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ, গির্জার প্রচারক এবং সব ধরনের সমাজ-সেবকরা গ্রাম-শহরে বইটি প্রচার করেন ; এইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সাধারণভাবে অনুমোদন পায়। বইটি হচ্ছে রোচাউ-এর 'কিশোর বন্ধু'।[৯৬] বইটির উদ্দেশ্য ছিল কৃষক ও কারিগর-সন্তানদের বৃত্তি আর সমাজ ও রাষ্ট্রে বয়জ্যেষ্ঠদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষাদান করা আর এইভাবে তাদের পার্থিব ভাগ্য, পোড়া রুটি, আলু, খতবন্দী শ্রম, কম মজুরি, বাপ-মার হাতে প্রহার এবং এই ধরনের অন্যান্য আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রসন্নচিত্তে থাকার জন্যে তাদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ; সেই সময়ে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলি তাদের কাছে হাজির করা হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্য নিয়েই শহর ও গ্রামের কিশোর ও তরুণদের কাছে এই উপদেশ রাখা হয়েছিল যে প্রকৃতি কত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রমের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার্জন ও আনন্দ উপভোগের বিধিলিপি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ; ধনীদের মতো বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যে না ভুগে এবং পছন্দসই মুখরোচক খাবার অতৃপ্তি সহকারে গেলবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে কৃষক বা কারিগররা যে হাড়ভাঙা মেহনতের মধ্যে দিয়ে তাদের খাদ্যকে সুস্বাদু করে নিতে পারছে, তাতে তারা কত সুখী। স্যাক্সনির নির্বাচকমণ্ডলীর অধীন কৃষক ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সেই সময়ে উপযুক্ত বলে যেসব সুসমাচার রোচাউ হাজির করেছিলেন, সেই একই মামুলি বক্তব্য হের ড্যুরিং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সর্বাধুনিক 'মৌলিক বনিয়াদ' হিসাবে তাঁর 'দর্শন আলোচনা'র চতুর্দশ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে উপস্থিত করেছেন।

'মানবিক চাহিদাগুলির নিজস্ব স্বাভাবিক নিয়ম রয়েছে। একটা সীমা পর্যন্তই এগুলিকে প্রসারিত করা সম্ভব, একমাত্র অস্বাভাবিক কার্যাবলীর মাধ্যমে ও একান্তই সাময়িকভাবে এই সীমা অতিক্রম করা যায়—যতক্ষণ না এইসব কাজের পরিণতিস্বরূপ বিতৃষ্ণা, জীবনে ক্লান্তি, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, সামাজিক ভাঙন দেখা দিচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণতি ঘটছে কল্যাণকর বিনাশের মধ্যে।...গূঢ় উদ্দেশ্যহীন নিছক সুখভোগের জন্যে জীবনযাপন অচিরেই যে কোন মানুষকে উপভোগ বা অনুভব করার ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেয়। সুতরাং কোনো না কোনো ধরনের প্রকৃত শ্রম সুস্থ মানুষের পক্ষে একটা স্বাভাবিক সামাজিক নিয়ম।...যদি প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিকে সংযত করার ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ইতিহাসের ধারায় জীবনের গভীরতর বিকাশ দূরে থাকুক, এগুলি আমাদের একটা শিশুসুলভ অস্তিত্বও সৃষ্টি করতে পারত না। এগুলি যদি একটা সীমাহীন মাত্রায় ও আয়াসহীনভাবে পরিতৃপ্ত হতো, তাহলে তারা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং পুনরায় আকাঙ্ক্ষা বোধ না করা পর্যন্ত, একটা ক্লান্তিকর অবকাশের অস্তিত্বহীনতার মধ্যে পড়ে থাকত। সুতরাং সমস্ত দিক থেকে প্রকৃতির বাহ্যিক ব্যবস্থা ও মানুষের অভ্যন্তরীণ গঠন উভয়ের পক্ষেই এ একটা কল্যাণকর মৌলিক নিয়ম যে প্রবৃত্তি ও আবেগসমূহের তৃপ্তিবিধান নির্ভর করে আর্থনীতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি জয় করার ওপর'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা দেখা যাচ্ছে যে পণ্ডিতপ্রবর রোচাউ-এর অর্থহীন মামুলি বক্তব্যগুলি হের ড্যুরিং-এর মধ্যে দিয়ে তাদের শতবার্ষিকী উদযাপন করছে, উপরন্তু এটা করতে গিয়ে এটাই হয়ে উঠেছে একমাত্র যথার্থ বিচারমূলক ও বিজ্ঞানসম্মত 'সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি'র 'গভীরতর বনিয়াদ'।

এইভাবে বনিয়াদ নির্মাণ করে হের ড্যুরিং ভবিষ্যৎ নির্মাণকর্মের দিকে এগিয়েছেন। গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বৃদ্ধ ইউক্লিড-এর প্রণালী অনুযায়ী তিনি আমাদের একগুচ্ছ সংজ্ঞা উপহার দিয়েছেন।[৩৭] এ একটা বেশ সুবিধাজনক পদ্ধতি, কেননা এর ফলে তিনি তাঁর সংজ্ঞাগুলি এমনভাবে উদ্ভাবন করতে পেরেছেন যাতে এই সংজ্ঞাগুলির সাহায্যে যা প্রমাণ করতে হবে, তা ইতিমধ্যেই এগুলির ভিতরে স্থান পেয়ে গেছে। তাই একেবারে গোড়াতেই আমরা এটা জানতে পারি যে—

যে ধারণা আগেকার সমস্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে তা

হচ্ছে ধনসম্পদ সংক্রান্ত ধারণা, এবং এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধন-সম্পদকে যেভাবে বোঝা হয়েছে ও পৃথিবীর ইতিহাসে এর যে-অর্থটি প্রধান হয়ে উঠেছে তা হলো 'মানুষ ও জিনিসপত্রের ওপর আর্থনীতিক ক্ষমতার প্রাধান্য'।

দ্বিবিধ অর্থেই সংজ্ঞাটি ভুল। প্রথমত, প্রাচীন জগতের উপজাতীয় ও গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজের সম্পদ কোনো অর্থেই মানুষের ওপর প্রভুত্বমূলক ছিল না। আর দ্বিতীয়ত, শ্রেণীবিরোধমূলক সমাজেও, যেখানে মানুষের ওপর প্রভুত্ব চলত, সেখানেও মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েম হয়েছিল বস্তুজগতের ওপর মানুষের প্রভুত্বের গুণে ও তার মাধ্যমে একেবারে সুপ্রাচীন-কালে, যখন দাসদের বন্দী ও দাসদের শোষণ করা একটা পৃথক সামাজিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তখন দাস-শ্রমের শোষকদের দাস কিনতে হতো এবং দাসদের ক্রয়-মূল্য তাদের জীবন-ধারণের উপকরণ ও শ্রমের হাতিয়ার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তাদের পূর্ব-কর্তৃত্বের জোরেই দাস-মালিকরা মানুষের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়। সারা মধ্যযুগ জুড়ে বৃহদায়তন ভূসম্পত্তি এমন একটা উপাদান ছিল যার সাহায্যে সামন্ত অভিজাতরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারত ও তাদের দিয়ে বেগার খাটাতো। এমনকি এখনকার একটা ছ' বছরের শিশুও এটা বোঝে যে সম্পদ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করে তার অধিকারভুক্ত বস্তুসামগ্রীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মাধ্যমেই।

কিন্তু হের ড্যুরিংকে কেন এই ভুল সংজ্ঞা উদ্ভাবন করতে হয়েছে আর কেনই বা তিনি আগেকার সমস্ত শ্রেণী-সমাজের মধ্যে যে বাস্তব যোগসূত্র ছিল সেগুলি ছিন্ন করেছেন? ধনসম্পদকে অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে নৈতিক ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসার জন্যেই তাঁকে এই কাজটি করতে হয়েছে। বস্তুসামগ্রীর ওপর প্রভুত্ব ভালো কাজ কিন্তু মানুষের ওপর প্রভুত্ব একটা অন্যায় ব্যাপার; আর যেহেতু হের ড্যুরিং মানুষের ওপর বস্তুসামগ্রীর প্রভুত্বকে ব্যাখ্যা করতে নারাজ, তাই তিনি আবার একটা সাংঘাতিক ভোজবাজির আশ্রয় নিয়ে তার অতি প্রিয় বলপ্রয়োগের তত্ত্বের সাহায্যে মানুষের ওপর প্রভুত্বের বিষয়টিকে নির্বিবাদে ব্যাখ্যা করেছেন। ধনসম্পদ যেহেতু মানুষের ওপর প্রভুত্ব, তাই তা 'ডাকাতি'—এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রুধোঁর সেই পুরানো সূত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় ফিরে যাই: 'সম্পত্তি হচ্ছে চুরিবৃত্তির ফল।'[১৮]

এখন আমরা ধনসম্পদকে নিশ্চিন্তে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

উৎপাদন ও বণ্টন : বস্তুসামগ্রীর ওপর প্রভুত্বকারী সম্পদ হচ্ছে উৎপাদনজাত সম্পদ, এটা এর ভালো দিক ; মানুষের ওপরে প্রভুত্বকারী সম্পদ—বর্তমানকাল পর্যন্ত বণ্টিত সম্পদ, এটা এর খারাপ দিক, এটা জাহান্নামে যাক ! বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে একে প্রয়োগ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় : পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বেশ ভালোই, এটা চলতে পারে, কিন্তু পুঁজিবাদী বণ্টন পদ্ধতি খারাপ আর তাই তাকে উচ্ছেদ করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেকার যোগসূত্র উপলব্ধি না করে অর্থনীতি নিয়ে লিখতে গেলে এই ধরনের মূর্খতাই প্রকাশ পায়।

সম্পদ সম্বন্ধে এইসব কথা বলার পর মূল্য সংক্রান্ত এই সংজ্ঞাটি হাজির করা হয়েছে :

'ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থসামগ্রী ও সার্ভিসের দামই হচ্ছে মূল্য।' এই দাম 'দর কিংবা মজুরির মতো অন্য যে কোনো সমতুল্য নামের' অনুরূপ।

ভাষান্তরে মূল্য হচ্ছে দর। কিংবা হের ড্যুরিং-এর প্রতি সুবিচার করতে হলে এবং তাঁর সংজ্ঞার অবাস্তবতাকে যতদূর সম্ভব তাঁর নিজের কথায় তুলে ধরতে হলে বলতে হয় : একই মূল্যের অনেকগুলি দর। কারণ তিনি উনিশ পাতায় লিখেছেন :

'মূল্য এবং দরগুলি অর্থের মধ্যে অভিব্যক্ত'।

এইভাবে তিনি নিজেই বলছেন যে একই মূল্যের বিভিন্ন দর রয়েছে আর তাই মূল্যও বহু রকম। হেগেল বহুদিন আগে মারা না গেলে, এখন নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতেন ; কারণ তাঁর যাবতীয় ধর্মতত্ত্ব সত্ত্বেও তিনি এমন একটা মূল্যের কথা ভাবতেই পারতেন না যার বিভিন্ন রকম মূল্য ও দর আছে। একটা অর্থের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় আর অন্যটা তা হয় না—এই ছাড়া দর ও মূল্যের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই—এই ঘোষণার মাধ্যমে হের ড্যুরিং অর্থনীতির যে একটা নতুন ও গভীরতর ভিত্তি পত্তন করলেন, সেটা তাঁর মতো স্থির-বিশ্বাসে কথা বলা ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু মূল্য কী তা এখনও আমরা জানতে পারি নি, আর কিভাবে সেটা নির্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে তো আরও কম জানা গেছে। তাই হের ড্যুরিং আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

'একেবারে সাধারণভাবে বলতে গেলে, তুলনামূলক বিচার ও মূল্যায়নের যে মৌল নিয়ম মূল্য ও অর্থের মধ্যে অভিব্যক্ত দরগুলির নির্ধারক, সেটা

প্রথমত বিশুদ্ধ উৎপাদনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, বণ্টনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ; মূল্যের ধারণার মধ্যে একটা গৌণ উপাদান। দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করার লক্ষ্য-পথে নানারকম প্রাকৃতিক অবস্থা যেসব কম-বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং যার জন্যে কম-বেশি পরিমাণ আর্থনীতিক শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়...সেইগুলিই কম-বেশি পরিমাণ মূল্যের নির্ধারক' এবং 'দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে' সেই অনুযায়ী এই মূল্য নির্ধারিত হয়। · 'এইসব বস্তুসামগ্রীর মধ্যে আমরা আমাদের যে পরিমাণ শক্তি নিয়োজিত করি, সেটাই সাধারণভাবে মূল্য ও তার নির্দিষ্ট মাত্রা সৃষ্টির আশু নিয়ামক কারণ।'

এই বক্তব্যের যদি কোনো অর্থ থাকে, তা হলো এই : শ্রম দিয়ে তৈরি কোনো জিনিসের মূল্য স্থির হয় তার উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা ; হের ড্যুরিং-এর বক্তব্য ছাড়াই, বহু দিন আগেই আমরা এটা জানতাম। এই সত্যটিকে সহজ কথায় না বলে, তিনি অনেক ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে রহস্যাবৃত ভাষায় হাজির করেছেন। এটা বলা মোটেই ঠিক নয় যে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুতে যে-শক্তি নিয়োগ করে, তার পরিমাণই (ড্যুরিং এর আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায়) মূল্য ও মূল্যের মাত্রা নির্ধারণের আশু কারণ। প্রথমত, কোন জিনিসের মধ্যে শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, আর দ্বিতীয়ত, কিভাবে শক্তি নিয়োজিত হয়েছে—এই দুটি বিষয়ের ওপর এটা নির্ভর করে। যদি কেউ এমন কোনো দ্রব্য তৈরি করে যার ব্যবহারিক মূল্য নেই, তাহলে তার সমস্ত শক্তি দিয়েও সামান্যতম মূল্য সৃষ্টি হবে না ; যদি কোনো গোঁয়ার তার হাতের জোরে এমন একটা দ্রব্য তৈরি করে, যা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করলে কুড়ি গুণ সস্তায় করা যায়, তাহলে সেই দ্রব্যের উৎপাদনে ঐ ব্যক্তির নিয়োজিত শক্তির কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগ সাধারণভাবে মূল্য কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য—কিছুই সৃষ্টি করবে না।

উপরন্তু, যে উৎপাদনশীল শ্রম বাস্তব দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে, তাকে নেহাৎ নেতিবাচক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার উপাদানে পরিণত করা সত্যের এক চরম বিকৃতি সাধন। এই বিচারে, একটা জামা তৈরি করতে হলে আমাদের এই ধরনের একটা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে : প্রথমত তুলো বীজ বোনা ও তার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তুলো বীজগুলির প্রতিবন্ধকতা আমাদের কাটাতে হবে, তারপর কার্পাস তোলা, গাঁঠবন্দী হওয়া ও অন্যত্র বহন করে নিয়ে যাবার

বিরুদ্ধে কার্পাস তুলোর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে, তারপর গাঁট ছাড়ানো, যন্ত্রে আঁচড়ানো ও সুতো তৈরির বিরুদ্ধে এদের বাধা কাটাতে হবে, এরপর কাপড় বোনার বিরুদ্ধে সুতোর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে, তারপর রং করা ও সেলাই করার বিরুদ্ধে কাপড়টির বাধা অতিক্রম করতে হবে এবং সবশেষে জামাটি গায়ে দেবার বিরুদ্ধে তৈরি জামাটির প্রতিরোধ জয় করতে হবে।

এই শিশুসুলভ পাগলামো ও উচ্ছৃঙ্খলতার অর্থ কী? 'প্রতিবন্ধকতার' তত্ত্বের সাহায্যে, 'উৎপাদন মূল্য', যা সঠিক কিন্তু এখনও শুধুমাত্র আদর্শ মূল্য, থেকে অতীত ইতিহাসে একমাত্র স্বীকৃত বলপ্রয়োগ দ্বারা বিকৃত মূল্য অর্থাৎ 'বণ্টন মূল্যে' পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে।

'প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও…আরও একটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা সম্পূর্ণ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা।…মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রতিবন্ধক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়, এই শক্তি মানুষ নিজেই। নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন মানুষ একটা স্বাধীন সত্তা হিসাবে প্রকৃতির সম্মুখীন হয়।… যখনই আমরা এক দ্বিতীয় মানুষের কথা চিন্তা করি, তখনই পরিস্থিতি পাল্টে যায়, প্রকৃতি জগতে প্রবেশের জন্যে তরোয়াল হাতে এই মানুষটি প্রকৃতি ও তার সম্পদের দখলদারি চায় এবং যেকোনো রূপেই একটা মূল্য দাবি করে। বলতে গেলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তির কাছ থেকে কর আদায় করে, আর এই কারণে দ্রব্যের সংগ্রহ বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ইপ্সিত দ্রব্যটির যে মূল্য হতো, তার থেকে বেশি হয়ে যায়।…দ্রব্যের এই কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তোলা মূল্যের নির্দিষ্ট রূপগুলি বহু রকম, আর স্বভাবতই শ্রমের মূল্য অনুরূপভাবে কমিয়ে আনার মধ্যে এর একটা আনুষঙ্গিক প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়।…সুতরাং শব্দটির অর্থে সমতুল্য হিসাবে মূল্যকে আগে থেকে গণ্য করার চেষ্টা, অর্থাৎ এটাকে এমন কিছু হিসাবে গণ্য করা যা সমান মূল্যসম্পন্ন অথবা সার্ভিস বা সেবা ও সেবার প্রতিদান তুল্যমূল্য কিংবা এই সূত্র থেকে উদ্ভূত বিনিময়-সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করার চেষ্টা একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার।…বরঞ্চ, মূল্য-মানের সঠিক তত্ত্বের মানদণ্ড হচ্ছে, এই তত্ত্বে মূল্যমান স্থির করার যে একান্ত সাধারণ কারণ ধারণা করা হয়েছে, সেটা বাধ্যতামূলক বণ্টনের ওপর নির্ভরশীল বিশেষ রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী এই রূপের

পার্থক্য ঘটে, এবং এর সঙ্গে পার্থক্য রেখে মাপ করা উৎপাদন মূল্যই হচ্ছে যথার্থ আর্থনীতিক মূল্য আর উৎপাদনের ক্ষেত্রে একমাত্র বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ও কারিগরি চরিত্রের প্রতিবন্ধকতাগুলির পরিবর্তনের ফলেই এটা পরিবর্তিত হতে পারে।'

সুতরাং হের ড্যুরিং-এর মতে বস্তুতপক্ষে কোনো দ্রব্যের মূল্য দুটি অংশে বিভক্ত: প্রথমটি হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত শ্রম, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'তরোয়াল হাতে' এর ওপর চাপানো কর। ভাষান্তরে বর্তমানে প্রচলিত মূল্য আসলে একটা একচেটিয়া দর। মূল্যমানের এই তত্ত্ব অনুযায়ী যদি সমস্ত পণ্যের দরই হয় একচেটিয়া দর, তাহলে একমাত্র দুটি বিকল্পই সম্ভব। বিক্রেতা হিসাবে একজন যা লাভ করে, বিক্রেতা হিসাবে তাকে সেটা লোকসান দিতে হয়; দরদাম নামে মাত্র পরিবর্তিত হয় কিন্তু বাস্তবে—তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে—একই থাকে; সবকিছুই থাকে আগের মতো এবং বহুখ্যাত বণ্টন মূল্যটি হয়ে দাঁড়ায় নিছক একটা মায়া।

কিংবা তথাকথিত বাড়তি দরের মধ্যে প্রকৃত মূল্যের পরিমাণটি প্রকাশ পায়—যে মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রমজীবী, মূল্য সৃষ্টিকারী শ্রেণীর দ্বারা কিন্তু সেটা আত্মসাৎ করে একচেটিয়া শ্রেণী, আর এই পরিমাণ মূল্য নিছক মুফত শ্রমের ফল। এই ক্ষেত্রে তরোয়ালধারী ব্যক্তিটি সত্ত্বেও, তথাকথিত বাড়তি কর ও বহুখ্যাত বণ্টন মূল্যটি সত্ত্বেও আমরা আবার সেই মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে পৌঁছে যাই।

বিখ্যাত 'বণ্টন মূল্যের' কয়েকটি দৃষ্টান্তের দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। ১৩৫ ও তার পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় আমরা লক্ষ্য করি যে:

'ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ফলে যে দর সৃষ্টি হয় সেটাকে আর্থনীতিক বণ্টন ও পরস্পরের ওপর কর চাপানোর একটা রূপ হিসাবে গণ্য করা উচিত।...কোনো প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত হঠাৎ বেশ খানিকটা কমে গেলে, বিক্রেতারা অস্বাভাবিক হারে মুনাফা করার সুযোগ পায়...যেসব অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ থাকে তখন বিশেষভাবে বোঝা যায় কী বিপুল পরিমাণে দরবৃদ্ধি হচ্ছে।' উপরন্তু, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও কার্যত একচেটিয়া ব্যবসায়িক অবস্থাই চলে, যার ফলে ইচ্ছামতো দাম বাড়ানো সম্ভব হয়। রেল কোম্পানি, শহরে জল ও গ্যাস ইত্যাদি সরবরাহকারী কোম্পানিগুলি এর দৃষ্টান্ত।

বহুদিন ধরেই এটা জানা গেছে যে একচেটিয়া শোষণের সুযোগ সমাজে রয়েছে। কিন্তু এখানে একচেটিয়া দরকে ব্যতিক্রম ও বিশেষ ঘটনা হিসাবে ধরা হচ্ছে না, বর্তমানে প্রচলিত মূল্য-নির্ধারণের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে নতুন ব্যাপার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর কিভাবে নির্ধারিত হয়? এর উত্তরে ড্যুরিং বলছেন: এমন একটা শহরে যান যেখানে জিনিসপত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে, আর তার পরে নিজেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। বাজারদর নির্ধারণকে প্রতিযোগিতা কিভাবে প্রভাবিত করে? একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারাই আপনাকে এর সব কিছু বুঝিয়ে দেবে।

এই ব্যাপারে যে তরোয়ালধারী ব্যক্তিটির একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, তার কিন্তু দেখা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ মালপত্রশূন্য অবরুদ্ধ শহরগুলিতে ঐ তরোয়ালধারী, সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যক্তিটি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সাধারণত তিনি অচিরেই একচেটিয়ার অবসান ঘটান এবং সমানভাবে ভাগবাটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া মজুত মালপত্রের দখল নিয়ে নেন। কিন্তু তরোয়ালধারী ব্যক্তিরা যখনই একটা 'বণ্টন মূল্য' উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন, তখনই তাঁরা খারাপ ব্যবসা ও আর্থিক লোকসান ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারেননি। পূর্বভারতীয় ব্যবসাকে এক-চেটিয়া করে তুলে ওলন্দাজরা নিজেরাই তাদের একচেটিয়া অধিকার ও ব্যবসা দুটিকেই ধ্বংস করে ফেলেছে। এযাবৎকালের দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী সরকার—উত্তর আমেরিকার বিপ্লবী সরকার ও ফরাসী জাতীয় কনভেনশন সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

বেশ কয়েক বছর ধরে রুশ সরকার রাশিয়া-সংক্রান্ত লণ্ডনের হুণ্ডিগুলি ক্রমাগত কিনে নিয়ে রুশ কাগজী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়াবার চেষ্টা করছে এবং অপরিবর্তনীয় ব্যাংকনোটগুলিকে ক্রমাগত বাজারে ছেড়ে দেশের মধ্যে এই বিনিময় হার কমিয়ে নিয়ে আসছে। এই প্রমোদের পিছনে গত কয়েক বছরে সরকারের ৬ কোটি রুবল ব্যয় হয়ে গিয়েছে এবং এখন এক রুবলের দাম দাঁড়িয়েছে দুই মার্কেরও কম, আগে যেটা তিন মার্কেরও বেশি ছিল। হের ড্যুরিং তরোয়ালটিকে যে যাদুকরী আর্থনীতিক ক্ষমতায় বিভূষিত করেছেন, তাই যদি তার থাকত তাহলে স্বর্ণের 'বণ্টন-মূল্য' সংগ্রহে

খারাপ কাগজী মুদ্রাকে বাধ্য করার ক্ষমতা কোনো সরকারের নেই কেন? আর বিশ্ব-বাজারের নিয়ন্ত্রণকর্তা সেই তরোয়ালটিই বা কোথায়?

পাল্টা সার্ভিস না দিয়ে অন্যদের সার্ভিস আত্মসাৎ করার বন্দোবস্ত করে দেয় যে-বন্টন মূল্য তার আর একটি প্রধান রূপ হচ্ছে: মালিকানাসূচক খাজনা অর্থাৎ জমির খাজনা ও পুঁজি থেকে মুনাফা। এখনকার মতো আমরা এটা শুধু উল্লেখ করে রাখছি যে এই বিখ্যাত 'বন্টন-মূল্য' সম্বন্ধে আমাদের যা জানার তার সবটুকুই আমরা জানলাম। সত্যিই কি আর কিছু জানার নেই? তা মোটেই নয়। তবে শুনুন:

'উৎপাদন-মূল্য ও বন্টন-মূল্যের স্বীকৃতির মধ্যে যে দুটি দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পায়, এ ছাড়াও এদের মধ্যে সর্বদাই একটা অভিন্ন কিছু আছে যা দিয়ে সমস্ত মূল্য সৃষ্টি হয় এবং যার দ্বারা যাবতীয় মূল্যের পরিমাপ করা যায়। প্রত্যক্ষ, স্বাভাবিক পরিমাপকটি হচ্ছে শক্তির ব্যয় এবং স্থূলতম অর্থে মনুষ্য শক্তি হচ্ছে সরলতম একক। শেষের উপাদানটিকে অস্তিত্ব-কালে পর্যবসিত করা যায়, যার আত্মরক্ষণ আবার পুষ্টিবিধান ও জীবনের কিছু বাধাবিঘ্নকে কাটিয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বন্টন অথবা ভোগ—যেকোনো ক্ষেত্রেই মূল্য বিশুদ্ধভাবে ও স্বতন্ত্ররূপে একমাত্র সেখানেই অবস্থান করে, যেখানে অনুৎপাদক দ্রব্যগুলির হস্তান্তর করার ক্ষমতাকে বা আরও সাধারণ কথায় বললে দ্রব্যগুলিকে সার্ভিস কিংবা যথার্থ উৎপাদন-মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করা যায়। যে-সমধর্মী উপাদানটি মূল্যের প্রতিটি রূপের মধ্যে ও মূল্যের সংশ্লিষ্ট অংশগুলির মধ্যে (যে অংশগুলি বন্টনের মাধ্যমে ভোগ করা হয় অথচ তার প্রতিদানে কোনো সার্ভিস বা সেবা পাওয়া যায় না) নিহিত থাকে ও প্রতিনিধিত্ব করে, তা হচ্ছে মনুষ্য-শক্তির ব্যয়…এটা…প্রতিটি পণ্যের ভিতর মূর্ত হয়ে ওঠে।'

এ সম্পর্কে আমাদের আর কী বলা উচিত? যদি প্রতিটি পণ্য-মূল্যকে পণ্যের অন্তর্নিহিত মনুষ্য-শক্তির ব্যয়ের দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তাহলে বন্টন মূল্য, অতিরিক্ত ধার্য দর, কর এ সবের কী হবে? এটা ঠিক যে হের ড্যুরিং আমাদের বলেছেন অনুৎপাদিত দ্রব্যসমূহকেও (যার ফলে এইসব দ্রব্যের কোনো বাস্তব মূল্য নেই) বন্টন-মূল্য দেওয়া যেতে পারে এবং উৎপাদিত ও মূল্যবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহের সঙ্গে সেগুলির বিনিময় চলতে পারে। আবার একই সঙ্গে তিনি আমাদের এটাও বলছেন যে যাবতীয় মূল্য, এর ফলে

সমস্ত বিশুদ্ধ ও একান্ত বণ্টন-মূল্যও, হচ্ছে এদের যে-ব্যয়িত শক্তি রয়েছে সেটাই। দুঃখের বিষয়, অনুৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে কিভাবে ব্যয়িত শক্তি থাকতে পারে, তা আমাদের জানানো হয়নি। যাই হোক, এই সব জগাখিচুড়ি মূল্য থেকে স্পষ্ট যা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে : বণ্টন মূল্য, সামাজিক অবস্থানের জোরে পণ্যের ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো এবং তরোয়ালের জোরে কর বসানো—এই সবই নিরর্থক। একমাত্র মনুষ্য-শক্তির ব্যয়, স্থূল শ্রমের দ্বারাই পণ্য-মূল্য নির্ধারিত হয় এবং পণ্য মূল্যের মধ্যে এই শ্রমই মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং জমির খাজনা ও কয়েক ধরনের একচেটিয়া দরের বিষয় বাদ দিলে, হের ড্যুরিং ঐ একই কথা বলছেন; অবশ্য যথেষ্ট দাষারোপ করা রিকার্ডীয় মার্কসীয় মূল্যমানের তত্ত্ব বহু পূর্বেই যা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলে গেছে, সেই কথাই হের ড্যুরিং এখন অনেক অগোছালো ও বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থিত করছেন।

হের ড্যুরিং একবার এই কথা বলেছেন, আবার একই সঙ্গে বিপরীত কথাও বলেছেন রিকার্ডোর গবেষণাকে ভিত্তি করে মার্কস বলছেন: পণ্যগুলির মূল্য নির্ধারিত হয় পণ্যের মধ্যে নিহিত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধারণ মনুষ্য-শ্রমের দ্বারা এবং শ্রমকে আবার পরিমাপ করা যায় কোনো পণ্য তৈরি করতে যে-পরিমাণ সময় লাগে তার দ্বারা। শ্রম হচ্ছে সমস্ত মূল্যের মাপকাঠি, কিন্তু শ্রমের নিজের কোনো মূল্য নেই। হের ড্যুরিং তাঁর অনুরূপ অগোছালো পদ্ধতিতে শ্রমকে মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে উপস্থিত করে বলেছেন:

'একে অস্তিত্ব কালে পর্যবসিত করা যায়, যার আত্মরক্ষা আবার পুষ্টিবিধান জীবনের কতকগুলি বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার প্রতীক।'

নিছক চমকপ্রদ কিছু সৃষ্টি করার উৎসাহে শ্রম-সময়কে (অবশ্য এটাই এখানে প্রধান বিষয়) অস্তিত্ব-কাল বলে আখ্যা দেওয়ার তাঁর এই বিভ্রান্তিকর ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করা যাক, এই অস্তিত্ব কাল কখনও মূল সৃষ্টি করেনি অথবা মূল্যের পরিমাপও করেনি। অস্তিত্ব-কালের 'আত্মরক্ষা' শব্দটি যে মেকি 'সমাজতান্ত্রিক' ভণ্ডামির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে, সেটাকেও এখানে উপেক্ষা করা যাক। যতদিন ধরে এই জগৎটার অস্তিত্ব রয়েছে এবং যতদিন এর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন প্রতিটি মানুষের নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই হবে—যার অর্থ হচ্ছে তার নিজেকে জীবনধারণের উপকরণ ব্যবহার করতেই হবে। মনে করা যাক হের ড্যুরিং সুনির্দিষ্ট আর্থনীতিক ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত

করছেন: তাহলে উদ্ধৃত বাক্যটির আদৌ কোনো অর্থ হয় না, কিংবা তার অর্থ দাঁড়ায় এই রকম: কোনো একটা পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে নিহিত শ্রম-সময়ের দ্বারা এবং এই শ্রম-সময়ের মূল্য নির্ধারিত হয় ঐ বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণের দ্বারা। বর্তমান সমাজে এর প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করে পণ্যের মধ্যে নিহিত মজুরি।

হের ড্যুরিং সত্যিসত্যিই যা বলতে চাইছিলেন, এতক্ষণে সেটা আমরা বুঝলাম। স্থূল অর্থনীতির বক্তব্য অনুসারে উৎপাদন-খরচ অনুযায়ী পণ্য মূল্য স্থির হয়:

এর পাল্টা কেরি 'এই সত্যটি ব্যক্ত করেন যে উৎপাদন খরচ নয়, পুনরুৎ-পাদন-খরচই মূল্য-নির্ধারক' (ক্রিটিক্যাল হিস্টরি, পৃ ৪০১)।

উৎপাদন বা পুনরুৎপাদন খরচটা কী সেটা আমরা পরে বিচার করে *দেখব। আপাতত আমরা শুধু এই সুপরিচিত তথ্যটাই বলে রাখছি* যে এই খরচ হচ্ছে পুঁজি-নির্ভর মজুরি ও মুনাফা। পণ্যের মধ্যে নিহিত 'শক্তির ব্যয়', উৎপাদন-মূল্য প্রকাশ পায় মজুরির মধ্যে। একচেটিয়া অবস্থানের সুযোগ, হাতের তরোয়ালের জোরে পুঁজিপতি যে কর বা অতিরিক্ত দর আদায় করে, সেই অতিরিক্ত কর বা দরকে—বণ্টন মূল্যকে প্রতিফলিত করে মুনাফা। ড্যুরিং-এর মূল্যমানের তত্ত্বে যে স্ব-বিরোধী বিভ্রান্তিকর অবস্থা রয়েছে, শেষ পর্যন্ত এইভাবে তার অত্যন্ত চমৎকার ও সুসঙ্গত সমাধান হয়ে যায়।

অ্যাডাম স্মিথ-এর রচনায় শ্রম-সময়ের ভিত্তিতে মজুরির দ্বারা পণ্য-মূল্য নির্ধারণের যে-রীতি প্রায়শই স্থান পেয়েছে, রিকার্ডোর পর থেকে বিজ্ঞান-সম্মত অর্থনীতিতে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র স্থূল অর্থনীতিতেই সেটা এখনও প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একমাত্র হাল্কা বুদ্ধির চাটুকাররাই মজুরির দ্বারা মূল্য নির্ধারণের কথা প্রচার করে থাকে, আর এই সঙ্গেই তারা এটা বলে থাকে যে পুঁজিপতির মুনাফাও এক ধরনের উচ্চতর মজুরি—এটা তার মিতাচারিতার মজুরি (পুঁজি নিয়ে নয়-ছয় না করার জন্যে পুঁজিপতি তার পুরস্কার হিসাবে এটা পায়), ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে মজুরি ইত্যাদি। স্থূল অর্থনীতির সঙ্গে হের ড্যুরিং-এর একমাত্র পার্থক্য এখানেই যে তিনি মুনাফাকে ডাকাতি বলে ঘোষণা করেছেন। ভাষান্তরে বলা যায়, হের ড্যুরিং তাঁর সমাজবাদকে নিকৃষ্ট ধরনের স্থূল অর্থ-

নীতির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। এই স্থূল অর্থনীতির মূল্য যতটুকু, তাঁর সমাজবাদের মূল্যও ততটুকুই। এদের উত্থান-পতন একসঙ্গে বাঁধা।

মোটের ওপর এটা সুস্পষ্ট যে একমাত্র শ্রমিক যা উৎপাদন করে আর এজন্যে যা ব্যয় হয় এবং একটা মেশিন যা উৎপাদন করে ও এজন্যে যা ব্যয় হয়—দুটো একেবারে ভিন্ন জিনিস। একজন শ্রমিক তার বারো ঘণ্টার শ্রম-দিবসে যে-মূল্য সৃষ্টি করে, এই শ্রম-দিবসে ও সেই সঙ্গে তার অবসর সময়ে জীবন-ধারণের যেসব উপকরণ সে ভোগ করে, তার সঙ্গে জীবনধারণের উপকরণ-মূল্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই। শ্রমোৎপাদনশীলতার বিকাশের স্তর অনুযায়ী জীবনধারণের এইসব উপকরণের মধ্যে তিন, চার অথবা সাত ঘণ্টার শ্রম-সময় নিহিত থাকতে পারে। আমরা যদি এটা ধরে নিই যে এইগুলির উৎপাদনের জন্যে সাত ঘণ্টার শ্রম প্রয়োজন, তাহলে হের ড্যুরিং-এর দ্বারা স্বীকৃত স্থূল অর্থনীতির মূল্য-তত্ত্বের তাৎপর্য দাঁড়ায় এটাই যে বারো ঘণ্টার শ্রম-দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হচ্ছে সাত ঘণ্টার শ্রম-দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অর্থাৎ বারো ঘণ্টার শ্রম সাত ঘণ্টার শ্রমের সমান—১২ = ৭। আরও সহজভাবে বললে: সামাজিক সম্পর্ক যে ধরনেরই হোক না কেন, একজন কৃষি-মজুর এক বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য, ধরা যাক ষাট বুশেল গম, উৎপাদন করে। এই সময়ের মধ্যে সে যে মূল্য নিজের ভোগের জন্যে ব্যবহার করে, তার পরিমাণ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বুশেল গম। তাহলে ষাট বুশেল গমের মূল্য পঁয়তাল্লিশ বুশেল গমের সমান হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে একই বাজারে, একই রকম পরিস্থিতিতে; অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ষাট = পঁয়তাল্লিশ। আর এটাকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হিসাবে জাহির করা হচ্ছে!

বর্বর বন্য অবস্থা পেরিয়ে মানবসমাজের বিকাশ তখন থেকে শুরু হয়, যখন পরিবার প্রতিপালনের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপাদিত হতে থাকে পারিবারিক শ্রমের মাধ্যমে, যখন থেকে নিছক জীবন-ধারণের উপকরণসমূহ উৎপাদন করার পরিবর্তে শ্রমের একটা অংশ উৎপাদনের উপকরণ তৈরিতে নিয়োজিত হয়। মেহনতকারীর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় খরচপত্রের অতিরিক্ত শ্রমজাত দ্রব্য এবং এই উদ্বৃত্ত দ্রব্য থেকে সামাজিক উৎপাদন ও মজুত তহবিল গঠন ও তার প্রসার যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং এখনও করছে। ইতিহাসে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই তহবিল একটা সুবিধাভোগী শ্রেণীর

অধিকারে থেকেছে আর এর ওপর ভিত্তি করেই ও এই অধিকারকে সম্বল করে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব। আসন্ন সমাজবিপ্লব এই প্রথম এই সামাজিক উৎপাদন ও মজুত তহবিলকে, অর্থাৎ সমস্ত কাঁচামাল, উৎপাদনের হাতিয়ার ও জীবনধারণের উপকরণকে, এর দখলদারি থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীকে বঞ্চিত করে এবং এটাকে সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দিয়ে সামাজিক তহবিলে পরিণত করবে।

এখানে দুটি বিকল্প ধারা রয়েছে। হয় পণ্যোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রমের ভরণপোষণের ব্যয়ই পণ্য-মূল্য নির্ধারক, অর্থাৎ বর্তমান সমাজে মজুরির দ্বারাই এটা নির্ধারিত হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রমিক তার শ্রমজাত দ্রব্যের মূল্য মজুরি হিসাবে পায়; এই ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা মজুরিভোগী শ্রেণীকে শোষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে করা যাক, কোনো একটা সমাজে শ্রমিকের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় তিন শিলিং। তাহলে এক রোজ শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য, উপরোক্ত স্থূল অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব অনুসারে, হচ্ছে তিন শিলিং। এবার মনে করা যাক, এই শ্রমিকের মালিক পুঁজিপতিটি এই উৎপন্ন দ্রব্যটিতে এক শিলিং মুনাফা বা কর যোগ করে দ্রব্যটিকে চার শিলিং দামে বিক্রি করছে। অন্য পুঁজিপতিরাও ঐ একই জিনিস করে। কিন্তু এই সময় থেকেই শ্রমিকটি আর তিন শিলিং-এ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারে না, এই জন্যে তার চার শিলিং প্রয়োজন হয়। যেহেতু অন্য অবস্থা একই রকম থাকছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তাই জীবনধারণের উপকরণের মধ্যে যে মজুরির প্রকাশ, সেটাও একই থাকছে, অথচ অর্থ-রূপ মজুরি যাচ্ছে বেড়ে, অর্থাৎ এটা রোজ তিন থেকে চার শিলিং বাড়ছে। পুঁজিপতিরা মুনাফা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে যা নিয়ে নেয়, সেটাই আবার মজুরি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ফেরত দিতে হয়। গোড়াতে আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম: মজুরি যদি মূল্যের নির্ধারক হয়, তাহলে পুঁজিপতি তার কোনো মজুরকে শোষণ করতে পারে না। উদ্বৃত্ত দ্রব্যের উৎপাদনও অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ আমাদের পূর্বোক্ত অনুমান অনুসারে শ্রমিকরা যে পরিমাণ মূল্যের স্রষ্টা, তারা ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যই ভোগ করে। আর যেহেতু পুঁজিপতিরা কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না, তাই কী করে তারা বেঁচে থাকে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ভোগের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদন, এই ধরনের উৎপাদন ও মজুত তহবিলের অস্তিত্ব রয়েছে, আর তা

রয়েছে পুঁজিপতিদেরই হাতে, তাই এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে শ্রমিকরা তাদের জীবনধারণের জন্যে নিছক পণ্যসমূহের মূল্যই ভোগ করে থাকে এবং পণ্যসমূহকে অতিরিক্ত কাজে ব্যবহারের জন্যে পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেয়।

অথবা, এই উৎপাদন ও মজুতশুতহবিল যদি বস্তুতপক্ষে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতেই থাকে, প্রকৃতপক্ষে এটা যদি মুনাফা-সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়ে থাকে (জমির খাজনাকে আপাতত আমরা বিবেচনা করছি না), তাহলে শ্রমের ফল হিসাবে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে তুলে দেয়, যা কিনা পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে যে-মজুরি দেয় তার অতিরিক্ত, সেই সঞ্চিত উদ্বৃত্ত থেকেই গড়ে ওঠে এই তহবিল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে মজুরি মূল্য নির্ধারণ করে না, মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, এই ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী মজুরি হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে যা পায়, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ মূল্যসম্পন্ন শ্রমজাত দ্রব্য পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়; আর এই ক্ষেত্রে, অন্যদের শ্রমের ফল মুফতে আত্মসাৎ করার নানা ধরনের মতো, পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফাকে, মার্কস-আবিষ্কৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা সরল আঙ্গিকে উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

একটা উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো ড্যুরিং-এর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সমগ্র আলোচনার মধ্যে, রিকার্ডো যা দিয়ে তাঁর সেই বিরাট ও যুগান্তকারী গ্রন্থ শুরু করেছেন, তার কোনো উল্লেখ নেই:

'কোনো পণ্যের মূল্য···নির্ভর করে সেটা উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রমের আপেক্ষিক পরিমাণের ওপর, ঐ শ্রমের জন্যে কম-বেশি প্রদত্ত ক্ষতি-পূরণের ওপর নয়।'[৯৯]

'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি'র মধ্যে জ্ঞানগর্ভ বাণীতে এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে:

'এটা বিবেচনায় আনা হয়নি যে (রিকার্ডোর রচনায়) কম-বেশি অনুপাতে মজুরি জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (!) বরাদ্দ স্বরূপ হতে পারে···যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মূল্য-সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ!'

—পাঠক এই বক্তব্যটির যা খুশি অর্থ করতে পারেন আর সব থেকে ভালো হয় তিনি যদি এর থেকে কোনো অর্থই উদ্ধার করার চেষ্টা না করেন।

হের ড্যুরিং আমাদের সামনে যে পাঁচ রকম মূল্য উপস্থিত করেছেন, তার থেকে পাঠক এবার যে-কোনো একটিকে তাঁর খুশিমতো বেছে নিন: প্রকৃতি

থেকে আসা উৎপাদন মূল্য ; বণ্টন মূল্য, মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি থেকে যার জন্ম এবং এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তির ব্যয় দ্বারা এর পরিমাপ করা যায়, অথচ যে-শক্তি এর মধ্যে নেই ; তৃতীয়ত, শ্রম-সময় দ্বারা পরিমাপযোগ্য মূল্য ; চতুর্থত, পুনরুৎপাদনের ব্যয় দ্বারা পরিমাপযোগ্য মূল্য ; আর শেষত, মজুরির দ্বারা পরিমাপযোগ্য মূল্য। বাছাইয়ের ক্ষেত্রটি বেশ লম্বা-চওড়া, অবস্থাটা হতবুদ্ধিকর, আর তাই হের ড্যুরিং-এর সঙ্গে সমস্বরে এই কথাটি ঘোষণা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই :

'মূল্য-তত্ত্ব হচ্ছে আর্থনীতিক পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব যাচাইয়ের কষ্টিপাথর !'

ছয়

সরল ও মিশ্র শ্রম

হের ড্যুরিং অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের আলোচনার মধ্যে একটা হাস্যকর ভুল আবিষ্কার করেছেন যাতে স্কুলের ছাত্রও লজ্জা পাবে, আবার সেই সঙ্গে এর মধ্যে এমন একটা সমাজতন্ত্র বিরোধী বিষয়েরও হদিস পেয়েছেন যা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

মার্কসের মূল্য-তত্ত্ব 'শ্রমই সমস্ত মূল্যের স্রষ্টা আর শ্রম-সময় হচ্ছে ঐ মূল্যের পরিমাপক···এই রকম একটা গতানুগতিক তত্ত্ব ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তথাকথিত দক্ষ শ্রমের বিশেষ ধরনের মূল্যটি কিভাবে নির্ণীত হবে, সে সম্পর্কে সবটাই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এটা ঠিক যে আমাদের তত্ত্বেও একমাত্র ব্যয়িত শ্রম-সময়ই স্বাভাবিক ব্যয়ের ও সেই কারণে আর্থিক দ্রব্যসামগ্রীর নির্বিশেষ মূল্যের পরিমাপক হতে পারে; কিন্তু এখানে একেবারে শুরুতেই প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম-সময়কে সম্পূর্ণ সমান বলে গণ্য করতে হবে এবং দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদনে, যেমন যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি-বিশেষের শ্রম-সময়ের সঙ্গে অন্যান্য মানুষের শ্রম-সময় যে জড়িয়ে যায়, সেটা বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং মার্কসের অস্পষ্ট ধারণার মতো ব্যাপারটা এইরকম নয় যে, একজনের শ্রম-সময়ই অন্যের শ্রম-সময়ের চাইতে মূল্যবান, কেননা অধিকতর গড়পড়তা শ্রম-সময় যেন এর মধ্যে ঘনীভূত হয়ে থাকে, কিন্তু নীতিগতভাবে সমস্ত শ্রম-সময় মূল্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ সমতুল্য, আর এর কখনও হেরফের হয় না, সুতরাং প্রথমেই এর গড় হিসাব করার প্রয়োজন নেই; এবং কোনো ব্যক্তির সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ও প্রতিটি তৈরি জিনিসের ক্ষেত্রেও নির্ধারণযোগ্য বিষয় হচ্ছে যেটাকে একজনের নিজস্ব শ্রম-সময় বলে মনে হয়, তার মধ্যে অন্য ব্যক্তিদের শ্রম-সময় কতটা লুকানো রয়েছে সেটা স্থির করা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে হাতের যন্ত্রের, কিংবা হাতের অথবা মস্তিষ্কেরও, যা অন্যদের শ্রম-সময় ছাড়া কর্মক্ষেত্রে তার

বিশেষ চরিত্র ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারত না, এই তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই। যাই হোক, মূল্য সম্পর্কে তাঁর পণ্ডিতী আলোচনার মধ্যে হের মার্কস অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা দক্ষ শ্রম-সময়ের ভূতকে কখনই তাঁর ঘাড় থেকে নামাতে পারেন নি। এখানে তিনি কোনো আদ্যপান্ত পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি, কারণ তিনি শিক্ষিত শ্রেণীগুলির চিরাচরিত চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছেন; এদের কাছে একজন কুলির শ্রম-সময় ও একজন স্থপতির শ্রম-সময় সম্পূর্ণ সমান মূল্যসম্পন্ন হওয়াটা অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

হের ড্যুরিং মার্কসের লেখার যে অংশটি সম্পর্কে একেবারে 'ক্ষেপে গেছেন', তা খুবই সংক্ষিপ্ত। পণ্যসমূহের মূল্য নির্ধারণ করে কে—এটা বিচার করতে গিয়ে মার্কস এই উত্তর দিয়েছেন: এগুলির মধ্যে সঞ্চিত মনুষ্য-শ্রম। তিনি বলেছেন, এটা

'হচ্ছে সরল শ্রম-শক্তির ব্যয়, কোনো বিশেষ গুণের কথা বাদ দিলে, যে শ্রম-শক্তি গড়পড়তা প্রতিটি সাধারণ মানুষের শরীরে বিদ্যমান…দক্ষ শ্রমকে সরল শ্রমের নিছক ঘনীভূত রূপ হিসাবে কিংবা বহুগুণিত সরল শ্রম হিসাবে গণ্য করা যায়, যাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দক্ষতা বেশি পরিমাণ সরল শ্রমের সমান হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এই রূপান্তর অনবরত করা হচ্ছে। একটা পণ্য হয়ত খুবই দক্ষ শ্রমের সৃষ্টি কিন্তু এর মূল্য, সরল অদক্ষ শ্রমের দ্বারা তৈরি দ্রব্যের সঙ্গে একে সমকক্ষ বলে ধরলে, শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সরল শ্রমকেই প্রকাশ করে। যে বিভিন্ন অনুপাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমকে তাদের মানদণ্ড হিসাবে অদক্ষ শ্রমে পর্যবসিত করা হয়, সেটা এক সামাজিক প্রক্রিয়া—এটা ঘটে উৎপাদকদের দৃষ্টির আড়ালে আর তাই একে চিরাচরিত প্রথা বলে মনে হয়।'*

প্রথমত, মার্কস এখানে আলোচনা করছেন শুধুমাত্র পণ্যসমূহের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে, এখানে তিনি সেইসব দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বিচার করছেন, যেগুলি ব্যক্তিগত উৎপাদকরা তাদের ব্যক্তিগত কারবারের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে। সুতরাং এই অংশে 'নির্বিশেষ মূল্যে'র প্রশ্নটি, তার অস্তিত্ব যেখানেই থাক না কেন, কোনো রকমেই উঠছে না, এখানে আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায়

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৫১-৫২। সম্পাদক।

প্রচলিত মূল্যের প্রশ্ন। মার্কস এখানে দেখিয়েছেন, ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এই মূল্যটির সৃষ্টি ও পরিমাপ করা হয় পৃথক পৃথক পণ্যের মধ্যে সঞ্চিত মনুষ্য শ্রমের দ্বারা এবং আরও দেখিয়েছেন, এই মনুষ্য শ্রম হচ্ছে ব্যয়িত সরল শ্রম-শক্তি। কিন্তু সব শ্রমই মানুষের সরল শ্রম-শক্তির নিছক ব্যয় নয়; এমন বহু রকমের শ্রম রয়েছে যার সঙ্গে কম-বেশি প্রয়াস, সময় ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞান প্রয়োগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এই ধরনের মিশ্র শ্রম, একই পরিমাণ সময়ের মধ্যে, যে-পরিমাণ পণ্যমূল্য সৃষ্টি করতে পারে, সরল শ্রম, নিছক সরল শ্রম-শক্তির ব্যয়ের মাধ্যমেও কি ঐ সমপরিমাণ সময়ের মধ্যে একই পরিমাণ পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করতে পারে? নিশ্চয়ই না। সরল শ্রমের এক ঘণ্টার উৎপাদনের তুলনায় মিশ্র শ্রমের এক ঘণ্টার উৎপাদনজাত পণ্যের মূল্য অনেক বেশি—সম্ভবত দু'তিনগুণ বেশি। মিশ্র শ্রমজাত দ্রব্যের মূল্য এই তুলনার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সরল শ্রম হিসাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু মিশ্র শ্রমের এই রূপান্তর ঘটে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা, যে প্রক্রিয়াকে মূল্য-তত্ত্বের বিকাশে বর্তমান পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় মাত্র, ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই সহজ-সরল ঘটনাটি বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিদিনই আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। মার্কস সেটাকেই এখানে বিবৃত করেছেন। এই তর্কাতীত ঘটনাটির বিরুদ্ধে হের ড্যুরিংও তাঁর 'আলোচনা'য় অথবা তাঁর অর্থনীতির ইতিহাসে আপত্তি তুলতে সাহস করেন নি; আর এত সহজ সরলভাবে মার্কস এটাকে উপস্থিত করেছেন যাতে একমাত্র ড্যুরিং ছাড়া আর কারুর কাছেই ব্যাপারটা 'সম্পূর্ণ দুর্বোধ্যতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না।' তাঁর নিজের কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হওয়ায় তিনি পণ্যমূল্যকে 'স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয়ের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন (মার্কস এই পণ্যমূল্য নির্ধারণের কাজে প্রথমেই মনোযোগ দিয়েছিলেন), যার ফলে এই দুর্বোধ্যতা আরও বেশি হতবুদ্ধিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে; তিনি এই পণ্যমূল্যকে 'নির্বিশেষ মূল্যে'র সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন, যা, আমরা যতদূর জানি, এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে নি। কিন্তু স্বাভাবিক ব্যয় বলতে হের ড্যুরিং যাই বুঝে থাকুন না কেন এবং তাঁর পাঁচ রকমের মূল্যের মধ্যে যে কোনোটিই নির্বিশেষ মূল্য হিসাবে পরিগণিত হোক না কেন, একটা বিষয় এখানে অন্ততপক্ষে সুনিশ্চিত যে মার্কস একমাত্র পণ্যসমূহের মূল্য ছাড়া

এর কোনোটারই আলোচনা এখানে করেন নি ; এবং পণ্য-মূল্যের এই তত্ত্ব অন্যান্য ধরনের সমাজে আদৌ প্রযুক্ত হতে পারে কিনা অথবা কতটা পর্যন্ত হতে পারে, সেই সম্পর্কে মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর মূল্য সংক্রান্ত গোটা অধ্যায়ে বিন্দু-মাত্র ইঙ্গিতও দেন নি।

হের ড্যুরিং বলছেন, 'সুতরাং হের মার্কসের ধোঁয়াটে ধারণা অনুযায়ী একজন ব্যক্তির শ্রম-সময় অন্য ব্যক্তির শ্রম-সময়ের চাইতে মূল্যবান, কারণ এর মধ্যে নাকি আরও বেশি গড় শ্রম-সময় ঘনীভূত হয়ে আছে—বিষয়টা তা নয় ; বরঞ্চ সমস্ত শ্রম-সময়, নীতিগতভাবে ও কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই মূল্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সমতুল্য, আর সেই কারণে প্রথমেই ওর গড় হিসাব করার প্রয়োজন নেই।'

হের ড্যুরিং-এর সৌভাগ্য যে উৎপাদক হওয়া তাঁর কপালে নেই, আর তার ফলে এই নতুন সূত্রের ভিত্তিতে তাঁর পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা এবং অবধারিত-ভাবে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কি এখনও উৎপাদকদের সমাজেই আটকে আছি ? নিশ্চয়ই না। হের ড্যুরিং তাঁর স্বাভাবিক ব্যয় ও নির্বিশেষ মূল্যের সাহায্যে একলাফে আমাদের শোষকদের বর্তমান পাপময় নশ্বর জগৎ থেকে তাঁর ভবিষ্যতের আর্থনীতিক কমিউনে, সাম্য ও ন্যায়ের পবিত্র স্বর্গরাজ্যে তুলে নিয়ে গেছেন, তাই একটু আগবাড়িয়ে হলেও, এই নতুন জগতের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতেই হচ্ছে।

এটা ঠিক যে, হের ড্যুরিং-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, এমন কি আর্থনীতিক কমিউনেও শুধু ব্যয়িত শ্রম-সময়ই আর্থনীতিক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের মাপকাঠি হতে পারে ; কিন্তু একেবারে প্রথমেই এটা ধরে নিতে হবে যে প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম-সময় সম্পূর্ণভাবে সমান, নীতিগতভাবে ও কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত শ্রম সময় মূল্যের দিক থেকে সমান এবং প্রথমেই গড় হিসাব করার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন এই চরম সমতাবাদী সমাজবাদের সঙ্গে মার্কসের ধোঁয়াটে ধারণার তুলনা করা যাক। মার্কসের ধারণা অনুযায়ী একজন ব্যক্তির শ্রম-সময় অপর একজন ব্যক্তির শ্রম-সময়ের চাইতে বেশি মূল্যবান, কারণ বেশি পরিমাণ গড় শ্রম-সময় এর মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে এবং এই ধারণাটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিরাচরিত চিন্তাধারার যুক্তিজালে মার্কসকে আটকে ফেলেছে—এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে

একজন কুলি ও একজন স্থপতির শ্রম-সময়ের মূল্য একেবারে সমান—এই ধারণাটা অকল্পনীয় ব্যাপার!

এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে 'ক্যাপিটাল' থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশটির সঙ্গে মার্কস ছোট্ট একটি পাদটীকা যোগ করেছেন: 'পাঠককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শ্রমিক একটা নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্যে যে মজুরি বা মূল্য পায়, আমরা এখানে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছি না, এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পণ্যের মূল্য, যার মধ্যে দিয়ে শ্রম-সময় বাস্তব রূপ পায়।'* সম্ভবত ড্যুরিং সম্পর্কে একটা পূর্ব-আশংকা থেকেই মার্কস, বর্তমান সমাজে মিশ্র শ্রমের জন্যে মজুরি দানের ক্ষেত্রে যাতে তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য প্রযুক্ত না হয়, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু হের ড্যুরিং এতে সন্তুষ্ট না হয়ে এইসব বক্তব্যকে মার্কসের নীতি হিসাবে উপস্থিত করেছেন: মার্কস নাকি মনে করতেন সমাজতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত সমাজে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বন্টন এই নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে; এ এমন একটা নির্লজ্জ প্রতারণা, যার নজির একমাত্র শিহরণ-জাগানো পত্র-পত্রিকাতেই পাওয়া যায়।

কিন্তু সমমূল্যের তত্ত্বটিকে আরও একটু খুঁটিয়ে বিচার করা যাক। সব শ্রম-সময়ের মূল্য সমান, তা কুলিরই হোক বা স্থপতিরই হোক। সুতরাং শ্রম সময় ও শ্রমের নিজস্ব একটা মূল্য আছে। কিন্তু শ্রমই যাবতীয় মূল্যের স্রষ্টা। একমাত্র শ্রমই প্রকৃতির সকল বস্তুকে আর্থনীতিক অর্থে মূল্যবান করে তুলতে পারে। একটি বস্তুর মধ্যে বাস্তবায়িত সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় মনুষ্য শ্রমের প্রকাশ ছাড়া মূল্য আর কিছুই নয়। তাই শ্রমের কোনো মূল্য থাকতে পারে না। কেউ শ্রমের মূল্যের কথা বলতে পারেন অথবা এই মূল্য নির্ধারণের কথাও বলতে পারেন, তিনি মূল্যের মূল্যের কথা অথবা ভারি বস্তুর নয়, খোদ ভারি বস্তুর গুরুত্ব নির্ণয় করার চেষ্টাও করতে পারেন। হের ড্যুরিং ওয়েন, সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়ের-এর মতো ব্যক্তিদের সমাজতত্ত্বের অ্যালকেমিস্ট বা মেকি রসায়নবিদ বলে বাতিল করে দিয়েছেন। শ্রম-সময়ের অর্থাৎ শ্রমের মূল্য নির্ধারণের জন্যে তাঁর সূক্ষ্ম বাছবিচার তাঁকে সত্যিকারের অ্যালকেমিস্টদের চাইতেও নিচুতে নামিয়ে দিয়েছে। একজনের শ্রম-সময় আর একজনের চেয়ে বেশি

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৫১, বড় হরফ এঙ্গেলসের। সম্পাদক।

মূল্যবান, সুতরাং শ্রমের একটা মূল্য আছে—হের ড্যুরিং যখন মার্কসের ওপর এই বক্তব্য চাপিয়ে দেন, তখন তার ধৃষ্টতা পরিমাপের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিলাম ; অথচ শ্রমের কোন মূল্য থাকতে পারে না এবং কেন থাকতে পারে না—সেটা মার্কসই প্রথম প্রতিপন্ন করেন।

যে সমাজবাদ মানুষের শ্রম-শক্তিকে তার পণ্য-দশা থেকে মুক্ত করতে চায়, তার পক্ষে শ্রমের কোনো মূল্য নেই ও থাকতে পারে না, এই উপলব্ধিটি খুবই মূল্যবান। এই উপলব্ধির সঙ্গে এক ধরনের উচ্চতর মজুরি হিসাবে ভবিষ্যৎ সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সমাজবাদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর যেকোন ধ্যানধারণার উত্তরাধিকারী হের ড্যুরিং এর যাবতীয় চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর থেকে আমরা আরও একটা উপলব্ধিতে পৌঁছাই : বন্টন যে পরিমাণে একান্ত আর্থনীতিক স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, বন্টনকে সেই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবে উৎপাদনের স্বার্থ এবং সেই ধরনের বন্টন-পদ্ধতি উৎপাদনকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যোগাবে, যেখানে সমাজের সমস্ত মানুষ সর্বব্যাপক সবজনীনতার সঙ্গে তাদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার, সংরক্ষণের ও প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা পাবে। এটা ঠিক যে হের ড্যুরিং যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী তাদের কাছে এমন একটা সময়ের চিন্তা করা অকল্পনীয় যখন পেশাদার কুলি কিংবা স্থপতি থাকবে না এবং যে মানুষ আধ ঘণ্টা স্থপতির কাজ পরিচালনা করবে, সেই মানুষই আবার স্থপতি হিসাবে তার কাজের প্রয়োজন না দেখা দেওয়া পর্যন্ত কুলির কাজেও নিয়োজিত হবে। যেখানে পেশাদার কুলির কাজ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, সে একটা চমৎকার সমাজতন্ত্রই বটে।

সব শ্রম সময়ের মূল্যই সমান—এই কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে প্রত্যেকটি শ্রমিক একই পরিমাণ সময়ের মধ্যে সমপরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে এবং যার কোনো গড় নির্ণয় করার প্রয়োজনও হয় না, তাহলে সেটা হবে স্পষ্টতই ভুল। আমরা যদি শিল্পের একই শাখার দু'জন শ্রমিকের কথাও বিচার করি, তাহলেও দেখা যাবে যে এক ঘণ্টার শ্রম-সময়ের মধ্যে তারা যে-মূল্য উৎপন্ন করবে, তাদের শ্রমের তীব্রতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তার মধ্যে সব সময়েই পার্থক্য ঘটবে। হের ড্যুরিং-এর মতো ব্যক্তিরা এটাকে যতই অন্যায় বলে মনে করুন না কেন, অন্তত আমাদের গ্রহের ক্ষেত্রে, এমনকি কোনো আর্থনীতিক কমিউনেও এই অন্যায়ের কোনো মীমাংসা নেই। তাহলে যে কোনো শ্রমের

ক্ষেত্রেই মূল্য পুরোপুরি সমান—এই বক্তব্যের আর কি অবশিষ্ট রইল ? নিছক দাম্ভিক উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, শ্রমের দ্বারা মূল্য নির্ধারণ ও মজুরির দ্বারা মূল্য নির্ধারণ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গমে হের ড্যুরিং-এর অক্ষমতা ছাড়া যার কোনো আর্থনীতিক ভিত্তি নেই—সমান শ্রম সময়ের জন্যে সমান মজুরি—সম্রাটের এই অনুশাসন, নতুন আর্থনীতিক কমিউনের এই মৌল নিয়ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মজুরির সমতা বিধানের পক্ষে পুরানো ফরাসি কমিউনিস্ট কর্মীরা ও ভেইটলিং যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা এর থেকে বেশি যুক্তিপূর্ণ।

তাহলে মিশ্র শ্রমের জন্যে প্রদত্ত উচ্চতর মজুরির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে আমরা কিভাবে মীমাংসা করব ? ব্যক্তিগত উৎপাদকদের সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা তাদের পরিবারবর্গ শিক্ষিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যয় বহন করে ; তাই শিক্ষিত শ্রম-শক্তির জন্যে প্রদত্ত উচ্চ মূল্যের ফল প্রথমেই ব্যক্তিগত উৎপাদকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় : দক্ষতাসম্পন্ন দাস চড়া দামে বিক্রি হয় এবং দক্ষ শ্রমিক পায় বেশি মজুরি : সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত সমাজে এই প্রশিক্ষণ ব্যয় বহন করবে সমাজ আর তার ফলে মিশ্র শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট বৃহত্তর মূল্যসমূহের অধিকারী হবে সমাজ। শ্রমিক কোনো অতিরিক্ত মজুরি দাবি করবে না। এর থেকেই এই নীতিটি প্রতিপন্ন হয় যে 'শ্রমের সম্পূর্ণ ফলে'র জন্যে শ্রমিকদের অতিপ্রিয় দাবির মধ্যে একটা ত্রুটি থেকে যায়।[১০০]

সাত

পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্য

'পুঁজি সম্পর্কে স্বীকৃত মতবাদ অর্থাৎ পুঁজি হচ্ছে ইতিমধ্যে উৎপাদিত উৎপাদনের একটি উপকরণ—এই মতকে হের মার্কস গোড়া থেকেই অস্বীকার করেছেন ; তিনি এর বিপরীত একটা বিশেষ দ্বান্দ্বিক-ঐতিহাসিক ভাবধারা উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন যা ধারণা ও ইতিহাসের রূপান্তর নিয়ে যদৃচ্ছ ভাবনা-চিন্তা মাত্র। তাঁর মতে পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে অর্থ থেকে ; এ একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে, যার সূত্রপাত ঘটে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ একটা বিশ্ব-বাজারের সূচনা থেকে, যা সেই সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। স্বভাবতই এই ধরনের অনুমানমূলক ব্যাখ্যার মধ্যে জাতীয়-আর্থনীতিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধরনের অসার ধ্যানধারণাগুলি আধা-ঐতিহাসিক ও আধা-যৌক্তিকরূপে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আসলে এগুলি ইতিহাস ও যুক্তিশাস্ত্রের উদ্ভট কল্পনাশক্তির বিকৃত সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এগুলির মধ্যে ধ্যানধারণা প্রয়োগের সততা সমেত বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে।'

আর তিনি পুরো একটি পৃষ্ঠা জুড়ে এইভাবে তর্জন-গর্জন করেছেন···

'পুঁজির ধারণা সংক্রান্ত মার্কসের সংজ্ঞা জাতীয় অর্থনীতির সঠিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিছক বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে···বাচালতাকে গভীর যুক্তিসঙ্গত সত্য রূপে উপস্থিত করা হয়েছে···এর ভিত্তি খুবই নড়বড়ে' ইত্যাদি।

আমাদের বলা হচ্ছে মার্কসের মতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ায় পুঁজির উদ্ভব ঘটে অর্থ থেকে। এটা এই কথা বলার শামিল যে তিন হাজার বছর আগে ধাতবমুদ্রা সৃষ্টি হয়েছিল গবাদি পশু থেকে, কারণ এক সময়ে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গবাদি পশু অর্থের ভূমিকা পালন করেছিল। একমাত্র হের ড্যুরিং-এর পক্ষেই এই ধরনের স্থূল ও অবান্তরভাবে নিজেকে প্রকাশ

করা সম্ভব। যেসব আর্থনীতিক রূপের মধ্যে দিয়ে পণ্য-সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটেছিল, সেইসব রূপের বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন মুদ্রা একেবারে শেষ পর্যায়ে আবির্ভূত হয়েছে। 'পণ্য-সঞ্চালনের এই চূড়ান্ত উৎপন্নটি হচ্ছে প্রাথমিক রূপ, যার মধ্যে দিয়ে পুঁজির উদ্ভব ঘটে। ইতিহাসের দিক থেকে পুঁজি হচ্ছে ভূ-সম্পত্তির বিপরীত রূপ, এটা অনিবার্য-ভাবেই প্রথমে অর্থের রূপ নেয়; আর্থিক সম্পদ, বণিক ও মহাজনের পুঁজি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে…। আমরা রোজ এটা চোখের সামনে ঘটতে দেখি। এমনকি আজকের দিনেও সমস্ত নতুন পুঁজি, তা সেটা পণ্য, শ্রম বা অর্থ যাই হোক না কেন, প্রথমে মঞ্চে অর্থাৎ বাজারে এসে হাজির হয় অর্থের রূপ নিয়ে, একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এই অর্থকে পুঁজিতে পরিণত করতে হয়।'*

এখানে মার্কস আবার একটি বাস্তব ঘটনাকে বিবৃত করেছেন। এটা নিয়ে আপত্তি তুলতে না পেরে হের ড্যুরিং মার্কসের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করেন: পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে অর্থ থেকে!

এরপর মার্কস অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়া প্রক্রিয়াটি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং প্রথমে তিনি এটা লক্ষ্য করেছেন যে যে-রূপের মাধ্যমে অর্থের সঞ্চালন ঘটে পুঁজি হিসাবে, সেই রূপটি পণ্যের সর্বজনীন সমতুল্য হিসাবে অর্থ-সঞ্চালনের রূপের বিপরীত। একজন সাধারণ পণ্য-মালিক কেনার উদ্দেশ্যে তার পণ্য বিক্রি করে; তার যা প্রয়োজন নেই, তাই সে বিক্রি করে এবং ঐ বিক্রিত অর্থে তার যা প্রয়োজন তাই সে কেনে। এই উদীয়মান পুঁজিপতিটি সেইসব জিনিস কিনতে শুরু করে, তার কাছে যা অপ্রয়োজনীয়, সে কেনে বিক্রির জন্যে, বেশি দামে বিক্রির জন্যে,—কেনার জন্যে প্রথমে যে অর্থ সে নিয়োগ করেছিল, সেটা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এর ফলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর মার্কস এই বৃদ্ধিকেই বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য।

কোথেকে এই উদ্বৃত্ত মূল্য আসে? পণ্যসমূহের মূল্যের চাইতে কম মূল্যে যে-ক্রেতা পণ্য ক্রয় করে, এটা তার কাছ থেকে আসতে পারে না। কিংবা যে-বিক্রেতা পণ্যসমূহকে সেগুলির মূল্যের চাইতে বেশি মূল্যে বিক্রি করে, তার কাছ থেকেও আসতে পারে না। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি ব্যক্তির

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ১৪৫। বড় হরফ এঙ্গেলসের। সম্পাদক।

লাভ ও লোকসান পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যায়, যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিই একই সঙ্গে ক্রেতা ও বিক্রেতা। জোচ্চুরি থেকে এটা সৃষ্টি হতে পারে না, যদিও জোচ্চুরি থেকে একজন ঠকে, আর একজন লাভবান হয়। কিন্তু জোচ্চুরির মাধ্যমে উভয় পক্ষের মোট অর্থের অংক বৃদ্ধি পায় না। আর তাই জোচ্চুরি বাজারে প্রচলিত মোট মূল্যের পরিমাণ বাড়াতে পারে না। 'যে কোনো দেশের সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না।'*

তবুও এটা আমরা দেখতে পাই যে প্রতিটি দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী সামগ্রিকভাবে ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে ও উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে আমাদের চোখের সামনেই নিজেদের অনবরত সমৃদ্ধিশালী করে তুলছে। সুতরাং আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই আটকে গেলাম: এই উদ্বৃত্ত মূল্য আসছে কোত্থেকে? এই প্রশ্নটির অবশ্যই সমাধান করতে হবে, আর তা করতে হবে যথার্থ আর্থনীতিক পদ্ধতিতেই, জোচ্চুরি ও বলপ্রয়োগের ভূমিকা বাদ দিয়েই—প্রশ্নটি হচ্ছে: যদি এটা ধরে নেওয়া যায় যে সব সময়েই বিনিময় চলছে সমমূল্যের দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে, তাহলে ক্রয়-মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করা কিভাবে সম্ভব?

মার্কসের যাবতীয় কাজের মধ্যে এর সমাধানই হচ্ছে সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার। অর্থনীতির যে-ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রীরাও এতদিন বুর্জোয়া অর্থ-নীতিবিদদের মতো গভীর অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, মার্কসের এই আবিষ্কারটি সেই ক্ষেত্রটিকে দিনের আলোয় স্পষ্ট করে তুলেছে। এই সমাধানটির আবিষ্কার থেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সূত্রপাত এবং একে কেন্দ্র করেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ গড়ে উঠেছে।

সমাধানটা এই রকম: অর্থের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে তার পুঁজিতে রূপান্তর এই অর্থের মধ্যে দিয়ে ঘটতে পারে না অথবা ক্রয়ের ক্ষেত্র থেকেও এর উদ্ভব ঘটতে পারে না, কারণ পণ্যের দাম আদায় করা ছাড়া এখানে অর্থের কোনো ভূমিকা নেই, আর এই দাম পণ্যটির দামের চাইতে পৃথক কিছু নয়। কারণ ধরে নিয়েছি যে বিনিময় ঘটছে সমান মূল্যের মধ্যে। ঐ একই কারণে, পণ্য-বিক্রির মধ্যেও এই মূল্য-বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে না। সুতরাং এই পরিবর্তনটি

* ক্যাপিটাল, পৃ ১৬০। সম্পাদক।

ঘটে কেনা পণ্যের মধ্যে ; পণ্যটি অবশ্য তার মূল্যের জন্যে ক্রীত হয় না, যেহেতু এটা কেনা ও বেচা হয় তার মূল্যে। ব্যবহারিক মূল্যের জন্যে এটা কেনা হয়, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় পণ্য ব্যবহারের মধ্যে। 'একটা পণ্যের ব্যবহারের মধ্যে থেকে মূল্য আদায় করে নেওয়ার জন্যে আমাদের বন্ধু টাকার থলিকে (অর্থাৎ পুঁজিপতি)...বাজারে এমন একটা পণ্য খুঁজে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে হবে, যার ব্যবহারিক মূল্য মূল্যের একটা উৎস হওয়ার বিশেষ গুণের অধিকারী, সুতরাং যার বাস্তব ব্যবহার শ্রমেরই একটা মূর্তরূপ, আর তাই এটা মূল্যের স্রষ্টা। অর্থের মালিক শ্রম করার ক্ষমতা বা শ্রম-শক্তির মধ্যে এই ধরনের একটা বিশেষ পণ্যের সন্ধান পায়।'* যদিও আমরা এর আগে দেখেছি নিছক শ্রমের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু শ্রম-শক্তির পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। যে-মুহূর্তে এটা পণ্যে পরিণত হয় তখনই এর মধ্যে মূল্যের সঞ্চার ঘটে, বর্তমানে ঠিক এটাই দেখা যাচ্ছে। আর এই মূল্য নির্ধারিত হয় 'অন্যান্য প্রতিটি পণ্যের মতোই এই বিশেষ বস্তুটির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা।'** বলতে গেলে একজন শ্রমিকের কর্মক্ষম অবস্থায় টিকে থাকতে এবং তার বংশবিস্তারের জন্যে জীবন ধারণের যেসব উপকরণের প্রয়োজন হয়, সেগুলির উৎপাদনের প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা এই মূল্য নির্ধারিত হয়। মনে করা যাক জীবনধারণের এইসব উপকরণ উৎপাদন করতে রোজ ছয় ঘণ্টা শ্রম সময়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের উদীয়মান পুঁজিপতি তার ব্যবসা চালাবার জন্যে শ্রম-শক্তি কেনে, অর্থাৎ একজন শ্রমিককে ভাড়া করে ; তার ফলে সে যদি এই শ্রমিককে সেই পরিমাণ অর্থ দেয় যা তার ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান, তাহলে সে ঐ শ্রমিককে তার এক দিনের শ্রম-শক্তির পুরো দাম দিয়ে দিচ্ছে। যখনই ঐ শ্রমিকটি উদীয়মান পুঁজিপতির অধীনে ছয় ঘণ্টা কাজ করছে, তখনই সে পুঁজিপতিকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিচ্ছে তার জন্যে ব্যয়, একদিনের শ্রম-শক্তির মূল্য (পুঁজিপতি যা তাকে দিয়েছিল)। কিন্তু এতেও অর্থ পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না ; সৃষ্টি হয় না উদ্বৃত্ত মূল্য। আর এই কারণেই শ্রম-শক্তির ক্রেতা যে লেনদেন করে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে সে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা নেয়। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখতে যে মাত্র ছয় ঘণ্টার শ্রম প্রয়োজন হয়, এই

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো ১৯৭২, পৃ ১৬৪, বড় হরফ এঙ্গেলসের। সম্পাদক।

** ঐ, পৃ ১৬৭। সম্পাদক।

তথ্যটি তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। শ্রম-শক্তির মূল্য এবং শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রম-শক্তি যে মূল্য সৃষ্টি করে, এই দুই ধরনের মূল্যের পরিমাণ ভিন্ন। টাকার মালিক এক দিনের শ্রম-শক্তির মূল্য মিটিয়ে দিয়েছে; সুতরাং সে সারা দিনের মতো শ্রমিকটিকে খাটাতে পারে, শ্রমিকটির সারাদিনের শ্রম তারই অধীন। একদিন একে খাটিয়ে যদি তার নিজস্ব মূল্যের দ্বিগুণ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা ক্রেতার পক্ষে বিশেষভাবে সৌভাগ্যজনক, কিন্তু পণ্য-বিনিময়ের নিয়ম অনুযায়ী এতে শ্রম-বিক্রেতার প্রতি কোনো অন্যায় করা হয় না। সুতরাং আমাদের ধারণা অনুযায়ী শ্রমিকটি প্রতিদিন টাকার মালিককে ছয় ঘণ্টা শ্রমের উৎপাদন-দ্রব্যের মূল্য ব্যয় করায়। কিন্তু সে রোজ তার হাতে তুলে দেয় বার ঘণ্টা শ্রমের উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য। টাকার মালিকের পক্ষে সুবিধাজনক পার্থক্যটি হচ্ছে—মুফতে পাওয়া ছয় ঘণ্টার উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য; যার জন্যে তাকে শ্রমিকটিকে কিছু দিতে হয় নি, আর যার মধ্যে ছয় ঘণ্টার শ্রম নিহিত রয়েছে। প্রতারণাটা এইখানেই। উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়েছে; অর্থ রূপান্তরিত হয়েছে পুঁজিতে।

কিভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং পণ্য-বিনিময়ের নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির অধীনে কিভাবে শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে—এইভাবে সেটা দেখিয়ে মার্কস প্রচলিত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও তার ওপর নির্ভরশীল শ্রমের ফল আত্মসাৎকারী পদ্ধতির কলাকৌশলটিকে উদঘাটন করেছেন; যে মূল-কেন্দ্রকে ঘিরে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাটি সংহত হয়েছে, মার্কস সেটাকে অনাবৃত করে দিয়েছেন।

কিন্তু এই পুঁজি সৃষ্টির জন্যে অবশ্যই একটা পূর্বাবস্থা থাকা প্রয়োজন: 'অর্থকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার জন্যে…অর্থের মালিককে বাজারে স্বাধীন শ্রমিক পাওয়া প্রয়োজন। যে-শ্রমিক দ্বিবিধ অর্থে স্বাধীন, যে স্বাধীন মানুষের মতোই তার নিজস্ব পণ্যরূপ শ্রম-শক্তিকে বিক্রি করে এবং অন্যদিকে বিক্রি করার মতো আর কোনো পণ্য তার নেই, তার শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগানোর মতো আর কোনো সম্বল তার নেই।'* কিন্তু একদিকে টাকা বা পণ্যের মালিক এবং অন্যদিকে নিজস্ব শ্রম-শক্তির অতিরিক্ত যার আর

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ১৬৯, বড় হরফ এঙ্গেলসের। সম্পাদক।

কিছুই নেই—এই উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক কোনো প্রাকৃতিক সম্পর্ক নয়, ইতিহাসের সব যুগে এটা ছিলও না। 'স্পষ্টতই এটা বিগত ঐতিহাসিক বিকাশের ফল···সামাজিক উৎপাদনের পুরানো রূপগুলির সমগ্র ধারা বিলুপ্ত হওয়ার পরিণতি।'* বস্তুতপক্ষে ইতিহাসে ব্যাপকভাবে এই স্বাধীন শ্রমিক আমরা প্রথম দেখতে পাই পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের শুরুতে—সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ভেঙে পড়ার পরিণতি হিসাবে। যাই হোক, এই সঙ্গে এবং এই সময় থেকে বিশ্ব-বাণিজ্য ও বিশ্ব-বাজারের উদ্ভব ঘটার মধ্যে দিয়ে সেই ভিত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত বিপুল অস্থাবর সম্পদ অনিবার্য গতিতে ক্রমবর্ধমানভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমশই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে।

এই পর্যন্ত আমরা মার্কসের সেইসব 'অসার ধ্যান-ধারণা' অনুসরণ করে এসেছি যেগুলি 'ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক কল্পনাশক্তির বিকৃত সৃষ্টি' এবং যেগুলির মধ্যে 'ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের সততা সমেত বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে'। হের ড্যুরিং যেসব গভীর 'যৌক্তিক সত্য' এবং 'যথার্থ শিক্ষার অর্থে সুনির্দিষ্ট ও সবচেয়ে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেগুলির সঙ্গে ঐসব 'বাচালতা'র একটা তুলনা করা যাক।

মার্কস 'ইতিমধ্যেই উৎপাদিত উৎপাদনের একটা উপকরণ হচ্ছে পুঁজি, এই স্বীকৃত আর্থনীতিক মতটি স্বীকার করেন নি'; বরঞ্চ তিনি বলেছেন যে খানিকটা মূল্য একমাত্র তখনই পুঁজিতে পরিণত হতে পারে যখন সেটা মূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। আর হের ড্যুরিং এই সম্পর্কে কী বলছেন?

'উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্যে এবং সাধারণ শ্রম-শক্তির ফলগুলির অংশ গঠনের জন্যে আর্থনীতিক ক্ষমতার হাতিয়ারের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজি।'

এটা যতই ধোঁয়াটে ও বিশ্রীভাবে বলা হোক না কেন, একটা বিষয় এখানে সুনিশ্চিত: আর্থনীতিক ক্ষমতার হাতিয়ারের ভিত্তি উৎপাদনকে অনন্তকাল ধরে চালু রাখতে পারে, কিন্তু হের ড্যুরিং-এর নিজের কথায়, এটা ততক্ষণ পুঁজি হয়ে উঠতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা 'সাধারণ শ্রম-শক্তির ফলগুলির

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ। সম্পাদক।

অংশ গঠন করছে', অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য অন্ততপক্ষে উদ্বৃত্ত দ্রব্য সৃষ্টি 'করছে। সুতরা' পুঁজি সম্পর্কে স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ না করার জন্য হের ড্যুরিং মার্কসের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ তুলেছেন, তিনি নিজেও ঐ একই পাপের ভাগীদার। শুধু তাই নয়, মার্কসের বক্তব্যের যে চরম বিকৃতি তিনি ঘটিয়েছেন, তা তাঁর বড় বড় কথার আড়ালে চাপা পড়ে নি।

২৬২ পৃষ্ঠায় এই বক্তব্যটিকে আরও বিশদ করা হয়েছে :

'সামাজিক অর্থে পুঁজি (সামাজিক অর্থ নেই এমন পুঁজি হের ড্যুরিং এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি) বস্তুতপক্ষে নিছক উৎপাদনের উপকরণের চেয়ে নির্দিষ্টভাবে ভিন্ন ; কেননা যেখানে শেষোক্তটি শুধুমাত্র কারিগরি চরিত্র-সম্পন্ন এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই প্রয়োজনীয়, সেখানে প্রথমোক্তটি ভোগদখল ও অংশ গঠনের ক্ষমতার পরিচায়ক। এটা ঠিক যে সামাজিক পুঁজি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক ভূমিকা পালনকারী উৎপাদনের কারিগরি উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু ঠিক এই ভূমিকাটিকেই…নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।'

আমরা যখন এটা চিন্তা করি যে মার্কসই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি এই 'সামাজিক ভূমিকা'র ওপর প্রথম জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে একমাত্র এই ভূমিকার জন্যেই খানিকটা মূল্য পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, 'এই বিষয় সংক্রান্ত যে-কোনো মনোযোগী গবেষকের কাছে তৎক্ষণাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে পুঁজির ধারণা সংক্রান্ত মার্কসের সংজ্ঞা শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে'— না হের ড্যুরিং যেরকম ভেবেছেন, সেই রকম সঠিক জাতীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ যা সুস্পষ্ট, একমাত্র হের ড্যুরিং-এর মগজের মধ্যেই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, যিনি তাঁর আলোচনায় পুঁজির উপরোক্ত ধারণা কতটা কাজে লাগিয়েছিলেন তার কথা 'ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি'তে ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছেন।

যাই হোক, 'শুদ্ধতর'-রূপে হলেও, পুঁজি সম্পর্কে মার্কসের সংজ্ঞা ধার করে নিয়েও হের ড্যুরিং নিবৃত্ত হন নি। 'ধারণা ও ইতিহাসের রূপান্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে' গিয়েও তিনি মার্কসকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং 'বন্ধ্যা ধ্যান-ধারণা', 'চপলতা', 'নড়বড়ে ভিত্তি' ইত্যাদি ছাড়া এর থেকে যে আর কিছু বেরিয়ে আসতে পারে না, সে সম্পর্কে তাঁর বেশি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এটা ঘটেছে। পুঁজির এই যে 'সামাজিক ভূমিকা' অন্যদের

শ্রমের ফসল আত্মসাতে পুঁজিকে সক্ষম করে তোলে এবং নিছক উৎপাদনের উপাদান থেকে তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দেয়, সেই সামাজিক ভূমিকার উৎস কোথায় ?

হের ড্যুরিং বলছেন এটা 'উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রকৃতি ও সেগুলির কারিগরিগত অপরিহার্য'তার ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং এর উদ্ভব ঘটেছে ইতিহাসের ধারায়। তিনি ২১২ পৃষ্ঠায় দুটি মানুষের অতিপরিচিত রোমাঞ্চকর কার্যাবলীর সাহায্যে এর উৎস ব্যাখ্যা করেন, এর আগে বারদশেক শোনা সেই বক্তব্যটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে ; এই দুটি মানুষের মধ্যে একজন ইতিহাসের প্রথম পর্বে অন্যজনের ওপর জবরদস্তি চালিয়ে নিজের উৎপাদনের উপকরণগুলিকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করেছিল। মূল্যকে পুঁজিতে রূপান্তরকারী সামাজিক ভূমিকার ওপর ঐতিহাসিক সূচনা আরোপ করে হের ড্যুরিং কিন্তু সন্তুষ্ট থাকেন নি ; তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এর একটা ঐতিহাসিক সমাপ্তি-পর্বও থাকবে : 'ঠিক এটাকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।' যে ঘটনা ইতিহাসের ধারায় উদ্ভূত হয় আবার ইতিহাসের ধারার মধ্যে দিয়েই মিলিয়ে যায়, সাধারণ ভাষায় তাকে 'একটা ঐতিহাসিক পর্ব' বলাই রীতি। সুতরাং পুঁজি যে একটা ঐতিহাসিক পর্ব, সেটা শুধু মার্কসেরই মত নয়, হের ড্যুরিং-এরও ; তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা এখন জেসুইটদের শিবিরে।[১০১] যখন দুজন ব্যক্তি একই কাজ করেন, তখন সেটা একই কাজ হয় না। মার্কস যখন বলেন পুঁজি একটা ঐতিহাসিক পর্ব, তখন সেটা নাকি একটা দেউলিয়া ধারণা, ইতিহাস ও যুক্তির কাল্পনিকতার জারজ সন্তান, যার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে ধারণা প্রয়োগের সত্তা কবরস্থ হয়ে যায়। কিন্তু হের ড্যুরিং যখন একইভাবে পুঁজিকে একটি ঐতিহাসিক-পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন, তখন সেটা তাঁর আর্থনীতিক বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা ও যথাযথ জ্ঞানের অর্থে তাঁর সুনির্দিষ্ট ও সবচেয়ে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে পুঁজি সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে ড্যুরিং-এর ধারণার পার্থক্য কোথায় ?

মার্কস বলেছেন, 'উদ্বৃত্ত শ্রম পুঁজির আবিষ্কার নয়। যেখানেই সমাজের একটা অংশের হাতে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকদের জীবনধারণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার জন্যে, মুক্ত বা মুক্ত নয়, যেকোনো ধরনের

শ্রমিককেই তার নিজের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সঙ্গে কিছুটা অতিরিক্ত সময় যোগ করতেই হয়।'*

সুতরাং যে পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত অস্তিত্ববান সমস্ত ধরনের সমাজ শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম, শ্রমিকের নিজের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত শ্রম এবং এই উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল অন্যদের দ্বারা আত্মসাৎ ও শ্রমকে শোষণ করা এই সমস্ত সমাজে একটা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত-শ্রমের ফসল যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপ নেয়, যখন উৎপাদনের উপকরণের মালিক সামাজিক বন্ধনমুক্ত, নিজস্ব সম্পদহীন ও শোষণের একটা বস্তু হিসাবে মুক্ত শ্রমিকের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাকে শোষণ করে, মার্কসের মতে, একমাত্র তখনই উৎপাদনের উপকরণগুলি পুঁজির বিশেষ চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের শুরুতে এটাই প্রথম ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে।

এর উল্টো বক্তব্য হিসাবে হের ড্যুরিং ঘোষণা করেছেন যে 'সাধারণ শ্রম-শক্তির ফসলসমূহের অংশগঠনকারী' অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-শ্রম সৃষ্টিকারী উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রত্যেকটির যোগফল হচ্ছে পুঁজি, অর্থাৎ মার্কস-আবিষ্কৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমকে হের ড্যুরিং নিজেই দখল করে নেন, আর তা করেন তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে অসুবিধাজনক উদ্বৃত্ত মূল্যকে হত্যা করার মতলবে, যে-উদ্বৃত্ত-মূল্যও মার্কসের আবিষ্কার। সুতরাং ড্যুরিং-এর মতে যেসব নাগরিক করিন্থ ও অ্যাথেন্স-এর দাসদের কাজে লাগিয়ে আর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল পুঁজি; শুধু তাই নয়, রোম সাম্রাজ্যের সময়কার বৃহৎ রোমান ভূস্বামী এবং একই রকমভাবে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যারনদের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিও নিঃসন্দেহেই ছিল পুঁজি—কেননা এগুলির প্রত্যেকটি কোনো-না-কোনোভাবে উৎপাদনে সহায়তা করেছিল।

সুতরাং 'ইতিমধ্যে উৎপাদিত উৎপাদনের একটি উপকরণ হিসাবে পুঁজি-সংক্রান্ত স্বীকৃত সংজ্ঞাটি' হের ড্যুরিং নিজে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি ঠিক এর বিপরীত; এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উৎপাদনের যেসব উপকরণ উৎপাদিত হয় নি, যেমন পৃথিবী ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ, সেগুলিও

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ২৩৩। সম্পাদক।

পুঁজির অন্তর্ভুক্ত। পুঁজি শুধুমাত্র 'উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ',—এই এই বক্তব্যটি কিন্তু স্থূলদর্শী অর্থনীতিবিদদেরই স্বীকৃত বক্তব্য। হের ড্যুরিং-এর অতি প্রিয় এই স্থূলদর্শী অর্থনীতির পরিধির বাইরে 'উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ' কিংবা যেকোনো মূল্যের পরিমাণ একমাত্র তখনই পুঁজি হয়ে ওঠে যখন তা মুনাফা কিংবা সুদ আদায় করে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের রূপের ভিতর দিয়ে মুফত শ্রমের উদ্বৃত্ত ফসল আত্মসাৎ করে, উপরন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের এই দুটি নির্দিষ্ট উপ রূপের ভিতর দিয়েই আত্মসাৎ করে। সমগ্র বুর্জোয়া অর্থনীতি এখনও পর্যন্ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছে যে মুনাফা বা সুদ প্রদানকারী বৈশিষ্ট্য সমস্ত মূল্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে যাকে উৎপাদন বা বণ্টনের সাধারণ পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো হয়। এই বক্তব্যের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই। সাবেকি অর্থনীতির আলোচনায় পুঁজি ও মুনাফা কিংবা পুঁজি ও সুদ অবিচ্ছেদ্য, পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ, যেমন কার্য ও কারণ, পিতা ও পুত্র, গতকাল ও আজ। আধুনিক আর্থনীতিক অর্থে 'পুঁজি' শব্দটি দেখা দিয়েছে তখন, যখন বস্তুটি তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, যখন পণ্যোৎ-পাদনের উদ্দেশ্যে সামন্ত-বন্ধনহীন শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে শোষণ করে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজির ভূমিকা গ্রহণ করেছে; আর বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের প্রথম পুঁজিপতি জাতি ইতালীয়রাই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এর প্রবর্তন করেছিল। এবং আধুনিক পুঁজির বৈশিষ্ট্যসূচক আত্মসাৎ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসই যদি প্রথম মৌলিক বিশ্লেষণ করে থাকেন, শেষ পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক তথ্য থেকে পুঁজির ধারণাকে রূপ দেওয়া হয়েছিল এবং যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা পুঁজির অস্তিত্বের উৎস, পুঁজির ধারণাকে সেইসব ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে তিনি যদি উপস্থিত করে থাকেন, যেসব অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান ধারণা এখনও পর্যন্ত সাবেকি বুর্জোয়া অর্থনীতি ও প্রাক্তন সমাজতন্ত্রীদের গায়ে সেঁটে আছে, সেইসব ধারণাকে তিনি যদি পরিষ্কার করে থাকেন, তাহলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে মার্কসই সেই 'সুনির্দিষ্ট ও সবচেয়ে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' প্রয়োগ করেছেন, যার সম্পর্কে হের ড্যুরিং অনবরত বকে চলেছেন, অথচ যা তাঁর লেখায় শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত।

আসলে হের ড্যুরিং-এর বিশ্লেষণ একেবারে ভিন্ন ধরনের। পুঁজিকে একটা ঐতিহাসিক-পর্ব হিসাবে উপস্থিত করার বিরুদ্ধে প্রথমে বাক্যবাণ প্রয়োগ

করে এবং এই উপস্থাপনাকে 'ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক উদ্ভট কল্পনাশক্তির বিকৃত সৃষ্টি' হিসাবে আখ্যাত করে এবং পরে নিজেই একে ঐতিহাসিক-পর্ব হিসাবে উপস্থিত করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি; তিনি স্পষ্টভাবেই এটা ঘোষণা করেছেন যে 'সাধারণ শ্রম-শক্তির ফসলের অংশ' আত্মসাৎকারী আর্থনীতিক ক্ষমতার সমস্ত উপকরণ, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ—আর সেই কারণে সমস্ত শ্রেণী-সমাজের ভূসম্পত্তিও হচ্ছে পুঁজি। অবশ্য এই জন্যে তাঁর বিশ্লেষণের পরবর্তী অংশ প্রচলিত পদ্ধতিতে পুঁজি ও মুনাফাকে ভূসম্পত্তি ও জমির খাজনা থেকে আলাদা করতে এবং উৎপাদনের যেসব উপকরণ মুনাফা বা সুদ প্রদান করে, সেগুলিকে পুঁজি হিসাবে আখ্যা দিতে তাঁর কিছুমাত্র বাধা হয় নি; তিনি তাঁর 'কোর্স' এর ১৫৬ পৃষ্ঠার অনেকটা জায়গা নিয়ে ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এটাই করেছেন। ঘোড়া, বলদ, গাধা ও কুকুর—এরা সবাই পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, এই যুক্তিতে হের ড্যুরিং প্রথমে এদের 'ইঞ্জিন' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন এবং শুধু আধুনিক বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন শব্দটি সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে এবং একে একটা ঐতিহাসিক পর্যায় হিসাবে দাঁড় করাবার জন্যে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের ভর্ৎসনাও করতে পারেন, কারণ এসব হচ্ছে দেউলিয়া ধারণা, ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক উদ্ভট কল্পনাশক্তির বিকৃত সৃষ্টি ইত্যাদি; আর শেষে এটাও ঘোষণা করতে পারেন যে তা সত্ত্বেও ঘোড়া, গাধা, বলদ ও কুকুরকে ইঞ্জিন বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না, এই শব্দটি শুধুমাত্র বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে।

সুতরাং আবার আমরা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, পুঁজি সম্পর্কে ড্যুরিং-এর ধারণার মধ্যে আর্থনীতিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ধারণা ব্যবহারের সততার সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতাও লুপ্ত হয়েছে। হের ড্যুরিং-এর রচনাবলীর সর্বত্র দেউলিয়া ধারণা, চপলতাকে যুক্তিসঙ্গত সত্য হিসাবে চালানোর নিদর্শন ও নড়বড়ে ভিত্তি পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

কিন্তু ড্যুরিং-এর কাছে এসব অর্থহীন। কারণ তিনি এতেই গর্বিত যে যে-অক্ষের চারপাশে সমস্ত অর্থনীতি, সমস্ত রাজনীতি ও আইনশাস্ত্র, এক কথায় সমস্ত ইতিহাস, এতদিন ধরে আবর্তিত হচ্ছে, সেই অক্ষটি তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সেটা হচ্ছে এই:

'সামাজিক যোগসূত্র গঠনের ক্ষেত্রে যে দুটি মুখ্য উপাদান ভূমিকা নেয়, তা হলো বলপ্রয়োগ ও শ্রম।'

এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্যে আমরা এ যাবৎকালের আর্থনীতিক দুনিয়ার সম্পূর্ণ কাঠামোটিকে পেয়ে যাই। এটা খুবই সংক্ষিপ্ত ও নিম্নরূপ :

প্রথম ধারা : শ্রম উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় ধারা : বলপ্রয়োগে বন্টন করে।

'পরিষ্কার মনুষ্য-ভাষায় বলতে গেলে' এটাই হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক জ্ঞানের সমগ্র সারবস্তু।

করা তাঁর পক্ষে এক অমার্জনীয় ধৃষ্টতা কিংবা তিনি এর সবটাই বুঝতে পেরেছেন, আর তাই যদি হয় তাহলে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিষয়বস্তুকে বিকৃত করেছেন।

এরপর তিনি বলছেন :

'জুলুম করে আদায়ের বিষয়টি উপস্থিত করার সময় হের মার্কসের যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য সংক্রান্ত মতবাদের তত্ত্বগত অবস্থান স্বীকার না করেও মজুরি-শ্রমভিত্তিক আর্থনীতিক কাঠামোর শোষণমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে তীব্রতর ঘৃণা প্রকাশকে আরও বেশি মাত্রায় স্বীকার করে নেওয়া যায়।'

সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিন্তু ভ্রান্ত তত্ত্বগত অবস্থান মার্কসকে জুলুম করে আদায় করার বিষয়টির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় প্ররোচিত করেছে; কিন্তু তাঁর এই ভ্রান্ত 'তত্ত্বগত অবস্থানে'র ফলে নৈতিক আবেগটির প্রকাশ পেয়েছে অনৈতিকভাবে, যা কুৎসিৎ ঘৃণা ও হীন বিদ্বেষের রূপ নিয়েছে, অন্যদিকে হের ড্যুরিং এর সুনির্দিষ্ট ও সবচেয়ে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ একটি উন্নত চরিত্রের নৈতিক আবেগ ও ক্রোধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এই ক্রোধের রূপ উন্নতর নৈতিকতার পরিচায়ক, এমন কি বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণার পরিমাণের দিক থেকেও উন্নততর। এইভাবে হের ড্যুরিং যখন নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন, তখন দেখা যাক এই উন্নততর ক্রোধের উৎস কোথায়।

এরপর আমরা দেখছি : 'এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে প্রতিযোগিতাকারী পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমেত শ্রমের সমস্ত ফসলের স্বাভাবিক উৎপাদনী ব্যয়ের চাইতে এমন একটা বেশি দাম প্রতিনিয়ত আদায় করে নিতে পারে যা ইতিমধ্যেই উল্লিখিত উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের অনুপাত দেখিয়ে দেয়। মার্কসের তত্ত্বে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এটা না পাওয়ার সহজ কারণ হচ্ছে এর মধ্যে এই প্রশ্নটি উত্থাপনেরই কোনো ক্ষেত্র নেই। ভাড়া-করা শ্রম-ভিত্তিক উৎপাদনের বিলাসবহুল চরিত্রটি মোটেই গভীরভাবে আলোচিত হয় নি এবং শোষণমূলক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সামাজিক গঠনটিকে হীন দাসত্বের চূড়ান্ত ভিত্তি হিসাবে কোনভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। বরঞ্চ সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে অর্থনীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কথাই বলা হয়েছে।'

মার্কসের লেখা উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে একথা আদৌ বলা হয় নি যে

উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য যারা প্রথমেই আত্মসাৎ করে সেই শিল্প-পুঁজিপতিরা এই উৎপন্ন দ্রব্যকে সব সময়েই তার পুরো দামে গড়পড়তা হিসাবে বিক্রি করে থাকে, হের ড্যারিং এখানে যা মনে করেছেন। মার্কস পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে, বণিকের মুনাফাও উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ এবং এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন এটা ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদক তার উৎপন্ন দ্রব্যটিকে দ্রব্যটির মূল্যের চাইতে কম মূল্যে বণিকের কাছে বিক্রি করে এবং এইভাবে তার লুণ্ঠনের একটা অংশ বণিকের হাতে ছেড়ে দেয়। এখানে প্রশ্নটিকে যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে, মার্কসের আলোচনায় প্রশ্নটিকে সেইভাবে উত্থাপনের স্পষ্টতই কোনো সুযোগ নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে গেলে প্রশ্নটি হচ্ছে এই : উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে মুনাফা, সুদ, বাণিজ্যিক মুনাফা, ভূমির খাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন খণ্ডরূপে রূপান্তরিত হয়? মার্কস তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই প্রশ্নটি মীমাংসা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু 'ক্যাপিট্যাল'-এর* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত হের ড্যারিং যদি অপেক্ষা না করতে পারেন, তাহলে প্রথম খণ্ডটিকেই তিনি আর একটু ভালো করে দেখে নিন। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত অংশটি ছাড়াও ৩২৩** পৃষ্ঠায় তিনি দেখতে পাবেন যে মার্কসের মতানুসারে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়মাবলী হিসাবে পুঁজির বাহ্যিক গতিবিধির ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং এই রূপেই পৃথক পৃথক পুঁজিপতির চেতনায় তার কর্মতৎপরতার প্রেরণাশক্তি হিসাবে ধরা পড়ে; সুতরাং পুঁজির অন্তর্নিহিত চরিত্রের ধারণা অর্জনের পূর্বে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ঠিক যেমন মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের আপাত-দৃশ্যমান গতিবিধি একমাত্র সেই ব্যক্তিই ধরতে পারেন যিনি সেগুলির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর নয় এমন যথার্থ গতির হদিশ জানেন। এরপর মার্কস একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, মূল্যমানের নিয়ম প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রকাশ পায় ও তার চালিকা শক্তি প্রয়োগ করে। হের ড্যারিং শুধুমাত্র এটা থেকেই বুঝতে পারতেন যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং

* মার্কসের পরিকল্পনা ছিল 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ একত্র করে দ্বিতীয় খণ্ড বার করবেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তৃতীয় ভাগটি তৃতীয় খণ্ড হিসাবে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়।
সম্পাদক।

** ক্যাপিটাল, খণ্ড ১; মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৩০০। সম্পাদক।

সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন খণ্ড-রূপে উদ্বৃত্ত মূল্যের রূপান্তর অন্ততপক্ষে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার পক্ষে প্রথম খণ্ডের ইঙ্গিতগুলিই যথেষ্ট।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা হের ড্যুরিং-এর কাছে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। পরস্পরের প্রতিযোগী মালিকরা কিভাবে উদ্বৃত্ত উৎপাদনসমেত শ্রমজাত সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে এমন একটা বেশি দাম আদায় করে নিতে পারে, তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। এখানে আবার আমরা তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশভঙ্গির 'কঠোরতা' দেখতে পাই, যেটা আসলে একটা বিশৃঙ্খলতারই প্রকাশ। মার্কসের বিশ্লেষণে নিছক উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিন্দুমাত্র উৎপাদন-ব্যয় নেই; এটা উৎপাদনের সেই অংশ যার জন্যে পুঁজিপতির কোনো ব্যয় হয় না। সুতরাং প্রতিযোগী মালিকরা যদি উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে তার স্বাভাবিক ব্যয় আদায়ে ইচ্ছুক হতেন, তাহলে এই উৎপাদনকে তাদের নেহাৎই দান-খয়রাত করতে হতো। কিন্তু এই ধরনের 'চুলচেরা বিশ্লেষণে' আমাদের সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। প্রতিযোগী মালিকরা কি প্রতিদিন শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীকে তার স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয়ের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করছে না? হের ড্যুরিং-এর মতে:

উৎপাদনের স্বাভাবিক ব্যয় হচ্ছে 'শ্রম বা শক্তির ব্যয়, আর এটাকে আবার শেষ পর্যন্ত খাদ্য বাবদ ব্যয়ের দ্বারা মাপা যায়:'

অর্থাৎ বর্তমান সমাজে এই ব্যয় হচ্ছে কাঁচা মাল, শ্রমের যন্ত্রপাতি ও মজুরি বাবদ প্রকৃত ব্যয়, যা 'কর', মুনাফা কিংবা জবরদস্তি করে চাপানো অতিরিক্ত কর থেকে আলাদা। কিন্তু এটা সবারই জানা কথা যে আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানে প্রতিযোগী মালিকরা তাদের পণ্যসামগ্রীকে স্বাভাবিক উৎপাদনী ব্যয়ে বিক্রি করে না, এর ওপর তারা একটা তথাকথিত অতিরিক্ত কর, মুনাফা চাপায় এবং সাধারণত এটা তারা ফিরেও পায়। যে-প্রশ্নটি উত্থাপন করেই হের ড্যুরিং মার্কসীয় কাঠামোটিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবেন বলে ভেবেছেন—একদা জসুয়া যেমন জেরিকোর দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল—সেই একই প্রশ্ন হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রেও থেকে যাচ্ছে। এবার দেখা যাক কিভাবে তিনি প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন:

তিনি বলছেন, 'পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার কোনো বাস্তব অর্থ নেই এবং

মানুষের উপকরণের বিরুদ্ধে পরোক্ষ বলপ্রয়োগ যুগপৎ এর অন্তর্ভুক্ত না হলে এটা বাস্তব রূপ পেতে পারে না। এই বলপ্রয়োগের ফল হচ্ছে পুঁজির আয় আর তাই পুঁজির আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে এই শক্তি প্রয়োগের ব্যাপ্তি ও তীব্রতার ওপর।...পুঁজির আয় হচ্ছে একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা, যার প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা প্রতিযোগিতার চাইতেও বেশি। এক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নেয় এবং তাদের প্রত্যেকে স্ব-স্ব অবস্থান বজায় রাখে। পুঁজির আয়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রচলিত আর্থনীতিক কাঠামোতে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়।'

দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত আমরা এটা জানতে পারি নি যে স্বাভাবিক উৎপাদনী ব্যয়ের চেয়ে বেশি দাম প্রতিযোগী মালিকরা শ্রমজাত দ্রব্য থেকে কিভাবে নিয়মিত আদায় করে নেয়। হের ড্যুরিং কি তাঁর পাঠকদের এতটাই মূর্খ বলে মনে করেন যে প্রাশিয়ার রাজা যেমন আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তেমনি পুঁজির আয় প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে—এই কথা বলে তিনি তাঁদের প্রতারণা করতে পারবেন। কোন্ কলাকৌশল খাটিয়ে প্রাশিয়ার রাজা আইনের ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন, তা আমরা জানি ; কোন্ কৌশলে পুঁজির আয় প্রতিযোগিতার চাইতে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল, সেটা আমাদের কাছে হের ড্যুরিং-এর ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু এটা তিনি কিছুতেই আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন না। উপরন্তু তিনি এটাই বলেছেন যে পুঁজিপতিরা যদি এ-ক্ষেত্রে একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে এবং প্রত্যেকে তার স্ব-স্ব অবস্থান বজায় রাখে, তা হলেও কিছু এসে যায় না। কিছু লোক একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করলেই, তাদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থান বজায় রাখতে পারবে—তাঁর এই কথাটা আমরা মেনে নেব, এমন আশা করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়। প্রত্যেকেই এটা জানেন যে মধ্য যুগের গিল্ড মালিকরা এবং ১৭৮৯-এর ফরাসি অভিজাত সম্প্রদায় সুনিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করত, তা সত্ত্বেও তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জেনায় প্রাশীয় বাহিনীও ছিল একটা প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তারাও তাদের অবস্থান বজায় রাখতে না পেরে পশ্চাদ-অপসরণ করেছিল এবং পরে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। প্রাধান্যমূলক আর্থব্যবস্থায় খানিকটা পরিমাণ পুঁজির উপার্জন অবশ্য প্রয়োজনীয়—এই বক্তব্যেও আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই ; কারণ কেন এই রকম হয়,

এটাই প্রমাণ করা দরকার। হের ড্যুরিং-এর এই বক্তব্যও আমাদের মোটেই লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যায় না :

'পুঁজির আধিপত্য দেখা দিয়েছিল জমির ওপর আধিপত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে। ভূমিদাসদের একটা অংশ প্রথমে শহরের কারিগরে এবং শেষ পর্যন্ত কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভূমি-রাজস্বের পর পুঁজির উপার্জন দ্বিতীয় এক ধরনের মালিকানার খাজনা হিসাবে বিকাশলাভ করে।'

এমনকি আমরা যদি এই ঘোষণার ঐতিহাসিক অযথার্থতাকেও উপেক্ষা করি, তাহলেও এটা নিছক একটা ঘোষণাই থেকে যাচ্ছে, এবং যা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করতে হবে তার পুনরাবৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না যে তাঁর নিজের প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা হের ড্যুরিং-এর নেই : কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকরা স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয়ের চাইতে বেশি দামে শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে সক্ষম হয় ; অর্থাৎ তিনি মুনাফার উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। তিনি স্থূলভাবে এইরকম একটা ঘোষণাই শুধু করতে পারেন : পুঁজির উপার্জন হচ্ছে বলপ্রয়োগের ফল আর সত্যিসত্যিই এটা ড্যুরিং-এর সামাজিক সংবিধানের এই ২নং ধারার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ : বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বন্টনকার্য চলে। বেশ সুন্দরভাবেই এটা বলা হয়েছে ; কিন্তু 'এখন প্রশ্ন হলো' : বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কী বণ্টিত হয় ? বন্টনযোগ্য কিছু তো অবশ্যই থাকতে হবে। বন্টনযোগ্য কিছু না থাকলে সবচেয়ে সদিচ্ছাসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ক্ষমতার পক্ষেও কিছু বন্টন করা সম্ভব নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিপতিরা যে আয় পকেটস্থ করে, তা খুবই স্পষ্ট ও বাস্তব। বলপ্রয়োগে এগুলি কেড়ে নেওয়া যায় কিন্তু উৎপাদন করা যায় না। বলপ্রয়োগে কিভাবে পুঁজি-পতিদের উপার্জন কেড়ে নেওয়া যায়. হের ড্যুরিং কিছুতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না, বলপ্রয়োগ কোত্থেকে এই উপার্জন কেড়ে নেয়—সেই প্রশ্নে তিনি একেবারে নীরব, শ্মশানের মতো নীরব। যেখানে কিছুই নেই, সেখানে অন্য যেকোনো শক্তির মতো রাজাও তাঁর অধিকার হারান। শূন্য থেকে কিছুই জন্মায় না, মুনাফা তো নয়ই। পুঁজির মালিকানার যদি কোনো বাস্তব তাৎপর্য না থাকে এবং মনুষ্য-শক্তির বিরুদ্ধে পরোক্ষ বলপ্রয়োগ না করে যদি তার বাস্তব রূপ না দেওয়া যায়, তাহলে প্রথমত আবার এই প্রশ্নটি দেখা দেয়

যে পুঁজি-সম্পদ কিভাবে এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করেছিল—উপরোক্ত একগুচ্ছ ঐতিহাসিক আপ্তবাক্য থেকে মোটেই তার উত্তর পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত, এই বলপ্রয়োগ কিভাবে পুঁজির মূল্য অর্জনে, মুনাফায় রূপান্তরিত হলো; আর তৃতীয়ত, কোত্থেকে এ এই মুনাফা অর্জন করল।

যেকোনো দিক থেকেই ড্যুরিং-এর অর্থনীতিকে বিচার করি না কেন, আমরা এক ধাপও এগোতে পারব না। প্রতিটি ন্যাক্কারজনক ঘটনার—মুনাফা, জমির খাজনা, প্রায় অনাহারে থাকার মতো মজুরি, শ্রমিকদের দাসত্ব-বন্ধন—কারণ হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যা একটাই: বলপ্রয়োগ আর বলপ্রয়োগ এবং হের ড্যুরিং-এর 'প্রচণ্ড ক্রোধ' শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ক্রোধে পর্যবসিত হয়। প্রথমত, আমরা দেখেছি যে বলপ্রয়োগের যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ একটা নিকৃষ্ট ধরনের অজুহাত তুলে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলমাত্র, এর ফলে প্রশ্নটি অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চলে যায় এবং এই বলপ্রয়োগ অর্থনীতির একটা সমস্যারও সমাধান করতে পারে না, দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি এটা বলপ্রয়োগের উৎসকেই অমীমাংসিত রেখে দেয়, আর তার সঙ্গত কারণও রয়েছে, কেননা তা হলে একে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হতো যে সমস্ত সামাজিক শক্তি ও সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির উৎস রয়েছে আর্থনীতিক পূর্ব-শর্তগুলির মধ্যে, প্রতিটি কালপর্বে প্রতিটি সমাজে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদন ও বিনিময়-পদ্ধতির মধ্যে।

এখন দেখা যাক, অর্থনীতির এই 'গভীরতর ভিত্তি'র এই অক্লান্ত প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে মুনাফা সম্পর্কে আরও কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা। মজুরি সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা থেকে আমরা হয়তো কিছু পেতেও পারি। ১৫৮ পৃষ্ঠায় আমরা দেখছি*:

'শ্রম-শক্তি বজায় রাখার জন্যে প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে মজুরি এবং এটা প্রথমে জমির খাজনা ও পুঁজির উপার্জনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সৃষ্টি-হওয়া সম্পর্কগুলি স্বচ্ছভাবে বোঝার জন্যে মজুরির প্রশ্নটি বাদ দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে অর্থাৎ দাসপ্রথা বা ভূমিদাস প্রথার ভিত্তি থেকে প্রথমে জমির খাজনা ও পরে পুঁজির উপার্জন সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ...দাস, ভূমিদাস কিংবা মজুরি-শ্রমিক, যেই হোক না কেন, এদের প্রত্যেককেই প্রতিপালন করতে হয় এবং তাই শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মালিকের আয়

সৃষ্টি হয় শ্রম-শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রী থেকে ।...এর থেকে এটা বোঝা যায় যে একদিকে কোনো না কোনো ধরনের মালিকানার খাজনা এবং অন্যদিকে সম্পত্তিহীন মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে যে মৌল বিরোধ বর্তমান, সেই মৌল বিরোধের অস্তিত্ব শুধুমাত্র এক পক্ষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না, বরঞ্চ উভয় পক্ষের মধ্যেই একই সঙ্গে এই বিরোধ লক্ষ্য করা যায় ।'

কিন্তু ১৮৮ পৃষ্ঠা থেকে আমরা জানতে পারি যে মালিকানার খাজনা বলতে জমির খাজনা ও পুঁজির উপার্জন উভয়ই বোঝায় । ১৭৪ পৃষ্ঠায় আবার আমরা দেখি :

'পুঁজির উপার্জনের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হচ্ছে এটা শ্রমশক্তির উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের আত্মসাৎকরণ । প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো রূপ ছাড়া এর ধারণা করা যায় না ।'

১৮৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

মজুরি 'সমস্ত ক্ষেত্রেই শ্রমিকের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সাধারণভাবে সুনিশ্চিত করার জন্যে ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয় ।'

অবশেষে ১৯৫ পৃষ্ঠায় দেখি :

'মালিকানার খাজনা হিসাবে অংশটি মজুরি হিসাবে ব্যয় হয়ে যায় এবং সাধারণ উৎপাদন-ক্ষমতা (!) থেকে শ্রমিকের হাতে যা আসে, তা অবশ্যই মালিকানার রাজস্ব থেকে আদায় করতে হবে ।'

হের ড্যুরিং আমাদের একের পর এক বিস্ময়ের মধ্যে নিয়ে যান । তাঁর মূল্যমানের তত্ত্বে এবং প্রতিযোগিতার তত্ত্ব সমেত' পরবর্তী সমস্ত পরিচ্ছেদে অর্থাৎ ১ থেকে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশে পণ্যসমূহের দাম কিংবা মূল্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল : এক, স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয় কিংবা উৎপাদন-ব্যয় অর্থাৎ কাঁচামাল, শ্রমের যন্ত্রপাতি ও মজুরি খাতে খরচা ; দুই, অতিরিক্ত কর কিংবা বন্টন-মূল্য, একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থে তরোয়ালের জোরে যে-কর চাপানো হয় ; আমরা দেখেছি এই অতিরিক্ত কর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি, কেননা এই কর এক হাতে যা আদায় করে অন্য হাতে সেটাই তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় ; তাছাড়া এর উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে হের ড্যুরিং আমাদের যা জ্ঞাত করেছেন, তাতে দেখা যায় যে শূন্য থেকে এর উদ্ভব

আর তাই এর প্রকৃতিও শূন্য। পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ ১৫৬ থেকে ২১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে এই অতিরিক্ত কর সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তার বদলে, শ্রমের প্রতিটি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অর্থাৎ প্রতিটি পণ্যের মূল্য নিম্নোক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: এক, উৎপাদনী ব্যয়, প্রদত্ত মজুরি যার অন্তর্ভুক্ত; দুই, 'শ্রম শক্তিকে ব্যবহার করে প্রাপ্ত মোট উৎপন্ন দ্রব্য' যার থেকে সৃষ্টি হয় মালিকের আয়। এই মোট উৎপন্ন দ্রব্যের একটা সুপরিচিত গঠন বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে কোনো রকম উল্কি এঁকে বা চুনকাম করে লুকিয়ে রাখা যাবে না। 'এই ক্ষেত্রে সৃষ্টি-হওয়া সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্যে' পাঠক যদি তাঁর কল্পনায় হের ড্যুরিং এর উপরোক্ত অংশটি উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কিত মার্কসের আলোচনার পাশাপাশি উপস্থিত করেন, তাহলেই তিনি দেখবেন যে এখানে হের ড্যুরিং তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায় 'ক্যাপিটাল' থেকে সরাসরি নকল করেছেন।

দাসপ্রথা কিংবা মজুরি-শ্রম সব ধরনের উদ্বৃত্ত শ্রমকেই হের ড্যুরিং সমস্ত শাসক শ্রেণীর আয়ের এযাবৎকালের উৎস বলে মনে করেছেন: এই অংশটি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ২২৭* পৃষ্ঠার বহু-উদ্ধৃত অংশটি থেকে নেওয়া হয়েছে: উদ্বৃত্ত শ্রম পুঁজির আবিষ্কার নয় ইত্যাদি।

'মালিকের আয়' সৃষ্টিকারী 'মোট দ্রব্যসামগ্রী' মজুরির উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছাড়া আর কী হতে পারে এবং শ্রমিকের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা সাধারণভাবে সুনিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় 'ক্ষতিপূরণের গায়ে একেবারে অনাবশ্যক ছদ্মবেশ পরানো সত্ত্বেও হের ড্যুরিংও কি এটা স্বীকার করেন নি? মার্কস যেমনটি দেখিয়েছেন, শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণসমূহ পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনের শ্রমের চেয়ে বেশি শ্রম যদি পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করে না নেয়, অর্থাৎ শ্রমিকদের দেয় মজুরির মূল্য ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে যদি পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের খাটাতে না পারে, তাহলে 'শ্রম-শক্তির দ্রব্যসামগ্রীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের আত্মসাৎ' কী করে সম্ভব? সুতরাং শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণগুলি পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সীমা অতিক্রম করে শ্রম-দিনের সম্প্রসারণ অর্থাৎ মার্কস-কথিত

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ২২৬। সম্পাদক।

উদ্বৃত্ত শ্রম এবং শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত শ্রমই হের ড্যুরিং-এর 'শ্রমশক্তির ব্যবহার' ও মালিকের হস্তগত 'মোট দ্রব্যসামগ্রী'র আড়ালে লুকিয়ে আছে। মার্কসীয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত মূল্য ছাড়া আর কিভাবে এগুলি প্রকাশ পেতে পারে? আর অযথাযথ সূত্রায়ন ছাড়া ড্যুরিং-কথিত মালিকানার খাজনার সঙ্গে মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যের পার্থক্য কোথায়। এছাড়া হের ড্যুরিং মালিকানার খাজনা (Besitzrente) নামটি রডবারটাস-এর কাছ থেকে ধার করেছেন। রডবারটাস জমির খাজনা ও পুঁজির খাজনা অথবা পুঁজির উপার্জন, উভয়কেই খাজনা শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, হের ড্যুরিং এর সঙ্গে 'মালিকানা' কথাটি যুক্ত করেছেন মাত্র।* তাঁর এই চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয়, সেজন্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ('ক্যাপিটাল' পৃ ৫৩৯**) মার্কস শ্রম-শক্তির দাম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ পরিবর্তনের যে-নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, হের ড্যুরিং তাঁর নিজস্ব রীতিতে সেই নিয়মগুলির সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করেছেন। আর এটা এমনভাবে করেছেন যাতে মালিকানার খাজনা যা আসে, মজুরি হিসাবে সেটাই আবার ব্যয় হয়ে যায় এবং এর বিপরীতটাও ঘটে। এইভাবে তিনি বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ কতকগুলি মার্কসীয় সূত্রকে বিষয়বস্তুহীন একই কথার পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত করেছেন, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে দুটি অংশে বিভক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অংশ কিছুতেই বৃদ্ধি পায় না—যদি না অপর অংশটির হ্রাস ঘটে। সুতরাং হের ড্যুরিং মার্কসের ভাবধারাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন, যার ফলে 'সঠিক শিক্ষার অর্থে নির্দিষ্ট ও অত্যন্ত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ'—যা সুনিশ্চিতভাবেই মার্কসের ব্যাখার মধ্যে বর্তমান—একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে পারি না যে 'ক্যাপিটাল' সম্পর্কে তাঁর 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি'-তে হের ড্যুরিং যে অদ্ভুত হট্টগোল সৃষ্টি করেছেন এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত প্রশ্নটি নিয়ে (যে-প্রশ্নটির উত্তর তিনি দিতে পারবেন না, সেটা না তুললেই ভালো করতেন) তিনি যে ধূম্রজাল

---

* শুধু এটাই নয়। রডবারটাস বলেছেন: (সোস্যাল লেটার্স, লেটার ২, পৃ ৫৯) 'এই (তাঁর) তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তিগত শ্রম ব্যতীত, শুধুমাত্র মালিকানার ভিত্তিতে উপার্জিত সমস্ত আয় হচ্ছে খাজনা' (এঙ্গেলসের টীকা)।

** ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ২২৩। সম্পাদক

সৃষ্টি করেছেন—এ সবই তাঁর 'কোর্স'-এর মধ্যে মার্কসের লেখা থেকে স্থূল চৌর্যবৃত্তিকে আড়াল করার সাময়িক কৌশল, ধূর্ত পদক্ষেপ মাত্র। বস্তুতপক্ষে 'যে জটিল গোলকধাঁধাকে হের মার্কস 'ক্যাপিটাল' বলেছেন' তাতে, ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক রূপকথার জারজ সন্তান, হতবুদ্ধিকর ও ধোঁয়াটে হেগেলীয় ধারণা এবং ভেলকিবাজি ইত্যাদিতে নিজেদের জড়িত না করতে পাঠকদের সতর্ক করে দেওয়ার পিছনে হের ড্যুরিং-এর যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। যে ভেনাসের বিরুদ্ধে এই বিশ্বস্ত এক্‌কার্ট[১০৩] জার্মান যুব সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছেন, সেই ভেনাসকে তিনি নিজেই মার্কসীয় সংগ্রহশালা থেকে চুরি করে নিয়ে এসে নিজের ব্যবহারের জন্যে নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়েছেন। মার্কস-কথিত শ্রম শক্তির ব্যবহার থেকে আত্মসাৎ করা তাঁর এই মোট শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীর জন্যে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য বলতে মার্কস শুধু মুনাফা অথবা পুঁজির উপার্জন বুঝিয়েছিলেন, তাঁর এই একগুঁয়ে (দুটি সংস্করণেই এটার পুনরাবৃত্তি রয়েছে) ও ভ্রান্ত দাবির ভিত্তিতে মালিকানার খাজনা কথাটির আড়ালে মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যকে দখল করে নেবার জন্যে তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাতেই হয়।

সুতরাং হের ড্যুরিং-এর নীতিকে তাঁর ভাষায় এইভাবে চিত্রিত করা যায়:

হের ড্যুরিং-এর 'মতে একজন শ্রমিক নিজের জীবনধারণের জন্যে যে সময়টুকু শ্রম করে, মজুরির মধ্যে সেই শ্রম-সময়ের পাওনাই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রয়োজন হয়; বাকি শ্রম-দিবসে, যা প্রায় সময়েই বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে আমাদের লেখক যাকে বলেছেন' মালিকানার খাজনা। 'উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে' যে-শ্রম-সময় ইতিমধ্যেই শ্রমের যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তাকে যদি আমরা হিসাবের বাইরে রাখি, তাহলে শ্রম-দিবসের এই উদ্বৃত্ত অংশটি হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী মালিকের একটা ভাগ। শ্রম-দিবসের বিস্তার সাধন আসলে পুঁজিপতির স্বার্থে মুনাফা নিংড়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যে-বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঙ্গে হের ড্যুরিং 'শোষণের কার্যকলাপ সংক্রান্ত এই ধারণাটিকে হাজির করেছেন, তা বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না…' কিন্তু যা ভালভাবে বোঝা যায় না তা হচ্ছে, তিনি কিভাবে এখন তাঁর 'প্রবলতর ক্রোধে' ফিরে আসবেন।

নয়

অর্থনীতির প্রাকৃতিক সূত্রাবলী

জমির খাজনা

এখনও পর্যন্ত আমরা, আমাদের একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বুঝে উঠতে পারি নি কিভাবে হের ড্যুরিং অর্থনীতির ক্ষেত্রে

'নতুন একটা পদ্ধতির দাবিদার হবেন, যা শুধু যুগোপযোগীই নয়, যুগের পক্ষে কর্তৃত্বসম্পন্নও বটে।'

কিন্তু তাঁর বলপ্রয়োগের তত্ত্ব মূল্য ও পুঁজি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে আমরা যা খুঁজে পাই নি, হের ড্যুরিং-এর 'জাতীয় অর্থনীতির প্রাকৃতিক সূত্রাবলী' বিচার করার সময় হয়তো তা আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। কারণ তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৌলিকতা ও তীব্রতা নিয়ে বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থিত করেছেন,

'আপাত স্থিতিশীল বিষয়ের নিছক বিবরণদান ও শ্রেণীবিভাগ অতিক্রম করা এবং বস্তুসমূহের জন্ম-সূত্রকে উদ্ঘাটিত করে এমন জীবন্ত স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়েই উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিজয় ঘোষিত হয়। সুতরাং নিয়মগুলির জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে নিখুঁত জ্ঞান, কেননা এটা আমাদের দেখিয়ে দেয় একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা আর একটি প্রক্রিয়া কিভাবে নির্ধারিত হয়।'

যেকোনো অর্থনীতির একেবারে প্রথম প্রাকৃতিক সূত্রটি বিশেষভাবে হের ড্যুরিং-এর আবিষ্কার।

'একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো' অ্যাডাম স্মিথ 'সমস্ত আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির অগ্রণী ভূমিকা শুধু প্রকাশ করতেই যে পারেন নি তাই নয়, এর পার্থক্যসূচক রূপটিকে তুলে ধরতেও

একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন, এইভাবে তিনি আধুনিক ইউরোপের বিকাশের ক্ষেত্রে যে শক্তিটি তার জোরালো প্রভাব ফেলেছে, সেটাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে গৌণ ভূমিকায় পর্যবসিত করেছেন।' এই 'মৌলিকসূত্রটি, যাকে প্রধান ভূমিকা অর্পণ করতেই হবে, হচ্ছে কারিগরি হাতিয়ার, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত মৌল সূত্র, মানুষের স্বাভাবিক আর্থনীতিক শক্তি সংক্রান্ত মৌলিক সূত্র।'

হের ড্যুরিং-এর আবিষ্কৃত 'মৌলিক সূত্র'টি এইরকম:

প্রথম সূত্র। 'আর্থনীতিক হাতিয়ার, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুষ্য-শক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক। হের ড্যুরিং আমাদের সঙ্গে মলিয়েরের বিদূষকের মতো আচরণ করছেন, যে-বিদূষক হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বাবুটিকে এই সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন যে গদ্য কী তা না জেনেই তিনি সারা জীবন ধরে গদ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।[১০৪] অনেক আগে থেকেই আমরা জানতাম যে বহু ক্ষেত্রেই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করেছে (আবার বহু ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি করেও নি, দুনিয়ার প্রতিটি পেটেন্ট অফিসের সংগ্রহশালায় ফেলে-দেওয়া কাগজের বোঝা দেখলেই এটা প্রমাণিত হবে); কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাটি, যা অত্যন্ত সুপ্রাচীন, যে সমস্ত অর্থনীতির মৌলিক সূত্র—এই জ্ঞানদায়ক সংবাদটি সরবরাহের জন্য আমরা হের ড্যুরিং-এর কাছে কৃতজ্ঞ। দর্শনের মতো অর্থনীতিতেও যদি 'উচ্চতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিজয়' বলতে বোঝায় গতানুগতিক বক্তব্যকে গালভরা নামে ভূষিত করা এবং তাকে প্রাকৃতিক কিংবা মৌলিক সূত্র হিসাবে তারস্বরে ঘোষণা করা, তাহ'লে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে, এমনকি বার্লিনের ভকসসেৎটুং[১০৫]-এর সম্পাদকদের পক্ষেও 'গভীরতর ভিত্তি স্থাপন করা' এবং বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা প্লেটো সম্পর্কে ড্যুরিং এর মন্তব্য স্বয়ং ড্যুরিং-এর সম্পর্কেই 'কঠোরভাবে' প্রয়োগ করতে বাধ্য হব:

'অবশ্য যদি একে রাজনৈতিক-আর্থনীতিক জ্ঞান হিসাবে মনে করা হয়, তাহলে 'বিচারমূলক ভিত্তি'র[১০৬] লেখক সেইসব ব্যক্তির সঙ্গেই এই জ্ঞানের অংশীদার, যাঁরা কোনো-না-কোনো সময়ে কোনো কিছু ধারণা করেছেন কিংবা 'যা অত্যন্ত স্পষ্ট সে সম্পর্কে' আধো-আধো ভাবেও কোনো কিছু বলেছেন।'

যেমন, আমরা যদি বলি পশুরা খায়, তাহলে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই প্রশান্তচিত্তে একটা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করে ফেলব ; কারণ যদি আমরা এর সঙ্গে এইটুকু যোগ করি যে আহার সমগ্র প্রাণিজগতের একটা মৌলিক নিয়ম, তাহলেই আমরা সমগ্র প্রাণিবিদ্যায় বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে পারব।

দ্বিতীয় সূত্র। শ্রম-বিভাগ : 'বাণিজ্যের বিভাজন ও কর্ম-বিভাগ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।'

এর মধ্যে যতটুকু সত্য, তা অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকেই সর্বজনবিদিত। এই বক্তব্য কতটা সত্য, তা দেখা যাবে তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় সূত্র। 'দূরত্ব ও পরিবহণ উৎপাদিকা শক্তিগুলির সহযোগিতাকে ব্যাহত বা সুগম করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।'

চতুর্থ সূত্র। 'শিল্প-প্রধান রাষ্ট্র, কৃষি-প্রধান রাষ্ট্রের চাইতে অনেক বেশি জনসংখ্যাকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।'

পঞ্চম সূত্র। 'আর্থ-ব্যবস্থায় বৈষয়িক স্বার্থ বাদ দিয়ে কোনো কিছুই ঘটে না।'

এইসব 'প্রাকৃতিক সূত্রে'র ওপরই হের ড্যুরিং তাঁর নব অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি তাঁর পদ্ধতির প্রতি অনুগতই রয়েছেন, দর্শন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই এই পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একেবারেই অসার একগুচ্ছ ও প্রায়শই অত্যন্ত স্থূলভাবে ব্যক্ত করা স্বতঃপ্রমাণিত বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে হাজির করা হয়েছে, যেগুলিকে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় নি, এগুলিই তাঁর মৌলিক নিয়ম, প্রাকৃতিক সূত্র। এইসব সূত্রের মর্মবস্তু বিকশিত করার অজুহাতে, আসলে যার কোনো মর্মবস্তু নেই, নানা বিষয়ের ওপর একঘেয়ে আর্থনীতিক বাক্যস্রোত বইয়ে দিয়েছেন ; উদ্ভাবন, শ্রম-বিভাগ, পরিবহণের উপকরণ, জনসংখ্যা, সুদ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নামে এই সূত্রগুলি প্রকাশ পেয়েছে ; এ এক প্রবল শব্দ-স্রোত যার নীরস একঘেয়েমিকে ভরিয়ে তোলা হয়েছে আপ্তবাক্যের বাগাড়ম্বরে এবং কোথাও কোথাও অবান্তর সূত্রায়ন কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের কূট প্রশ্ন তুলে চুলচেরা বিতর্ক পাকিয়ে তোলা হয়েছে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা জমির খাজনা, পুঁজির উপার্জন ও মজুরির প্রসঙ্গে গিয়ে পৌঁছাই, আর আমরা যেহেতু ইতিপূর্বে

শুধুমাত্র শেষোক্ত দুই ধরনের আত্মসাৎকরণের বিষয়টি আলোচনা করেছি, তাই উপসংহারে আমরা এখন খাজনা সংক্রান্ত হের ড্যুরিং-এর মতটি সংক্ষেপে বিচার করে দেখব।

এটা করতে গিয়ে আমরা, হের ড্যুরিং তাঁর পূর্বসূরী কেরীর রচনা থেকে যেসব বিষয় নেহাৎই নকল করেছেন, সেগুলি বিচার-বিবেচনা করব না; কেরীকে নিয়ে আমাদের মাথা-ঘামানোর প্রয়োজন নেই, জমির খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর মতামতের কেরী যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর যে মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে, তার বিরুদ্ধে রিকার্ডোকে সমর্থন করার তাগিদও আমাদের নেই। হের ড্যুরিং-ই আমাদের বিবেচনার বিষয়। তাঁর মতে খাজনা হচ্ছে:

'সেই আয় যা জমির মালিক ঠিক ঐভাবেই জমি থেকে উপার্জন করে?'

জমির খাজনার আর্থনীতিক ধারণাটিই হের ড্যুরিং এর ব্যাখ্যা করার কথা; অথচ এই ধারণাটিকে তিনি সোজাসুজি নিয়ে গিয়েছেন আইনের ক্ষেত্রে, তার ফলে আমাদের জ্ঞান যা ছিল, তাই রইল। সুতরাং এই গভীরতর ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতাকে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আর কিছু ব্যাখ্যা দিতে রাজি হতে হয়েছে। তিনি একজন প্রজার কাছে জমির ইজারা দানকে তুলনা করেছেন একজন উদ্যোগী মালিককে পুঁজি ঋণদানের সঙ্গে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এটা বুঝতে পেরেছেন যে অন্যান্য অনেক তুলনার মতো এই তুলনাতেও একটা গরমিল রয়ে গেল।

তিনি বলছেন, কেননা 'এই সাদৃশ্যকে যদি আরও প্রসারিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে খাজনা মিটিয়ে দেওয়ার পর প্রজার হাতে যে আয় অবশিষ্ট থাকে, সেটা উদ্যোগী মালিকের হাতে পড়ে-থাকা পুঁজির উপার্জনের উদ্বৃত্তর অনুরূপ হতেই হবে, যে মালিক সুদ মিটিয়ে দেবার পর এই পুঁজিকে লগ্নি করবে। কিন্তু প্রজার উপার্জনকে প্রধান আয় হিসাবে এবং খাজনাকে উদ্বৃত্ত হিসাবে সাধারণত গণ্য করা হয় না।...এই ধারণার পার্থক্যের প্রমাণ হচ্ছে জমির খাজনার তত্ত্বে ভূস্বামীর দ্বারা ভূমি-ব্যবস্থাপনার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হয় না এবং ইজারার ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ ও ভূস্বামী যেখানে নিজেই খাজনা সৃষ্টি করে—এই দুইয়ের পার্থক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। *সে যাই হোক, একটা অংশ যেন ভূসম্পত্তির ওপর* সুদ এবং আর একটি অংশ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত উপার্জন—জমির স্ব-ব্যবস্থাপনা

থেকে উৎপন্ন খাজনাকে এইরকম দুই অংশে বিভক্ত বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেউ বোধ করেন নি। ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত প্রজার নিজস্ব পুঁজি ছাড়া, সম্ভবত, তার নির্দিষ্ট উপার্জন এক ধরনের মজুরি হিসাবেই প্রধানত বিবেচিত হয়। অবশ্য এই বিষয়ে কোনো কিছু জোর দিয়ে বলা কঠিন। কারণ এইরকম সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্নটি কখনও উত্থাপিত হয় নি। বেশ বড়ো ধরনের খামারের কথা বিবেচনা করার সময় এটা সহজেই দেখা যায় যে বিশেষভাবে যা কৃষকের উপার্জন, সেটাকে মজুরি হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না। কারণ এইসব উপার্জন গ্রামীণ শ্রম-শক্তির সঙ্গে প্রচলিত বিরোধের ওপর ভিত্তি করেই সৃষ্ট, একমাত্র এই শ্রম-শক্তিকে শোষণ করেই এই ধরনের উপার্জন সম্ভব। এটা স্পষ্টতই খাজনার সেই অংশ, যা প্রজার হাতে থেকে যায় এবং মালিক নিজে পরিচালনা করে যা পেতে পারত, সেই পুরো খাজনা এইভাবে হ্রাস পায়।'

জমির খাজনার তত্ত্বটি সুনির্দিষ্টভাবেই ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির একটা অংশ এবং বিশেষ করে তাই-ই, কারণ একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই এমন এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যেখানে খাজনাকে মুনাফা ও সুদ থেকে যথার্থভাবেই আলাদা করা হয়েছিল। একটা সুপরিচিত ঘটনা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে বৃহৎ জমিদারি ও বৃহদায়তন কৃষিরই প্রাধান্য। এখানে জমিদাররা বৃহদায়তন, প্রায় ক্ষেত্রে খুবই বৃহদায়তন খামারকে প্রজাস্বত্বভোগী কৃষকদের ইজারা দিয়ে দেয়। যথেষ্ট পুঁজির অধিকারী এইসব কৃষক আমাদের দেশের কৃষকদের মতো নিজেরা চাষ করে না, পুরোপুরি পুঁজিবাদী মালিকদের মতো খেত-মজুর ও দিনমজুরদের নিয়োগ করে। সুতরাং এখানে আমরা বুর্জোয়া-সমাজের তিনটি শ্রেণীর বিশেষ ধরনের আয়ের পরিচয় পাই: জমিদার, যার আয় হচ্ছে জমির খাজনা, পুঁজিপতি, যার আয় হচ্ছে মুনাফা, আর শ্রমিক, যার আয় হচ্ছে মজুরি। হের ড্যুরিং-এর কাছে যা মনে হয়েছে, কোনো ইংরেজ অর্থনীতিবিদ সেইরকমভাবে কৃষকের আয়কে এক ধরনের মজুরি হিসাবে কখনও ধরে নেন নি; কৃষকের মুনাফা যে সুনিশ্চিতভাবে স্পষ্টতই ও বাস্তবিকপক্ষে পুঁজি থেকে মুনাফা, এটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা এই ধরনের অর্থনীতিবিদের কাছে কম অসুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল। কৃষকদের আয় আসলে কী, এই প্রশ্নটি কখনও সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপিত হয় নি—এটা বলা খুবই হাস্যকর। ইংল্যাণ্ডে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার

কখনও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় নি; বাস্তব ঘটনা থেকে এই প্রশ্ন ও উত্তর বহু দিন আগে থেকেই জানা ছিল। আর অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকে এইগুলি সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

হের ড্যুরিং যাকে স্ব-ব্যবস্থাপনা বলেছেন, কিংবা যেটা ভূস্বামীর পক্ষে গোমস্তাদের দ্বারা খামার পরিচালনা, জার্মানিতে যেটা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রচলিত, তাতে অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। ভূস্বামী যদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকেন, এবং তাঁর নিজের স্বার্থেই খামারটি যদি পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে খাজনা ছাড়াও পুঁজির মুনাফা তিনি আত্মসাৎ করেন, এটা একান্তই সহজবোধ্য এবং প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতি এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর হের ড্যুরিং যদি এইরকম দাবি করেন যে মালিকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত খাজনাকে (তাঁর এটাকে আয় বলা উচিত ছিল) দুইভাগে বিভক্ত বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও পর্যন্ত কেউ মনে করেন নি, তাহলে বলতে হয় এটা একেবারেই ঠিক নয়, এটা আর একবার তাঁর অজ্ঞতাই প্রমাণ করে।

যেমন তিনি বলছেন:

'শ্রম থেকে অর্জিত আয়কে মজুরি বলা হয়। যে ব্যক্তি মজুতের ব্যবস্থাপনা করে অথবা একে কাজে লাগায়, সেই মজুত থেকে অর্জিত আয়কে বলা হয় মুনাফা।...সম্পূর্ণভাবে জমি থেকে অর্জিত আয়কে খাজনা বলা হয় এবং এটা জমিদারের প্রাপ্য।...এই তিন ধরনের আয় যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রাপ্য হয় তখন এদের মধ্যে পার্থক্যটা ধরতে পারা সহজ। কিন্তু যখন সেগুলি একই ব্যক্তির কাছে চলে যায়, তখন সেগুলি নিয়ে মাঝে-মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে তো বটেই। যে ভদ্রলোক তাঁর নিজস্ব খামারের একটা অংশ নিজেই চাষ করেন, চাষের খরচ মেটাবার পর, জমিদারের খাজনা ও কৃষকের মুনাফা, উভয়ই তাঁর প্রাপ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অর্জনকে মুনাফা হিসাবে চিহ্নিত করতে চান আর এইভাবে, অন্তত সাধারণ কথাবার্তায়, খাজনাকে মুনাফার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আমাদের উত্তর আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আবাদী জমির মালিকদের বেশির ভাগের অবস্থাই এইরকম। এঁদের বেশির ভাগই নিজেদের মহালে চাষ করেন, আর সেই কারণে আবাদের খাজনার কথা আমরা বিশেষ শুনতে পাই না, প্রায় যেটা শোনা যায় তা হচ্ছে মুনাফার কথা।...যে বাগিচা-মালিক নিজের হাতে তাঁর বাগিচা চাষ করেন,

তাঁর মধ্যে জমিদার, কৃষক ও শ্রমিক—এই তিনটি ভিন্ন চরিত্রের সমাহার ঘটে। সুতরাং তাঁর উৎপন্ন দ্রব্য থেকে প্রথমটি অর্থাৎ জমিদারের খাজনা, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কৃষকের মুনাফা এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি তাঁর পাওয়া উচিত। অবশ্য তাঁর সমগ্র উপার্জনকে সাধারণভাবে তাঁর শ্রমের আয় হিসাবে গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে খাজনা ও মুনাফা দুটিকেই একাকার করে ফেলা হয় মজুরির সঙ্গে।'

এই অংশটি অ্যাডাম স্মিথের* প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে স্ব-ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একশো বছর আগেই অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা হের ড্যুরিং-এর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, সেটা নিছক তাঁর অজ্ঞানতাপ্রসূত। শেষ পর্যন্ত এক দুঃসাহসিক কৌশল খাটিয়ে তিনি এই উভয় সংকট থেকে রক্ষা পান:

'কৃষকের উপার্জন আসে 'গ্রামীণ শ্রম-শক্তি'র শোষণ থেকে আর সেই কারণে এটা স্পষ্টতই 'খাজনার একটা অংশ', যে-শোষণের ফলে 'পুরো খাজনা'টা ভূস্বামীর পকেটে যাওয়ার কথা, সেটা 'কমে যায়'।'

এর থেকে আমরা দুটো জিনিস জানতে পারি। প্রথমত, কৃষক ভূস্বামীর খাজনা 'কমিয়ে দেয়'; সুতরাং, এতদিন ধরে যে মনে করা হতো কৃষক ভূস্বামীকে খাজনা দেয়, হের ড্যুরিং-এর মতে তা ঠিক নয়, ভূস্বামীই কৃষককে খাজনা দেয়—নিশ্চয়ই এটা একেবারে 'মূল থেকে গজিয়ে ওঠা' দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয়ত, আমরা জানতে পারছি জমির খাজনা বলতে হের ড্যুরিং কী বোঝেন: গ্রামীণ শ্রমকে শোষণ করে কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত সমগ্র উদ্বৃত্ত উৎপাদনকেই তিনি জমির খাজনা' বলে মনে করেন। কিন্তু যেহেতু এযাবৎকালের সমস্ত অর্থনীতিতে, মুষ্টিমেয় স্থূল অর্থনীতিবিদদের গ্রন্থাদি ছাড়া, এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে জমির খাজনা এবং পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফায় বিভক্ত করা হয়েছে, তাই আমরা এটা বলতে বাধ্য যে খাজনা সম্বন্ধে হের ড্যুরিং এর মতামতও 'স্বীকৃত মতামত নয়'।

সুতরাং হের ড্যুরিং এর মতে জমির খাজনা ও পুঁজির উপার্জনের মধ্যে

* অ্যাডাম স্মিথ, অ্যান এনকোয়্যারি ইনটু দি নেচার অ্যাণ্ড কজেস অব দি ওয়েলথ অব নেশনস, খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৭৭৬, পৃ ৬৩-৬৫। সম্পাদক।

একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি পাওয়া যায় কৃষি থেকে আর দ্বিতীয়টি আসে শিল্প বা বাণিজ্য থেকে। এই ধরনের বিচার-বিবেচনাহীন ও বিভ্রান্তিকর মতামতে পৌঁছানো হের ড্যুরিং-এর পক্ষে অনিবার্য ছিল। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি হের ড্যুরিং শুরুই করেছেন এই 'প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারণা' নিয়ে যে মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতেই জমির ওপর আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। সুতরাং যখনই যে-কোনো ধরনের বশ্যতামূলক শ্রমের সাহায্যে জমির চাষ শুরু হয়, তখনই জমিদারের জন্য সৃষ্টি হলো উদ্বৃত্ত, আর এই উদ্বৃত্তটাই হচ্ছে খাজনা, ঠিক শিল্পে যেমন শ্রমিকের উপার্জনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপাদনই হচ্ছে পুঁজির মুনাফা।

'তাই এটা সুস্পষ্ট যে যে-কোনো ধরনের বশ্যতামূলক শ্রমের সাহায্যে যখন ও যেখানেই কৃষিকাজ করা হয়, সেখানেই ব্যাপক মাত্রায় জমির খাজনার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।'

খাজনাকে এইভাবে কৃষিজাত সমগ্র উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাবে উপস্থিত করে হের ড্যুরিং ইংরেজ কৃষকদের মুনাফা এবং ইংল্যাণ্ডের কৃষি-ব্যবস্থাভিত্তিক এবং ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে স্বীকৃত জমির খাজনা ও কৃষকের মুনাফায় ঐ উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, আর সেইজন্যে তাঁর অবস্থানটি হয়ে পড়েছে খাজনা সংক্রান্ত নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট ধারণার বিরোধী। হের ড্যুরিং কী করলেন? তিনি এমন একটা ভাব দেখালেন যে কৃষকের মুনাফা ও খাজনার উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদনের বিভাজন সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না আর সেই কারণে ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থ-নীতির সমগ্র খাজনা-তত্ত্বটিও তাঁর অজানা রয়েছে; তিনি আরও বললেন যে কৃষকের মুনাফা বলতে সত্যিসত্যিই কী বোঝায়—সেই প্রশ্নটি কখনও 'সুনির্দিষ্টভাবে' উত্থাপিত হয় নি, তাঁর আলোচ্য বিষয়টি ইতিপূর্বে কখনও অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু ছিল না। আর এই সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা ছাড়া কারও কিছু জানা নেই। তাই তিনি এই বিপজ্জনক ইংল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে অব্যাহতি পান—কোনো রকম তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই এখানে কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন জমির খাজনা এবং পুঁজির মুনাফার মধ্যে নির্মমভাবে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—এখান থেকে পালিয়ে তিনি আশ্রয় নেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমিতে, যেখানে প্রশীয় লাণ্ডরেখ্‌ট-এর প্রাধান্য, যেখানে স্ব ব্যবস্থাপনার পিতৃতান্ত্রিক রূপ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, যেখানে 'জমিদাররা

খাজনা বলতে তাদের নিজস্ব জমির আয়ই বোঝে' এবং যেখানে খাজনা সম্বন্ধে য়ুংকারদের মতামত বিজ্ঞানের শেষ কথা। সুতরাং হের ড্যুরিং এখানে খাজনা ও মুনাফা সম্বন্ধে তাঁর বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে এখনও টিকে থাকার আশা করতে পারেন, এমনকি তাঁর এই নবতম আবিষ্কারটির সমর্থকও পেয়ে যেতে পারেন: জমির খাজনা কৃষক জমিদারকে দেয় না, জমিদারই কৃষককে খাজনা দেয়।

দশ

'বিচারমূলক ইতিহাস' থেকে

পরিশেষে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিচারমূলক ইতিহাস'-এর (ক্রিটিক্যাল হিস্টরি অব পলিটিক্যাল ইকনমি) দিকে একবার নজর দেওয়া যাক ; এই 'উদ্যোগ' হের ড্যুরিং-এর ভাষায় 'একেবারে নজিরবিহীন'। সম্ভবত, অবশেষে আমরা সেই সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিচারের সন্ধান পাব, যার প্রতিশ্রুতি তিনি প্রায়ই দিয়ে থাকেন।

হের ড্যুরিং তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে খুবই সোচ্চার কণ্ঠে বলছেন যে

'অর্থনৈতিক বিজ্ঞান একটা বিরাট আধুনিক বিষয়' (পৃ ১২)।

বস্তুতপক্ষে, মার্কস 'ক্যাপিটালে' লিখেছেন : 'একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে ম্যানুফ্যাকচার-এর কালপর্বে' * এবং তিনি 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিচারমূলক আলোচনা'র** ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে 'ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির···সূচনা হয় ইংল্যাণ্ডে উইলিয়ম পেট্টি ও ফ্রান্সে বয়েসগাইলবের্ত-এর সময়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে প্রথমোক্ত দেশের রিকার্ডো ও দ্বিতীয়োক্ত দেশের সিসমণ্ডি র পর।'১০৭ হের ড্যুরিং-এর মতে ধ্রুপদী যুগ শেষ হওয়ার পর বুর্জোয়া বিজ্ঞানের হাতে যে শোচনীয় গর্ভপাত ঘটে, একমাত্র তখনই সূত্রপাত হয় উচ্চতর অর্থনীতির—এইটুকু ছাড়া তিনি পূর্ব-পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। অন্যদিকে, তাঁর ভূমিকার শেষে এই বিজয়দৃপ্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক :

'কিন্তু এই কর্মপ্রচেষ্টা যদি, বাহ্যভাবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তুর অধিকতর নতুন অংশের বিচারে, একেবারে নজিরবিহীন হয়ে থাকে, তাহলে

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৩৪৪। সম্পাদক।

** প্রগ্রেস পাবলিশার্স সংস্করণ, মস্কো, ১৯৭০, পৃ ৫২। সম্পাদক।

এর অভ্যন্তরীণ বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও তার সাধারণ দৃষ্টিকোণ, আরও বেশি করে বিশেষভাবে আমার।' (পৃ,৯)

বস্তুতপক্ষে, ভিতর ও বাইরের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর এই 'উদ্যোগ'টির (যন্ত্রশিল্প থেকে এই শব্দটি বাছাই করা মন্দ হয়নি) নাম দিতে পারতেন: অহং ও স্বয়ং।[১০৮] ইতিহাসে উদ্ভূত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন কালের আর্থব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই যে পটভূমিতে পণ্য-উৎপাদন, বাণিজ্য, অর্থ, সুদ সৃষ্টিকারী পুঁজি ইত্যাদি এর কতকগুলি ঘটনা পুঁজিবাদী সমাজ ও অতীতের সমাজ, উভয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বর্তমান, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন গ্রীক সমাজের লেখকদের রচনায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত নীতি ও তত্ত্বগুলির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীকরা এই ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যতটুকু পরিক্রমা করেছিলেন, তাতেই তাঁরা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তাঁদের নিজস্ব প্রতিভা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কারণেই তাঁদের চিন্তাধারা, ইতিহাসের বিচারে, আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগত উৎস-ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। এখন দেখা যাক বিশ্ব-ঐতিহাসিক হের ড্যুরিং কী বলেন।

'সঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানসম্মত আর্থনীতিক তত্ত্ব সম্পর্কে সত্যিসত্যিই(!) ইতিবাচক কিছুই আমাদের বলার নেই এবং একেবারে অবৈজ্ঞানিক মধ্যযুগের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে (কিছুই না বলার ব্যাপারে) বলার সুযোগ আরও কম। কিন্তু মেকি পাণ্ডিত্যের দম্ভ প্রদর্শনের ফ্যাশন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃত চরিত্রকে···যেভাবে বিকৃত করেছে, তাতে অন্ততপক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিতেই হয়।'

এরপর হের ড্যুরিং সমালোচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন, যেগুলি 'মেকি পাণ্ডিত্যে'র আভাস থেকে সত্যিসত্যিই মুক্ত।

অ্যারিস্টটলের বক্তব্যটি এইরকম:

'প্রতিটি বস্তুকে দুইভাবে ব্যবহার করা যায়।···এর একটি খোদ বস্তুটির বৈশিষ্ট্যসূচক, অপরটি তা নয়। যেমন, চটিজুতো পায়ে পরা যায়, আবার সেটা বিনিময়যোগ্যও বটে। দু'ভাবেই চটিজুতোকে ব্যবহার করা যায়, যার চটিজুতোর প্রয়োজন তার সঙ্গে যে অর্থ বা খাদ্যের জন্যে এটা বিনিময় করে, সেও চটিজুতোকে চটিজুতো হিসাবেই ব্যবহার করে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। কারণ বিনিময় করার জন্যে এটা তৈরি করা হয়নি।'[১০৯]

হের ড্যুরিং মনে করেন এই বক্তব্যটি 'শুধু মামুলিভাবে ও পণ্ডিতী কায়দাতেই' প্রকাশ করা হয়নি ; যাঁরা এর মধ্যে 'ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য' দেখতে পান, তাঁরা একটা 'হাস্যকর মানসিক গঠনে-র' অধিকারী এবং তাঁরা ভুলে যান যে 'সর্বাধুনিক কালে' ও 'সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতির কাঠামোতে'—যেটা অবশ্যই হের ড্যুরিং-এর নিজস্ব পদ্ধতি—ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

'রাষ্ট্র সম্পর্কে প্লেটোর রচনায় শ্রমের জাতীয়-আর্থনীতিক বিভাজনসংক্রান্ত আধুনিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়···বলে অনেকে দাবি করে থাকেন।'

স্পষ্টতই এখানে 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ৫ম অধ্যায়-এ (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৩৬৯) উল্লিখিত সেই অংশের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে বিপরীত দিক থেকে এটাই দেখানো হয়েছে যে শ্রম-বিভাগ সম্পর্কে ধ্রুপদী প্রাচীন জগতের মতামত ছিল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির 'একেবারে বিপরীত।'*

শহরগুলির (গ্রীকরা যেগুলিকে রাষ্ট্র বলে মনে করত) স্বাভাবিক ভিত্তি হিসাবে শ্রম-বিভাগকে[১১০] উপস্থাপনের জন্যে হের ড্যুরিং প্লেটোকে শুধু অবজ্ঞাই করেছেন, অথচ সেই যুগের পটভূমিতে এই উপস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। আর এই অবজ্ঞার কারণ হচ্ছে প্লেটো হের ড্যুরিং-এর জন্যে এটা উল্লেখ করে যান নি যে (যদিও গ্রীক দার্শনিক জেনোফোন[১১১] এটা করেছিলেন) :

'পেশাগুলির আরও শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ ধরনের কাজের করণ-কৌশলগত ভাগাভাগির ওপর বাজারের নির্দিষ্ট পরিধি একটা 'সীমা' আরোপ করে···শুধু এই সীমার ধারণাই এমন একটা জ্ঞান, যার সাহায্যে এই ধারণাটি একটা বড় রকমের আর্থনীতিক সত্য হয়ে ওঠে, নচেৎ একে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিহিত করা যায় না।'

আসলে 'অধ্যাপক' রশ্চার, যাঁর প্রতি হের ড্যুরিং-এর এত অবজ্ঞা, এই 'সীমা' খাড়া করেছিলেন, যেখানে শ্রম-বিভাজনের ধারণাটি নাকি প্রথম বিজ্ঞানসম্মত রূপ পেয়েছে এবং তাই তিনিই প্রথম অ্যাডাম স্মিথকে শ্রম-বিভাগের সূত্রের আবিষ্কর্তা বলে উল্লেখ করেন।[১১২] যে সমাজে উৎপাদনের প্রধান রূপ হচ্ছে পণ্যোৎপাদন, সেখানে 'বাজার'—হের ড্যুরিং-এর কায়দায়

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৩৪৫-৪৭। সম্পাদক।

বলতে গেলে—যে সব সময়েই 'সীমাবদ্ধ'—'ব্যবসায়ী মহল' তা ভালোভাবেই জানে। কিন্তু বাজার পুঁজিবাদী শ্রম বিভাগ সৃষ্টি করেনি, বরঞ্চ আগেকার সামাজিক সম্পর্কের বিলুপ্তি এবং এর থেকে উদ্ভূত শ্রম বিভাগই বাজারের সৃষ্টি করেছে—এটা বোঝার জন্যে 'জ্ঞান ও দৈনন্দিন সহজাত বোধে'র চাইতে অতিরিক্ত কিছু দরকার। (ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ২৪, ৫; 'শিল্প-পুঁজির জন্যে দেশীয় বাজারের সৃষ্টি') *

'আর্থনীতিক (!) ভাবধারার ক্ষেত্রে অর্থের ভূমিকা সব সময়েই প্রথম ও প্রধান প্রেরণা হিসাবে কাজ করে এসেছে। একজন অ্যারিস্টটল এই ভূমিকার কথা কতটুকু জানতেন? আদিমকালের সরাসরি পণ্য-বিনিময় প্রথার পর অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ধারণার চাইতে নিশ্চয়ই বেশি কিছু নয়।'

কিন্তু যখন 'একজন' অ্যারিস্টটল মনে করেন তিনি অর্থ সঞ্চালনের দুটি পৃথক রূপ আবিষ্কার করেছেন, যেখানে এর একটা নিছক সঞ্চালনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং অপরটি কাজ করে অর্থ-পুঁজি হিসাবে,[১১৩] তখন তিনি, হের ড্যুরিং-এর ভাষায়—

'শুধুমাত্র একটা নৈতিক বিদ্বেষপরায়ণতার প্রকাশ ঘটান।'

আর যখন 'একজন' অ্যারিস্টটল মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে অর্থের 'ভূমিকা' বিশ্লেষণের চেষ্টা করার মতো ঔদ্ধত্য দেখান এবং সমস্যাটিকে সত্যিসত্যিই বিবৃত করেন, অর্থ-তত্ত্বকে সঠিকভাবে[১১৪] উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ, তখন 'একজন' ড্যুরিং এই রকম অননুমোদনীয় হঠকারিতা সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন (অবশ্য যথেষ্ট ব্যক্তিগত কারণেই)।

শেষ পরিণতি: প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, হের ড্যুরিং-এর 'দৃষ্টিতে' প্রতিবিম্বিত, বস্তুতপক্ষে 'কতকগুলি মামুলি ধারণা'র (পৃ ২৫) অধিকারী ছিল মাত্র, অবশ্য যদি এই ধরনের 'মামুলি' (পৃ ২৯) ধারণার সঙ্গে সাধারণ কিংবা অসাধারণ, কোনো ধরনের ধারণার মিল থেকে থাকে।

বাণিজ্যতন্ত্র সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর লেখা পরিচ্ছেদটি 'মূল' রচনা থেকে, অর্থাৎ এফ. লিস্ট এর লেখা জাতীয় ব্যবস্থা, পরিচ্ছেদ ২৯: 'শিল্প ব্যবস্থা, মত-সম্প্রদায়ের দ্বারা ভ্রান্তভাবে আখ্যাত বাণিজ্যতন্ত্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি থেকেই পড়ে নেওয়া ভালো। এখানেও হের ড্যুরিং কীরকম সতর্কভাবে

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ৬৯৭-৭১২। সম্পাদক।

'পাণ্ডিত্যের দম্ভ প্রদর্শন' এড়িয়ে গিয়েছেন, তা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে দেখতে পাওয়া যাবে :

পরিচ্ছেদ ২৮ : 'ইতালীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদদের' সম্পর্কে লিস্ট বলেছেন :

'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ও তত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রেই ইতালি সমস্ত আধুনিক জাতির চাইতে এগিয়ে ছিল',

এবং তারপর তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছেন,

'নেপলস এর আন্তনিও সেরার (১৬১৩) বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্পর্কে লেখা বইটিই এই সংক্রান্ত প্রথম রচনা—রাজ্যগুলির স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাচুর্য অর্জন এর আলোচ্য বিষয়।'[১১৫]

হের ড্যুরিং বেশ জোরের সঙ্গেই এটা মেনে নিয়েছেন এবং তার ফলে সেরা-র ব্রেভে ত্রাত্তাতো[১১৬] গ্রন্থটিকে তাঁর মনে হয়েছে :

'অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রাক্‌ই-তিহাসের প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ এক ধরনের অনুশাসন।'

'ব্রেভে ত্রাত্তাতো' সম্পর্কে তাঁর আলোচনা বস্তুতপক্ষে 'সাহিত্যের এইরকম ভাঁড়ামি'তে পর্যবসিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আসল ব্যাপারটা অন্যরকম : 'ব্রেভে ত্রাত্তাতো' বার হবার চার বছর আগে, ১৬০৯ সালে টমাস মুন-এর 'বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একটি আলোচনা'[১১৭] প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল এটাই যে, এমনকি তার প্রথম সংস্করণেই, এটা আদি মুদ্রা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল, যে মুদ্রা-ব্যবস্থা তখনও রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ইংল্যাণ্ডে সমর্থিত হচ্ছিল; সুতরাং এটা ছিল বাণিজ্য-তন্ত্র ও তার সৃষ্টিকারী ব্যবস্থার মধ্যে একটা সচেতন আত্ম-বিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন। এমনকি বইটি প্রথমে যেভাবে প্রকাশিত হয়, তারও কয়েকটি সংস্করণ বাজারে বেরোয় এবং আইন প্রণয়নকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ১৬৬৪ সালের সংস্করণটিকে ('ইংল্যাণ্ডের ধনসম্পদ ইত্যাদি') লেখক একেবারে নতুনভাবে রচনা করেন এবং এটা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, পরবর্তী একশো বছর ধরে এটা বাণিজ্যতন্ত্রের অনুশাসন হিসাবে প্রচলিত থাকে। সুতরাং 'প্রবেশ-পথে উৎকীর্ণ অনুশাসন হিসাবে' এই বইটিই বাণিজ্যতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে, আর বিশেষ করে এই কারণেই হের

রূপ নিচ্ছে এমন সব অগোছালো ভাবনাচিন্তার সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু যে লেখক দেড়শ বছরেরও বেশি কাল পরে ঐসব ভাবনাচিন্তার, যার ফলাফল ইতিপূর্বেই বইয়ের জগৎ থেকে সাধারণ চেতনার জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, বিচার বিশ্লেষণ করছেন এবং রচনা করছেন সংক্ষিপ্তসার, তাঁর পক্ষে এটা বিস্ময়কর আচরণ। আর আমরা এর আগেই দেখেছি বড় ব্যাপার থেকে ছোট ব্যাপারে নেমে এসেছেন হের ড্যুরিং ; তিনি আমাদের সামনে ইচ্ছা মতো বেছে নেবার জন্যে পাঁচটি বিভিন্ন রকম মূল্য ও সেগুলির সঙ্গে সম-সংখ্যক বিপরীত মতামত হাজির করেছেন। অবশ্য 'তাঁর নিজস্ব চিন্তা যদি আরও তীক্ষ্ণ হতো' তাহলে পেট্টির সম্পূর্ণ স্বচ্ছ মূল্য-সংক্রান্ত ধারণা থেকে তাঁর পাঠকদের পরিপূর্ণ বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলার জন্যে তাঁকে এতটা মেহনত করতে হতো না।

পেট্টির 'কোয়ানটালামকানকিউ কনসার্নিং মানি' ('অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি কথা') গ্রন্থটি একটা নিটোল কাজ, একটা অখণ্ড সৃষ্টি। এটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৮২ সালে, তাঁর 'অ্যানাটমি অব আয়ারল্যাণ্ড' বার হবার দশ বছর পর (এই 'প্রথম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৬৭২ সালে, হের ড্যুরিং-এর উল্লিখিত ১৬৯১ সালে নয় ; তিনি 'সাম্প্রতিকতম পাঠ্যপুস্তক সিরিজ' থেকে এটা গ্রহণ করেছেন)।[১১৯] এই বইটিতে বাণিজ্যতন্ত্রবাদী মতামতের, যা তাঁর অন্যান্য রচনায় রয়েছে, শেষ চিহ্ন একেবারেই মিলিয়ে গেছে। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর দিক থেকে এটা তাঁর সেরা সৃষ্টি আর ঠিক সেই কারণেই হের ড্যুরিং বইটির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও মৌলিক অর্থনীতি-গবেষকদের সম্পর্কে, আমাদের দাম্ভিক ও পণ্ডিতাভিমানী সাধারণ ব্যক্তিটি উদ্ধতভাবে শুধু তাঁর ক্ষোভই প্রকাশ করতে পারেন এবং তাত্ত্বিক চিন্তার ঝলকানিতে প্রকাশমান তাৎক্ষণিক 'স্বতঃসিদ্ধগুলি' যে সাধারণ সৈন্যবাহিনীর মতো গর্বিতভাবে কুচকাওয়াজ না করে ট্যাক্স বা করের মতো 'স্থূল' ব্যবহারিক বিষয়ের ভিতর থেকে সময় সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

'রাজনৈতিক গণিত', সাধারণ রাশিবিদ্যা সংক্রান্ত পেট্টির তাত্ত্বিক বনিয়াদকে হের ড্যুরিং ঐ লেখকের আর্থনীতিক রচনাবলীর সঙ্গে সমপর্যায়ে ফেলেই বিচার করেছেন। পেট্টির ব্যবহৃত অস্বাভাবিক পদ্ধতিগুলির প্রতি

তাঁর অপছন্দ পরশ্রীকাতরতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে : এক শতাব্দী পরে, এমনকি লেভয়েসিয়রও[১২০] এই ক্ষেত্রে যে ধরনের অদ্ভুত পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, এবং পেট্টি একটা বিস্তৃত রূপরেখায় রাশিবিজ্ঞানের সামনে যে-লক্ষ্য উপস্থিত করেছিলেন, তার থেকে সমকালীন রাশিবিজ্ঞানের মধ্যে যে বিপুল দূরত্ব বর্তমান, সেই সবকিছুর বিচারে প্রবহমান ঘটনাবলীর দুই শতাব্দী পরে এই রকম আত্মসন্তুষ্টির অহংকার নির্লজ্জ মূঢ়তারই পরিচায়ক।

পেট্টির সবচেয়ে মূল্যবান ধারণাগুলি, হের ড্যুরিং-এর 'উদ্যোগে' যার প্রতি যৎসামান্য নজর দেওয়া হয়েছে, হের ড্যুরিং-এর মতে যোগসূত্রহীন উদ্ভট ধারণা, আকস্মিক চিন্তা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়, একমাত্র আমাদের সময়েই প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে সেগুলিকে উদ্ধৃত করে ঐগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যদিও আসলে এগুলির গুরুত্ব নেই ; সুতরাং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সত্যিকারের ইতিহাসে এইগুলির কোনো স্থান থাকতে পারে না, হের ড্যুরিং-এর গভীরগামী বিচার এবং 'অপূর্ব শৈলীতে রচিত ঐতিহাসিক বিবরণে'র চাইতে নিম্নমানের আধুনিক বইপত্রেই এগুলির যা-কিছু মূল্য। সম্ভবত তাঁর 'উদ্যোগ'-এর মধ্যে, তিনি এমন এক ধরনের পাঠকগোষ্ঠীর কথা ভেবেছিলেন, যারা তাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল এবং তাঁর মতামতের পক্ষে প্রমাণ চাইবার সাহস যাদের নেই। আমরা শীঘ্রই এই বিষয়ে আবার ফিরে আসব (লক ও নর্থ সম্বন্ধে আলোচনার সময়) কিন্তু এখন বয়েসগাইলবার্ত ও ল-এর দিকে একনজর তাকানো যাক।

প্রথম ব্যক্তিটির সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর এই একমাত্র আবিষ্কারের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : বয়েসগাইলবার্ত ও ল এর মধ্যেকার এযাবৎকালের উপেক্ষিত সম্পর্কটিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। বয়েস-গ্যুইলবার্ত প্রতিপন্ন করেছেন যে মূল্যবান ধাতুগুলি পণ্য-সঞ্চালনে যে স্বাভাবিক মুদ্রার ভূমিকা নেয়, ঋণ মুদ্রার (un morceau de papier)* দ্বারাও সেই ভূমিকা পালন করানো যেতে পারে।[১২১] অন্যদিকে, ল-এর মতে এইসব 'কাগজের টুকরোগুলি'র সংখ্যা'বৃদ্ধি' জাতির সম্পদ বাড়িয়ে তোলে। এর থেকে হের ড্যুরিং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বয়েসগাইলবার্ত-এর

'চিন্তাধারা ইতিমধ্যেই বাণিজ্যতন্ত্র সম্পর্কে একটা নতুন ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছে'।

---

* এক টুকরো কাগজ। সম্পাদক।

ভাষান্তরে বলা যায়, এর মধ্যে ল-এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।' নিম্নোক্ত বক্তব্যে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার :

'একমাত্র যেটা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে 'সাধারণ কাগজের টুকরোগুলি'কে সেই ভূমিকা অর্পণ করা, যা মূল্যবান ধাতুর পালন করার কথা এবং এই-ভাবে তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যতন্ত্রের রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল।'

ঠিক একইভাবে কাকার কাকিমাতে রূপান্তর ঘটা সম্ভব। অবশ্য হের ড্যুরিং এর পরে একটু নরম হয়ে বলছেন :

'বয়েসগাইলবার্ত-এর মনে অবশ্য এইরকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'

কিন্তু কাগজী মুদ্রার সাহায্যে মূল্যবান ধাতুকে অপসারিত করা যায়—এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি কিভাবে মূল্যবান ধাতুর দ্বারা অর্থের ভূমিকা পালন সংক্রান্ত তাঁর যুক্তিবাদী ধারণার বদলে বাণিজ্যতন্ত্রীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন, ত একমাত্র শয়তানই জানে।

এসব সত্ত্বেও একটা কপট গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে হের ড্যুরিং বলছেন :

'তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে আমাদের লেখকটি কোথাও কোথাও সত্যিকারের যথার্থ মন্তব্য করতে পেরেছেন।' (পৃ ৮৩)

ল-এর প্রসঙ্গে হের ড্যুরিং একমাত্র এই ধরনের একটা 'যথার্থ জুতসই মন্তব্য' করতে পেরেছেন :

'ল-ও স্বভাবতই উল্লিখিত ভিত্তিটিকে (অর্থাৎ 'মূল্যবান ধাতুর ভিত্তি') একেবারে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হন নি, কাগজী মুদ্রার বিষয়টাকে তিনি শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, বলতে গেলে, টেনে নিয়ে গেছেন পদ্ধতিটির বিলুপ্তি পর্যন্ত' (পৃ ৯৪)।

অবশ্য বাস্তবে এই কাগজের প্রজাপতিগুলি ছিল নেহাতই অর্থের প্রতীক, জনসাধারণের মধ্যে এদের উড়তে দেওয়া হয়েছিল মূল্যবান ধাতুগুলির ভিত্তি 'নষ্ট' করার জন্যে নয়, নিঃশেষিতপ্রায় রাষ্ট্রের অর্থ-ভাণ্ডারে এদের প্রলুব্ধ করে টেনে আনাই ছিল এর উদ্দেশ্য।[১২২]

পেটি এবং অর্থনীতির ইতিহাসে হের ড্যুরিং-আরোপিত তাঁর গুরুত্বহীন ভূমিকার প্রসঙ্গে এবার প্রত্যাবর্তন করা যাক। পেটির ঠিক পরবর্তী উত্তরসূরী লক ও নর্থ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সেটাই এবার শোনা যাবে ;

লক-এর 'সুদের হ্রাস ও মুদ্রার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা'* এবং নর্থ এর 'বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা'—দুটি গ্রন্থই ১৬৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

'প্রচলিত সুদ ও মুদ্রা সম্পর্কে তিনি (লক) যা লিখেছিলেন সেগুলি রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যতন্ত্রের প্রাধান্যের যুগে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলির পরিধি অতিক্রম করে যেতে পারেনি।' (পৃ ৬৪)

অষ্টাদশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছরে ফ্রান্স ও ইতালির রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে, লক-এর 'সুদের হ্রাস' গ্রন্থটি কেন বহুমুখী ধারায় এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল, সেটা এখন এই 'বিবরণে'র পাঠকের কাছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাওয়া উচিত।

'সুদের হারের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি সম্পর্কে বহু ব্যবসায়ীর চিন্তাটি ছিল একই রকম (লক-এর মতো) এবং বিকাশমান পরিস্থিতিও সুদের ওপর বিধিনিষেধ চাপাবার কাজকে অকার্যকর বলে গণ্য করার প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল। যে সময়ে অবাধ বাণিজ্যের লক্ষ্য নিয়ে জনৈক ডাডলি নর্থ তাঁর 'বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা' গ্রন্থটি লিখতে পেরেছিলেন, তখন এমন সব ধ্যানধারণার প্রাধান্য ছিল, যার প্রভাবে সুদের হারের ওপর বিধিনিষেধ চাপাবার বিরুদ্ধে তত্ত্বগত বিরোধিতা আদৌ সেরকম অসাধারণ বলে মনে হয় নি।'(পৃ ৬৪)

সুতরাং সুদের হারের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিকে তাত্ত্বিক রূপ দেবার জন্যে লককে কোনো-না-কোনো সমসাময়িক 'ব্যবসায়ী'র ধ্যানধারণা আয়ত্ত করতে হয়েছিল অথবা 'চালু ধ্যানধারণাগুলি'র আবহাওয়ায় তাঁকে নিশ্বাস নিতে হয়েছিল, তাই 'অসাধারণ' কিছুই তিনি বলতে পারেন নি। বস্তুতপক্ষে, সেই ১৬৬২ সালেই তাঁর 'কর ও বিভিন্ন প্রদেয় সম্পর্কে আলোচনা'য় পেটি 'অর্থ-রূপ খাজনা, যাকে আমরা মহাজনী বলে থাকি', হিসাবে সুদকে 'জমি ও বাড়ির খাজনা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং উৎসাহী জমিদারদের সামনে 'প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দেওয়ানি আইন প্রণয়নের দম্ভ ও অকার্যকরতা' সম্পর্কে বক্তৃতা ঝেড়েছিলেন;[১২৩] এই জমিদাররা নিশ্চিতভাবেই জমির খাজনাকে নয়, অর্থ-রূপ খাজনাকে আইনের মাধ্যমে হ্রাস করতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর 'কোয়ানটালামকানকিউ' (১৮৬২) গ্রন্থে লিখেছিলেন যে মূল্যবান ধাতুর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অথবা বিনিময়-

---

* 'Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Intarest and Raising the Value of Money'. সম্পাদক।

হারের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা, আইন করে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টার মতোই মূর্খতার পরিচায়ক। ঐ একই গ্রন্থে তিনি 'মুদ্রাবৃদ্ধি' সম্পর্কে (যেমন, এক আউন্স রূপো থেকে শিলিং-এর সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ছয় পেনিকে এক শিলিং আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা) তর্কাতীত প্রামাণ্য বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে লক ও নর্থ তাঁকে নকল করেছিলেন মাত্র। অবশ্য সুদ সম্পর্কে লক অনুসরণ করেছিলেন অর্থরূপ খাজনা ও জমির খাজনার মধ্যে পেট্টির তুলনাকে এবং নর্থ আরও এগিয়ে গিয়ে 'মজুত মালের খাজনা' হিসাবে সুদকে জমির খাজনার বিরুদ্ধে ও জমিদারদের মজুত-দারদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন।[১২৪] আর লক যেখানে পেট্টির দাবি অনুসারে সুদের হারের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিকে দ্বিধান্বিতভাবেই মেনে নিয়েছেন, সেখানে নর্থ এটাকে গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়।

হের ড্যুরিং 'সূক্ষ্মতর' অর্থে নিজেই একজন অসন্তুষ্ট বাণিজ্যতন্ত্রী। 'অবাধ বাণিজ্যের লক্ষ্য নিয়ে' ডাডলি নর্থ-এর 'বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা' গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল—এই মন্তব্য করে যখন তিনি ঐ গ্রন্থটিকে খারিজ করে দেন, তখন সেটা তাঁর পক্ষেও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এটা যেন এই রকম উক্তির সামিল যে হার্ভে লিখেছিলেন রক্ত সংবহনের 'লক্ষ্য নিয়ে'। নর্থ-এর গ্রন্থ, অন্যান্য গুণ ছাড়াও, একটা চমৎকার কাজ। তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের সাহায্যে বৈদেশিক ও দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের মতবাদকে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছিলেন, যা ১৬৯১ সালের পক্ষে নিশ্চয়ই 'অনন্যসাধারণ'!

হের ড্যুরিং প্রসঙ্গত আমাদের জানিয়েছেন যে:

'নর্থ ছিলেন একজন 'বণিক', তাও আবার আনাড়ি জাতের এবং তাঁর রচনাও 'কোনো স্বীকৃতি পায় নি।'

তাই নাকি! ইংল্যাণ্ডে সংরক্ষণবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের কালে উন্মত্ত গণ-মেজাজের আবহাওয়ায় এই ধরনের রচনা 'স্বীকৃতি' পাওয়ার আশা কিভাবে করা যেতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর তাৎক্ষণিক প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় নি। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরেই, এমনকি সপ্তদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই এমন অনেক আর্থনীতিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে এই প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পেট্টি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম যে সাহসী পদক্ষেপ

করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী একের পর এক ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এই পথেই এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এরও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন—লক ও নর্থ আমাদের কাছে তার প্রমাণ দাখিল করে গিয়েছেন। ১৬৯১ থেকে ১৭৫২ সালের মধ্যে এই ধারার পদচিহ্ন একান্ত অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছেও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, এই সময়ের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক লেখাপত্র ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচকই হোক, হয়েছিল পেটি থেকেই। সুতরাং মৌলিক চিন্তানায়কে পরিপূর্ণ এই কালপর্বটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্রমিক উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। পেটি ও ঐ সময়ের লেখকদের নিয়ে 'ক্যাপিটাল'-এ অতিরিক্ত হৈ চৈ করে মার্কস ক্ষমাহীন অপরাধ করেছেন বলে 'অপূর্ব শৈলীর ইতিহাস-চিত্রণে' অভিযোগ করা হয়েছে এবং এই 'ইতিহাস-চিত্রণ' এইসব লেখককে ইতিহাস থেকে সরাসরি বাতিল করে দিয়েছে। লক, নর্থ, বয়েসগাইলবার্ত ও ল থেকে এই 'ইতিহাস চিত্রণ' একলাফে সোজাসুজি ফিজিওক্র্যাটদের* কাছে চলে এসেছে এবং তারপর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রকৃত মন্দিরের প্রবেশ পথের সন্ধান মিলেছে ডেভিড হিউমে। এবার হের ড্যুরিং-এর অনুমতি নিয়ে ফিজিওক্র্যাটদের আগে হিউমকে কালানুক্রমিকভাবে হাজির করা যাক।

১৭৫২ সালে হিউমের আর্থনীতিক 'প্রবন্ধাবলী' প্রকাশিত হয়।[১২৫] 'অর্থ প্রসঙ্গে', 'বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রসঙ্গে', 'ব্যবসা বাণিজ্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধগুলিতে হিউম ১৭৩৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত জ্যাকব ভ্যাণ্ডারলিন্ট এর 'অর্থই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর' গ্রন্থটিকে, লেখকের খামখেয়ালি মনোভাব সমেত, প্রতিপদে অনুসরণ করেছেন। হের ড্যুরিং-এর কাছে ভ্যাণ্ডারলিন্ট যতই অপরিচিত হোন না কেন, অষ্টাদশ শতকের শেষে, অর্থাৎ অ্যাডাম স্মিথের পরবর্তী সময়ে, ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখাপত্রে তাঁর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ভ্যাণ্ডারলিন্ট-এর মতো হিউমও অর্থকে মূল্যের নিছক প্রতীক হিসাবে গণ্য করেছেন। একটা দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য কেন স্থায়ীভাবে অনুকূল

* ভূ সম্পত্তিবাদী—এঁদের মতে জমি ও তার ফসলই হচ্ছে প্রকৃত সম্পদের একমাত্র উৎস আর সেই কারণে রাজস্ব সংগ্রহের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উৎসও বটে। অনুবাদক।

বা প্রতিকূল থাকে না, এটা বিচার করতে গিয়ে তিনি ভ্যাণ্ডারলিন্ট-এর যুক্তিকে প্রায় হুবহু আক্ষরিকভাবে নকল করেছেন (আর এটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মূল্যের প্রতীক হিসাবে অর্থের তত্ত্বটিকে অন্যান্য সূত্র থেকেও নিতে পারতেন)। ভ্যাণ্ডারলিন্ট-এর মতো তিনিও বলছেন যে ভারসাম্যগুলিতে বিভিন্ন আর্থনীতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই সমতা আসে। ভ্যাণ্ডারলিন্টের মতো তিনিও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি অতটা সাহসী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নন। তুলনামূলকভাবে অগভীর হলেও, তিনিও ভ্যাণ্ডারলিন্ট এর মতোই উৎপাদনের প্রেরণা শক্তি হিসাবে চাহিদার ওপর জোর দিয়েছেন। পণ্যসামগ্রীর দামের ওপর প্রভাবের ব্যাপারে তাঁর মতামতও ভ্যাণ্ডারলিন্টের অনুসারী, এটাকে তিনি ভ্রান্তভাবে সাধারণ ব্যাংকমুদ্রা ও সরকারি জামানতের ওপর আরোপ করেছেন। ভ্যাণ্ডারলিন্টের মতো তিনিও ঋণ-মুদ্রাকে বাতিল করেছেন। ভ্যাণ্ডারলিন্টের মতো তিনিও পণ্যের দামকে, শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরি-নির্ভর হিসাবে গণ্য করেছেন। এমনকি তিনি ভ্যাণ্ডারলিন্টের এই উদ্ভট ধারণাটিকেও হুবহু নকল করেছেন যে পুঞ্জীভূত সম্পদ পণ্যের দামকে কমিয়ে রাখে ইত্যাদি।

হিউমের মুদ্রা-তত্ত্বকে অন্যেরা কিরকম ভুল বুঝেছে, সেই সম্পর্কে হের ড্যুরিং তাঁর গোড়ার দিকের আলোচনায় একটা রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন; বিশেষ করে 'ক্যাপিটাল'-এ ভ্যাণ্ডারলিন্ট ও জে. ম্যাসির[১২৬] সঙ্গে হিউমের গোপন যোগাযোগকে মার্কস যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, সেই সম্পর্কে হের ড্যুরিং হুমকি দেওয়ার ভাষায় কথা বলেছেন। ম্যাসির ব্যাপারে পরে আলোচনা করা যাবে।

এই ভুল বোঝা সম্পর্কে ঘটনাবলী নিম্নরূপ: হিউমের প্রকৃত মুদ্রা-তত্ত্ব (অর্থাৎ মুদ্রা মূল্যের নিছক একটা প্রতীক আর তাই অন্যান্য অবস্থা একই রকম হলে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির অনুপাতে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং এর হ্রাসের অনুপাতে ঐ দাম পড়ে যায়) সম্পর্কে যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার মাধ্যমেই, হের ড্যুরিং-এর পক্ষে তাঁর পূর্বসূরীদের ভুল-ভ্রান্তিগুলি পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয়। অবশ্য হিউম তাঁর উপরোক্ত তত্ত্বটি সূত্রায়িত করার পর নিজেই এই আপত্তি তুলেছেন যে (একই সূত্র থেকে আরম্ভ করে মন্তেস্কু[১২৭] আগে যা করেছিলেন):

তা সত্ত্বেও 'এটা সুনিশ্চিত' যে আমেরিকাতে খনিগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার

পর 'ঐসব খনির মালিকরা ছাড়া ইউরোপের সমস্ত দেশেই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে' এবং 'অন্যান্য কারণের মধ্যে এইজন্যে সোনা ও রূপোর যোগান বৃদ্ধিকে দায়ী করা যেতে পারে।'

এই ব্যাপারটিকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

'যদিও পণ্যসমূহের চড়া দরের অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে সোনা ও রূপার বৃদ্ধি, তবে এই বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে ঘটে না ; সমগ্র রাষ্ট্রে মুদ্রার প্রচলনের আগে এবং সমস্ত স্তরের মধ্যে এর ফলাফল অনুভূত হওয়ার জন্যে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়।' এই অন্তবর্তী সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর এর সুফল পড়ে।

এটা কেন এইরকম হয়, এই বিশ্লেষণের শেষে হিউম সেটা আমাদের জ্ঞাত করেছেন, যদিও সেটা তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীন লেখকদের চাইতে অনেকটা অসম্পূর্ণভাবে :

'রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে মুদ্রার অগ্রগতির সন্ধান করা সহজ ; এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে এটা প্রতিটি ব্যক্তির শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির পরেই শ্রমের দাম বৃদ্ধি করতে পারে।'[১২৮]

ভাষান্তরে বলা যায়, হিউম এখানে মূল্যবান ধাতুর মূল্যের ওপর একটা বিপ্লবের অর্থাৎ মূল্যহ্রাসজনিত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন, যার অর্থ মূল্যবান ধাতুগুলির মূল্য-পরিমাপের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব। তিনি সঠিক-ভাবেই বলছেন যে পণ্য-মূল্য ধীরে ধীরে পুনর্বিন্যাস করার প্রক্রিয়ায়, এই মূল্য-হ্রাস 'শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করে', অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি করে, তাও একেবারে শেষ পর্যায়ে ; বলতে গেলে, শ্রমিক-স্বার্থের বিনিময়ে এটা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির মুনাফা বাড়িয়ে তোলে (শ্রমিক অবশ্য এটাকে ন্যায্য বলেই মেনে নেয়) এবং এইভাবে 'বৃদ্ধি করে শ্রমের তীব্রতা'। কিন্তু তিনি আসল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন না, অর্থাৎ মূল্য একই থাকলে, মূল্যবান ধাতুগুলির যোগান বৃদ্ধি কি পণ্যমূল্যকে প্রভাবিত করে, আর করলে সেটা কিভাবে ; আর তিনি প্রতিটি 'মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি'কে তার মূল্য-হ্রাসের সঙ্গে একাকার করে ফেলেন। সুতরাং মার্কস যা বলেছেন ('রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিচারমূলক আলোচনা', পৃ ১৪১)[১২৯] হিউম করেছেন ঠিক তাই-ই। আমরা আবার এই বিষয়ে ফিরে আসব। কিন্তু এখন 'সুদ' সম্বন্ধে হিউমের প্রবন্ধটির দিকে আমাদের নজর দিতেই হচ্ছে।

হিউমের এই যুক্তিটি স্পষ্টতই লকের বিরুদ্ধে: সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফার হারের দ্বারা, প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণের দ্বারা নয় এবং সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির নির্ধারক কারণগুলি সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় 'সুদের স্বাভাবিক হারের নির্ধারক কারণগুলি সংক্রান্ত প্রবন্ধ, যেখানে ঐ প্রসঙ্গে স্যার ডাবলিউ. পেট্টি ও মিঃ লকের মনোভাব বিচার করা হয়েছে' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে হিউমের ব্যাখ্যা আরও যথাযথভাবে ও অপেক্ষাকৃত কম চতুরতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এটা প্রকাশিত হয় ১৭৫০ সালে, হিউমের প্রবন্ধ বের হওয়ার দু'বছর আগে। এর লেখক হচ্ছেন বহু ক্ষেত্রে সক্রিয় জে. ম্যাসি; তৎকালীন ইংরেজি বইপত্র থেকে দেখা যায় তাঁর একটা বড় পাঠকগোষ্ঠীও ছিল। সুদের হার সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের আলোচনা হিউমের চাইতে ম্যাসিরই কাছাকাছি। ম্যাসি কিংবা হিউম কেউই 'মুনাফা'র চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানতেন না অথবা এই সম্পর্কে তাঁরা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি, যদিও এই দু'জনের ক্ষেত্রেই মুনাফার একটা ভূমিকা রয়েছে।

হের ড্যুরিং আমাদের উদ্দেশে এক বক্তৃতা ঝেড়ে বলছেন: 'সাধারণভাবে হিউমের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মনোভাব অতিরিক্ত পক্ষপাতদুষ্ট এবং এমন সব ধ্যানধারণা তাঁর নামে চালানো হয়েছে, যার বিন্দুবিসর্গও তিনি পোষণ করতেন না।'

হের ড্যুরিং এইরকম 'মনোভাবের' একাধিক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

যেমন, সুদ সম্পর্কে হিউমের প্রবন্ধ শুরু হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে:

'যে কোনো জাতির সমৃদ্ধির নিশ্চিত লক্ষণ হিসাবে সুদের নিম্নহারকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়, আর তার যুক্তিও আছে; যদিও সাধারণভাবে যা মনে করা হয়, আমার মতামত তার চাইতে কিছুটা ভিন্ন।'[১৩০]

সুতরাং হিউম একেবারে প্রথম বাক্যটিতেই যে প্রচলিত মতটি ব্যক্ত করছেন —অর্থাৎ সুদের নিম্নহার একটা জাতির সমৃদ্ধির সুনিশ্চিত লক্ষণ—সেই ধারণাটি তাঁর সময়েই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। বস্তুতপক্ষে চাইল্ডের পর থেকে পুরো-পুরি একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই 'ধারণা'টি একটা চালু ধারণায় পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে:

'সুদের হার সম্পর্কে হিউমের মতামতের মধ্যে **এই ধারণাটির প্রতি আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে** যে এটাই লক্ষণের (কোন্

লক্ষণের ?) সত্যিকারের মানদণ্ড এবং এর নিম্নহার একটা জাতির সমৃদ্ধির অভ্রান্ত পরিচায়ক।' (পৃ ১৩০))

কোন্ 'পক্ষপাতদুষ্ট' ও মোহমুগ্ধ 'ব্যাখ্যাকার' এই কথা বলছেন ? হের ড্যুরিং ছাড়া আর কেউ নন।

যে ঘটনাটি আমাদের 'বিচারমূলক ঐতিহাসিকটি'কে সহজেই অবাক করে দেয় তা হচ্ছে, কোনো চমৎকার ভাবনার প্রভাবেই হিউম 'এমন দাবিই করেন যে তিনি এই ধারণার স্রষ্টা।' হের ড্যুরিং-এর ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটতে পারত না।

এর আগে আমরা দেখেছি, মূল্যবান ধাতুগুলির সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-হ্রাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ বৃদ্ধিকে, এই ধাতুগুলির নিজস্ব মূল্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রদবদলকে হিউম কিভাবে একাকার করে ফেলেছেন। হিউমের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, কারণ মূল্যের পরিমাপক হিসাবে মূল্যবান ধাতুগুলির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সামান্যতম ধারণাও ছিল না। এই ধারণা তিনি করতে পারতেনও না, কারণ মূল্য সম্পর্কেই তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। এই শব্দটি তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সম্ভবত একবারই মাত্র লক্ষ্য করা যায় ; মূল্যবান ধাতুগুলির 'শুধু একটা কল্পিত মূল্য' আছে—লকের এই ভুল ধারণাটি 'সংশোধনের' চেষ্টায় এই ধাতুগুলির 'মূল্য নিছক অলীক'[১৩১] এই বলে তিনি বিষয়টাকে আরও খারাপ করে দিয়েছিলেন।

এই ক্ষেত্রে তিনি শুধু পেট্টির থেকেই নয়, তাঁর সমকালীন অনেক ইংরেজ লেখক থেকেও যথেষ্ট নিকৃষ্ট। 'বণিক'ই উৎপাদনের প্রধান উৎসধারা—এই সেকেলে ধারণাটি ঘোষণা করে তিনি সেই ধরনের 'পশ্চাৎপদতা'র পরিচয় দিয়েছেন যা পেট্টি বহুদিন আগেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। হিউম তাঁর প্রবন্ধ-গুলিতে 'মুখ্য আর্থনীতিক সম্পর্কগু'ল' নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন—হের ড্যুরিং-এর এই আশ্বাসের ব্যাপারে পাঠক যদি অ্যাডাম স্মিথ কর্তৃক উদ্ধৃত কান্তিলোর (যে বছর হিউমের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, সেই একই বছরে, ১৭৫২ সালে এটাও প্রকাশিত হয়, যদিও এটা ঘটে লেখকের মৃত্যুর বহু বছর পরে[১৩২]) রচনা তুলনা করে দেখেন, তাহলে হিউমের আর্থনীতিক প্রবন্ধাবলীর সংকীর্ণ পরিধি দেখে বিস্ময়বোধ করবেন। এর আগেই আমরা বলেছি, হের ড্যুরিং যদিও হিউমকে অনুমতিপত্র মঞ্জুর করেছেন, তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও

তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেও কোনো মৌলিক গবেষক নন, যুগান্তকারী চিন্তাবিদ তো নন-ই। তাঁর সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর আর্থনীতিক প্রবন্ধাবলীর প্রভাবের কারণ শুধু চমকপ্রদ উপস্থাপনাই নয়, এর প্রধান কারণ হচ্ছে এইসব প্রবন্ধ ছিল তখনকার বিকাশমান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রগতিশীল ও আশাবাদী প্রশংসায় ভরা, অন্য কথায় পুঁজিবাদী সমাজের প্রশংসায় পরিপূর্ণ ; ইংল্যাণ্ডে তখন দ্রুত উদ্ভব ঘটছিল পুঁজিবাদের এবং প্রবন্ধগুলির পক্ষে এই সমাজের 'অনুমোদন' পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। এখানে এই সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট। সবাই জানেন যে হিউমের সময়ে ইংল্যাণ্ডের জনগণ পরোক্ষ কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করছিলেন। সেই সময় ভূস্বামী ও সাধারণভাবে ধনিক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্যে অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে কুখ্যাত স্যার রবার্ট ওয়ালপোল নিয়মিত শোষণ চালিয়ে আসছিলেন। হিউম 'কর প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে, পরোক্ষ করের প্রবলতম প্রতিপক্ষ এবং ভূমি-করের সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা, তাঁর পক্ষে একান্ত প্রামাণ্য পণ্ডিত ভ্যাণ্ডারলিন্ট-এর বিরুদ্ধে (তাঁর নামোল্লেখ না করে) যুক্তি উপস্থিত করে বলেছেন :

'এগুলি যথার্থই (ভোগ্যদ্রব্যের ওপর চাপানো কর) অত্যন্ত বেশি পরিমাণ কর এবং উন্নত শিল্প ও মিতব্যয়ী ব্যবস্থার দ্বারা খুব অন্যায়ভাবে চাপানো হয়েছে —একজন হস্তশিল্পী তার শ্রমের দাম না বাড়িয়ে নিজের ক্ষমতায় এটা দিতে পারবে না।'১৩৩

মনে হয় যেন স্বয়ং রবার্ট ওয়ালপোলই কথা বলছেন, বিশেষ করে 'জাতীয় ঋণ' সংক্রান্ত প্রবন্ধটির যে-অংশে রাষ্ট্রের ঋণদাতাদের ওপর কর ধার্যের অসুবিধা-সম্পর্কে হিউম উল্লেখ করেছেন :

'অন্তঃশুল্ক বা বহিঃশুল্কের কোনো বিভাগের আড়ালে তাদের রাজস্ব-হ্রাসকে লুকিয়ে রাখা যাবে না।'১৩৪

একজন স্কটল্যাণ্ডের লোকের কাছে যা আশা করা যায়, বুর্জোয়া সঞ্চয়-প্রবৃত্তি সম্পর্কে হিউমের প্রশংসা মোটেই সে রকম কোনো নিষ্কাম চরিত্রের নয়। একজন গরীব মানুষ হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি কয়েক হাজার পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের অধিকারী হয়েছিলেন ; হের ড্যুরিং বেশ চতুরতার সঙ্গে বিষয়টাকে এইভাবে রেখেছেন (যেহেতু পেটি এখানে তাঁর আলোচনার বিষয় নন) :

'অত্যন্ত স্বল্প বিত্তের সঞ্চয় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করে তিনি এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, যখন কাউকে খুশি করার জন্যে তাঁকে কলম ধরতে হয় নি।'

হের ড্যুরিং আরও বলেছেন :

'কোনো পার্টি, রাজন্যবর্গ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবের কাছে তিনি বিন্দুমাত্র মাথা হেঁট করেন নি।'

কোনো ভাগনার এর[১৩৫] সঙ্গে হিউমের গ্রন্থ-রচনার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ অবশ্য নেই, তবে এটা সুপরিচিত ঘটনা যে তিনি ছিলেন হুইগ শাসক-গোষ্ঠীর একজন গোঁড়া সমর্থক এবং 'চার্চ' ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এদের খুব উচ্চ ধারণাই ছিল। তাঁর সেবার পুরস্কার হিসাবে প্রথমে তাঁকে পারীর দূতাবাসের একজন সচিবের পদ দেওয়া হয় এবং পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মোটা মাইনের সহকারী মন্ত্রীর পদে বসানো হয়।

এঁর সম্পর্কে বৃদ্ধ শ্লোসার[১৩৬] বলেছেন :

'রাজনীতিতে হিউম বরাবরই একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি এবং নিজ মতামতের দিক থেকে গোঁড়া রাজতন্ত্রী। এই কারণে প্রতিষ্ঠিত গির্জার সমর্থকরা তাঁকে কখনও গিবন-এর মতো ধর্মদ্রোহী হিসাবে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করে নি।'

হের ড্যুরিং-এর ভাষায় :

'এই স্বার্থপর হিউম, এই মিথ্যাচারী ঐতিহাসিক' ইংরেজ পাদরিদের এই বলে ভৎর্সনা করেছিলেন যে তারা মেদবহুল জীব, তাদের না আছে স্ত্রী, না আছে পরিবার, এবং ভিক্ষা করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়; 'কিন্তু তাঁরও স্ত্রী বা পরিবার ছিল না, তিনি নিজেও ছিলেন মেদবহুল জীব, তাঁর ভরণপোষণের বেশির ভাগটাই চলতো জনগণের অর্থে, অথচ তিনি সত্যিকারের এমন কোনো জনসেবামূলক কাজ করেন নি যার জন্যে এটা তাঁর ন্যায্য পাওনা হতে পারে'—'রূঢ়ভাষী' জননেতা কোবেট তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন।[১৩৭]

হিউম ছিলেন 'জীবনের ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মূলগতভাবে কাণ্টের চাইতে অনেক উন্নততর পর্যায়ের মানুষ।'

কিন্তু 'বিচারমূলক ইতিহাস'-এ হিউমকে এত অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে কেন? তার আসল কারণ হলো এই 'সুগভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ'টি

আঠারো শতকে ড্যুরিং-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিউম এ বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ যে

> 'একটা উন্নততর দার্শনিক সাফল্য হিসাবে এই বিজ্ঞানের (অর্থনীতি) সমগ্র শাখার সৃষ্টি হয়েছে।'

আর অনুরূপভাবে হিউমই পূর্বসূরী হিসাবে এই বিষয়ের সবচেয়ে বড় গ্যারাণ্টি যে বিজ্ঞানের এই সমগ্র শাখাটি নিকট ভবিষ্যতে সহযোগী রূপে সেই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে খুঁজে পাবে, যিনি 'উন্নততর দর্শন'কে বাস্তবতার পরম জ্যোতির্ময় দর্শনে রূপান্তরিত করবেন এবং হিউমের মতোই যাঁর মাধ্যমে

> 'শব্দটির সংকীর্ণ অর্থে দর্শন-চর্চার মিলন ঘটবে—জার্মানির মাটিতে যা অভূতপূর্ব ঘটনা—জাতীয় অর্থনীতির পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের সঙ্গে।'

তাই আমরা দেখতে পাই, অর্থনীতিবিদ হিসাবে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিউমকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যেসব ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি 'যুগের পক্ষে প্রভাবশালী' হিউমের কীর্তিগুলিকে এতদিন একগুঁয়েমি করে চেপে রেখেছিল, সেই ধরনের ব্যক্তিরাই তাঁর গুরুত্ব এতদিন ধরে অস্বীকার করে এসেছে।

* * *

এটা সবাই জানেন যে ফিজিওক্র্যাটিক বা ভূ-সম্পত্তিবাদী সম্প্রদায় কোয়েসনের-র 'ট্যাবলো ইকোনমিকি'[১৩৮] নামে একটা হেঁয়ালী রেখে গিয়েছে। এর অর্থ উদ্ধারের জন্যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমস্ত প্রাক্তন সমালোচক ও ঐতিহাসিক এতদিন ধরে বৃথাই মাথা কুটে মরছেন। একটা দেশের মোট সম্পদের উৎপাদন ও সঞ্চালন সম্পর্কে ভূ-সম্পত্তিবাদীদের ধারণাটি পরিষ্কার-ভাবে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই 'ট্যাবলো'টি রচিত হয়—কিন্তু অর্থনীতির পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছে এটা একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই বিষয়েও হের ড্যুরিং শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোকিত করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন :

> তিনি বলছেন : 'কোয়েসনে-র নিজের কাছে উৎপাদন ও বন্টনের সম্পর্কগুলির এই আর্থনীতিক প্রতিচ্ছবির অর্থ কি ছিল', সেটা 'তাঁর নিজস্ব মুখ্য ধারণাগুলিকে প্রথমে সতর্কভাবে বিচার করে'ই বলা সম্ভব। এটা এই কারণে আরও প্রয়োজনীয় যে এতদিন ধরে এগুলি হাজির করা হয়েছে শুধুমাত্র 'দোদুল্যমান

অনিশ্চয়তা'র সঙ্গে এবং এমনকি অ্যাডাম স্মিথের কাছেও সেগুলির 'মর্মগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়ে নি'।

হের ড্যুরিং এইসকম 'ভাসা-ভাসা বিবরণদানে'র চিরাচরিত কাজটি এখানেই একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর তিনি পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে বোকা বানাবার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। এই পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে হরেকরকম দাম্ভিক বাগাড়ম্বর, ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ও পরিকল্পিত বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা—যার উদ্দেশ্য হলো কোয়েসনে-র 'মুখ্য ধারণাগুলি' সম্পর্কে 'সর্বাধিক প্রচলিত পাঠ-সংকলনে' যা আছে তার অতিরিক্ত আমাদের কাছে বলার মতো কিছু হের ড্যুরিং-এর যে নেই সেটা কাউকে বুঝতে না দেওয়া। অথচ এইসব 'পাঠ-সংকলন' সম্পর্কে তিনি আমাদের অনবরত হুঁশিয়ার করে আসছেন। এই ভূমিকার 'সবচেয়ে সন্দেহজনক দিকগুলির অন্যতম' হলো এটাই যে এখানেও 'ট্যাবলো'টি, এতক্ষণ যার শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচনার কাজ এক নিঃশ্বাসে সেরে ফেলা হয়েছে এবং তারপর 'প্রয়াস ও ফলাফলের মধ্যেকার পার্থক্যে'র মতো হরেকরকম 'চিন্তা'র মধ্যে হারিয়ে গেছে। যদিও শেষোক্তটি 'এটা ঠিকই যে কোয়েসনে-র চিন্তার মধ্যে পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায় না', তবুও হের ড্যুরিং যখন তাঁর দীর্ঘ ভূমিকাসূচক 'প্রয়াস' থেকে তাঁর এক-নিঃশ্বাসে শেষ করা 'ফলাফল'-এ প্রবেশ করবেন, অর্থাৎ 'ট্যাবলো'টির একটা বিশদ ব্যাখ্যা দেবেন, তখন তিনি এই সম্পর্কে একটা চোখ-ধাঁধানো দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। কোয়েসনে-র 'ট্যাবলো' সম্পর্কে যা তিনি আমাদের বলতে চান, এখন আক্ষরিকভাবেই তার সবটাই আমরা উপস্থিত করব।

হের ড্যুরিং তাঁর 'প্রয়াস'-এর মধ্যে লিখেছেন :

'এটা তাঁর (কোয়েসনে) কাছে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থকে (হের ড্যুরিং সবেমাত্র নীট উৎপন্ন দ্রব্যের কথা বলেছেন) আর্থিক মূল্য রূপে ভাবতে ও বিচার করতে হবে।...তিনি তাঁর আলোচনা (!) সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং এটা ধরে নিয়েছেন যে এই আর্থিক মূল্যগুলি হচ্ছে প্রথম হস্তান্তরের সময়ে সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রির ফল। এইভাবে তিনি তাঁর 'ট্যাবলো'র কলামে কয়েকশো কোটি মূল্য (অর্থাৎ আর্থিক মূল্য) নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন।

সুতরাং আমরা তিনবার এটা জানতে পারলাম যে কোয়েসনে তাঁর 'ট্যাবলো'তে 'নীট উৎপন্ন দ্রব্য' বা 'নীট ফসল'-এর আর্থিক মূল্য সমেত 'কৃষিজাত দ্রব্যে'র 'আর্থিক মূল্য' নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। এখানে আরও আমরা দেখি :

> 'কোয়েসনে যদি সতি সত্যিই একটা স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর বিচার করতেন শুধুমাত্র মূল্যবান ধাতুগুলি ও অর্থের পরিমাণ থেকে নয়, আর্থিক মূল্যগুলিকে গুরুত্বদানের ব্যাপার থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারতেন…। কিন্তু যা ঘটেছে তা হলো তিনি শুধু মূল্যগুলির সমষ্টি নিয়ে হিসাব-নিকাশ করেছেন এবং আর্থিক মূল্য হিসাবে 'নীট উৎপন্ন দ্রব্যকে' আগে থেকেই অনুমান করে (!) নিয়েছেন।'

'ট্যাবলো'তে যে শুধু আর্থিক মূল্যের প্রসঙ্গই রয়েছে—এটা আমরা চতুর্থ ও পঞ্চমবার জানতে পারলাম !

> 'খরচ বাদ দিয়ে এবং "খাজনা হিসাবে জমিদারের কাছে যে মূল্য জমা হয়, সেই মূল্যের" কথা "প্রধানত চিন্তা (!) করে (চিরাচরিত পদ্ধতিতে না হলেও এটা ভাসা-ভাসা বিবরণ)" তিনি (কোয়েসনে) এটা পেয়েছেন।'

আমরা এখনও এক পা-ও এগোতে পারি নি, কিন্তু এখনও এটা আসছে :

> 'অন্যদিকে যাহোক, এখনও'—এই 'যাহোক, এখনও' একটা রত্ন-বিশেষ ! একটা প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে নীট উৎপন্ন দ্রব্য সঞ্চালন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং এইভাবে এটা একটি উপাদানে পরিণত হয় যা…অনুৎপাদক হিসাবে আখ্যাত শ্রেণীকে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভ্রান্তিটি তৎক্ষণাৎ (!) ধরা পড়ে যায়—কারণ একটা ক্ষেত্রে এটা আর্থিক মূল্য, আবার অন্য ক্ষেত্রে আসল বস্তুটাই, যা নির্ধারণ করে চিন্তার গতি-প্রকৃতি।'

সাধারণভাবে এটা মনে হয় যাবতীয় পণ্যের সঞ্চালন ক্ষেত্রে এই 'বিভ্রান্তি' সৃষ্টি হয় যে পণ্যগুলি একই সঙ্গে 'প্রাকৃতিক দ্রব্য' ও 'আর্থিক মূল্য' হিসাবে সঞ্চালনের জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু আমরা এখনও 'আর্থিক মূল্যে'র বৃত্তের

মধ্যে পাক খাচ্ছি। কারণ 'বিক্রয়জাত জাতীয় আর্থনীতিক অর্থ দুবার খাতায় জমা পড়া এড়াবার জন্যে কোয়েসনে উদ্বিগ্ন।'

হের ড্যুরিং-এর অনুমতি নিয়ে বলতে চাই: কোয়েসনে-র 'বিশ্লেষণ' গ্রন্থে[১৩৯] নানা রকম দ্রব্যসামগ্রী 'প্রাকৃতিক দ্রব্য' হিসাবে 'ট্যাবলো'র পাদটীকায় এবং সর্বোপরি 'ট্যাবলো'র মধ্যেই এগুলির আর্থিক মূল্য স্থান পেয়েছে। পরবর্তী অংশে, কোয়েসনে তাঁর সহকারী আব্বে বা দিউকে দিয়ে প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলিকে তাদের আর্থিক মূল্যের পাশাপাশি 'ট্যাবলো'র অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন।[১৪০]

এই 'প্রয়াসে'র পর শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে পৌঁছাই 'ফলাফলে'। এই কথাগুলি শ্রবণ করে কৃতার্থ হোন:

> 'তা সত্ত্বেও যুক্তিহীনতা' (কোয়েসনে জমিদারদের যে ভূমিকা অর্পণ করেছেন সেই প্রসঙ্গে) 'সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন আমরা জাতীয় আর্থনীতিক সঞ্চালন-প্রক্রিয়ায় খাজনা হিসাবে আত্মসাৎ করা নীট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে থাকি। এই ব্যাপারে ভূ-সম্পত্তিবাদীরা ও 'ট্যাবলো ইকনমিকি' কতকগুলি বিভ্রান্তিকর ও খামখেয়ালি ধারণা ছাড়া আমাদের আর কিছুই দিতে পারে না, যা একটা রহস্যবাদের দিকে নিয়ে যায়।'

সব ভালো, যার শেষ ভালো। তাই হের ড্যুরিং 'জাতীয়-আর্থনীতিক সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় খাজনা হিসাবে আত্মসাৎ করা নীট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি কী হয়েছে' ('ট্যাবলো'তে যা আছে) তা ধরতেই পারলেন না। তাঁর মতে 'ট্যাবলো'টি 'একটা বৃত্তের মধ্যে পাক খেয়েছে।' তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি ভূ-সম্পত্তিবাদের অ-আ-ক-খও বোঝেন না। এতক্ষণ ধরে যেসব এলোপাথাড়ি বকবকানি, অযথা বাগাড়ম্বর, এদিক-ওদিক নর্তন-কুর্দন, ভাঁড়ামি, নানা ঘটনা, বিক্ষিপ্ত আলোচনা, পুনরাবৃত্তি ও হতবুদ্ধিকর জগাখিচুড়ি তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—'কোয়েসনে নিজে "ট্যাবলো"তে কী বুঝেছেন'—এই সিদ্ধান্তটি জবরদস্তি করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আমাদের মনকে প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু এ সবের পরেও হের ড্যুরিং নির্লজ্জের মতো স্বীকারোক্তি করেছেন যে তিনি নিজেই কিছু বোঝেন নি।

এই বেদনাদায়ক গোপন কথাটি প্রকাশ করার পরই, এই হোরেসীয় 'ব্ল্যাক কেশার'[১৪১] ভূ-সম্পত্তিবাদীদের দেশ অতিক্রম করার সময়ে পিঠ কুঁজো করে বসেছিলেন। আমাদের 'গুরুগম্ভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ'টি তাঁর জয়ঢাকটিতে আর একটি জয়ধ্বনি নিনাদিত করলেন :

'তাঁর বেশ সহজ-সরল (!) 'ট্যাবলো'তে কোয়েসনে এখানে ওখানে যেসব রেখা অংকন করেছেন' (মোট পাঁচটি এইরকম রেখা!), 'এবং যেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে নীট উৎপন্ন দ্রব্যের সঞ্চালনকে উপস্থিত করা' সেইগুলি এই সন্দেহ জাগায় যে 'কলামগুলির এই খামখেয়ালি মিশ্রণ' কোনো কাল্পনিক গণিতও ব্যাখ্যা করতে পারবে কিনা ; বৃত্তটির মধ্যে সমান বর্গক্ষেত্র রচনার বা অসম্ভবকে সম্ভব করার যেসব চেষ্টা কোয়েসনে চালিয়ে ছিলেন, এগুলি তার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

যেহেতু হের ডুারিং, তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই, এই সহজ-সরল রেখাগুলির অর্থ ধরতে পারেন নি, তাই তাঁকে তাঁর প্রিয় পদ্ধতি—সেগুলিকে সন্দেহ করা—গ্রহণ করতে হয়েছে। আর এখন তিনি সেই বিরক্তিকর 'ট্যাবলো'র বিরুদ্ধে জোরের সঙ্গে শেষ কথা ঘোষণা করতে পারেন :

'আমরা এক্ষেত্রে নীট উৎপন্ন দ্রব্যকে তার সব চাইতে সন্দেহজনক দিক থেকে বিচার করে দেখেছি' ইত্যাদি।

সুতরাং তিনি নিরুপায়ভাবে এই স্বীকারোক্তিটি করতে বাধ্য হয়েছেন যে 'ট্যাবলো ইকনমিকি' এবং এর অন্তর্ভুক্ত নীট উৎপন্ন দ্রব্যের ভূমিকার মাথামুণ্ডু কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। আর তাই তাঁকে 'নীট উৎপন্ন দ্রব্যের সবচাইতে সন্দেহজনক দিক'-এর কথা বলতে হয়েছে। কী নিদারুণ রসিকতা!

কিন্তু হের ডুারিং-এর কাছ থেকে যেসব পাঠক আর্থনীতিক জ্ঞানের 'প্রথম পাঠ' নিয়েছেন, তাঁরা যাতে কোয়েসনে-র 'ট্যাবলো' সম্পর্কে ঐরকম শোচনীয় অজ্ঞতার মধ্যে না থাকেন, সেইজন্যে আমরা এর একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হাজির করছি :

এটা মোটামুটিভাবে জানা আছে যে ভূ-সম্পত্তিবাদীরা (ফিজিওক্র্যাট) সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন : (১) উৎপাদকশ্রেণী, অর্থাৎ যে-শ্রেণী যথার্থভাবে কৃষিকাজে নিযুক্ত—রায়ত চাষী ও ক্ষেতমজুর ; তাদের উৎপাদক বলা হয়, কারণ তাদের শ্রম উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা সৃষ্টি করে।

(২) যে শ্রেণী এই উদ্বৃত্ত ভোগ-দখল করে,—ভূস্বামী ও তাদের কর্মচারী, রাজন্যবর্গ ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রের বেতনভুক সমস্ত কর্মচারী এবং এইসঙ্গে চার্চও, ধর্মীয় কর আদায় করা যার একটা বিশেষ চরিত্র। সংক্ষেপে বলার জন্য প্রথম শ্রেণীটিকে আমরা শুধু 'কৃষক' বলব, আর দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে বলব 'জমিদার'। (৩) শিল্প-মালিক শ্রেণী বা অনুৎপাদক শ্রেণী; ভূ সম্পত্তি-বাদীদের মতে, এরা অনুৎপাদক, কারণ উৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে এরা যে কাঁচা মাল পায়, এরা তাতে শুধু সেই পরিমাণ মূল্য যোগ করে—যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদক শ্রেণীর যোগান দেওয়া জীবনধারণের উপকরণ থেকে এরা ব্যবহার করে। কোয়েসনে র 'ট্যাবলো' রচনার উদ্দেশ্য ছিল: একটা দেশের (নির্দিষ্টভাবে ফ্রান্সের) সংবৎসরের মোট উৎপাদন কিভাবে এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং বার্ষিক পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে, তারই একটা চিত্র হাজির করা।

কোয়েসনের সময়ে কৃষি খামার পদ্ধতি ও বৃহদাকার কৃষি বল'ত কী বোঝাত, এটাই ছিল 'ট্যাবলো'র প্রথম প্রস্তাবনা; নরম্যাণ্ডি, পিকার্ডি, ইলে দ্য ফ্রান্স ও ফ্রান্সের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে সাধারণভাবে চালু হয়ে এটা ছিল ঐ পদ্ধতির আদিরূপ। সুতরাং কৃষকই এখানে কৃষির প্রকৃত নেতা, 'ট্যাবলো'র মধ্যে সেই সমগ্র উৎপাদক (কৃষিতে নিযুক্ত) শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং জমিদারকে টাকায় খাজনা প্রদানকারী। এক হাজার কোটি 'লিভার' বিনিয়োগকৃত পুঁজি কিংবা মজুত মাল সমগ্র কৃষকশ্রেণীর অধিকারভুক্ত করা হয়েছে; এই অংকের এক-পঞ্চমাংশ বা দুশো কোটি লিভার সক্রিয় পুঁজি, যা প্রতি বছর নতুন করে বিনিয়োগ করতে হয়—এই অংকটিও হিসাব করা হয়েছিল উপরোক্ত প্রদেশগুলির সবচেয়ে সুপরিচালিত খামারগুলির অবস্থার ভিত্তিতে।

অন্যান্য প্রস্তাবনা হলো: (১) সরলীকরণের জন্যে এটা বলা হয়েছিল যে স্থায়ী দাম ও সরল পুনরুৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকবে; (২) শুধু একটা শ্রেণীর মধ্যেকার সকল সঞ্চালনকে হিসাবের বাইরে রেখে শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সঞ্চালনকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে; (৩) একটা শিল্প-বৎসরে শ্রেণী-গুলির মধ্যে যে বেচা-কেনা চলে, সেগুলিকে মোট একটা অংকে যোগ করা হয়েছে। শেষত, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার যে কোয়েসনে-র সময়ে ফ্রান্সে এবং কম-বেশি পরিমাণে ইউরোপ জুড়েই খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বেশির ভাগটাই সরবরাহ করত কৃষক পরিবারগুলির কুটির শিল্প, আর সেই কারণে কুটির শিল্পকে কৃষির সহযোগী হিসাবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

'ট্যাবলো'র গোড়ার কথা হচ্ছে মোট ফসল, জমির বাৎসরিক উৎপাদনের মোট উৎপন্ন দ্রব্য, যাকে পরে প্রথম দফা হিসাবে দেশের, এক্ষেত্রে ফ্রান্সের, 'মোট পুনরুৎপাদন' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই মোট দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণকে হিসাব করা হয়েছে বাণিজ্যিক জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত কৃষিপণ্যের গড় দরের ভিত্তিতে। এর পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো কোটি লিভার, তৎকালীন রাশিবিজ্ঞান অনুযায়ী যতটা সম্ভব, সেই হিসাবে ফ্রান্সের মোট কৃষি উৎপাদনের আর্থিক মূল্য মোটামুটিভাবে এই অংকটির মধ্যে প্রকাশ পায়। কোয়েসনে কেন তাঁর 'ট্যাবলো'তে 'কয়েকশো কোটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন', সঠিকভাবে পাঁচশো কোটি নিয়ে, পাঁচ লিভার তুরনয়েস[১৪২] নিয়ে নয়—তার কারণ একমাত্র এটাই।

সুতরাং পাঁচশো কোটি লিভার মূল্যের সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদক শ্রেণীর হাতে রয়েছে, অর্থাৎ হাতে রয়েছে প্রথমত কৃষকদের, যারা দুশো কোটি লিভার বার্ষিক সক্রিয় পুঁজি অগ্রিম দিয়ে এটা উৎপন্ন করেছে এবং এটা এক হাজার কোটি বিনিয়োগকৃত পুঁজির সমতুল্য। কৃষিতে সরাসরি নিযুক্ত সকল ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন করে সক্রিয় পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ইত্যাদি যেসব কৃষিদ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তা নেওয়া হয় মোট উৎপাদিত ফসলের হিসাবে এবং নতুন কৃষি উৎপাদনের জন্যে ব্যয়িত হয়। যেহেতু আমরা আগেই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থায়ী দর ও সরল পুনরুৎপাদন ধরে নিয়েছি, তাই মোট উৎপাদন থেকে এইভাবে নিয়ে নেওয়া একাংশের আর্থিক মূল্য দুশো কোটি লিভারের সমান। সুতরাং এই অংশ সাধারণ সঞ্চালনের মধ্যে আসে না। এর কারণ হিসাবে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে যে-সঞ্চালন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে না ঘটে একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই ঘটে, 'ট্যাবলো'তে সেটা বিবেচনা-বহির্ভূত রয়েছে।

মোট উৎপাদন থেকে সক্রিয় পুঁজি সরিয়ে নেবার পর, তিনশো কোটির একটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়, যার দুশো কোটি যায় খাদ্যসামগ্রীতে আর একশো কোটি কাঁচামালে। অবশ্য যে-খাজনা কৃষকদের জমিদারকে দিতে হয়, সেটা এর দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুশো কোটির সমতুল্য। শীঘ্রই এটা বোঝা যাবে

যে শুধু এই দুশো কোটি কেন 'মোট উৎপন্ন দ্রব্য' বা 'মোট আয়' হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু 'ট্যাবলো'তে বর্ণিত গতিবিধির আগে দুশো কোটি নগদ অর্থের মোট তহবিলটি কৃষকদের হাতে মজুত থাকছে, আর তার সঙ্গে থাকছে পাঁচশো কোটি মূল্যের 'কৃষিজাত মোট পুনরুৎপাদন', যার মধ্যে তিনশো কোটি প্রবেশ করছে সাধারণ সঞ্চালন-প্রক্রিয়ায়। এটা নিম্নোক্তভাবে ঘটছে।

যেহেতু 'ট্যাবলো'র গোড়ার কথা হচ্ছে মোট ফসল, তাই এটা আবার আর্থিক বৎসরের, যেমন ১৭৫৮ সালের, পরিসমাপ্তিও বটে, এর পরই শুরু হচ্ছে একটা নতুন আর্থিক বৎসর। এই নতুন বৎসরে অর্থাৎ ১৭৫৯ সালের মধ্যে, সঞ্চালনের জন্যে নির্ধারিত মোট উৎপন্ন দ্রব্যের একটা অংশ অনেকগুলি স্বতন্ত্র লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য দুটি শ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হয়। এইসব গতিবিধি,—বিচ্ছিন্ন এবং গোটা বছরব্যাপী বিস্তৃত, পর্যায়ক্রমিক—কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক লেনদেনের মধ্যে সংহত হয়েছে এবং এই লেনদেনের প্রতিটিতে সারা বছরের কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'ট্যাবলো'র ক্ষেত্রে এই ধরনের উপস্থাপনা অপরিহার্য ছিল। সুতরাং ১৭৫৭ সালে কৃষকশ্রেণী যে দুশো কোটি লিভার খাজনা হিসাবে জমিদারদের দিয়েছিল, ১৭৫৮ সালের শেষে সেই পরিমাণ অর্থ আবার কৃষকদের কাছে ফিরে যায় (এটা কী করে ঘটেছে, 'ট্যাবলো' থেকেই তা বোঝা যাবে); এর ফলে কৃষকশ্রেণী এই পরিমাণ অর্থ ১৭৫৯ সালে আবার সঞ্চালন-প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করতে পারে। যেহেতু কোয়েসনে-র কাছে এটা ধরা পড়েছে যে ঐ পরিমাণ অর্থ, দেশের (ফ্রান্সে) মোট সঞ্চালন-প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি, কারণ লেনদেন ঘটে সবসময়েই খণ্ডখণ্ডভাবে, তাই দেশের সঞ্চালন-ক্ষেত্রে মোট অর্থের পরিমাণ হচ্ছে দুশো কোটি লিভার, যা কৃষকদের হাতে সঞ্চিত রয়েছে।

খাজনা আদায়কারী জমিদার শ্রেণীটি প্রথমে দেখা দেয়, এমনকি আজকের দিনেও এটা ঘটনা, পাওনাদার হিসাবে। কোয়েসনে মনে করেছিলেন প্রকৃত জমিদাররা দুশো কোটি লিভার খাজনার মাত্র সাত ভাগের চার ভাগ গ্রহণ করে: সাত ভাগের দু'ভাগ যায় সরকারি তহবিলে এবং সাত ভাগের এক ভাগ যায় ধর্মীয় কর গ্রহণকারীদের কাছে। কোয়েসনে-র কালে চার্চই ছিল বৃহত্তম জমিদার, উপরন্তু অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি থেকেও ধর্মীয় কর লাভ করত।

সারা বছর ধরে অনুৎপাদক বা 'বন্ধ্যা' শ্রেণীটি যে সক্রিয় পুঁজি কাজে

লাগায়, সেটা একশো কোটি মূল্যের কাঁচামাল, নিছক কাঁচামালই, কারণ হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই শ্রেণীরই উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর শিল্প-সংস্থাগুলিতে উৎপাদিত এই ধরনের দ্রব্য সামগ্রীর বহুরকম ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে 'ট্যাবলো' ততটুকুই মাথা ঘামিয়েছে, যতটুকু পণ্য ও অর্থের সঞ্চালনের সঙ্গে এই শ্রেণীটি সংশ্লিষ্ট। যে শ্রমের মজুরি দানের মাধ্যমে এই অনুৎপাদক শ্রেণীটি কাঁচামালকে তৈরি মালে রূপান্তরিত করে, সেই শ্রমের মজুরি এই শ্রেণীর জীবনধারণের উপকরণের মূল্যের সমান, সে এর খানিকটা পায় সরাসরি উৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে এবং খানিকটা পায় পরোক্ষভাবে জমিদারদের কাছ থেকে। যদিও এই শ্রেণী পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিক রূপে দ্বিধা-বিভক্ত, তবুও কোয়েসনে-র মূল ধারণা অনুযায়ী, এ একটা অবিভাজ্য শ্রেণী; এরা উৎপাদক শ্রেণী ও জমিদারদের বেতন-তালিকাভুক্ত। ফসল সংগ্রহের পর যে মোট শিল্পোৎপাদন এবং তার ফলস্বরূপ এর মোট সঞ্চালন সারা বছর ধরে বণ্টিত হয়, সেটাকেও অনুরূপভাবে সামগ্রিক হিসাবের মধ্যে আনা হয়েছে। সুতরাং এটা অনুমান করা হয়েছে যে, 'ট্যাবলো'তে উল্লিখিত গতিবিধির শুরুতে অনুৎপাদক শ্রেণীর বাৎসরিক পণ্যোৎপাদন পুরোপুরিভাবে এর হাতেই থাকে আর তার ফলে একশো কোটি লিভার মূল্যের এর সমগ্র সক্রিয় পুঁজি দুশো কোটি মূল্যবিশিষ্ট পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়, যার অর্ধেক এই রূপান্তর-কালে ভোগে ব্যয়িত জীবনধারণের উপকরণের দাম। এখানে এই আপত্তিটি দেখা দিতে পারে: অনুৎপাদক শ্রেণীটি তার নিজস্ব গার্হস্থ্য প্রয়োজনে নিশ্চয়ই শিল্পজাত দ্রব্যসমূহকে ব্যবহার করে, কিন্তু তার নিজস্ব মোট উৎপাদন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি অন্য শ্রেণীগুলির হাতে চলে যায়? এর জবাবে বলা হয়েছে: অনুৎপাদক শ্রেণীটি তার নিজস্ব পণ্যসমূহের একটা অংশ শুধু ভোগই করে না, উপরন্তু পণ্যসমূহের বাকি অংশ যতটা সম্ভব হাতে রাখার চেষ্টাও করে। সুতরাং সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার জন্যে প্রেরিত পণ্যকে এই শ্রেণী সেগুলির প্রকৃত মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করে, আর এটা তাকে করতেই হয়, কারণ আমরা এই পণ্যগুলির মূল্য হিসাব করেছি তাদের উৎপাদনের মোট মূল্য ধরে। এতে অবশ্য 'ট্যাবলো'র সংখ্যাগুলির হেরফের হয় না, কারণ অন্য দুটি শ্রেণী যে তৈরি মাল পায়, সেটা ঐগুলির শুধুমাত্র মোট উৎপাদন-মূল্যের সমান।

সুতরাং 'ট্যাবলো'তে উল্লিখিত গতিবিধির শুরুতে তিনটি আলাদা শ্রেণীর আর্থনীতিক অবস্থান আমরা এখন জেনেছি।

সক্রিয় পুঁজির পরিবর্তে দ্রব্যসামগ্রী আসার পরও উৎপাদক শ্রেণীর হাতে তিনশো কোটি মূল্যবিশিষ্ট মোট কৃষিদ্রব্য এবং দুশো কোটি মূল্যবিশিষ্ট অর্থ থেকে যায়। জমিদার শ্রেণী একমাত্র তখনই দুশো কোটি লিভার খাজনার দাবি নিয়ে উৎপাদক শ্রেণীর কাছে হাজির হয়। অনুৎপাদক শ্রেণীর তৈরি মালের মধ্যে নিহিত থাকে দুশো কোটি। এই তিনটি শ্রেণীর মাত্র দুটি শ্রেণীর মধ্যে যে সঞ্চালন-প্রক্রিয়াটি চলে, ভূ-সম্পত্তিবাদীরা তাকে বলেছেন অসম্পূর্ণ সঞ্চালন; পুরো তিনটি শ্রেণীর মধ্যেকার সঞ্চালনকে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ সঞ্চালন।

এখন আর্থনীতিক 'ট্যাবলো'র দিকে নজর দেওয়া যাক।

প্রথম (অসম্পূর্ণ) সঞ্চালন: কৃষকরা বিনিময়ে কিছু না পেয়েই জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা দুশো কোটি টাকা তাদের দিয়ে দেয়। এই দুশো কোটির মধ্যে একশো কোটি থেকে জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে এবং এইভাবে খাজনা হিসাবে দেওয়া অর্থের অর্ধেক কৃষকদের হাতে ফিরে আসে।

তাঁর 'অ্যানালাইজ দ্যু ট্যাবলো ইকোনমিকি' গ্রন্থে কোয়েসনে জমির খাজনার দুই-সপ্তমাংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্র অথবা এক-সপ্তমাংশ গ্রহণকারী চার্চ সম্পর্কে আর কিছু বলেন নি। কারণ তাদের সামাজিক ভূমিকা সাধারণভাবে পরিচিত। অবশ্য প্রকৃত জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এদের ব্যয় (যার মধ্যে এদের সমস্ত কর্মচারীর ব্যয়ও রয়েছে), অন্ততপক্ষে এদের বেশির ভাগ ব্যয়ই অনুৎপাদক ব্যয়; একমাত্র যে সামান্য অংশটি 'তাদের জমি ও কৃষির উন্নতি সাধনের জন্যে' ব্যয়িত হয়, সেই অংশটি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু 'প্রাকৃতিক নিয়ম' অনুযায়ী তাদের আসল কাজ হলো 'নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ব্যয় করা এবং সুপরিচালনার ব্যবস্থা করা',[১৪৩] অথবা, যা আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে জমি তৈরি করা এবং খামারগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, যার ফলে তাদের সম্পূর্ণ পুঁজিকে একান্তভাবে প্রকৃত কৃষিকাজে লাগানো কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় (পূর্ণাঙ্গ) সঞ্চালন: যে দুশো কোটি অর্থ এরপরও তাদের

হাতে থেকে যায়, জমিদাররা সেই অর্থ দিয়ে অনুৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে তৈরি মাল কেনে। এবং শেষোক্ত শ্রেণী এইভাবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ঐ সমপরিমাণ মূল্যের জীবনধারণের উপকরণ কিনে নেয়।

তৃতীয় (অসম্পূর্ণ) সঞ্চালন ঃ কৃষকরা অনুৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে একশো কোটি পরিমাণ অর্থ দিয়ে অনুরূপ পরিমাণ তৈরি মাল কেনে ; এই মালের একটা বড় অংশ হচ্ছে কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং কৃষিতে ব্যবহার্য উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ। অনুৎপাদক শ্রেণী ঐ একই পরিমাণ অর্থ কৃষকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়, তার নিজস্ব সক্রিয় পুঁজিকে অপসারণের জন্যে একশো কোটি মূল্যের কাঁচামাল কেনে।

এইভাবে খাজনা বাবদ কৃষকরা যে দুশো কোটি অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থ আবার তাদের হাতে ফিরে যায় এবং ধারাটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সঙ্গে সেই বিরাট ধাঁধাটির উত্তর পাওয়া যায় :

> 'আর্থনীতিক সঞ্চালন-প্রক্রিয়ায় খাজনা হিসাবে যা আত্মসাৎ করা হয়েছে, সেই নীট ওৎপন্ন দ্রব্যের কী পরিণতি ঘটলো ?'

আমরা উপরে দেখেছি যে প্রক্রিয়াটির গোড়ার দিকে উৎপাদক শ্রেণীর হাতে তিনশো কোটি পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। এর মধ্যে দুশো কোটি নীট উৎপাদন খাজনা হিসাবে জমিদারদের দেওয়া হয়েছিল। উদ্বৃত্তর তৃতীয় একশো কোটিটি হচ্ছে কৃষকদের মোট লগ্নিকৃত পুঁজির ওপর সুদ, অর্থাৎ এক হাজার কোটির ওপর দশ শতাংশ সুদ। এটা ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে সঞ্চালন থেকে তারা এই সুদ পায় না ; এটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের হাতে থাকে এবং কেবলমাত্র সমান মূল্যের তৈরি মালে রূপান্তরিত করেই তারা এটা সঞ্চালন থেকে আদায় করে।

এই সুদের ব্যাপারটা না থাকলে, কৃষক—কৃষির প্রধান কর্মকর্তা—কৃষিতে অগ্রিম পুঁজি বিনিয়োগ করত না। ভূ-সম্পত্তিবাদীদের মতে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষির উদ্বৃত্ত আয়, যা সুদের আকার নেয়, খোদ কৃষকশ্রেণীর মতোই পুনরুৎপাদনের একটা অপরিহার্য শর্ত ; আর তাই এই উপাদানটি জাতীয় 'নীট উৎপাদন' বা 'নীট আয়'-এর বর্গের মধ্যে পড়ে না ; কারণ শেষোক্তটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতীয় পুনরুৎপাদনের আশু প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এটা ভোগ্যসম্পদ। কিন্তু কোয়েসনে-র মতে একশো কোটির এই তহবিলটির বেশির ভাগ ব্যয়িত হয় এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয়

মেরামতি কাজের ব্যয় নির্বাহে, এবং লগ্নিকৃত পুঁজির আংশিক নতুনভাবে বিনিয়োগের জন্যে; উপরন্তু দুর্ঘটনার জন্যে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে, আর সবশেষে যেখানে সম্ভব লগ্নিকৃত ও সক্রিয় পুঁজির প্রসার এবং জমির উন্নয়ন ও কৃষির বিস্তার সাধনের জন্যেও।

পুরো প্রক্রিয়াটা নিশ্চয়ই 'সহজ-সরল'। কৃষকদের কাছ থেকে প্রদত্ত খাজনা হিসাবে দুশো কোটি মূল্যের অর্থ এবং তিনশো কোটি মূল্যের উৎপন্ন দ্রব্য সঞ্চালনে প্রবেশ করে, যার দুই-তৃতীয়াংশ জীবন-ধারণের সামগ্রী এবং এক-তৃতীয়াংশ কাঁচা মাল; অনুৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে সঞ্চালনের মধ্যে ঢোকে দুশো কোটি মূল্যের উৎপন্ন দ্রব্য, দুশো কোটি মূল্যসম্পন্ন জীবন-ধারণের সামগ্রীর অর্ধেক ভোগ করে জমিদার ও তার কর্মচারীবর্গ এবং অন্য অর্ধাংশ অনুৎপাদক শ্রেণীর ব্যবহারে লাগে—তার শ্রমের পাওনা মেটানোর জন্যে। একশো কোটি মূল্যের কাঁচা মাল শেষোক্ত শ্রেণীর সক্রিয় পুঁজির অপসারণ ঘটায়। দুশো কোটি মূল্যসম্পন্ন সঞ্চালনের তৈরি মালের অর্ধেক যায় জমিদারদের কাছে আর অন্য অর্ধাংশ যায় কৃষকদের হাতে এবং তাদের কাছে এটা তাদের লগ্নি করা পুঁজির ওপর সুদের রূপভেদ মাত্র, যা কৃ ষত্তে পুনরুৎপাদন থেকে সরাসরি তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু কৃষকদের খাজনা হিসাবে প্রদত্ত যে অর্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে, তা আবার তাদের মালপত্র বিক্রির মধ্যে দিয়ে তাদের হাতে ফিরে আসে এবং এইভাবে পরবর্তী আর্থিক বৎসরে অনুরূপ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

হের ড্যুরিং-এর 'সত্যিসত্যিই বিচারমূলক' বিশ্লেষণ, যা 'গতানুগতিক ভাসা-ভাসা বিবরণে'র চাইতে যথেষ্ট উচ্চস্তরের, এখন আমাদের সেটার প্রশংসা করতেই হচ্ছে। 'ট্যাবলো'তে শুধু অর্থের মূল্য ধরে কাজ করতে যাওয়া কোয়েসনে-র পক্ষে কীরকম বিপজ্জনক হয়েছিল, উপরন্তু যেটা ভুলও বটে, এই কথা পরপর পাঁচবার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাছে বলবার পর তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে প্রশ্ন তুলেছেন:

> 'জাতীয় আর্থনীতিক সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার খাজনা হিসাবে আত্মসাৎ করা নীট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি কী হলো'?—আর্থনীতিক 'ট্যাবলো' 'কতকগুলি বিভ্রান্তিকর ও খামখেয়ালি ধারণা ছাড়া আমাদের আর কিছুই দিতে পারে না, যা একটা রহস্যবাদের দিকে নিয়ে যায়।'

আমরা দেখেছি যে 'ট্যাবলো' সঞ্চালনের মাধ্যমে পুনরুৎপাদনের বৎসর-ব্যাপী প্রক্রিয়াটিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত করতে পেরেছে—জাতীয়-আর্থনীতিক সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় নীট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি সম্পর্কে খুব সঠিক উত্তর দিয়েছে—যা খুবই সহজ-সরল ও সেই সময়ের তুলনায় চমকপ্রদ। সুতরাং আবার এটা দেখা গেল যে 'রহস্যবাদ' আর 'কতকগুলি বিভ্রান্তিকর ও খামখেয়ালি ধারণা' একমাত্র হের ড্যুরিং-এরই 'সবচেয়ে সন্দেহজনক দিক', ভূ-সম্পত্তিবাদ নিয়ে তার পড়াশোনার 'নীট ফসল'।

ভূ-সম্পত্তিবাদীদের ঐতিহাসিক প্রভাব এবং তাঁদের তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর পরিচিতি এই রকম।

তিনি আমাদের শেখাচ্ছেন: 'তুর্গোর সঙ্গে সঙ্গে, প্রয়োগ ও তত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রেই, ভূ-সম্পত্তিবাদের সমাপ্তি ঘটে।'

আর্থনীতিক মতামতের দিক থেকে মিরাবু ছিলেন মূলত ভূ সম্পত্তি-বাদী। ১৭৮৯ সালের সংবিধান-পরিষদে তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, এই পরিষদ আর্থনীতিক সংস্কারের মাধ্যমে ভূ-সম্পত্তি-বাদীদের নীতিগুলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল এবং বিশেষ করে ভূস্বামীরা 'নির্বিচারে' জমির খাজনা হিসাবে যে-নীট উৎপাদন আত্মসাৎ করত, তার ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করেছিল—'একজন' ড্যুরিং-এর কাছে এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই।

১৬৯১ থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত এক কলমের খোঁচায় হিউমের সমস্ত পূর্বসূরীকে যেমন সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তেমনি আর এক খোঁচায় হিউম ও অ্যাডাম স্মিথের মধ্যবর্তী স্যার জেমস স্টুয়ার্টকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। স্টুয়ার্টের একটি বৃহৎ কীর্তি সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর 'প্রয়াস'-এ একটা কথাও বলা হয় নি। অথচ এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও এটা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভাণ্ডারকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।[১৪৪] এটাকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে, হের ড্যুরিং তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বিনীত শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং এটাই বলেছেন যে তিনি অ্যাডাম স্মিথের সমসাময়িক জনৈক অধ্যাপক। দুঃখের বিষয় এই কটাক্ষটি নেহাৎই স্বকপোলকল্পিত, আসল ঘটনা হচ্ছে স্টুয়ার্ট ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একজন বৃহৎ ভূস্বামী এবং স্টুয়ার্ট-ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি গ্রেট ব্রিটেন থেকে নির্বাসিত হন। কন্টিনেন্টে

দীর্ঘদিন থাকা ও ঘোরাফেরার ফলে বিভিন্ন দেশের আর্থনীতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন।

এক কথায় 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি' অনুসারে শুধু হের ড্যুরিং-এর 'কর্তৃত্বপূর্ণ' ও গভীরতর ভিত্তির 'প্রাথমিক উপাদান' হিসাবেই আগেকার অর্থনীতিবিদদের একটা গুরুত্ব আছে অথবা তাঁদের ত্রুটিজনক মতবাদের জন্যে সেগুলি হের ড্যুরিং-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে এমন কিছু বীর রয়েছেন, যাঁরা 'গভীরতর ভিত্তি'র 'প্রাথমিক উপাদান'গুলির প্রতিনিধিই শুধু নন,—যে 'নীতিগুলি' থেকে এই ভিত্তি 'উদ্ভূত' হয় নি, প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয়েছে, সেই নীতিগুলিরও প্রতিনিধি এঁরা. যেমন 'তুলনাহীনভাবে মহৎ ও প্রখ্যাত' লিস্ট, জার্মান শিল্পপতিদের স্বার্থে ফেরিয়ার ও অন্যান্যদের 'সূক্ষ্মতর' বাণিজ্যিক মতবাদগুলিকে 'জোরালো' শব্দে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন; এখানে কেরির নামও করতে হবে, যিনি তাঁর জ্ঞানের সারাৎসারকে নীচের বাক্যটির মধ্যে অভিব্যক্ত করেছেন:

'রিকার্ডোর পদ্ধতিতে নানা অসঙ্গতি···এর সবটাই শ্রেণীগুলির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়···তাঁর গ্রন্থটি কোনো বাক্‌পটু ব্যক্তির নিবন্ধ যে ভূ-সম্পত্তির সমান পুনর্বণ্টন নীতি, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়।'[১৪৩]

আর সবশেষে লণ্ডন শহরের কনফুসিয়াস, ম্যাকলিঅড-এর নাম করতে হয়।

যাঁরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বর্তমান ও আশু দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতের ইতিহাস পড়তে ইচ্ছুক, তাঁরা যদি হের ড্যুরিং-এর 'মহান আঙ্গিকসম্পন্ন ইতিহাস চিত্রণে'র বদলে 'সর্বাধুনিক পাঠ্য-সংকলনগুলি'র 'দুর্বল রচনা', 'মামুলি আলোচনা' ও 'ভিক্ষুকের খুদকুঁড়ো' নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেন, তাহলে তাঁরা অনেক বেশি নিরাপদ ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হবেন।

* * *

তাহলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত হের ড্যুরিং-এর 'একান্ত স্বকীয় পদ্ধতি' নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণের শেষে আমরা কী পেলাম? কিছুই না। যাবতীয় বাগাড়ম্বর ও আরও বড় বড় প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি সত্ত্বেও সেই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও যা ঘটেছে, সেইরকম প্রতারণার মধ্যেই আমরা থাকছি। তাঁর মূল্য-

মানের তত্ত্ব, আর্থনীতিক পদ্ধতিগুলি বিচারের কষ্টিপাথরটির তাৎপর্য হচ্ছে এই : হের ড্যুরিং মূল্য বলতে পাঁচটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও প্রত্যক্ষভাবে স্ববিরোধী জিনিস বোঝেন আর তাই, খুব ভালোভাবে বলতে গেলেও বলতে হয়, তিনি কী চান তা তিনি নিজেও জানেন না। এত জাঁকজমক সহকারে ঘোষিত 'সমস্ত অর্থনীতির প্রাকৃতিক সূত্রগুলি' নিকৃষ্ট ধরনের ও সর্বজনবিদিত এবং নীরস মামুলি উক্তি ছাড়া কিছুই নয়, এমনকি এগুলি প্রায়শই যথাযথভাবে বোঝাও যায় নি। আর্থনীতিক তথ্যাবলী সম্পর্কে তাঁর 'একান্তভাবে স্বকীয়' পদ্ধতি যে একমাত্র ব্যাখ্যা আমাদের সামনে হাজির করতে পারে তা হলো এই যে এগুলি 'বলপ্রয়োগে'র ফল,—যাবতীয় অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্যে সমস্ত জাতির স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরে এই কথা বলেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন এবং তাতে একচুলও আমরা এগিয়ে যেতে পারি নি। কিন্তু এই বলপ্রয়োগের উৎস ও ফলাফল অনুসন্ধান করার পরিবর্তে হের ড্যুরিং এটাই আশা করেছেন যে যাবতীয় আর্থনীতিক ঘটনার চূড়ান্ত কারণ ও শেষ ব্যাখ্যা হিসাবে শুধু 'বলপ্রয়োগ' শব্দটি নিয়েই আমরা খুশি থাকব। শ্রমের পুঁজিবাদী শোষণ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়ে তিনি প্রথমে এটাকে দেখিয়েছেন কর ও অতিরিক্ত দরের ভিত্তিতে শোষণ রূপে এবং তিনি এইভাবে প্রুধোঁর 'পূর্বানুমান'কে গ্রহণ করে নিয়েছেন ; তারপর তিনি উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত মূল্য সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের সাহায্যে এই শোষণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যার কাজে হাত দিয়েছেন। এইভাবে তিনি দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বচ্ছন্দ সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন ; আর কাজটি সম্পন্ন করেছেন একনিশ্বাসে উভয়কেই নকল করে। দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেলের বিরুদ্ধে তিনি যেমন খুব কড়া কথা বলতে পারেন নি, তাঁকে অনবরত ব্যবহার করেছেন ও দুর্বল করে ফেলেছেন, ঠিক তেমন 'ক্রিটিক্যাল ইতিহাসে'র ক্ষেত্রেও তিনি মার্কসের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছেন ; এটা করেছেন এই তথ্যটিকেই গোপন করার মতলবে যে পুঁজি ও শ্রম সম্পর্কে তাঁর 'কোর্স' এ যেটুকু অর্থবহ বক্তব্য আছে, তা মার্কসের অক্ষম নকলনবিশি মাত্র। তিনি তাঁর 'কোর্স' এ সভ্যজাতিসমূহের ইতিহাসের সূচনায় 'বৃহৎ ভূস্বামীদের' স্থান দিয়েছেন ; ইতিহাসের যথার্থ সূত্রপাত ঘটেছে যে কৌম বা ট্রাইব্যাল ও গ্রামীণ গোষ্ঠী-সমাজের এজমালি মালিকানা স্বত্বের মধ্যে, সেই সম্বন্ধেও তাঁর কিছুই জানা নেই ; আজকের দিনে এই ধরনের

অজ্ঞতা একটা কল্পনাতীত ব্যাপার, 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি' এই অজ্ঞতার সীমাও অতিক্রম করে গেছে; 'তাঁর ইতিহাস পর্যালোচনার সার্বিক ব্যাপ্তি'তে পরিতৃপ্ত 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি' এই অজ্ঞতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয় এবং এই সম্পর্কে শুধু কয়েকটা নিরুৎসাহজনক দৃষ্টান্তই আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে। সংক্ষেপে: প্রথমে আত্মপ্রসংশার বিপুল 'প্রয়াস', নিজের ঢাক নিজে পেটানোর ভণ্ডামি, ক্রমাগত একটার পর একটা গালভরা প্রতিশ্রুতি আর তারপর 'ফলাফল'—একেবারেই শূন্য।

তৃতীয় খণ্ড

সমাজবাদ

এক

ঐতিহাসিক ভিত্তি

আমরা 'ভূমিকা'র* মধ্যে দেখেছি বিপ্লবের অগ্রদূত অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিকরা যাবতীয় বিষয়বস্তু বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে কিভাবে যুক্তিকে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ ছিল একটা যুক্তিসঙ্গত সরকার, একটা যুক্তিসঙ্গত সমাজ গঠন করা; চিরন্তন যুক্তির বিরোধী যাবতীয় বিষয়কে নির্মমভাবে খতম করা। আমরা এটাও দেখেছি যে এই চিরন্তন যুক্তি আসলে অষ্টাদশ শতকীয় নাগরিকদের, যারা সবে বুর্জোয়ায় পরিণত হচ্ছিল, আদর্শায়িত ধ্যান-ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসি বিপ্লব এই যুক্তি-সঙ্গত সমাজ ও সরকারকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলে।

কিন্তু দেখা গেল, এই নতুন ব্যবস্থা, আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হলেও, পূর্ণাঙ্গভাবে যুক্তিসঙ্গত নয়। যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রুশোর সামাজিক চুক্তি প্রকট রূপ পেল সন্ত্রাস-রাজের মধ্যে এবং বুর্জোয়ারা এর থেকে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর আস্থা হারাবার পর তারা প্রথমে আশ্রয় নেয় ডিরেক্টরেট-এর দুর্নীতির মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের স্বৈরাচারের[১৪৭] পক্ষপুটে। প্রতিশ্রুত সুচির শান্তি পরিণত হয় অন্তহীন দেশ দখলের যুদ্ধে। যুক্তির ওপর প্রতিশ্রুত সমাজ এর থেকে ভালো আর কিছু করতে পারল না। ধনী ও গরীবের বিরোধ, একটা সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বিলীন হওয়ার বদলে, গিল্ড ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা যা এই বিরোধকে এতদিন খানিকটা উপশম করত, হরণ করায়, এবং চার্চের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে দেওয়ায়, আরও তীব্র হয়ে উঠল। সামন্ত-বন্ধন থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা', কার্যত যা তখন বাস্তবায়িত হয়েছে, বৃহৎ পুঁজিপতি ও বৃহৎ জমিদারদের সঙ্গে প্রচণ্ড প্রতি-

---

* প্রথম পর্ব, দর্শন।১৪৩ (এঙ্গেলসের টীকা)।

যোগিতার চাপে বিধ্বস্ত ছোট পুঁজিপতি ও স্বল্পসম্পত্তির মালিকদের ক্ষেত্রে পরিণত হলো তাদের সামান্য সম্পত্তি বিক্রি করার স্বাধীনতায় আর এইভাবে ছোট পুঁজিপতি ও ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা'র পরিণতি ঘটল 'সম্পত্তির অধিকার থেকে স্বাধীনতায়'। পুঁজিবাদী ভিত্তিতে শিল্প-বিকাশ মেহনতি জনগণের দারিদ্র ও দুর্দশাকে সমাজের টিকে থাকার শর্ত করে তুলল। (কার্লাইল-এর ভাষায়, নগদ টাকার লেনদেন ক্রমশই বেশি মাত্রায় মানুষের একমাত্র সম্পর্ক হয়ে উঠল)। বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ততান্ত্রিক ভ্রষ্টাচারগুলি ঘটত প্রকাশ্য দিবালোকে বেপরোয়াভাবেই ; এখন সেগুলি একেবারে দূর হল না, যে কোনোভাবেই পর্দার আড়ালে চলে গেল। যেসব বুর্জোয়া ভ্রষ্টাচার এতদিন গোপনে চালানো হচ্ছিল, সেগুলি এখন আরও বেশি পরিমাণে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। বাণিজ্য ক্রমশই বেশি বেশি করে পর্যবসিত হলো প্রতারণায়। 'ভ্রাতৃত্বের'[১৪৮] বিপ্লবী শ্লোগানটির পরিণতি ঘটল প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ছলচাতুরি ও পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে। লাঠিবাজি করে অত্যাচারের বদলে এলো দুর্নীতি এবং সমাজের প্রবল শক্তি হিসাবে তরোয়ালের দাপটের স্থান নিল স্বর্ণ। সামন্তপ্রভুদের প্রথম রাত্রির অধিকার হস্তান্তরিত হলো বুর্জোয়া উৎপাদকদের কাছে। পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ল নজিরবিহীনভাবে। বিবাহ আগের মতোই হয়ে রইল আইনসঙ্গত রূপ, পতিতাবৃত্তির আনুষ্ঠানিক ছদ্মবেশ, এর সঙ্গে জাঁকিয়ে বসল ব্যভিচার।

সংক্ষেপে, দার্শনিকদের চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতির তুলনায়, 'যুক্তির বিজয়'জাত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তীব্র হতাশাব্যঞ্জক বিকৃত রূপ হয়ে ওঠে। তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এই আশাভঙ্গকে ভাষা দেওয়ার মতো মানুষদের এবং শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আবির্ভাব ঘটল। সাঁ-সিমোঁর জেনিভা-পত্রাবলী প্রকাশিত হলো ১৮০২ সালে ; ১৮০৮-এ প্রকাশিত হলো ফুরিয়ের-এর প্রথম গ্রন্থ, যদিও তাঁর তত্ত্বের গোড়াপত্তনের কাজ শুরু হয় ১৭৯৯ সালে ; ১৮০০ সালের ১ জানুয়ারি রবার্ট ওয়েন নিউ লানার্ক[১৪৯]-এর পরিচালনভার গ্রহণ করেন।

অবশ্য এই সময়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত-এর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মোটেই ভালোভাবে বিকশিত হয় নি। যে আধুনিক শিল্প তখন সবে ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়েছে, ফ্রান্সে তখনও তা অজ্ঞাত।

কিন্তু আধুনিক শিল্প একদিকে সেইসব বিরোধের বিকাশ ঘটায়, যা উৎপাদন পদ্ধতিতে একটা বিপ্লব (এবং এই পদ্ধতির পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপসাধন) অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, এইসব বিরোধ শুধু এই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত শ্রেণী-গুলির মধ্যেই দেখা দেয় না, এর উৎপাদিকা শক্তি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট বিনিময়ের রূপগুলির মধ্যেও দেখা দেয়। অন্যদিকে এই পদ্ধতি, এইসব বিপুলাকার উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে এই বিরোধগুলি দূর করার উপায়ও বিকশিত করে তোলে। সুতরাং, নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বিরোধ-গুলি যদি ১৮০০ সাল নাগাদ রূপ পেতে শুরু করে থাকে, তাহলে সেগুলি দূর করার উপায়সমূহের ক্ষেত্রেও এটা আরও বেশি সত্যি। সন্ত্রাসের রাজত্বের সময়, পারীর 'নিঃস্ব' জনগণ স্বল্পকালের জন্যে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে পেরেছিল (আর এইভাবে খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও, তারা বুর্জোয়া বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিল)। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তারা শুধু এটাই প্রমাণ করেছিল যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা কত অসম্ভব। যে প্রলেতারিয়েত তখন একটা নতুন শ্রেণীর মধ্যমণি হিসাবে এইসব 'নিঃস্ব' জনগণের মধ্যে থেকে প্রথম জন্ম নিতে শুরু করেছে, তখনও সে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে একেবারে অক্ষম; তখনও নিপীড়িত, নির্যাতীত হিসাবেই তার আত্মপ্রকাশ, সে তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে অপারগ এবং বড়জোর বাইরে থেকে কিংবা উপরতলা থেকে তাকে সাহায্য করা যায়।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিও সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রভাবিত করে। তাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা এবং অপরিণত শ্রেণীগত পরিবেশ মিলে গিয়েছিল অপরিণত তত্ত্বগুলির সঙ্গে। যেসব সামাজিক সমস্যা তখনও অপরিণত আর্থ-ব্যবস্থায় অন্তর্লীন ছিল, ইউটো-পীয়ানরা সেগুলির সমাধান বার করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা থেকে। সমাজের সবকিছুকেই অন্যায়, যুক্তি-বিরোধী বলে মনে হয়েছিল আর তাই এগুলিকে দূর করার দায়িত্ব বর্তেছিল যুক্তির ওপর। এই জন্যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল একটা নতুন ও আরও নিখুঁত সামাজিক ব্যবস্থা আবিষ্কার করার এবং এটাকে সমাজের ওপর প্রচারের মাধ্যমে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার, আর যেখানেই সম্ভব আদর্শ পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে সমাজের ওপর আরোপ করার। এইসব নতুন

সমাজব্যবস্থার পক্ষে ইউটোপিয়ায় পর্যবসিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল ; এগুলিকে যতই নিখুঁত করে তোলার জন্যে মাথা ঘামানো হচ্ছিল, ততই সেগুলির অনিবার্য পরিণতি ঘটছিল নিছক কাল্পনিকতায়। এই তথ্যগুলি উল্লেখ করার পর, এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আর একমুহূর্তও আলোচনা করতে চাই না, এটা এখন পুরোপুরি অতীতের ব্যাপার। আমাদের কাছে হাস্যকর এইসব উদ্ভট কল্পনা নিয়ে গুরুগম্ভীরভাবে কথার মারপ্যাঁচ চালানোর এবং এই ধরনের 'পাগলামি'র পটভূমিতে নিজেদের রসকষহীন যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বে উচ্চকিত হওয়ার বিষয়টিকে আমরা এখন হের ড্যুরিং-এর মতো চুনোপুঁটি লেখকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। যেসব বিস্ময়কর মহৎ চিন্তা ও চিন্তার বীজ এইসব কল্পনার আবরণ ভেদ করে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়, সেগুলি আমাদের আনন্দের সামগ্রী, অথচ এইগুলি সম্পর্কে এই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা একেবারে অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ ছিলেন মহান ফরাসি বিপ্লবের সন্তান, এই বিপ্লব শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স তিরিশও হয় নি। এই বিপ্লবে সুবিধাভোগী অলস শ্রেণী-গুলি, অভিজাত ও পুরোহিতদের বিরুদ্ধে থার্ড এস্টেট-এর, অর্থাৎ উৎপাদন ও বাণিজ্যে সক্রিয় জাতির বিপুলসংখ্যক জনগণের, বিজয় ঘটে। কিন্তু থার্ড এস্টেট-এর বিজয় অতিশীঘ্রই এই 'এস্টেট'-এর একটা ক্ষুদ্রাংশের বিজয় হিসাবে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ সমাজের একটা সুবিধাভোগী অংশরূপে সম্পত্তিবান বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়ারা নিশ্চিতভাবেই দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে, অংশত অভিজাত সম্প্রদায় এবং চার্চের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত-করা ও পরে বিক্রি করা জমির ফাটকাবাজির মাধ্যমে এবং অংশত যুদ্ধের ঠিকাদারির মাধ্যমে জাতিকে প্রতারণা করে। ডিরেক্টরেট-এর অধীনে এইসব প্রতারকের আধিপত্যই ফরাসি দেশ ও বিপ্লবকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায় আর এটাই নেপোলিয়নের পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়।

এই জন্যে সাঁ-সিমোঁর কাছে থার্ড এস্টেট ও সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি 'শ্রমিক' ও 'অলসদের' মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রতীয়মান হয়। অলসরা শুধু পুরানো সমাজ থেকে আসা সুবিধাভোগী শ্রেণীই ছিল না, যারা উৎপাদন বা বন্টনে কোনোরকম অংশগ্রহণ না করেই তাদের আয়েরওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত, তারাও ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। শুধু মজুরি-শ্রমিকরাই

শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হয় নি, শিল্প মালিক, ব্যবসাদার ও ব্যাংক-মালিকরাও শ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়েছিল। অলসরা যে বৌদ্ধিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটাই চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন হয়। সম্পত্তির মালিকানাহীন শ্রেণীগুলিরও যে এই ক্ষমতা ছিল না, সেটাও সন্ত্রাসের রাজত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বলে সাঁ-সিমোঁ মনে করেছিলেন। তাহলে কে নেতৃত্ব দেবে, কে পরিচালনা করবে? সাঁ-সিমোঁ ভেবেছিলেন, রিফরমেশন, সুনিশ্চিতভাবেই যা ছিল একটা রহস্যবাদী ও যাজকতান্ত্রিক 'নব্য খ্রিস্টধর্ম', তার পর থেকে ধর্মীয় ভাবধারার যে ঐক্য নষ্ট হয়ে গেছে, বিজ্ঞান ও শিল্প নতুন ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেই ঐক্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে বোঝাতো পণ্ডিতবর্গ এবং শিল্পের প্রতীক ছিল মুখ্যত সক্রিয় বুর্জোয়ারা, শিল্প মালিক, ব্যবসাদার ও ব্যাংক মালিকরা। সাঁ-সিমোঁ ভেবেছিলেন যে এইসব বুর্জোয়ারা নিশ্চিতভাবেই এক ধরনের সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের ট্রাস্টিতে নিজেদের রূপান্তরিত করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শ্রমিকদের তুলনায় কর্তৃত্বমূলক ও আর্থনীতিকভাবে সুবিধাভোগী অবস্থানে থাকবে। ঋণ-বন্টন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন পরিচালনার জন্যে ব্যাংক মালিকদের ডাকতেই হবে। সে সময়ে ফ্রান্সে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠছে এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সবে ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে, তখন এই ধারণা যথার্থই কালোপযোগী ছিল। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ করে যার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই: সব কিছুর মধ্যে প্রথমে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সর্বাধিক সংখ্যক ও সবচেয়ে গরীব শ্রেণীর মানুষদের ওপর।

• সাঁ-সিমোঁ তাঁর জেনিভা-পত্রাবলীতে এই সূত্রটি উপস্থিত করেছিলেন যে 'সব মানুষেরই কাজ করা উচিত'। ঐ একই লেখায় তিনি সন্ত্রাসের রাজত্বকে সম্পত্তির মালিকানাহীন জনগণের রাজত্ব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ঐ জনগণের উদ্দেশে তিনি লেখেন 'দেখ, তোমাদের কমরেডরা যখন দেশের শাসনভার দখল করে, তখন ফ্রান্সের দশা কী হয়েছিল, তারা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল।'[১৫০]

কিন্তু ফরাসি বিপ্লবকে অভিজাত ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পত্তিহীন জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে দেখাটা সেই (শুধু 'অভিজাত ও বুর্জোয়াদের

মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে নয়) ১৮০২ সালে একটা বিরাট সম্ভাবনাময় আবিষ্কার। ১৮১৬ সালে তিনি বলেন রাজনীতি হচ্ছে উৎপাদনের বিজ্ঞান এবং এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অর্থনীতি রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।[১৫১] রাজনৈতিক সংস্থাগুলির ভিত্তি হচ্ছে আর্থনীতিক অবস্থা—এই ধারণাটি এখানে একেবারে ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও খুব স্পষ্টভাবে যে ধারণাটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে জনগণের ওপর রাজনৈতিক শাসনকে ভবিষ্যতে বস্তুসমূহের ওপর শাসনে রূপান্তরিত করা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলির পরিচালনা, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি'—যা নিয়ে সম্প্রতিকালে এত হৈ চৈ হচ্ছে।

১৮১৪ সালে, পারীতে মিত্রশক্তিগুলির প্রবেশ ঘটার অব্যবহিত পরে, এবং আবার ১৮১৫ সালে, একশো দিনব্যাপী যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মিত্রতা এবং উভয় দেশের সঙ্গে জার্মানির মিত্রতা ইউরোপে সমৃদ্ধি ও শান্তির একমাত্র গ্যারাণ্টি সৃষ্টি করতে পারে বলে ঘোষণা করেন, তখন সমসাময়িক ব্যক্তিদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রমাণিত হয়।[১৫২] ওয়াটারলু র যুদ্ধে বিজয়ীদের সঙ্গে ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে মিত্রতার কথা প্রচার করা—জার্মান অধ্যাপকদের বাজে বকবকানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার চাইতে যে কোনোভাবেই অনেক বেশি সৎসাহসের প্রয়োজন।*

স াঁ-সিমোঁর মধ্যে আমরা যেমন কঠোরভাবে আর্থনীতিক নয় এমন এক ধরনের বিস্তৃত ধ্যান-ধারণা ভ্রূণাকারে সন্ধান পাই, যা পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যাবতীয় ধ্যান-ধারণার উৎসস্বরূপ, তেমনি ফুরিয়ের-এর মধ্যে দেখতে পাই প্রচলিত সামাজিক অবস্থার সমালোচনা, যা খাঁটি ফরাসি মেজাজের ও হাস্যরসাত্মক কিন্তু তাই বলে সেটা মোটেই কম অনুপুঙ্খ নয়। ফুরিয়ের বুর্জোয়া, বিপ্লব-পূর্ব তাদের অনুপ্রাণিত পয়গম্বরদের এবং বিপ্লবোত্তর তাদের স্বার্থান্বেষী স্তাবকগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্যমূল্যেই গ্রহণ করেছিলেন। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্যকে তিনি নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন। সমাজে যুক্তিই শুধু রাজত্ব করবে। সভ্যতা হবে সর্বজনীন সুখসমৃদ্ধির আধার, অফুরন্ত হবে মানুষের পূর্ণতা অর্জনের ধারা—এই সব উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যে সমাজ ও সভ্যতার কথা (পূর্ববর্তী) দার্শনিকরা বলে

---

* বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে হের ড্যুরিং-এর বিরোধ নিয়ে এখানে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। সম্পাদক।

গিয়েছিলেন—ফুরিয়ের সেই সব প্রতিশ্রুতিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সমকালীন বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের গালভরা বাকচাতুরীর সামনে। তিনি এটা দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে সর্বত্র সবচেয়ে নিদারুণ বাস্তব আর বাগাড়ম্বরপূর্ণ বুলির মধ্যে সম্পর্ক ঘটেছে এবং বাগাড়ম্বরের এই শোচনীয় পরিণতিতে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।

ফুরিয়ের শুধু একজন সমালোচকই ছিলেন না; তাঁর অচঞ্চল প্রশান্ত চরিত্র তাঁকে ব্যঙ্গপ্রিয় করে তুলেছিল, নিঃসন্দেহে সর্বকালের নামজাদা ব্যঙ্গ লেখকদের মধ্যেই তাঁর স্থান। ফরাসি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর যেসব লোক-ঠকানো ফাটকাবাজি দ্রুত গজিয়ে উঠেছিল এবং দেখা দিয়েছিল ফরাসি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বভাবসুলভ দোকানদারি মনোবৃত্তি—তিনি ছিলেন তার দক্ষ ও বলিষ্ঠ রূপকার। নারী-পুরুষের মধ্যেকার বুর্জোয়া সম্পর্ক এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ছিল আরও নিপুণতায় ভরা। তিনি এটা প্রথম ঘোষণা করেন যে কোনো একটি সমাজে নারী-মুক্তির মাত্রাই সেই সমাজের সার্বিক মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি।[১৫৪]

কিন্তু সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণার ক্ষেত্রেই ফুরিয়ের-এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাধিক। সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি বন্য অবস্থা, বর্বরপ্রথা, পিতৃতন্ত্র-ও সভ্যতা—এই চারটি বিবর্তনমূলক স্তরে বিভক্ত করেছেন। শেষ স্তরটি তথাকথিত বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের (অর্থাৎ ষোড়শ শতকে যে-ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটে) সমরূপ। তিনি এটা প্রমাণ করেন যে,

> 'বন্য অবস্থায় যেসব ভ্রষ্টাচার সরলাকারে প্রচলিত ছিল, সভ্য স্তর তার প্রত্যেকটিকেই একটা জটিল, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, সন্দেহপরায়ণ ও ভণ্ডামির পর্যায়ে উন্নীত করেছে।'

ফুরিয়ের এটাও প্রতিপন্ন করেন যে সভ্যতার গতিবিধি 'কুটিল', বিরোধাকীর্ণ; বিরোধগুলিকে সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে, অথচ সেগুলির সমাধান তার সাধ্যাতীত; সুতরাং যে লক্ষ্য সে অর্জন করতে চায় অথবা অর্জন করার ভান করে, তার বিপরীত অবস্থানেই তাকে পৌঁছাতে হয়।[১৫৫] তাই তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন:

'সভ্যতার আমলে অঢেল সম্পদ থেকেই দারিদ্রের জন্ম হয়।'[১৫৬]

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে ফুরিয়ের তাঁর সমসাময়িক হেগেলের মতোই ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ঐ

ডায়ালেকটিকসকে ব্যবহার করেই তিনি পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের অসীম ক্ষমতা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি হাজির করে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে তার উত্থান ও পতনের যুগ থাকে,[১৫১] এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎকেও তিনি ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। কাণ্ট যেমন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন, ইতিহাস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফুরিয়েরও তেমনি প্রবর্তন করেছেন মানবজাতির শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের ধারণা।

তখন ফরাসি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল বিপ্লবের ঝটিকা-প্রবাহ; আর ইংল্যাণ্ডে, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে হলেও, বিপ্লব প্রচণ্ড গতিতে পালাবদল ঘটাচ্ছিল। বাষ্প ও নতুন যন্ত্র-নির্মাণকারী মেসিনারি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করছিল, আর এইভাবে বুর্জোয়া সমাজের পুরো ভিত্তিটাই আমূল পাল্টে যাচ্ছিল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-যুগের মন্থর অগ্রগতির পালে লেগেছিল উৎপাদনের ঝড়ের গতি। নিরন্তর তীব্র গতিতে সমাজ ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল বৃহৎ পুঁজিপতি ও সম্পত্তিহীন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে, আগেকার সুস্থির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায়, জনসংখ্যার সবচেয়ে দোদুল্যমান অংশ হিসাবে কারিগর ও ক্ষুদ্র দোকানদারদের অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

নতুন উৎপাদন পদ্ধতি তখনও তার উত্থানপর্বের সূচনায়; তখনও পর্যন্ত এটাই স্বাভাবিক উৎপাদন-ধারা—তৎকালীন অবস্থায় একমাত্র সম্ভাব্য ধারা। তা সত্ত্বেও, এই উৎপাদন পদ্ধতি তখনই সামাজিক বিকৃতিকে বিকটাকারে ফুটিয়ে তুলেছিল—গৃহহারা মানুষদের জড়ো করছিল বড়ো বড়ো শহরের নোংরা, ঘিঞ্জি এলাকায়; এদের চিরাচরিত নৈতিক বন্ধন, পিতৃতান্ত্রিক আনুগত্য, পারিবারিক সম্পর্ক সবই শিথিল হয়ে পড়ছিল; বিশেষ করে নারী ও শিশুদের হাড়ভাঙা খাটুনি একটা ভয়ংকর চেহারা নিয়েছিল; হঠাৎ একটা নতুন অবস্থার মধ্যে (গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্পে, নিরাপদ জীবনযাপনের পরিবেশ থেকে দৈনন্দিন পরিবর্তনশীল অনিশ্চিত অবস্থায়) নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিরাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

এইরকম একটা পালাবদলের কালে সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হলেন ২৯ বৎসর বয়স্ক একজন শিল্প-মালিক; মহিমান্বিত, শিশুর মতো সরল প্রকৃতির মানুষ, আবার সহজাত জননেতা, সচরাচর যাঁর দৃষ্টান্ত মেলে না। রবার্ট-

ওয়েন বস্তুবাদী দার্শনিকদের এই শিক্ষাটি গ্রহণ করেছিলেন : একদিকে বংশধারা এবং অন্যদিকে ব্যক্তির জীবন-পরিবেশ, বিশেষ করে তার বিকাশ-পর্বের পরিবেশ, মানুষের চরিত্রকে রূপ দেয়। তাঁর শ্রেণীর বেশির ভাগ মানুষ শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে শুধু বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যই দেখতে পেয়েছিলেন ; তাঁদের কাছে এই বিপ্লব ঘোলা জলে মাছ ধরা এবং রাতারাতি বিপুল সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি এর মধ্যে তাঁর প্রিয় তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এবং বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। ম্যানচেস্টারে পাঁচশোরও বেশি শ্রমিকের একটি কারখানায় সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বটিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেন। ১৮০০ সাল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত, ম্যানেজিং পার্টনার হিসাবে তিনি স্কটল্যাণ্ডে নিউ লানার্ক-এর একটি বড় কাপড়ের কল ঐ একই নীতিতে পরিচালনা করেন, তবে এখানে তাঁর কাজের স্বাধীনতা ছিল আরও বেশি ; এখানেও তিনি সফল হন এবং এই সাফল্য তাঁকে ইউরোপে খ্যাতিমান করে তোলে। বিচিত্র ধরনের লোকজন নিয়ে, যাদের বেশির ভাগই নৈরাশ্য-পীড়িত, তিনি একটি আদর্শ উপনিবেশ গড়ে তোলেন, যার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫০০। এই উপনিবেশে মাতলামি, পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট, মামলা-মোকদ্দমা, গরীবদের জন্যে আইন ও দানধ্যানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মানুষকে শুধু মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ দিয়ে আর বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে সযত্নে লালন-পালনের পরিবেশ গড়ে তুলেই এই সাফল্য অর্জিত হয়। শিশু-বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম প্রবর্তক, আর নিউ লানার্কেই এটা প্রথম চালু হয়। দু'বছর বয়সেই শিশুরা এই স্কুলে যেত এবং এখানে তারা এত হাসিখুশির মধ্যে থাকত যে তারা আর বাড়ি ফিরতে চাইত না। তাঁর প্রতিযোগী মালিকরা যেখানে লোকজনকে রোজ তের-চৌদ্দ ঘণ্টা মেহনত করাত, সেখানে নিউ লানার্ক-এ রোজকার কাজের সময় ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা। তুলোর সঙ্কটে যখন চার মাস ধরে কাজ বন্ধ ছিল, তখনও তাঁর শ্রমিকদের পুরো মজুরি পেতে কোনো অসুবিধা হয় নি। এসব সত্ত্বেও ব্যবসা থেকে আয় দ্বিগুণেরও বেশি হয় এবং মালিকরাও প্রচুর মুনাফা করে।

এতেও ওয়েন খুশি হতে পারেন নি। তিনি শ্রমিকদের যে-অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন, সেটাও তাঁর কাছে ছিল মানুষের যোগ্য জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে।

'এইসব লোক আমার করুণার পাত্র।'

অপেক্ষাকৃত যে ভালো পরিবেশ তিনি তাদের জন্যে গড়ে তুলেছিলেন, সেটাও তাদের চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচারবুদ্ধিসম্মত বহুমুখী বিকাশের পক্ষে উপযোগী ছিল না, তাদের গুণাবলীর স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে তো নয়ই।

> 'আর তা সত্ত্বেও এই ২৫০০ শ্রমজীবী সমাজের জন্যে রোজ যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছিল, তা সৃষ্টি করতে অনধিক অর্ধশতক আগে ৬০,০০০ জনসংখ্যাবিশিষ্ট শ্রমজীবীর প্রয়োজন হতো। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল ৬০,০০০ ব্যক্তির যে পরিমাণ সম্পদ ভোগ করার কথা ছিল, তার সঙ্গে ২,৫০০ ব্যক্তির ভোগ-করা সম্পদের পরিমাণের পার্থক্য কোথায় গেল?'

উত্তরটা পরিষ্কারই ছিল। প্রতিষ্ঠানটির মালিকদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির ওপর ৫ শতাংশ পাওনা মেটানো এবং তার ওপর ৩০০,০০০ পাউণ্ডের বেশি মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার কাজে এটা ব্যবহৃত হয়েছিল। আর নিউ লানার্ক-এর ক্ষেত্রে যা বৈধ ছিল, ইংল্যাণ্ডের যাবতীয় কারখানার ক্ষেত্রে সেটা বৈধ ছিল আরও ব্যাপকভাবে।

> 'যন্ত্র যদি এই নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করত (খানিকটা বেঠিকভাবে কথাটা বলা হয়েছে), তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের যুদ্ধ এবং সমাজের অভিজাত নীতিগুলির প্রতি সমর্থন বজায় রাখা সম্ভব হতো না। তবুও এই নতুন ক্ষমতার সৃষ্টি করেছিল শ্রমিকশ্রেণী।'*

সুতরাং তারাই এই নতুন শক্তির ফলাফলগুলির অধিকারী। এই নব-সৃষ্টি বিপুল উৎপাদিকা শক্তি, এতদিন যা কিছু মানুষকে সম্পদশালী হয়ে উঠতে এবং জনগণকে পদানত রাখতে সহায়ক হয়েছে, ওয়েনের কাছে সামাজিক পুনর্গঠনের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ এনে দেয়; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের জন্যে এই উৎপাদিকা শক্তির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ওয়েনের সাম্যবাদ নিছক ব্যবসায়িক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে, বলতে গেলে, এটা ছিল বাণিজ্যিক হিসাব-নিকাশের ফল। বরাবরই এর এই

---

* 'দি রিভোলিউশন ইন মাইণ্ড অ্যাণ্ড প্র্যাক্টিস', পৃ ২১। 'ইউরোপের সমস্ত লাল প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও সোসালিস্টদের' উদ্দেশে স্মারক ভাষণ এবং ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার, ১৮৪৮ এবং 'রানী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের নিকট প্রেরিত। (এঙ্গেলসের টীকা)।

ব্যবহারিক চরিত্র বজায় ছিল। তাই দেখা যায়, ওয়েন ১৮২৩ সালে আয়ারল্যাণ্ডে গরীব-দুঃখীদের ত্রাণের জন্যে সাম্যবাদী উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করে সেগুলির প্রতিষ্ঠার ব্যয়, বাৎসরিক খরচা এবং সম্ভাব্য আয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরি করেছিলেন।[১৫৮] ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে (ভিত্তি-পরিকল্পনা ও অন্যান্য সবাদকই এর মধ্যে ছিল) এমন রূপরেখা রচনা করেছিলেন যে সামাজিক সংস্কারের ওয়েনীয় পরিকল্পনা একবার স্বীকার করে নিলে তার বিস্তারিত বিষয় বিন্যাস সম্পর্কে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুই বলা চলে না।

সাম্যবাদের দিকে ওয়েনের পদক্ষেপ, তাঁর জীবনে একটা পালাবদল। যতদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন শুধু সমাজহিতৈষী, ততদিন তাঁর জীবনে সম্পদ, উচ্চ প্রশংসা, মর্যাদা ও খ্যাতির অন্ত ছিল না। ইউরোপে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর স্বশ্রেণীর লোকেরাই শুধু নয়, রাষ্ট্রবিদ ও রাজন্যবর্গও তাঁর কথা প্রসন্নচিত্তে শুনতেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর সাম্যবাদী তত্ত্ব উপস্থিত করলেন, তখন ব্যাপাটা অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি—এই তিনটি বিষয় সমাজ সংস্কারের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করছে বলে তাঁর কাছে বিশেষভাবে মনে হয়েছিল। এগুলিকে আক্রমণ করলে তাঁর কী ঘটবে তা তিনি জানতেন—অভিজাত সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করবে, সামাজিক মর্যাদার সবটুকুই তিনি হারাবেন। কিন্তু পরিণতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঐ বিষয়গুলিকে তিনি আক্রমণ করলেন; আর তিনি যা ভেবেছিলেন ফলাফল সেই রকমই হয়েছিল। অভিজাত সমাজের দ্বারা নির্বাসিত ও পত্রপত্রিকার নীরবতার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এবং তাঁর সর্বস্ব নিয়োগ করে আমেরিকায় তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাতে সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি সরাসরি শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ঝোঁকেন এবং তিরিশ বছরে ধরে তাদের মধ্যে কাজ করে যান। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি সামাজিক আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রতিটি যথার্থ অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত ছিল। এইভাবে পাঁচ বছর ধরে লড়াই চালিয়ে, ১৮১৯ সালে তিনি কারখানায় নারী ও শিশু শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় সীমিত করা সংক্রান্ত প্রথম আইন পাশ করাতে বাধ্য করেন।[১৫৯] যে প্রথম কংগ্রেসে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন একটি বড় ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনে ঐক্যবদ্ধ হয়, তিনি ছিলেন তার সভাপতি।[১৬০]

সমাজের সম্পূর্ণ সাম্যবাদী পুনর্গঠনের রূপান্তরকালীন পদক্ষেপ হিসাবে তিনি একদিকে খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করেন। সেই সময় থেকে এগুলি অন্ততপক্ষে এই বাস্তব প্রমাণ হাজির করতে পেরেছে যে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকরা সামাজিকভাবে একেবারে অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, শ্রম-নোটের মাধ্যমে শ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময়ের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমের বাজার চালু করেন[১৬১], যে শ্রম-নোটের একক হিসাবে এক ঘণ্টার কাজকে ধরে নেওয়া হয়েছিল; এইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অনেক কাল পরে প্রুধোঁ যে বিনিময় ব্যাংকের কথা বলেন, এগুলি ছিল তার প্রথম রূপ;[১৬২] বিনিময় ব্যাংকগুলির সঙ্গে এগুলির শুধু এইটুকুই পার্থক্য ছিল যে এগুলিকে যাবতীয় সামাজিক ব্যাধির সর্বরোগহর ওষুধ হিসাবে দাবি করা হয় নি, সমাজে ব্যাপকতর মৌলিক বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।

হের ড্যুরিং তাঁর 'চরম ও পরম সত্যে'র গজদন্তমিনার থেকে এই ধরনের মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ করেছেন, যার সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করেছি। একদিক থেকে এই অবজ্ঞা একেবারে অহেতুক নয়; কেননা মূলত এর কারণ হচ্ছে তিনজন ইউরোপীয় চিন্তানায়কের রচনাবলী সম্বন্ধে সত্যিই এক ভয়াবহ অজ্ঞতা। তাই হের ড্যুরিং সাঁ-সিমোঁ সম্পর্কে বলেছেন:

> 'তাঁর আসল ধারণাটি মূলত সঠিক এবং কিছু একপেশে দিক ছাড়া, এমনকি এখনও পর্যন্ত এটা প্রকৃত সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যোগায়।'

যদিও এটা স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে সাঁ-সিমোঁর কিছু লেখা হের ড্যুরিং-এর হাতের কাছেই ছিল, তবুও সাঁ-সিমোঁর 'আসল ধারণা'টি খুঁজে পাওয়ার জন্যে প্রাসঙ্গিক সাতাশটি পৃষ্ঠা জুড়ে আমাদের অনুসন্ধান, কোয়েসনের 'ট্যাবলো'তে 'কোয়েসনে নিজে কী বলেছিলেন' তা খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের আগেকার অনুসন্ধানের মতোই নিষ্ফল হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের এই রকম বাগাড়ম্বর শুনেই শান্ত থাকতে হয়েছে:

> 'কল্পনা ও সমাজ-হিতৈষণার আবেগ···তার সঙ্গে জড়িত উদ্ভট কল্পনার বাড়াবাড়ি সাঁ-সিমোঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।'

ফুরিয়ের সম্বন্ধে হের ড্যুরিং যা জানেন কিংবা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন তা হচ্ছে রোম্যান্টিক খুঁটিনাটিতে ভরা তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্নবিলাস। ফুরিয়ের 'বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সমালোচনার যেসব প্রচেষ্টা সময়-সময় করেছেন,' সেটা তিনি কিভাবে করেছেন, তা বিচারের চাইতে এটা অবশ্য ফুরিয়ের অপেক্ষা হের ড্যুরিং-এর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে 'অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। সময়-সময়! বস্তুতপক্ষে, তাঁর রচনাবলীর প্রতিটি পৃষ্ঠা আমাদের অহংকৃত সভ্যতার নিদারুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সমালোচনার দীপ্তিতে ভাস্বর। এটা এই কথা বলার সামিল যে হের ড্যুরিং শুধু 'সময়-সময়' হের ড্যুরিংকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। রবার্ট ওয়েনের জন্যে বরাদ্দ করা বারোটি পৃষ্ঠায়, হের ড্যুরিং কূপমণ্ডূক সারগান্ট এর নিকৃষ্ট জীবনচরিত ছাড়া অন্য কোনো সূত্র ব্যবহার করেন নি; সারগান্ট নিজেও বিবাহ ও সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়েনের সবচেয়ে মূল্যবান লেখাগুলির হদিশ জানতেন না।[১৬৩] তাই হের ড্যুরিং এতটা বলতে সাহস পেয়েছেন যে 'সাম্যবাদ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা' ওয়েনের ছিল, তা আমরা মনে করতে পারি না। হের ড্যুরিং যদি ওয়েনের 'বুক অব নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড'' বইটি একটু নাড়াচাড়া করে দেখতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর নজরে আসত যে শ্রমের প্রতি সমান দায়দায়িত্ব ও ব্যবহার্য দ্রব্যের ওপর সমান অধিকার, যেটাকে ওয়েন সবসময়েই নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে যুক্ত করতেন, সমন্বিত সাম্যবাদের ধারণা সেখানে শুধু স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায় নি, ভাবী সাম্যবাদী সমাজের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ প্রকল্পের—তার ভিত্তি, সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়—রূপরেখা স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেউ যদি 'সমাজবাদী চিন্তা-জগতের প্রতিনিধিদের রচনাবলীর প্রত্যক্ষ অনুশীলন' শুধু তার শিরোনাম, কিংবা বড়োজোর এইসব রচনার একগুচ্ছ নীতিবাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে স্বভাবতই তার পক্ষে এই ধরনের নির্বোধ ও উদ্ভট কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ওয়েন 'সুস্পষ্ট সাম্যবাদ' শুধু প্রচারই করেন নি; পাঁচ বছর ধরে (তিরিশের দশকের শেষে ও চল্লিশের দশকের শুরুতে) তিনি হ্যাম্পশায়ারের হারমনি হল উপনিবেশে[১৬৪] এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন, যার সুস্পষ্ট সাম্যবাদী বৈশিষ্ট্য ছিল সন্দেহাতীত। এই আদর্শ সাম্যবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু সারগান্ট এসব অথবা ১৮৩৬ থেকে

১৮৫০ সালের মধ্যে ওয়েনের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আর তার ফলে হের ড্যুরিং-এর 'সুগভীর ইতিহাস-বিশ্লেষণ'ও গভীর অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। হের ড্যুরিং ওয়েনকে 'প্রতিটি বিষয়ে বিরক্তিকর বদান্যতার যথার্থই একটি দৈত্য' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সেই একই হের ড্যুরিং যখন সেইসব বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করতে শুরু করেন, যেগুলির শিরোনাম ও নীতিবাক্যগুলির চাইতে বেশি কিছু তাঁর জানা নেই, তখন আমরা তাঁকে 'সমস্ত বিষয়ে বিরক্তিকর বদান্যতার যথার্থই একটি দৈত্য' বলে কোনোভাবেই অভিহিত করতে পারি না, কেননা, সেটা আমাদের মুখে নিশ্চয়ই 'গালাগালি' হয়ে দাঁড়াবে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ইউটোপীয় চিন্তাবিদরা এই কারণেই ইউটোপীয় ছিলেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের পক্ষে অন্য রকম কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। নতুন সমাজের উপাদান-গুলিকে তাঁদের মগজ থেকেই উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, কারণ পুরানো সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের উপাদানগুলি তখনও সাধারণভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি ; নতুন সৌধ নির্মাণের বুনিয়াদি পরিকল্পনার জন্যে তারা শুধু যুক্তির কাছেই আবেদন জানাতে পারতেন। আর সেটা একমাত্র এই কারণেই যে তাঁরা তখনও সমকালীন ইতিহাসের কাছে আবেদন জানাতে পারতেন না। কিন্তু আজ যখন, তাঁদের সময় থেকে প্রায় আশি বৎসর পরে, হের ড্যুরিং আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন এবং একটা নতুন সমাজব্যবস্থার 'কর্তৃত্বব্যঞ্জক' দাবি উপস্থিত করছেন,—যে ব্যবস্থাটি তাঁর আয়ত্তাধীন ইতিহাসের উপকরণ থেকে এবং তার অবধারিত পরিণতি হিসাবে সৃষ্টি হয় নি, এটা নির্মিত হয়েছে তাঁর সার্বভৌম মগজে, পরমসত্যে পরিপূর্ণ তাঁর মনে,—তখন তিনি সর্বত্র নিকৃষ্ট উত্তর-সূরীদের গন্ধ পেলেও নিজেই ইউটোপীয় চিন্তাবিদদের একজন নিকৃষ্ট উত্তর-সূরী, সাম্প্রতিকতম ইউটোপীয়। তিনি মহৎ ইউটোপীয় চিন্তাবিদদের 'সামাজিক অ্যালকেমিস্ট' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তা হতেও পারে। একটা যুগে অ্যালকেমির প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু সেই সময়ের পর থেকে আধুনিক শিল্প পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে এমন একটা প্রচণ্ড সংঘাতের মুখে এনে ফেলেছে যাতে বলা যায় এই উৎপাদন পদ্ধতির আসন্ন ধ্বংস স্পষ্টত প্রতীয়মান ; বিকাশের বর্তমান স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করেই নতুন উৎপাদিকা শক্তিসমূহের

স্থায়িত্ব ও অধিকতর বিকাশ সম্ভব ; এতদিনকার প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং তীক্ষ্ণতর রূপে সেই সংগ্রামের প্রতিনিয়ত 'আত্মপ্রকাশ সমস্ত সভ্য দেশকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে আর সেটা প্রতিদিন আরও উগ্র হয়ে উঠছে ; ইতিহাসের এইসব পারস্পরিক যোগসূত্র. সামাজিক রূপান্তরের পূর্বশর্তগুলি,—যাকে ইতিহাসের পারস্পরিক যোগসূত্রগুলি অনিবার্য করে তুলেছে, এবং রূপান্তরের পূর্বশর্তগুলির দ্বারা নির্ধারিত এই রূপান্তরের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিমধ্যেই অনুধাবন করা গিয়েছে। আর হের ড্যুরিং যদি একটা নতুন ইউটোপীয় সমাজব্যবস্থা. আয়ত্তাধীন আর্থনীতিক উপকরণের বদলে তাঁর সার্বভৌম মগজ থেকে উদ্ভাবন করেন, তাহলে তিনি শুধু 'সামাজিক অ্যালকেমি'র চর্চাই করবেন না ; তিনি এমন একজন ব্যক্তির মতো আচরণ করবেন, যিনি আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র আবিষ্কার ও তার সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠার পরও সেকেলে অ্যালকেমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং পারমাণবিক গুরুত্ব, আণবিক সূত্র, পরমাণুর যোজ্যতা, কেলাসবিদ্যা এবং বর্ণালী বিশ্লেষণকে একমাত্র পরশমণি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।

দুই

তত্ত্বগত ভিত্তি

ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বের গোড়ার কথাই হচ্ছে মানুষের জীবনধারণের উপকরণ সমূহের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পরেই ঐ উপকরণগুলির বিনিময় সমস্ত সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি, ইতিহাসে যত সমাজের উদ্ভব ঘটেছে, তারা কী উৎপাদন করেছে, কিভাবে উৎপাদন করেছে এবং কিভাবে উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময় করেছে,—তার ওপর ভিত্তি করেই সম্পদের বণ্টন সমাধা হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত ব্যবস্থায় সমাজের বিভাজন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাবতীয় সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের চূড়ান্ত কারণগুলি মানুষের মগজে, গভীর অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের শাশ্বত সত্য ও ন্যায়বোধের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতিসমূহের পরিবর্তনের মধ্যে। এদের অনুসন্ধান করতে হবে দর্শনের জগতে নয়, প্রতিটি নির্দিষ্ট যুগের আর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক সংস্থাগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায্য হয়ে পড়েছে, যুক্তি-যুক্তিহীনতায়, সত্য-মিথ্যায়* পর্যবসিত হয়েছে।

এই ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি একমাত্র এটাই প্রমাণ করে যে উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির ভিতরে নিঃশব্দে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যা আগেকার আর্থনীতিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই সামাজিক ব্যবস্থাকে আর রক্ষা করতে পারে না। এর থেকে এটাও প্রতিপন্ন হয় যে এইসব প্রকট অসামঞ্জস্য কাটিয়ে ওঠার উপায়গুলিও কম-বেশি পরিণত অবস্থার মধ্যে, পরিবর্তিত উৎপাদন পদ্ধতিগুলির অভ্যন্তরে উপস্থিত থাকতে বাধ্য। কারও মগজ থেকে এই উপায়গুলি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন নেই। মগজের সাহায্যে এগুলিকে আবিষ্কার করতে হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তব উপাদানের মধ্যে।

* গ্যোয়েটের 'ফাউস্ট'-র মেফিস্টোফিলিস, খণ্ড ১, দৃশ্য ৪। সম্পাদক।

তাই এই সম্পর্কে আধুনিক সমাজবাদের বক্তব্যটি কী ?

এখন এটা যথেষ্ট ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে বর্তমান সমাজ-কাঠামো এযুগের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়াদের সৃষ্টি। 'মার্কসের সময় থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উৎপাদনের ধরনটি আঞ্চলিক ও ভূ সম্পত্তিগত বিশেষ সুবিধা আর সেই সঙ্গে সামন্তপ্রথার পারস্পরিক ব্যক্তিগত বন্ধনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছিল। বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রথাকে ভেঙে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তুলেছিল বুর্জোয়া সমাজের কাঠামো, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইনের চোখে সকল পণ্যমালিকের সমান অধিকার এবং পুঁজিবাদের গৌরবময় রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অবাধ অগ্রগতি ঘটতে থাকে। বাষ্পশক্তি, যন্ত্র এবং মেসিনের দ্বারা তৈরি যন্ত্রপাতি যখন পুরানো যন্ত্রোৎপাদনকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করল, তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় বিকাশমান উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং অভূতপূর্ব মাত্রায় বিকশিত হতে থাকল। কিন্তু ঠিক যেমন পুরানো শিল্পোৎপাদন ও হস্ত-শিল্প তার নিজস্ব প্রভাবে আরও বিকাশলাভ করে তৎকালীন গিল্ডগুলির সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংঘাতে এসেছিল, তেমনি এখন আধুনিক শিল্প, তার আরও উন্নততর বিকাশের মধ্যে দিয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বেড়াজালের সঙ্গে সংঘাতে আসছে, যে বেড়াজাল আধুনিক শিল্পকে তার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে চায়। নতুন উৎপাদনী শক্তিসমূহ, তাদের কাজে লাগাতে পারে এমন পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গিয়েছে। উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেকার এই বিরোধ—আদি পাপ ও দৈব ন্যায়বিচারের মতো মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় নি। আসলে এটা বাস্তব ক্ষেত্রেই রয়েছে, এমনকি যে সব মানুষ এই বিরোধ বাধায়, তাদের ইচ্ছা ও কার্যকলাপের তোয়াক্কা না রেখেই এটা অস্তিত্ববান। আধুনিক সমাজবাদ চিন্তার জগতে, এই বাস্তব বিরোধের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়; যে শ্রেণী এই বিরোধের ফলে প্রত্যক্ষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, সেই শ্রমিকশ্রেণীর মনোজগতে এর মানসিক প্রতিচ্ছবি।

এখন দেখা যাক এই বিরোধের বিষয়গুলি কী ?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের আগে, অর্থাৎ মধ্যযুগে ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত

মালিকানা ছিল এই ব্যবস্থার ভিত্তি, (গ্রামাঞ্চলে) এই ভিত্তি ছিল ছোট কৃষক, ফ্রিম্যান কিংবা ভূমিদাসদের চাষ, শহরে (গিল্ডে সংঘবদ্ধ) হস্তশিল্প। শ্রমের উপকরণ—জমি, কৃষির হাল-হাতিয়ার, ছোট কারখানা, হস্তচালিত যন্ত্রপাতি—ইত্যাদি সবই ছিল একজন ব্যক্তির শ্রমের হাতিয়ার, একজন শ্রমিকের ব্যবহারোপযোগী, আর সেই জন্যে স্বভাবতই এইগুলি ছোট, বেঁটে-খাটো ও সীমাবদ্ধ ব্যবহারের মতো করে তৈরি। আর ঠিক এই কারণেই সেগুলি সাধারণত প্রত্যক্ষ উৎপাদনের মালিকানাভুক্ত থাকত। এইসব ছড়ানো-ছিটানো সীমাবদ্ধ উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে একত্র করা, এর প্রসার ঘটানো এবং বর্তমান কালের শক্তিশালী উৎপাদনী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা—এইগুলিই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার নায়ক বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'ক্যাপিটাল'-এর চতুর্থ অধ্যায়ে মার্কস বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ শতকের পর থেকে—সরল সমবায়, ম্যানুফ্যাকচার ও আধুনিক শিল্প—এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস কিভাবে বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু সেখানে এটাও দেখানো হয়েছে, বুর্জোয়ারা এইসব সীমাবদ্ধ উৎপাদনের হাতিয়ারকে রূপান্তরিত না করে শক্তিশালী উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত করতে পারে নি ; একই সঙ্গে তারা ব্যক্তিগত উৎপাদনের হাতিয়ারকে সামাজিক উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত করে যা একমাত্র বহু মানুষের যৌথ শ্রমের মাধ্যমেই কাজে লাগানো সম্ভব। চরকা হস্তচালিত তাঁত ও কামারের হাতুড়িকে অপসারিত করে দেখা দিল সুতো তৈরির যন্ত্র, যন্ত্রচালিত তাঁত, বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত হাতুড়ি ; ব্যক্তি-মালিকানাধীন ছোট ছোট কারখানার জায়গায় উদ্ভব ঘটল হাজার হাজার শ্রমিকের সহযোগিতামূলক উৎপাদনের ভিত্তিতে বড় বড় কারখানা। অনুরূপভাবে, উৎপাদনও ব্যক্তিগত কর্মধারা থেকে সামাজিক কর্মধারায় রূপান্তরিত হলো এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী আর ব্যক্তিগত রইল না, সামাজিক দ্রব্যসামগ্রীতে রূপান্তরিত হলো। সুতো, কাপড়, ধাতুর জিনিসপত্র—যা কিছু কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছিল, সেই সবই ছিল বহু শ্রমিকের যৌথ উৎপন্ন দ্রব্য, সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসার আগে সেগুলিকে পরপর বহু শ্রমিকের হাত-ঘুরে আসতে হয়েছিল। 'এটা আমি তৈরি করেছি ; এটা আমার তৈরি জিনিস'—কোনো একজন মানুষের পক্ষে একথা বলা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যেখানে, একটা নির্দিষ্ট সমাজে, উৎপাদনের আসল রূপ হচ্ছে

স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম-বিভাগ (যা ধীরগতিতে অগ্রসর হয় এবং পরিকল্পনামাফিক নয়), সেখানে উৎপন্নদ্রব্য পণ্যের রূপ নয় এবং এগুলির পারস্পরিক বিনিময়, কেনা-বেচা পৃথক পৃথক উৎপাদকের নানা রকম চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। মধ্যযুগে এই রকমই ঘটেছিল।' যেমন, কৃষকরা কারিগরদের কাছে কৃষিদ্রব্য বিক্রি করত আর তাদের কাছ থেকে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি কিনত। ব্যক্তিগত উৎপাদকদের, পণ্যোৎপাদকদের এই সমাজে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখনকার সমাজে যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিকল্পনাহীন শ্রম-বিভাগের প্রাধান্য ছিল, তার অভ্যন্তরে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক শ্রম-বিভাগের উদ্ভব ঘটে, যা সংগঠিত হয় কারখানার মধ্যে; ব্যক্তিগত উৎপাদনের পাশাপাশি দেখা দেয় সামাজিক উৎপাদন। উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হতে থাকে একই বাজারে আর সেই কারণে সেগুলির দামও মোটামুটিভাবে একই রকম হয়। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক সংগঠন স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম-বিভাগের চাইতে শক্তিশালী ছিল। সমষ্টিগত সামাজিক শক্তিগুলির সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা কারখানাগুলি, ব্যক্তিগত ছোট ছোট উৎপাদকদের পণ্যসমূহের চাইতে, অনেক সস্তায় তাদের পণ্য উৎপাদন করছিল। ব্যক্তিগত উৎপাদন বিভিন্ন বিভাগে একের পর এক তার অবস্থান হারাচ্ছিল। সামাজিক উৎপাদন যাবতীয় পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এর বৈপ্লবিক চরিত্র তখন সামান্যই নজরে পড়েছিল; যার ফলে এটা চালু করা হয়েছিল পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও তার বিকাশের হাতিয়ার হিসাবে। এর উদ্ভব কালে, পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়ের কতকগুলি উপকরণকে এ হাতের কাছে পেয়েছিল এবং সেগুলিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছিল: যেমন বণিক পুঁজি, হস্তশিল্প, মজুরি-শ্রম। সামাজিক উৎপাদন এইভাবে হয়ে উঠেছিল পণ্যোৎপাদনের একটা নতুন রূপ, অবশ্য পণ্যোৎপাদনের আওতায় আত্মসাতের পুরানো রূপগুলিও পরিপূর্ণভাবে বজায় থাকল এবং এর উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এইগুলি প্রযোজ্য হলো।

পণ্যোৎপাদনের বিবর্তনে মধ্যযুগের অবস্থায় শ্রমজাত দ্রব্যের মালিক কে— এই প্রশ্নটি ওঠা সম্ভবই ছিল না। সাধারণত ব্যক্তিগত উৎপাদক তার নিজস্ব কাঁচামাল থেকে, যা সাধারণত তার নিজের তৈরি—তার নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্বহস্তে বা পরিবারের মেহনত খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করত। সুতরাং নিজের তৈরি পণ্যটিকে তার নিজের আত্মসাৎ করার প্রয়োজনই ছিল না।

স্বভাবতই এটা ছিল তার নিজেরই অধিকারভুক্ত। সুতরাং পণ্যটির মধ্যে তার সম্পত্তির ভিত্তি ছিল তার নিজস্ব শ্রম। এমনকি যেখানে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হতো, সেখানেও সাধারণভাবে এই সাহায্য সামান্যই লাগত, এবং এই সাহায্যের পারিশ্রমিক হিসাবে মজুরির বদলে অন্যান্য জিনিসপত্র দেওয়া হতো। শিল্পের শিক্ষানবীশ ও মজুররা খাদ্য ও মজুরির জন্যে যত-না কাজ করত, তার থেকে বেশি করত কাজ শিখে মালিক-কারিগর হয়ে ওঠার জন্যে।

তারপর দেখা দিল বড় বড় ওয়ার্কশপ ও কারখানায় উৎপাদনের উপায়গুলির (ও উৎপাদকদের) কেন্দ্রীভবন এবং প্রকৃত সামাজিক উৎপাদনের উপায়-সমূহে (ও সামাজিক উৎপাদকদের) সেগুলির রূপান্তর। কিন্তু সামাজিক (উৎপাদকদের ও) উৎপাদনের উপায় ও সেগুলির পণ্যসমূহকে, এই পরিবর্তনের পরেও, এমনভাবে বিবেচনা করা হতো যেন সেগুলি এখনও আগের মতোই, অর্থাৎ ব্যক্তি-মালিকানাধীন উৎপাদনের উপায় ও দ্রব্যসামগ্রী হিসাবেই রয়ে গিয়েছে। এতদিন শ্রমের যন্ত্রপাতির মালিক নিজেই উৎপন্নদ্রব্য ভোগদখল করত, কারণ সাধারণত এগুলি ছিল তার নিজেরই উৎপন্নদ্রব্য এবং অন্যদের সাহায্য ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। নতুন অবস্থাতেও শ্রমের যন্ত্রপাতির মালিক আগের মতোই আত্মসাৎ করতে লাগল উৎপন্নদ্রব্য, যদিও তখন এগুলি আর তার উৎপন্নদ্রব্য নয়, একান্তভাবেই অন্যদের শ্রমজাত দ্রব্য। এইভাবে, এখনকার সামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ তারা আর ভোগদখল করতে পারল না, যারা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপায়কে গতিশীল করে তুলেছে এবং পণ্যসমূহ উৎপন্ন করেছে; তার বদলে এসব আত্মসাৎ করছিল পুঁজিপতিরা। মূলগতভাবে উৎপাদনের উপকরণ ও খোদ উৎপাদনটাই হয়ে গিয়েছিল সামাজিক চরিত্রের। কিন্তু এটা এমন এক ধরনের ভোগদখলের অধীন, যেখানে এটাকে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উৎপাদন বলে ধরে নেওয়া হয়, সুতরাং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব উৎপন্নদ্রব্যের মালিক এবং সেইভাবেই উৎপন্নদ্রব্যকে বাজারে নিয়ে আসে। উৎপাদন পদ্ধতি এই ধরনের ভোগদখল প্রথার অধীন, যদিও যে পরিস্থিতির উপর ভোগদখল প্রথা নির্ভরশীল, উৎপাদন পদ্ধতি তার উচ্ছেদ ঘটায়।*

---

* এখানে এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে এমনকি ভোগদখলের রূপ যদি একই থাকে, তাহলেও ওপরে বর্ণিত পরিবর্তনসমূহের ফলে উৎপাদনের মতো ভোগদখলের চরিত্রেরও একই রকম বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটে। আমি নিজস্ব শ্রমের ফল ভোগদখল করছি

যে দ্বন্দ্ব নতুন উৎপাদন পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্রসম্পন্ন করে তুলেছে, বর্তমান সামাজিক বৈরদ্বন্দ্বের সমগ্র বীজটি তার মধ্যেই ছিল। উৎপাদনের নিয়ামক ক্ষেত্রগুলিতে এবং আর্থ-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত প্রভাবশালী দেশগুলিতে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি যতই বেশি করে আধিপত্য বিস্তার করছিল আর ব্যক্তিগত উৎপাদনকে গুরুত্বহীন ভগ্নাংশে পরিণত করছিল, ততই এটা বেশি মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠছিল যে সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী কায়দায় ভোগদখল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে প্রথম পুঁজিপতিরা (অন্যান্য ধরনের শ্রমের পাশাপাশি) মজুরি-শ্রমকে তাদের কাজের জন্যে সহজেই (বাজারে) পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল তখন এক ধরনের ব্যতিক্রমী, পরিপূরক, সহায়ক ও অস্থিতিশীল মজুরি-শ্রম। যে কৃষি শ্রমিকটি সময়-সময় দিনমজুর হিসাবে মেহনত করতে যেত, তার কয়েক বিঘা জমি ছিল এবং শুধু এই জমির ওপর নির্ভর করেই সে সারা বছর কষ্টেসৃষ্টে জীবনধারণ করতে পারত। গিল্ডগুলি এমনভাবে গঠিত ছিল যে সেখানকার দিনমজুররা কালক্রমে দক্ষ কারিগরে পরিণত হতো।

কিন্তু উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামাজিকীকৃত, পুঁজিবাদীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসবই পাল্টে যায়। ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপকরণ ও সেই সঙ্গে তার উৎপন্নদ্রব্য ক্রমশই বেশি করে অর্থহীন পড়ে; পুঁজিপতিদের অধীনে মজুরি শ্রমিক হওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। যে মজুরি-শ্রম এতদিন ছিল ব্যতিক্রমী ও সহায়ক ব্যাপার, সেটাই এখন যাবতীয় উৎপাদনের রীতি ও ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়, এটাই হয়ে দাঁড়ায় মজুরের একমাত্র কর্ম। সাময়িকভাবে যারা মজুরি-শ্রমিক ছিল, তারা এখন পরিণত হলো সারা জীবনের মজুরি-শ্রমিকে। সামন্ত-ব্যবস্থার যুগপৎ ভাঙন, সামন্তপ্রভুদের প্রজাস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তি, তাদের বাস্তুজমি থেকে কৃষকদের

না অন্যের শ্রমের ফল ভোগদখল করছি—এটা দুটো ভিন্ন ব্যাপার। প্রসঙ্গক্রমে এটা বলা যেতে পারে যে মজুরিশ্রম, যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ভ্রূণাকারে ছিল, খুবই প্রাচীন পদ্ধতি; নানা জায়গায়, বিক্ষিপ্তভাবে দাস-শ্রমের পাশাপাশি বহু শতাব্দী ধরে এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ভ্রূণটি একমাত্র তখনই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে, যখন ইতিহাসে তার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হয়। (এঙ্গেলসের টীকা)।

উচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটনার ফলে এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। একদিকে, পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের উপকরণ, আর অন্যদিকে, শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য সব কিছুর অধিকারহীন উৎপাদক—এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়'। সামাজিক উৎপাদন এবং পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে সম্পদের ভোগদখলের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসাবে।

আমরা এটা দেখেছি যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি পণ্যোৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, যে সমাজের সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করার মাধ্যমে। পণ্যোৎপাদক প্রতিটি সমাজের এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে: উৎপাদকরা তাদের নিজস্ব সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। প্রতিটি মানুষ তার উৎপাদনের উপকরণের সাহায্যে তার নিজের জন্যে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তার বাদবাকি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে উৎপাদন করে। নিজের উৎপাদিত জিনিসটি কী পরিমাণে বাজারে আসবে এবং তার চাহিদা কতটুকু তা কেউ জানে না। নিজের উৎপন্নদ্রব্যটি কোনো বাস্তব চাহিদা মেটাবে কিনা, সে তার উৎপাদন-ব্যয় পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা কিংবা তার পণ্যটি আদৌ বিক্রি হবে কিনা—তাও কেউ জানে না। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যই আধিপত্য চালায়।

কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্যোৎপাদনেরও নিজস্ব কতকগুলি সহজাত নিয়ম আছে যেগুলিকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, আর এইসব নিয়ম, নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের মধ্যেও নৈরাজ্যকে অবলম্বন করেই কাজ চালায়। সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের একমাত্র স্থায়ী রূপের মধ্যে অর্থাৎ বিনিময়ের মধ্যে এদের প্রকাশ ঘটে আর এই ক্ষেত্রে সেগুলি প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথমদিকে এগুলি উৎপাদকদের কাছেও ধরা পড়ে না, ক্রমশ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এগুলির হদিস পায়। সুতরাং এইগুলি উৎপাদন পদ্ধতির অবধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে উৎপাদকদের তোয়াক্কা না করে তাদের বিরুদ্ধেই কাজ করে। উৎপন্নদ্রব্য উৎপাদকদের পরিচালক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে মধ্যযুগের প্রথম দিকের কয়েকশো বছর ধরে, উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল উৎপাদকের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানো।

এটা তখন মূলত উৎপাদক ও তার পরিবারের চাহিদাই পূরণ করত। গ্রামাঞ্চলে যেখানে প্রচলিত ছিল ব্যক্তিগত অধীনতার সম্পর্ক, সেখানে উৎপাদন সামন্তপ্রভুদের চাহিদা পূরণেও সাহায্য করত। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল না। তার ফলে উৎপাদন পণ্যের চরিত্র পায় নি। জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রায় সব কিছুই উৎপন্ন করত কৃষক পরিবারের লোকজন। যখন তারা তাদের প্রয়োজন মেটানো এবং সামন্তপ্রভুদের প্রাপ্য ফসল ইত্যাদির মাধ্যমে পরিশোধ-যোগ্য খাজনার অতিরিক্ত উৎপাদন করতে শুরু করে, একমাত্র তখনই পণ্যের উদ্ভব ঘটতে থাকে। সামাজিক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত এবং বিক্রির জন্যে প্রেরিত এই উদ্বৃত্ত সামগ্রী পণ্যের রূপ নেয়।

এটা ঠিক যে শহরের কারিগররা একেবারে প্রথম থেকেই বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন করতো। কিন্তু তারাও নিজেদের প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই পূরণ করতো এই উৎপাদন থেকে। তাদের নিজস্ব বাগান ও জমি থাকতো। সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত জঙ্গলে তারা তাদের গবাদিপশু চরাতো। এখান থেকেই তারা সংগ্রহ করতো কাঠ ও জ্বালানি। মেয়েরা শন, পশম ইত্যাদি বুনতো। বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, পণ্যের উৎপাদন তখনও তার শৈশবে। সুতরাং বিনিময়ের ব্যাপারটা ছিল সীমাবদ্ধ, বাজার ছিল সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি স্থিতিশীল, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আঞ্চলিকভাবে আত্মনিবদ্ধ এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ; গ্রামাঞ্চলে ছিল মার্ক ১৬৫, শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্যোৎপাদনের প্রসার ঘটায়, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে এতদিনকার সুপ্ত পণ্যোৎপাদনের নিয়মগুলি আরও প্রকাশ্যে ও প্রবলবেগে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরানো বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে গেল, ভেঙে পড়ল সেকেলে গণ্ডিবদ্ধতা, উৎপাদকরা ক্রমশই বেশি মাত্রায় স্বাধীন, বিচ্ছিন্ন পণ্যোৎপাদকে পরিণত হতে লাগল। স্পষ্টতর হলো সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য এবং ক্রমশই সেটা বাড়তে থাকল। কিন্তু যে প্রধান উপায়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি সামাজিক উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে তীব্র করে তোলে, সেটা নৈরাজ্যের একেবারে বিপরীত। সেটা হচ্ছে, প্রতিটি উৎপাদনী সংস্থায় সামাজিক উৎপাদনের ভিত্তিতে উৎপাদনের ক্রম-বর্ধমান সংগঠন। এর ফলে পুরানো, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল অবস্থাটা শেষ

হয়ে গেল। যেসব শিল্পের ক্ষেত্রে এই উৎপাদনী সংগঠন প্রবর্তিত হলো, সেখানেই এটা তার পাশাপাশি অন্য কোনো উৎপাদন পদ্ধতি বরদাস্ত করল না। এই পদ্ধতি যেখানে পুরানো হস্তশিল্পের দিকে হাত বাড়াল, সেখানেই তাকে নির্মূল করে ছাড়ল। শ্রম-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণ-ক্ষেত্র। বড় বড় ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন বাজারের ব্যাপক প্রসার ঘটাল এবং হস্তশিল্পকে দ্রুততালে রূপান্তরিত করল যন্ত্রশিল্পে। শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ব্যক্তিগত উৎপাদকদের মধ্যেই এই 'লড়াই বাধল না', স্থানীয় লড়াই থেকে সৃষ্টি হলো জাতীয় সংঘর্ষ, সতেরো ও আঠারো শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ।[১৬৬]

আধুনিক শিল্প এবং বিশ্ব-বাজারের উদ্ভব এই সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনীন করে তুলল, একই সঙ্গে এটা হয়ে দাঁড়াল নজিরবিহীনভাবে ভয়ঙ্কর। উৎপাদনের স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম সুযোগ-সুবিধাগুলি এখন থেকে নির্ধারণ করতে থাকল ব্যক্তিগত পুঁজিপতির ও সেই সঙ্গে সমগ্র শিল্প ও দেশগুলির অস্তিত্ব-অনস্তিত্বকে। ব্যর্থ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকল। এ সেই ডারউইন-কথিত অস্তিত্বের জন্যে ব্যক্তিগত সংগ্রাম, যা প্রকৃতি থেকে প্রচণ্ড হিংস্ররূপে মানবসমাজে দেখা দিয়েছে। পশুর পক্ষে যে-ধরনের অস্তিত্ব স্বাভাবিক, মানুষের অগ্রগতির পক্ষে সেটাই যেন হয়ে দাঁড়াল চূড়ান্ত শর্ত। সামাজিক উৎপাদন ও পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে ভোগদখলের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি এখন আত্মপ্রকাশ করল এক-একটা কারখানার উৎপাদনী সংগঠন এবং সাধারণভাবে সমাজে উৎপাদনের নৈরাজ্যের মধ্যে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তার সহজাত এই দুই ধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। ফুরিয়ের যা আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, সেই 'পাপ চক্র' থেকে এ আর কখনও মুক্ত হতে পারে না। ফুরিয়ের তাঁর সময়ে যা দেখতে পান নি, তা হচ্ছে এই চক্রটি ক্রমশই ছোট হয়ে আসে, গতিটা হয়ে ওঠে ক্রমশই সর্পিল এবং গ্রহগুলির গতিবিধির মতো, কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে, এই গতিরও পরিসমাপ্তি ঘটতে বাধ্য। সামাজিক উৎপাদনে সাধারণভাবে নৈরাজ্যের বাধ্যতামূলক শক্তি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ক্রমশই একেবারে প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে। আবার এই প্রলেতারীয় জনগণই উৎপাদনে নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের এই বাধ্যতামূলক শক্তি আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন বিকাশের সম্ভাবনাকে এমন এক

বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করে, যার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত শিল্পপতিকে তার যন্ত্রপাতির ক্রমাগত উন্নতিসাধন করতে হয়, এটা লঙ্ঘন করলে তার ধ্বংস অবধারিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু যন্ত্রের উন্নতিসাধন মনুষ্য-শ্রমকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ও প্রসারের অর্থ যদি হয় মুষ্টিমেয় যন্ত্র-শ্রমিকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের অপসারণ, তাহলে যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধনের অর্থ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে যন্ত্র-শ্রমিকদেরই অপসারণ। শেষ পর্যন্ত এর তাৎপর্য হচ্ছে পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি, সেই ১৮৪৫* সালে আমি যাদের শিল্পের মজুতবাহিনী বলে অভিহিত করেছিলাম—শিল্পের তেজী অবস্থায় যাদের হাতের কাছে পাওয়া যায়, শিল্পে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় দেখা দিলে যাদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্কন্ধে এরা নিরন্তর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে, এরা পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে মানানসইভাবে মজুরির হার নিম্নমানে রাখতে সহায়ক হয়। মার্কসের ভাষায় যন্ত্র এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়; শ্রমের হাতিয়ার শ্রমিকদের হাত থেকে অনবরত ছিনিয়ে নেয় তাদের বেঁচে থাকার উপকরণগুলি; শ্রমিকদের উৎপন্নদ্রব্যই তাদের বশে রাখার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়[১৬৭]। এইভাবে একেবারে শুরু থেকেই শ্রমের যন্ত্রপাতির পরিমিত ব্যবহার একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় শ্রম-শক্তির বেপরোয়া অপচয়, যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি মধ্যে শ্রমিক কাজ করে, সেখানে লুণ্ঠন[১৬৮]; শ্রম-সময় সংক্ষিপ্ত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার স্বরূপ যন্ত্র রূপান্তরিত হয় পুঁজির মূল্য বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজিপতির হাতে সমর্পণ করার অব্যর্থ উপায়ে। এইভাবে কিছু মানুষের হাড়ভাঙা খাটুনি অন্যদের অলস হয়ে থাকার প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং সারা দুনিয়াজুড়ে নতুন ক্রেতা-সন্ধানী আধুনিক শিল্প নিজ নিজ দেশের জনগণের ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহারকে অনশনের পর্যায়ে নামিয়ে আনে আর এটা করতে গিয়ে নিজের দেশের বাজারেরই সর্বনাশ ঘটায়। 'যে নিয়ম পুঁজি-সঞ্চয়ের

---

* 'দ্য কণ্ডিশান অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড', পৃ ৮৪। এঙ্গেলস তাঁর টীকায় এটা উল্লেখ করেছেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অন ব্রিটেন', মস্কো, ১৯৬২, পৃ ১১৯।
—সম্পাদক।

ব্যাপকতা ও শক্তির সঙ্গে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কিংবা শিল্পের মজুদ বাহিনীর ভারসাম্য প্রতিনিয়ত রক্ষা করে, সেই নিয়মই প্রমিথিউসকে পাহাড়ে গেঁথে রাখা ভালকান দেবতার কীলকের চাইতেও শক্ত করে শ্রমিককে পুঁজির সঙ্গে বেঁধে রাখে। পুঁজির সঞ্চয়ের মতো দৈন্যও সঞ্চিত হতে থাকে। সুতরাং এক প্রান্তে পুঁজির সঞ্চয় এবং একই সঙ্গে অন্য প্রান্তে দৈন্য, হাড়ভাঙা খাটুনির যন্ত্রণা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা ও মানসিক অধঃপতন পুঞ্জীভূত হয় সেই শ্রেণীটির জীবনে যে তার নিজস্ব দ্রব্যকে পুঁজিরূপে উৎপাদন করে।' (মার্কসের 'ক্যাপিটাল', পৃ ৬৭১)।* পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি থেকে অন্যরকম বণ্টন প্রত্যাশা করা এটা মনে করার শামিল যে একটা ব্যাটারির সঙ্গে বিদ্যুতের তারগুলি (ইলেকট্রোড) যতক্ষণ যুক্ত থাকবে, ততক্ষণ এই তারগুলি অম্লমিশ্রিত জলকে বিশ্লিষ্ট করবে না এবং ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন এবং ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন বিনির্গত করবে না।

আমরা এটা দেখেছি যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান উন্নতিসাধনকে সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য এমন একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করে যার ফলে প্রত্যেক শিল্পমালিক ক্রমাগত তার যন্ত্রের উন্নতিসাধন ঘটাতে, যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার বাস্তবায়নও তার কাছে অনুরূপ বাধ্যতামূলক নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল বিস্তারের শক্তির সঙ্গে তুলনায় গ্যাসের সম্প্রসারণ শক্তিকে তুচ্ছ বলেই মনে হবে, গুণগত ও পরিমাণগতভাবে এই শক্তির সম্প্রসারণের অনিবার্যতা আমাদের কাছে এখন এমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হাস্যকর করে তোলে। ভোগ, বিক্রয় ও আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্যাপকতা ও তীব্রতা উভয় দিক থেকেই বাজারের সম্প্রসারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ্যত এমন কতকগুলি নিয়মের দ্বারা, যেগুলি ততটা জোরের সঙ্গে কাজ করে না। বাজারের প্রসার উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এই সংঘাত যতদিন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করতে পারে, ততদিন যেহেতু এই সংঘাতের কোনো যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায় না, তাই সংঘাতগুলির বারবার আবির্ভাব ঘটে, পুঁজিবাদী উৎপাদন নতুন 'পাপচক্রে'র জন্ম দেয়।

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৬০৪। বড় হরফ এঙ্গেলসের। সম্পাদক।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সাল থেকে, যখন প্রথম সাধারণ সংকটের উদ্ভব হয়, "সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্য জগৎ, সমস্ত উন্নত জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী কম-বেশি অনগ্রসর জাতিগুলির উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছর অন্তর একবার করে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ছে; ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজারে মালের যোগান অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, অবিক্রীত মালপত্র জমতে থাকে, নগদ টাকা উধাও হয়ে যায়; ঋণ মেলে না, কলকারখানা বন্ধ হয়, শ্রমিকদের জীবনধারণের উপকরণে টান পড়ে, কেননা তারা এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করেছে; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান একের পর এক দেউলে হয়ে যায়, তারা সর্বস্বান্ত হয়। কয়েক বছর ধরে এই রকম অচলাবস্থা চলতে থাকে; উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের অপচয় ঘটে এবং সেগুলিকে পাইকারি হারে নষ্ট করে ফেলা হয় —যতদিন না মজুত পণ্যসমূহ সস্তা দরে বাজারে কাটতি হয়ে যায় এবং উৎপাদন ও বিনিময় আবার ধীরে ধীরে সচল হতে থাকে। অল্প অল্প করে এই সচলতা বৃদ্ধি পায়। এটা তখন দুলকি চালে চলতে থাকে। শিল্পের দুলকি চালে আরও গতি সৃষ্টি হয়, এই গতি অবার পরিণত হয় শিল্প, বাণিজ্যিক ঋণ ও ফাটকার উদ্দাম ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়, যা মরি-বাঁচি করে লাফিয়ে লাফিয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে শুরুর অবস্থার মধ্যেই। অর্থাৎ আর একটি সংকটের গহ্বরে। বারবার এই ব্যাপারটিই ঘটতে থাকে। ১৮২৫ সালের পর থেকে পাঁচবার এটাই ঘটেছে, ঠিক এই সময়ে (১৮৭৭) ষষ্ঠবার আমরা এটা ঘটতে দেখছি। এই সংকটগুলির চরিত্র এতই সুস্পষ্ট যে ফুরিয়ের ক্রাইসিস প্লেথোরিকি বা অতিপ্রাচুর্য থেকে সংকট বলে প্রথম সংকটের যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যাবতীয় সংকট ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১৬৯]

এইসব সংকটে সামাজিক উৎপাদন এবং পুঁজিবাদী ভোগদখলের পরিণতি ঘটে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সাময়িকভাবে পণ্য সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। সঞ্চালনের মাধ্যম হিসাবে অর্থ সঞ্চালনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পণ্য উৎপাদন ও সঞ্চালনের যাবতীয় নিয়ম-কানুন উল্টেপাল্টে যায়। আর্থনীতিক সংঘাত তার চরমে গিয়ে পৌঁছায়। **উৎপাদন পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় পদ্ধতির বিরুদ্ধে, উৎপাদিকা শক্তিগুলি উৎপাদন পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করে ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।**

কারখানার মধ্যে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠন এতই উন্নত হয়ে ওঠে যে

সমাজে উৎপাদনের নৈরাজ্যের সঙ্গে সেটা আর খাপ খায় না। এই নৈরাজ্য উৎপাদনের পাশাপাশি টিকে থাকে ও তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অনেক বড় বড় এবং আরও বহুসংখ্যক পুঁজিপতির ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সংকটের সময়ে পুঁজির হিংস্র কেন্দ্রীভবন খোদ পুঁজিপতিদের কাছেও এই খাপ না-খাওয়ার ব্যাপারটিকে প্রকট করে তোলে; নিজের সৃষ্টি-করা উৎপাদিকা শক্তিগুলির চাপে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির চলন-শক্তি বানচাল হয়ে যায়। বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণকে তারা আর পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে পারে না। সেগুলি বন্ধ্যা হয়ে যায় আর ঠিক সেই কারণে শিল্পের মজুত-বাহিনীও বেকার হয়ে পড়ে, উৎপাদনের উপকরণ, জীবনধারণের সামগ্রী, প্রাপ্তিযোগ্য শ্রমিক, উৎপাদন ও সাধারণ সম্পদের যাবতীয় জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু 'প্রাচুর্যই হয়ে দাঁড়ায় দুঃখদুর্দশা ও অভাবের উৎস' (ফুরিয়ের), কারণ এটাই উৎপাদন ও জীবনধারণের উপকরণকে পুঁজিতে পরিণত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কেননা পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলি একমাত্র তখনই তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে, যখন সেগুলি পুঁজিতে, মানুষের শ্রম-শক্তি শোষণের উপায়ে প্রাথমিকভাবে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনে ও জীবনধারণের উপকরণগুলির পুঁজিতে রূপান্তরের এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা এইসব উপকরণ ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একমাত্র এটাই উৎপাদনের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত শক্তিগুলির সংহতিতে বাধা দেয়; একমাত্র এটাই উৎপাদনের উপকরণগুলিকে কাজে লাগাতে দেয় না, শ্রমিকদের মেহনত করে বেঁচে থাকার পথ আটকে দেয়। সুতরাং একদিকে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এইসব উৎপাদনী শক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার অক্ষমতার জন্যে অপরাধী; অন্যদিকে এই উৎপাদিকা শক্তিগুলি প্রবল জোরের সঙ্গে এগিয়ে যায় প্রচলিত বিরোধ দূর করার দিকে, পুঁজি হিসাবে তাদের চরিত্র বিলোপ ঘটাবার দিকে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে তাদের চরিত্রের পরিচয় ঘটাবার দিকে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলি জোরালো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজি হিসাবে তাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলির বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্রের স্বীকৃতির জন্যে এই ক্রমবর্ধমান চাপ সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দিতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব, পুঁজিপতি শ্রেণীকে ক্রমশই বেশি পরিমাণে বাধ্য করে। ঋণের অপরিমিত স্ফীতি সমেত

শিল্পের তেজী কালপর্ব এবং বড় বড় পুঁজিবাদী সংস্থার বিপর্যয়জাত মন্দার কালপর্ব—বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে সেই ধরনের সামাজিকীকরণ ঘটাবার প্রবণতা সৃষ্টি করে, যেগুলিকে আমরা বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির মধ্যে লক্ষ্য করি। উৎপাদন ও বন্টনের বহু উপকরণ একেবারে শুরু থেকে এত বিশালাকৃতি নেয় যে সেগুলিতে রেলওয়ের মতোই অন্যান্য ধরনের পুঁজিবাদী শোষণের উপায় থাকে না। বিবর্তনের একটা স্তরে এসে এই ধরনটাও অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কোনো একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট শিল্প-শাখার উৎপাদকরা একটা ট্রাস্ট-এ উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে একটি সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়। তারা উৎপাদনের মোট পরিমাণ স্থির করে, কে কতটা উৎপাদন করবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং আগে থেকেই বিক্রির দাম ধার্য করে ফেলে। কিন্তু ব্যবসায়ে মন্দা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধরনের ট্রাস্ট-এ সাধারণত ভাঙন দেখা দেয় আর ঠিক এই কারণেই ট্রাস্টগুলি আরও বৃহত্তর কেন্দ্রীভূত সংগঠন গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের সমস্ত শাখা এক বিশালায়তন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার বদলে এই একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে বসে। ১৮৯০ সালে ইংল্যাণ্ডে অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল। এই উৎপাদন এখন, ৪৮টি বৃহৎ সংস্থা একত্রিত হওয়ার পর, একটিমাত্র কোম্পানির হাতে; একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে এটা পরিচালিত হচ্ছে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতার পরিণতি ঘটে তার বিপরীত রূপে—একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী সমাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-হীন উৎপাদন ভাবী সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক উৎ-পাদনের কাছে পরাজিত হয়। তবে এই পর্যন্ত একচেটিয়া কারবার পুঁজি-পতিদের পক্ষে নিশ্চিতভাবেই উপকারী ও সুবিধাজনক। কিন্তু এক্ষেত্রে শোষণ এতই নগ্ন যে, তার বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির পরিচালিত উৎপাদন, লভ্যাংশলোভী একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর হাতে সমাজের নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই বরদাস্ত করতে পারে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারি প্রতিনিধিস্বরূপ রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব

বাধ্য হয়েই নিতে হয়।* রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরের এই প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম দেখা দেয় ডাক, তার ও রেলের মতো যোগাযোগ ও পরিবহনের বড় বড় সংস্থায়।

সংকটের মধ্যে দিয়ে যদি এটাই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে যে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা অপারগ হয়ে পড়েছে, তেমনি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, (ট্রাস্ট) ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে বৃহদাকার সংস্থাগুলির রূপান্তর এটাই প্রকট করে তোলে যে এইসব কাজের জন্যে বুর্জোয়া বা কী পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। পুঁজিপতিদের যাবতীয় সামাজিক কাজকর্ম এখন বেতনভুক কর্মচারীরা পরিচালনা করছে। লভ্যাংশ আত্মসাৎ করা, সুদগ্রহণ এবং পুঁজিপতিরা যে স্টক এক্সচেঞ্জে একে অপরের পুঁজি লুটপাট করে, সেখানে ফাটকাবাজিতে মত্ত হওয়া ছাড়া পুঁজিপতিদের আর কোনো সামাজিক কর্তব্য নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রথমে জবরদস্তি চালিয়ে শ্রমিকদের উচ্ছেদ করে। এখন উচ্ছেদ করছে পুঁজিপতিদের, ঠিক শ্রমিকদের মতো তাদের সংখ্যাও কমিয়ে আনছে, নামিয়ে আনছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও এখনই তাদের শিল্পের মজুত বাহিনীতে পর্যবসিত করছে না।

---

* আমি বলছি 'বাধ্য হয়েছে'। কারণ উৎপাদন ও বন্টনের উপকরণ যখন প্রকৃতপক্ষে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলির পরিচালন-সংগঠনকে অতিক্রম করে যাবে আর সেই জন্যে সেগুলির রাষ্ট্রীয়করণ যখন আর্থনীতিকভাবে অনিবার্য হয়ে উঠবে, একমাত্র তখনই, বর্তমান রাষ্ট্রের দ্বারাও যদি এটা সম্পন্ন হয়, এর ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটবে, সমস্ত উৎপাদিকা শক্তিকে সমাজের হাতে নিয়ে নেওয়ার দিকে হবে আর একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু সম্প্রতিকালে বিসমার্ক শিল্পসংস্থাগুলির রাষ্ট্রীয়করণের দিকে ঝোঁকার ফলে এক ধরনের ভেজাল সমাজবাদের উদ্ভব হয়েছে, যা কখনও কখনও বিসমার্কের স্তাবকতায় পর্যবসিত হচ্ছে এবং বিসমার্কীয় সমেত সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেই সমাজতান্ত্রিক বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। তামাক শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ যদি সমাজতান্ত্রিক হয়, তাহলে নেপোলিয়ন ও মেতারনিককে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে স্থান দিতে হয়। কতকগুলি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে বেলজিয়াম রাষ্ট্র যদি নিজেই তার প্রধান প্রধান রেলপথ নির্মাণ করে থাকে, কোনরকম আর্থনীতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, যুদ্ধের সময় রেলপথকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাবার জন্যে, সরকারের পক্ষে ভোট সংগ্রহে রেলকর্মীদের গরু-ঘোড়ার মতো ব্যবহার করার জন্যে এবং বিশেষ করে সংসদীয় ভোটের ওপর নির্ভর না করে আয়ের একটা নতুন উৎস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, এবং বিসমার্ক যদি প্রাশিয়ার বড় বড় রেলপথকে সরকারি মালিকানায় এনে থাকেন, তাহলে সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সচেতন বা অচেতনভাবে, কোনো অর্থেই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হয় না। অন্যথায় রয়াল মেরিটাইম কোম্পানি, রয়াল পোর্সিলিন কারখানা ১৭০ এমনকি সেনাবাহিনীর পোশাক তৈরির দর্জিসংস্থাগুলিকেও সমাজতান্ত্রিক সংস্থা বলতে হয়। (অথবা তৃতীয় ফ্রেডরিক ভিলহেলম-এর রাজত্বকালে এক ধূর্ত শেয়াল পতিতালয়গুলিকে রাষ্ট্রের হাতে নেবার জন্যে গুরুগম্ভীরভাবে যে প্রস্তাব করেছিল, সেটাও সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ) এঙ্গেলসের টীকা।

কিন্তু জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে (ও ট্রাস্টে) কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তরের ফলে উৎপাদিকা শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্র বিলুপ্ত হচ্ছে না। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলির (ও ট্রাস্টের) ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। আর আধুনিক রাষ্ট্রও এমন একটা সংগঠন, যাকে শ্রমিকশ্রেণীর ও সেইসঙ্গে পৃথক পৃথক পুঁজিপতির নিজ নিজ সীমা-লংঘনের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সাধারণ বাইরের পরিবেশকে বজায় রাখার জন্যে বুর্জোয়া সমাজের একমাত্র হাতিয়ার। আধুনিক রাষ্ট্র, তার রূপ যাই হোক না হোক কেন, আসলে একটা পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, সমগ্র জাতীয় পুঁজির ঘনীভূত আদর্শ রূপ। এই রাষ্ট্র উৎপাদিকা শক্তিকে যতই করায়ত্ত করে, ততই সে আরও বেশি মাত্রায় হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, নাগরিকদের ততই সে আরও বেশি পরিমাণে শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকরা মজুরি-শ্রমিক, প্রলেতারিয়েতই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্ক ধ্বংস হয় না। বরঞ্চ সেটা আরও চরম অবস্থায় এসে পৌঁছায়। কিন্তু এই চরম অবস্থায় এসে তার ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা এই বিরোধের কোনো সমাধান নয়, কিন্তু এই সমাধানের যা উপাদান সেই কারিগরি উপকরণগুলি এর মধ্যে লুকানো থাকে।

আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিক প্রকৃতির বাস্তব স্বীকৃতি আর সেই হেতু উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি, সম্পত্তির ভোগদখল ও বিনিময়ের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই শুধু এই সমাধান অর্জন করা সম্ভব। যেসব উৎপাদিকা শক্তি সমগ্র সমাজ ছাড়া আর সবরকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে, সেগুলিকে প্রকাশ্যে ও সরাসরি-ভাবে সামাজিক মালিকানাধীন করেই এর সমাধান করা যায়। উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্র আজ উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই ক্রিয়াশীল, মাঝে মাঝে যাবতীয় উৎপাদন ও বিনিময়কে বিপর্যস্ত করে দেয়, প্রকৃতির একটা নিয়মের মতো অন্ধভাবে, নিজশক্তিতে ধ্বংসাত্মকভাবে কাজ করে। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে সমাজ অধিগ্রহণ করার পর উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রকে উৎপাদকেরা, তার প্রকৃতি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি ক'রে, ভালোভাবে কাজে লাগাবে এবং বিশৃঙ্খলা ও মাঝে মাঝে বিপর্যয়ের উৎস না হয়ে এটা হয়ে উঠবে খোদ উৎপাদনেরই সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলি ঠিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মতোই কাজ করে: অন্ধভাবে, নিজের জোরে ও বিধ্বংসীরূপে—অবশ্য যতক্ষণ আমরা সেগুলিকে বুঝতে না পারি, বিবেচনার মধ্যে না আনি। কিন্তু একবার যদি সেগুলিকে বুঝতে পারি, সেগুলির ক্রিয়াশীলতা, গতিবিধি, ফলাফল উপলব্ধিতে আনতে পারি, তাহলে সেগুলিকে আরও বেশি পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার, তাদের কাজে লাগিয়ে আমাদের লক্ষ্য সাধন করার বিষয়টি শুধু আমাদের ওপরই বর্তায়। আর এ যুগের বিপুল ক্ষমতা-সম্পন্ন উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যতদিন এইসব সামাজিক শক্তির ক্রিয়াশীল প্রকৃতি ও চরিত্র আমরা একগুঁয়ের মতো বুঝতে অস্বীকার করব—আর যে উপলব্ধি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও তার সমর্থকদের পক্ষে পছন্দসই নয়—ততদিন এইসব শক্তি আমাদের উপেক্ষা করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাবে। ততদিন তারা আমাদের ওপর প্রভুত্ব চালাবে, যা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি।

কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়, তাহলে একসঙ্গে কর্মরত উৎপাদকদের হাতে তারা দৈত্যরূপ প্রভু থেকে হুকুম তামিল-করা ভৃত্যে পরিণত হবে। বজ্র-বিদ্যুতের ধ্বংসাত্মক শক্তি আর টেলিগ্রাফ ও ভোল্টা ব্যাটারির বিদ্যুৎ-এর মধ্যে, প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড ও মানুষের উপকারে-লাগা আগুনের মধ্যে যে তফাত—এখানেও তফাতটা সেই রকম। উৎপাদিকা শক্তি-গুলির এই যথার্থ চরিত্র বোধগম্য হলে, সমাজ ও প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন অনুসারে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যকে দূর করে উৎপাদনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সম্ভব হয়। ভোগদখলের পুঁজিবাদী পদ্ধতির, যার মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য প্রথমে উৎপাদনকে ও পরে ঐ দ্রব্যের ভোগদখলকারীকে জড়িয়ে ফেলে, বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক ধরনের ভোগদখল-পদ্ধতি, যা আধুনিক প্রকৃতির উৎপাদনের ভিত্তিতে গঠিত; এর একদিকে থাকে উৎপাদন বজায় রাখা ও প্রসারিত করার উপকরণস্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক ভোগদখল; এবং অন্যদিকে থাকে জীবনধারণ ও আমোদ প্রমোদের উপকরণস্বরূপ ব্যক্তিগত ভোগদখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে ক্রম-বর্ধমান মাত্রায় প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে এমন একটা শক্তির সৃষ্টি করে যার পক্ষে এই বিপ্লব সম্পন্ন না করে উপায় থাকে না,

অন্যথায় সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইতিপূর্বেই সামাজিকীকৃত বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তর ঘটাতে বাধ্য করে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই এই বিপ্লবের পথ দেখায়। **প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং উৎপাদনের উপকরণকে প্রথমেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে।**

কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে প্রলেতারিয়েত তার আত্মবিলুপ্তি ঘটায়, সমস্ত শ্রেণীগত পার্থক্য ও শ্রেণীসংঘর্ষ বিলুপ্ত করে, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আর রাখে না। শ্রেণী দ্বন্দ্বভিত্তিক সমাজের পক্ষে এতদিন ধরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ প্রয়োজন ছিল কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর এমন একটা সংগঠন যা নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি (দাসপ্রথা, ভূমিদাস প্রথা, মজুরি-শ্রম) অনুযায়ী নিপীড়নমূলক অবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে জবরদস্তি করে আটকে রাখবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ছিল উৎপাদনের বাহ্যিক পরিবেশ বজায় রাখার, তার সমগ্র সমাজের সরকারি প্রতিনিধি, সমাজের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি। কিন্তু যে পরিমাণে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীটি, কোনো একটা সময়ে, সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই পর্যন্তই এটা সেই শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়: প্রাচীনকালে ছিল দাসের অধিকারী নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুদের রাষ্ট্র; আমাদের নিজেদের যুগে বুর্জোয়া রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত যখন সমগ্র সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, তখন আর এর প্রয়োজন থাকে না। অধীন করে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণীই আর যখন থাকে না, যখন শ্রেণীশাসন এবং এখনকার নৈরাজ্য-ভিত্তিক উৎপাদনে টিকে থাকার জন্যে ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও এর থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান ঘটে, তখন দমন করার মতো কোনো কিছু আর থাকে না, থাকে না একটা বিশেষ দমন-মূলক শক্তি, একটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। যে প্রথম কাজটি করে রাষ্ট্র নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে—অর্থাৎ সমাজের নামে উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে—সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। একের পর এক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তারপর তা আপনা থেকেই লোপ পায়, লোক-জনকে শাসন করার বদলে প্রচলিত হয় বস্তুসামগ্রীর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ ঘটে না', তার মৃত্যু হয়। 'স্বাধীন রাষ্ট্র'[১৭১] কথাটিকে বিক্ষোভকারীদের সময়-সময় ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং

চূড়ান্ত অর্থে তার বৈজ্ঞানিক অযথার্থতা—এই উভয় দিক থেকেই স্বাধীন রাষ্ট্র কথাটিকে বিচার করে দেখতে হবে ; অবিলম্বে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার জন্যে নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটিকেও এই প্রসঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন।

ইতিহাসে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভূত হওয়ার সময় থেকেই, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায় প্রায়শই কম-বেশি অস্পষ্টভাবে, উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণের ওপর ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে সামাজিক মালিকানা কায়েম করার স্বপ্ন দেখে এসেছেন। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, ইতিহাসে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে, যখন এর বাস্তবায়নের উপযোগী প্রকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য প্রতিটি সামাজিক অগ্রগতির মতো এর বাস্তবায়ন যে সম্ভব তার কারণ এই নয় যে মানুষ বুঝতে পারছে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব ন্যায়, সমতা ইত্যাদির পরিপন্থী কিংবা এইসব শ্রেণীকে বিলুপ্ত করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছে। আসলে এর কারণ হচ্ছে কতকগুলি নতুন আর্থনীতিক অবস্থার সৃষ্টি। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন ছিল আগেকার যুগে উৎপাদনের অপরিণত ও সীমাবদ্ধ বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল। যতদিন পর্যন্ত মোট সামাজিক শ্রম সকলের নেহাৎ টিকে থাকার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি উৎপাদন করত, আর সেই কারণে সমাজের বেশির ভাগ মানুষের সময় বা প্রায় সবটুকু সময়ই মেহনতের কাজে লাগাতে হয়েছে, ততদিন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমাজের ভাগাভাগিটা হয়ে থেকেছে অনিবার্য। একান্তভাবে শ্রমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে এমন একটা শ্রেণী, যারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনমুখী শ্রম থেকে মুক্ত, যারা সমাজের সাধারণ ব্যবস্থাপনার পরিচালক : শ্রম-কর্ম পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম, আইন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান। সুতরাং শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিমূলে রয়েছে শ্রম-বিভাগের নিয়ম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে হিংসা, লুটপাট, প্রতারণা ও জোচ্চুরির মাধ্যমে শ্রেণী-বিভাগ গড়ে ওঠে নি ; একবার কর্তৃত্ব পেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতি করে শাসকশ্রেণী তার ক্ষমতা সংহত করে নি কিংবা তার সামাজিক নেতৃত্বকে জনগণের ওপর প্রচণ্ড শোষণ চালাবার কাজে ব্যবহার করে নি।

কিন্তু এই যুক্তিতে ইতিহাসের দিক থেকে শ্রেণী-বিভাগের কিছুটা যৌক্তিকতা যদি থেকেও থাকে, তাহলেও সেটা শুধু একটা বিশেষ পর্যায়ে,

নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতেই সীমাবদ্ধ। এই যৌক্তিকতার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের ঘাটতি। আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির সম্পূর্ণ বিকাশের ধাক্কায় এটা ভেসে যাবে: বস্তুতপক্ষে, সমাজে শ্রেণী-বিলোপের জন্যে ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় এমন একটা স্তর সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, যেখানে বিশেষ কোনো শাসক শ্রেণীরাই শুধু নয়, সমস্ত শাসক শ্রেণীরই; আর তাই যাবতীয় শ্রেণীভেদের অস্তিত্বই সেকেলে, যুগের সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়বে। সুতরাং এর জন্যে উৎপাদনের বিকাশকে এমন একটা স্তরে পৌঁছাতে হবে যেখানে সমাজের কোনো একটা শ্রেণীর দ্বারা উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখল এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব, সংস্কৃতির একচেটে অধিকার ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে তাই নয়, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

অবস্থা এখন এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। নিজেদের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক দেউলেপনা এখন আর খোদ বুর্জোয়াদের কাছেও গোপন নেই। তাদের আর্থনীতিক দেউলেপনা নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর প্রকট হয়ে পড়ে। প্রতিটি সংকটে অব্যবহৃত উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের বোঝার চাপে সমাজের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ভোগ করার মতো উৎপাদকদের কিছুই জোটে না। কারণ উপভোগকারীদের ঘাটতি রয়েছে—এই অদ্ভুত স্ববিরোধের মুখে সমাজ অসহায় হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের উপকরণকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রসার তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির ছেদহীন, নিয়ত ক্রমবর্ধমান বিকাশ আর সেই সঙ্গে খোদ উৎপাদনের বস্তুত সীমাহীন বৃদ্ধি—এই শৃঙ্খল থেকে উৎপাদনের উপকরণের মুক্তিলাভের একমাত্র ভিত্তি। এটাই সব নয়। উৎপাদনের উপকরণগুলি সামাজিকীকৃত হওয়ার ফলে উৎপাদনের ওপর আরোপিত বর্তমানের কৃত্রিম বাধানিষেধগুলিই শুধু দূর হয় না, উৎ-পাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের ডাহা অপচয় ও ধ্বংসসাধনেরও অবসান ঘটে, যা বর্তমানে উৎপাদনের অপরিহার্য সঙ্গী এবং সংকটের সময়ে যা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। তাছাড়া, এর ফলে এখনকার শাসক শ্রেণীগুলি ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন বেপরোয়া ভোগবিলাসের অবসান ঘটে এবং বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যকে সমাজের কাজে লাগানো সম্ভব হয়। সমাজের মালিকানাধীন উৎপাদনের

সাহায্যে সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার মতো পর্যাপ্ত বৈষয়িক সম্পদই শুধু নয়, সকলের স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং কায়িক ও মানসিক গুণাবলীর ব্যবহারের সম্ভাবনাও এই প্রথম এখানেই দেখা দিয়েছে।*

উৎপাদনের উপকরণ সমাজের দখলে চলে যাওয়ার পর পণ্যসমূহের উৎপাদন ও উৎপাদনের ওপর পণ্যদ্রব্যের আধিপত্যের একই সঙ্গে অবসান ঘটে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের স্থান নেয় সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট সংগঠন, অবসান ঘটে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রামের। এই পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট অর্থে মানুষ নিজেকে পশুজগৎ থেকে সর্বপ্রথম চূড়ান্তভাবে পৃথক করে ফেলে এবং পশুর জীবনধারণের অবস্থা থেকে একটা যথার্থ মানবিক পরিবেশে উত্তীর্ণ হয়। জীবনধারণের যে পরিবেশ এতদিন মানুষকে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছিল এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল, এখন সেই পরিবেশ মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ; সে এই প্রথম প্রকৃতির সত্যিকারের সচেতন কর্তা হয়ে ওঠে, কারণ সে নিজেই এখন তার সামাজিক সংগঠনের নায়ক হয়ে উঠেছে। মানুষের সামাজিক কাজর্মের যে নিয়মগুলি এতদিন পর্যন্ত বহিঃপ্রকৃতির নিয়ম হিসাবে তার বিরোধী ছিল ও তার ওপর কর্তৃত্ব করত, এই পর্যায়ে মানুষ সেগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নিয়েই প্রয়োগ করবে, নিয়ন্ত্রণ করবে। মানুষের নিজের তৈরি যে সামাজিক সংগঠন, প্রকৃতি ও ইতিহাসের চাপিয়ে-দেওয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা হিসাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সেই সংগঠনই এখন হয়ে দাঁড়াবে তার নিজস্ব স্বাধীন কর্মকাণ্ডের পরিণতি। মনুষ্য-বহির্ভূত যে শক্তি এতদিন ইতিহাসের ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছে, সেটা এখন থেকে খোদ মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। একমাত্র এই সময় থেকেই মানুষ নিজে সম্পূর্ণ সচেতন-

* পুঁজিবাদী চাপের মধ্যেও আধুনিক উৎপাদনের উপকরণ যে কি প্রচণ্ড গতিতে প্রসারিত হতে পারে, নিচের সংখ্যাগুলি থেকে তার একটা মোটামুটি হদিস পাওয়া যায়। শ্রীগিফেন-এর১৭২ হিসাব অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে, পূর্ণ সংখ্যায়,

১৮১৪ ২,২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড
১৮৬৫ ৬,১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড
১৮৭৫ ৮,৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

সংকটের সময়ে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের অপচয়ের নজির হিসাবে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ফেব্রুয়ারি ২১ ১৮৭৮) ১৭৩ দেখানো হয় যে ১৮৭৩-৭৮-এর সংকটে একমাত্র জার্মান লৌহ শিল্পেই মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২২,৭৫০,০০৫ পাউণ্ড। (এঙ্গেলসের *টীকা*)।

ভাবে তার নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। একমাত্র এই সময় থেকেই মানুষ যেসব সামাজিক ঘটনাকে গতিশীল করে তুলবে, সেগুলিই প্রধানত ও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে মানুষের ঈপ্সিত ফল সৃষ্টি করবে। এটাই হচ্ছে বাধ্য-বাধকতার জগৎ থেকে মানুষের স্বাধীনতার জগতে উত্তরণ।

এইবার ইতিহাসের বিবর্তন-ধারার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থিত করা যাক।

১। মধ্যযুগের সমাজঃ ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিগত উৎপাদন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী উৎপাদনের উপকরণ; তাই আদিম, শ্রীহীন, ছোটখাট, কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক। উৎপাদকের নিজের বা তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগ-ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন। এই ভোগ-ব্যবহারের পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, একমাত্র তখন সেটা বিক্রির জন্যে, বিনিময়ের জন্যে ছাড়া হয়। সুতরাং এটা পণ্যোৎপাদনের নেহাৎই শৈশবাবস্থা। কিন্তু তখনই এর মধ্যে সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য ভ্রূণাকারে অবস্থান করে।

২। পুঁজিবাদী বিপ্লবঃ শিল্পের রূপান্তর, প্রথমে সরল সহযোগিতা ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে। এতদিনকার বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের উপকরণ সমূহের বড় বড় কারখানায় কেন্দ্রীভবন। তার ফলে, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদনের উপকরণে সেগুলির রূপান্তর—যে রূপান্তরের ফলে বিনিময়ের রূপ সাধারণভাবে পাল্টায় না। ভোগদখলের পুরানো রীতিটাই বহাল থাকে। পুঁজিপতির উদ্ভব হয়। উৎপাদনের উপকরণের মালিক হিসাবে এই পুঁজিপতিই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নেয় এবং সেটাকে পণ্যে পরিণত করে। উৎপাদন হয়ে ওঠে একটা সামাজিক কাজ। বিনিময় ও ভোগদখল ব্যক্তিগত, ব্যক্তিবর্গের কাজ হিসাবে চলতে থাকে। ব্যক্তিমালিক সামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যকে ভোগ-দখল করে। আমাদের বর্তমান সমাজের যাবতীয় বিরোধ এই মূল বিরোধ থেকেই উদ্ভূত এবং আধুনিক শিল্প এই বিরোধগুলিকেই প্রকট করে তুলেছে।

ক. উৎপাদনের উপকরণ থেকে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা। শ্রমিকের যাবজ্জীবন মজুরি-শ্রমের দণ্ড। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শত্রুতামূলক বিরোধ।

খ. পণ্যোৎপাদনের নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির প্রাধান্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি,

লাগামহীন প্রতিযোগিতা। পৃথক পৃথক কারখানার মধ্যেকার সামাজিক চরিত্রের সংগঠন ও সমগ্র উৎপাদনে সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।

গ. একদিকে, প্রতিটি ব্যক্তিগত কারখানা-মালিকের প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে যন্ত্রের ক্রমোন্নতি এবং যার পরিপূরক হিসাবে ক্রমবর্ধমান হারে অনবরত শ্রমিক ছাঁটাই; শিল্পের মজুতবাহিনী সৃষ্টি। অন্যদিকে, প্রতিটি মালিকের দ্বারা উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার—যা প্রতিযোগিতার জন্যে বাধ্যতামূলক। উভয় দিকেই, উৎপাদিকা শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ, চাহিদার তুলনায় অঢেল যোগান, অতি-উৎপাদন, মালপত্রে বাজার বোঝাই, দশ বছর অন্তর সঙ্কট, পাপ-চক্র: একদিকে, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন-দ্রব্যের অতি-প্রাচুর্য, অন্যদিকে, বেকার ও জীবিকাহীন মজুরদের অতি-প্রাচুর্য। কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি শক্তি একসঙ্গে কাজ করতে পারে না, কেননা পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদন উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রিয়াশীলতার পথে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলির সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে—যদি না এগুলি পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, এগুলির অতি-প্রাচুর্যই যার প্রতিবন্ধক। এই বিরোধ একটা হাস্যকর সামঞ্জস্যহীনতার পর্যায়ে পৌঁছেছে: উৎপাদন পদ্ধতি বিনিময়ের রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়ারা তাদের নিজস্ব সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

ঘ. উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দান পুঁজিপতিদের পক্ষেই এখন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড় বড় সংস্থাকে প্রথমে হাতে নেয় জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলি, পরবর্তীকালে ট্রাস্ট ও তারপর রাষ্ট্র। বুর্জোয়ারা একটা অনাবশ্যক শ্রেণী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন বেতনভোগী কর্মচারীরাই তাদের যাবতীয় সামাজিক কাজকর্ম নির্বাহ করে।

ঙ. প্রলেতারীয় বিপ্লব: বিরোধগুলির সমাধান। প্রলেতারিয়েত সামাজিক ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং এই ক্ষমতার মাধ্যমে বুর্জোয়াদের হস্তচ্যুত উৎপাদনের সামাজিক উপকরণসমূহকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। এই কাজের মধ্যে দিয়ে প্রলেতারিয়েত উৎপাদনের উপকরণকে তার এতদিনকার পুঁজি-চরিত্র থেকে মুক্ত করে এবং এই উপকরণের সামাজিক

চরিত্র ক্রিয়াশীল হওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ করে দেয়। এখন থেকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদন সম্ভব হয়ে ওঠে, উৎপাদনের বিকাশ ঘটার ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব যুগের চরিত্রের সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়ে। সামাজিক উৎপাদন থেকে নৈরাজ্য যে-পরিমাণে দূর হয়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরও সেই পরিমাণে অবসান ঘটে। অবশেষে মানুষ তার নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের কর্তা হয়ে দাঁড়ায় আর একই সঙ্গে সে হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা—একেবারে স্বাধীন।

এই সর্বাত্মক মুক্তি-যজ্ঞ সম্পন্ন করাই আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ইতিহাস-নির্ধারিত কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনের ঐতিহাসিক অবস্থাকে এবং এই কর্তব্যের যথার্থ প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং বর্তমানে যে-শ্রেণী নিপীড়িত ও এই কর্তব্য সম্পাদনের ভার যার ওপর ন্যস্ত সেই প্রলেতারীয় শ্রেণীর চেতনায় এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তার তাৎপর্য সঞ্চারিত করাই প্রলেতারীয় আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বগত কর্তব্য।

তিন

উৎপাদন

এর আগে যা বলা হয়েছে, তারপর এটা জানতে পেরে পাঠক মোটেই আশ্চর্য হবেন না যে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত সমাজবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে হের ড্যুরিং-এর মতবাদের আদৌ কোনো মিল নেই। পাঠক এগুলিকে রসাতলে ছুঁড়ে ফেললেই ভালো করবেন, যেখানে পরিত্যক্ত 'ইতিহাস ও তর্কবিদ্যার কাল্পনিক বিকৃতিগুলি', 'অসার ধ্যানধারণাগুলি' এবং 'হতবুদ্ধিকর ও ধোঁয়াটে চিন্তাসমূহ' জমা হয়ে আছে। হের ড্যুরিং-এর কাছে সমাজবাদ আসলে ইতিহাসের আদৌ কোনো অনিবার্য পরিণতি নয়, নিছক উদরপূর্তির জন্যে আজকের স্থূল বস্তুগত আর্থনীতিক অবস্থার পরিণতি তো নয়ই। আরও ভালো ধরনের একটা কিছু তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সমাজবাদ একেবারে চূড়ান্ত ও পরম সত্য :

এটা 'সমাজের স্বাভাবিক পদ্ধতি', যার মূলের সন্ধান পাওয়া যাবে 'সর্বজনীন ন্যায়-নীতির' মধ্যে।

অতীতের পাপিষ্ঠ ইতিহাস যে বর্তমান পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে, তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই তিনি যদি এই পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তাহলে এটাকে বিশুদ্ধ ন্যায়নীতির পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার বলেই মনে করতে হবে। অন্যান্য সবকিছুর মতো সমাজবাদকেও হের ড্যুরিং, তাঁর সেই বিখ্যাত দুই ব্যক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তবে এর আগে পুতুল দু'টি প্রভু-ভৃত্যের ভূমিকায় যেভাবে অভিনয় করেছিল, তার বদলে এখন তারা সমানাধিকার সংক্রান্ত চরিত্রে অভিনয় করছে—আর এইভাবেই ড্যুরিঙ্গীয় সমাজবাদের ভিত্তি গাথা হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এটা না বললেও চলে যে হের ড্যুরিং-এর কাছে শিল্পে পর্যায়-

ক্রমিক সঙ্কটগুলির আদৌ কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই, যে-তাৎপর্য আমরা বাধ্য হয়েই ঐগুলির ওপর আরোপ করেছি। তাঁর মতে :

> এইসব সংকট 'স্বাভাবিকত্ব' থেকে মাঝে মাঝে ঘটে-যাওয়া বিচ্যুতিমাত্র আর খুব বেশি হলেও এগুলি 'আরও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার বিকাশ'কে ত্বরান্বিত করার পক্ষে সহায়ক। অতি-উৎপাদনের 'সাধারণ পদ্ধতি'র সাহায্যে সঙ্কটগুলির ব্যাখ্যা দান তাঁর 'আরও যথাযথ ধারণা'র পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। অবশ্য এই ধরনের ব্যাখ্যা 'কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকার বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যেতে পারে'। যেমন, 'বিপুল সংখ্যায় বিক্রির যোগ্য গ্রন্থাদির হঠাৎ পুনঃপ্রকাশ বইয়ের বাজারকে ভাসিয়ে দেয়'।

তাঁর অমর রচনাবলীর ভাগ্যে এই রকম বিশ্ব-বিপর্যয় ঘটবে না—এই অনুভূতি নিয়ে হের ড্যুরিং মনের সুখে নিদ্রা যেতে পারেন!

> কিন্তু তাঁর দাবি হলো বড় বড় সংকটে অতি-উৎপাদন নয়, বরঞ্চ 'জনগণের ভোগের পরিমাণ হ্রাস···কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভোগের ঘাটতির সঙ্গে···জনগণের চাহিদার (!) স্বাভাবিক বৃদ্ধির বৈষম্য ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাকটিকে এই রকম সঙ্কটজনকভাবে বাড়িয়ে তোলে।'

এই ধরনের সংকট-তত্ত্বের পক্ষে তিনি যে একজন শিষ্য খুঁজে পেয়েছেন, সেটা তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো জনগণের ভোগের ঘাটতি, বেঁচে-বর্তে থাকা ও বংশরক্ষার জন্যে প্রয়োজনের তুলনায় জনসাধারণের ভোগের স্বল্পতা কোনো নতুন ঘটনা নয়। যতদিন ধরে শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন ধরেই এটা ঘটছে। এমনকি ইতিহাসের যেসব যুগে জনগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল, যেমন পঞ্চদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে, তখনও তাদের ভোগের পরিমাণে ঘাটতি বজায় থেকেছে। নিজেদের বার্ষিক মোট উৎপন্ন-দ্রব্য ভোগের অধিকার কখনই তারা পায় নি। সুতরাং ভোগের ঘাটতি যখন হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাসের একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, তখন অতি-উৎপাদনের ফলে বাজারের সংকটকালীন সংকোচন মাত্র বিগত পঞ্চাশ বছরের ব্যাপার; তাই অতি-উৎপাদনের নতুন ঘটনার পরিবর্তে কয়েক হাজার বৎসর-ব্যাপী ভোগের ঘটনার সাহায্যে এই নতুন বিরোধকে ব্যাখ্যার জন্যে হের

ড্যুরিং-এর ভাসা-ভাসা স্থূল অর্থনীতির প্রয়োজন হয়। একটি ধ্রুবক ও একটি চলরাশির অনুপাতের মধ্যে ভেদকে একজন গণিতজ্ঞ যদি চলরাশির ভেদের পরিবর্তে ধ্রুবকের ধ্রুবত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তাহলে যা হয়, এখানেও ব্যাপারটা সেই রকমই। জনগণের ভোগের ঘাটতি শোষণ-ভিত্তিক সমস্ত সমাজেরই, ফলত পুঁজিবাদী সমাজেরও একটা অপরিহার্য বনিয়াদ। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিই প্রথম সংকটের জন্মদাতা। সুতরাং জনগণের ভোগের ঘাটতি ও সংকটের ভিত্তি এবং এই সংকট সৃষ্টির পিছনে তার একটা ভূমিকা রয়েছে যা বহু আগেই স্বীকৃত। কিন্তু যে সংকট আগে ছিল না অথচ এখন বর্তমান, এটা বোঝার পক্ষে এই ঘটনা আমাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না।

বিশ্ব-বাজার সম্বন্ধে হের ড্যুরিং-এর ধারণা একেবারেই অদ্ভুত। এর আগে আমরা দেখেছি, ঠিক জার্মানসুলভ বুদ্ধিজীবীর মতো তিনি বাস্তব শিল্প-সংকটকে লাইপজিগের বইয়ের বাজারের কল্পিত সংকটের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন—এযেন সমুদ্রের তুফানকে চায়ের পেয়ালায় তুফানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। তিনি এটাও কল্পনা করেছেন যে বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী উৎপাদনকে

> 'তার বাজারের জন্যে প্রধানত সম্পত্তিবান শ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠী-গুলির ওপরই নির্ভর করতে হবে।'

এই বক্তব্য সত্ত্বেও ঠিক ষোলো পৃষ্ঠা পরে, সাধারণভাবে একটি স্বীকৃত বক্তব্য হিসাবে, লৌহ ও তুলা শিল্পকে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন আধুনিক শিল্প বলে হাজির করতে তাঁর বাধে নি—উৎপাদনের ঠিক এই দুটি শাখার উৎপন্নদ্রব্য সম্পত্তিবান শ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীগুলি যৎসামান্যই ব্যবহার করে থাকে এবং এই দুটি শাখাকে তাদের টিকে থাকার জন্যে জনগণের ভোগের ওপরই বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। হের ড্যুরিং-এর লেখার সর্বত্রই শূন্যগর্ভ ও স্ববিরোধী বাচালতার ছড়াছড়ি। তুলা শিল্প থেকে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। ম্যাঞ্চেস্টারের চারপাশে অনেকগুলি শহরের মধ্যে ওল্ডহ্যাম শহরটি অপেক্ষাকৃত ছোট—এখানকার ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার অধিবাসী তুলা শিল্পে নিযুক্ত। শুধুমাত্র এই শহরেই ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ এই চার বছরের মধ্যে ৩২ নম্বর সুতো কাটা টাকুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল; সুতরাং ইংল্যাণ্ডের একটা মাঝারি ধরনের শহরে শুধুমাত্র একটা নম্বরের সুতো তৈরির জন্যে যত টাকু

দরকার হয়েছে, তার সংখ্যা আলসাস সমেত সমগ্র জার্মানির তুলা শিল্পে ব্যবহৃত টাকুর সংখ্যার সমান। আর ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে তুলা শিল্পের অন্যান্য শাখা ও অঞ্চল মোটামুটিভাবে অনুরূপ পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছে। এইসব তথ্য বিচার করলে, ইংল্যাণ্ডের সূতোকলের মালিকদের অতি উৎপাদনের দ্বারা সূতো ও কাপড়ের ব্যবসার সম্পূর্ণ অচলাবস্থাকে ব্যাখ্যা না করে, ইংল্যাণ্ডের জনগণের ভোগের ঘাটতির সাহায্যে এই অচলাবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে হলে যথেষ্ট ধৃষ্টতার প্রয়োজন।*

কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয়েছে। যিনি লাইপজিগের বইয়ের বাজারকে আধুনিক শিল্পের অর্থে গণ্য করতে পারেন, অর্থনীতি সম্বন্ধে এইরকম অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্কে যাওয়া অর্থহীন। সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা নিছক এইটুকুই বলতে চাই যে হের ড্যুরিং সংকট সম্বন্ধে আরও একটা তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেছেন:

> সংকটের মধ্যে আমরা 'অতিরিক্ত চাপ ও শিথিলতার সাধারণ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' ছাড়া আর কিছুই পাই না; 'শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিকল্পিত বৃদ্ধির জন্যেই' ফাটকাবাজী হয় না। 'অতিরিক্ত যোগানের কারণগুলির মধ্যে বিভিন্ন মালিকের হঠকারিতা ও ব্যক্তি-মালিকের অসতর্কতাকেও বিবেচনা করতে হবে।'

কিন্তু হঠকারিতা এবং ব্যক্তি-মালিকের অসতর্কতা দেখা দেওয়ার পিছনে কারণ কী? পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিকল্পনাহীনতাই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। এবং একটা নতুন কারণ আবিষ্কারের তাগিদে একটা আর্থনীতিক ঘটনার প্রকাশকে নৈতিক ভর্ৎসনা হিসাবে ভুল করাও অত্যন্ত 'হঠকারী' কাজের নমুনা।

এবার আমরা সংকটের প্রশ্নটি বর্জন করতে পারি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এটা আমরা দেখিয়েছি যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি অবধারিতভাবেই এই সংকট সৃষ্টি করে এবং আমরা খোদ উৎপাদন পদ্ধতির সংকট হিসাবে, সমাজ-বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলার হাতিয়ার হিসাবে সেগুলির তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা

---

* এই 'ভোগের ঘাটতি'-সংক্রান্ত ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেন সিসমাণ্ড; তাঁর ব্যাখ্যার এখনও খানিকটা তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে রডবারটাস এটা গ্রহণ করেন এবং হের ড্যুরিং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্থূল রীতিতে এটা রডবারটাস থেকে নকল করেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা)

করেছি। এখন এই বিষয়ে হের ড্যুরিং-এর ভাসাভাসা বক্তব্যের জবাবে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এইবার তাঁর ইতিবাচক আবিষ্কার 'সমাজের স্বাভাবিক পদ্ধতি' সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

'সর্বজনীন ন্যায়-সূত্রের' ভিত্তিতে সৃষ্ট বলেই এই পদ্ধতিটি যাবতীয় বিস্ময়কর বাস্তব ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত—আর্থনীতিক কমিউনগুলির একটা সমষ্টিগত রূপ, যেগুলির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

> 'চলাফেরার স্বাধীনতা এবং বিধিবদ্ধ আইনকানুন ও প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী নতুন সদস্য গ্রহণের অবশ্যপালনীয় রীতি।'

আর্থনীতিক কমিউন হচ্ছে 'মানবেতিহাসে বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন একটি সর্বাঙ্গীণ প্রকল্প' যা কোনো এক মার্কসের 'ভ্রান্ত আধা-খেঁচড়া পদ্ধতি'র তুলনায় অনেক উন্নত। এটা 'এমন ব্যক্তিদের সমাজ যারা যৌথভাবে অংশ-গ্রহণের জন্যে একটা নির্দিষ্ট এলাকাধীন জমি ও সর্বসাধারণের ব্যবহারের যোগ্য কতকগুলি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বিলি-বন্দোবস্ত করার সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ।' এই সাধারণ অধিকারটি হচ্ছে 'বস্তুসামগ্রীর ওপর অধিকার...প্রকৃতি ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রচারবিদের সম্পর্কের অর্থে।'

এই কথাগুলির অর্থ কী সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার দায়িত্ব আমরা আর্থনীতিক কমিউনের ভবিষ্যৎ আইনজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিলাম; এটা আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করলাম। এখানে আমরা শুধু এইটুকুই উদ্ধার করতে পারছি:

> এটা আদৌ 'শ্রমিকদের সংগঠনগুলির যৌথ মালিকানা'র মতো নয়, এর মধ্যে থেকে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, এমনকি মজুরি-শ্রমের শোষণের বিষয়টিও বাদ যায় না।

এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে

> মার্কসের রচনায় 'যৌথ মালিকানা'র যে ধারণাটি পাওয়া যায়, সেটা 'খুব কম করে বললেও অস্পষ্ট ও বিতর্কমূলক, কারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধারণা সবসময়েই এই মনোভাব সৃষ্টি করে যে শ্রমিকদের গোষ্ঠী-গুলির যৌথ মালিকানা ছাড়া এর আর অর্থ নেই।'

বিষয়টি যা নয় তাই বলে প্রতিপন্ন করার যে 'নীচ স্বভাব' হের ড্যুরিং-এর রয়েছে, এটা তার আরও একটা নজির। তাঁর নিজের কথা ব্যবহার করেই

বলা যায় 'তাঁর স্থূল চরিত্রের পক্ষে অশালীন নীচ কথাটিই সবচেয়ে মুতসই।' যৌথ মালিকানা বলতে মার্কস এমন একটা 'মালিকানা বুঝিয়েছিলেন যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক'—হের ড্যুরিং-এর অন্যান্য আবিষ্কারের মতো এটাও একটা ভিত্তিহীন মিথ্যা উক্তি।

যাই হোক, এই কথাটি পরিষ্কার: শ্রমের হাতিয়ারগুলির ক্ষেত্রে আর্থনীতিক কমিউনের রাজনৈতিক প্রচারবিদের অধিকার হলো সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকার, অন্ততপক্ষে অন্যান্য আর্থনীতিক কমিউন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের তুলনায়।

> কিন্তু এই অধিকার কমিউনকে 'বহির্জগৎ থেকে...নিজেকে বিচ্ছিন্ন' করার অধিকার দেয় না; 'কেননা বিভিন্ন আর্থনীতিক কমিউনের মধ্যে চলাফেরার স্বাধীনতা বর্তমান এবং বিধিবদ্ধ আইন ও প্রশাসনিক নিয়মকানুনের ভিত্তিতে নতুন সদস্য গ্রহণের বাধ্যতামূলক বিধি রয়েছে...বর্তমান কালে রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান কিংবা সমাজের আর্থনীতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন থাকে।'

সুতরাং ধনী ও দরিদ্র আর্থনীতিক কমিউন থাকবে এবং সমতা আসবে দরিদ্র কমিউন পরিত্যাগ করে ধনী কমিউনে গিয়ে লোকজন ভিড় করার মধ্যে দিয়ে। যদিও হের ড্যুরিং ব্যবসা-বাণিজ্যের জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলে বিভিন্ন কমিউনের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা দূর করতে চান, অথচ তিনিই আবার উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাবার ব্যাপারটি নীরবে মেনে নেন। বস্তুসামগ্রীকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করা হয় কিন্তু মানুষ তার অধীনেই থাকে।

'রাজনৈতিক প্রচারবিদের অধিকার' সংক্রান্ত প্রশ্নটি এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। দুই পৃষ্ঠা পরে হের ড্যুরিং আমাদের কাছে এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন

> বাণিজ্যিক কমিউন 'প্রথমে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রের ওপর দখল বিস্তার করবে, যার বসবাসকারীরা একটি বৈধ সত্তা এবং এই চরিত্রের জন্যেই সমস্ত জমি, বাসস্থান ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তাদের অধিকারভুক্ত।'

সুতরাং কোনো একটা কমিউনের অধীনে নয়, সমগ্র জাতিই এই বস্তু-

সামগ্রীর অধিকারী। তাই 'জনগণের অধিকার', 'বস্তুসামগ্রীর ওপর অধিকার', 'প্রকৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারবিদের সম্পর্ক' ইত্যাদি বিষয়ই শুধু 'অন্ততপক্ষে অস্পষ্ট ও বিতর্কমূলক নয়', 'পরস্পর-বিরোধীও বটে। যাই-হোক, যেখানে প্রতিটি আর্থনীতিক কমিউন একই সঙ্গে একটি বৈধসত্তা, সেখানে এটা এমন এক 'মালিকানা যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়তই' এবং শেষোক্ত 'অস্পষ্ট বর্ণসঙ্করটি'কে আবার হের ড্যুরিং-এর রচনাতেই সন্ধান পাওয়া যায়।

যে কোনোভাবেই, উৎপাদনের জন্যে শ্রমের হাতিয়ারগুলি আর্থনীতিক কমিউনের অধিকারভুক্ত। কিভাবে এই উৎপাদন চলে? হের ড্যুরিং আমাদের যা বলেছেন, সেই বিচারে বলা যায়: অতীতের পদ্ধতিতেই, এখানে একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো কমিউন পুঁজিপতিদের স্থান নেয়। এছাড়া আর যা আমাদের বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, তখন প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামতো তার পেশা বেছে নিতে পারবে এবং কাজের ক্ষেত্রে সকলের একই রকম বাধ্য-বাধকতা থাকবে।

আজ পর্যন্ত যাবতীয় উৎপাদনের মৌলিক রূপ হচ্ছে শ্রম-বিভাগ, একদিকে সমাজের মধ্যে, আর অন্যদিকে প্রতিটি পৃথক পৃথক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে। এই বিষয়ে হের ড্যুরিং-এর 'সামাজিকতা'র অবস্থান কোথায়?

সমাজে প্রথম বড় রকমের শ্রম-বিভাগ হচ্ছে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিভাজন।

> হের ড্যুরিং-এর মতে এই বিরোধ 'বস্তুর প্রকৃতিগত, অনিবার্য।' কিন্তু 'কৃষি ও শিল্পের মধ্যেকার ব্যবধানকে দুর্লঙ্ঘ্য গণ্য করাটা সাধারণভাবে সঠিক বলে মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে, এই দুটির মধ্যে খানিকটা নিয়মিত পারস্পরিক যোগসূত্র আগে থেকেই রয়েছে, ভবিষ্যতে যার যথেষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা বর্তমান।' ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে দু'টি শিল্প কৃষি ও গ্রামীণ উৎপাদন-ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে: 'প্রথমত, মদ চোলাইয়ে ও দ্বিতীয়ত বীট-চিনি উৎপাদনে। ...মদ তৈরি এর মধ্যে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে একে বাড়িয়ে দেখার চাইতে কমিয়ে দেখার সম্ভাবনাই বেশি'। আর 'যদি কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে অনেকগুলি শিল্প এমনভাবে গড়ে ওঠে, যাতে তাদের উৎপাদন গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য

হয় এবং কাঁচামাল উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি এটাকে যুক্ত করে ফেলে' তাহলে এটা শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধকে দুর্বল করবে এবং 'সভ্যতা-বিকাশের ব্যাপকতম সম্ভাব্য বনিয়াদ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে।' উপরন্তু, 'অন্য উপায়েও একই রকম ফল পাওয়া যেতে পারে। কারিগরি চাহিদা ছাড়াও সামাজিক চাহিদাগুলি ক্রমশই বেশি করে সামনে আসছে, এবং মানুষের কাজকর্ম গোষ্ঠীবদ্ধ করার ব্যাপারে যদি শেষোক্ত বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে তাহলে সেইসব সুবিধাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না, যেগুলি গ্রামীণ পেশা ও কাঁচামাল থেকে জিনিসপত্র তৈরির কারিগরি প্রকরণগুলির মধ্যেকার একটা ঘনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল যোগসূত্র থেকে উদ্ভূত।'

এইভাবে আর্থনীতিক কমিউনে নির্দিষ্টভাবে সামাজিক চাহিদাগুলিই সামনে এসে যায়; সুতরাং কৃষি ও শিল্পের মিলন ঘটাবার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সুবিধাগুলি যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাবার জন্যে এটা কি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না? এই প্রশ্নে আর্থনীতিক কমিউনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তাঁর 'আরও যথাযথ ধারণাগুলি' নিজের অভ্যস্ত ক্লান্তিকর রীতিতে আমাদের কাছে উপস্থিত করা থেকে হের ড্যুরিং কি বিরত থাকবেন? পাঠক যদি আশা করেন যে তিনি এই কাজ থেকে বিরত থাকবেন, তাহলে তাঁকে মর্মান্তিকভাবে হতাশই হতে হবে। প্রাশীয় লাণ্ডরেখ্ট-এর আওতাধীন মদ-চোলাই, বীট চিনি তৈরি ক্ষেত্রের গণ্ডির মধ্যে উপরোক্ত তুচ্ছ, একঘেয়ে মামুলী বক্তব্য ছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের শহর ও গ্রামের বিরোধ সম্বন্ধে হের ড্যুরিং-এর আর কিছু বলার নেই।

এখন শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক। এখানে হের ড্যুরিং 'আর একটু বেশি যথাযথ'। তিনি বলছেন:

'এক ব্যক্তি নিজেকে একান্তভাবেই এক ধরনের পেশায় নিযুক্ত করেছে।' উৎপাদনের একটি নতুন শাখার প্রবর্তন যদি আলোচ্য বিষয় হয়, তাহলে একটিমাত্র দ্রব্য উৎপাদনে নিজেদের নিযুক্ত করবে, এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যসামগ্রী (!) সরবরাহ করা যাবে কিনা, সমস্যাটি শুধু সেই প্রশ্নের ওপরই নির্ভরশীল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের কোনো শাখাতেই 'বহু লোকের দরকার হবে না', আর তাই 'তাদের

জীবন-যাপনের স্বাতন্ত্র্য-সূচক রীতি অনুযায়ী' মানুষের 'আর্থনীতিক প্রজাতি' দেখা দেবে।

এইভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবকিছুই আগের মতো থেকে যায়।

অবশ্য এখন পর্যন্ত সমাজে একটি 'ভ্রান্ত শ্রম-বিভাগ' অর্জন করা গিয়েছে।

কিন্তু এটা কী এবং আর্থনীতিক কমিউন কিসের মাধ্যমে একে অপসারণ করবে, সে সম্বন্ধে আমাদের শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে:

'খোদ শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে এর আগেই আমরা বলেছি যে যখনই নানাবিধ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত দক্ষতাগুলিকে বিচারের মধ্যে আনা হবে, তখনই বুঝতে হবে যে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।'

দক্ষতা ছাড়াও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়েছে:

'যে ধরনের কাজে অতিরিক্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, সেই ধরনের কাজে উদ্যোগী হওয়ার মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেটা একান্তভাবে নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট পেশাটির প্রতি ঝোঁক এবং অন্য কোনো জিনিসের নয়, শুধু এই জিনিসটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে যে-আনন্দলাভ হবে তার ওপর (জিনিসটির প্রয়োগ !)।

আর এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা জাগিয়ে তুলবে, যাতে

'খোদ উৎপাদনটাই হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় এবং রোজগারের উপায় ছাড়া যার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, সেই ধরনের ক্লান্তিকর ব্যাপার পরিস্থিতির ওপর তার দুর্বহ ভার আর চাপাতে পারবে না।'

যেসব সমাজে উৎপাদন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়েছে (আমাদের বর্তমান সমাজটাও সেই ধরনের), সেইসব সমাজের অবস্থা এমন নয় যাতে উৎপাদকরা উৎপাদনের উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বরঞ্চ উৎপাদকরা নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদনের উপকরণের দ্বারা। এই ধরনের সমাজে প্রতিটি উৎপাদনের নতুন লীভার অনিবার্যভাবেই উৎপাদকদের উৎপাদনের উপকরণের অধীনস্থ করার নতুন মাধ্যমে পরিণত হয়। আধুনিক শিল্প প্রবর্তিত হওয়ার আগে উৎপাদনের যে লীভার অর্থাৎ শ্রম-বিভাগ সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, এটা সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। প্রথম বড় শ্রম-বিভাগ অর্থাৎ শহর ও গ্রামের মধ্যে

বিচ্ছিন্নতা গ্রামীণ জনসংখ্যাকে হাজার হাজার বছরের জন্যে মানসিক জড়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং প্রতিটি শহরের মানুষকে তার নিজস্ব বৃত্তির ওপর নির্ভরশীল করে রেখে দেয়। এটা গ্রামীণ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও শহরের মানুষদের দৈহিক বিকাশের ভিত্তি ধ্বংস করে ফেলে। কৃষক যখন তার জমিতে ও শহরের মানুষ যখন তার বৃত্তির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে, তখন জমি কৃষককে আর বৃত্তি শহরের মানুষকে অনুরূপ পরিমাণেই আচ্ছন্ন করে রাখে। শ্রম বিভক্ত হওয়ার ফলে মানুষও বিভক্ত হয়ে যায়। একটিমাত্র কর্মতৎপরতার বিকাশের জন্যে অন্য সমস্ত কায়িক ও মানসিক দক্ষতা জলাঞ্জলি দিতে হয়। শ্রম-বিভাগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, মানুষের পঙ্গুত্বও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকে এবং শিল্পোৎপাদনের পর্বে এসে এই শ্রম-বিভাগ তার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায়। শিল্পোৎপাদন প্রত্যেকটি পেশাকে টুকরো টুকরো আংশিক কাজে ভাগ করে ফেলে, এর এক-একটি কাজ শ্রমিককে সারা জীবনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং এইভাবে একটা নির্দিষ্ট খুঁটিনাটি কাজের সঙ্গে ও একটা নির্দিষ্ট যন্ত্রের সঙ্গে তাকে আজীবন বেঁধে রাখে। 'আংশিক কাজে নৈপুণ্য অর্জনের চাপে উৎপাদনশীল ক্ষমতার জগৎ ও সহজাত বৃত্তিকে বিপন্ন ক'রে এটা শ্রমিককে এক অক্ষম দানবে পরিণত করে।......ব্যক্তি-মানুষটাই হয়ে ওঠে একটা টুকরো কাজ করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র' (মার্কস)* এবং বহু ক্ষেত্রেই এটা এমন এক যন্ত্র যা দক্ষতা অর্জন করে শ্রমিককে যথার্থ অর্থেই কায়িক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে। আধুনিক শিল্পের যন্ত্রপাতি শ্রমিককে যন্ত্র থেকে যন্ত্রাংশে পরিণত করে তার অধঃপতন ঘটায়। 'একই যন্ত্র চালানোর জীবনভর বিশেষ বৃত্তি এখন একই যন্ত্রে কাজ করার সারা জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। মজুরকে একেবারে বাল্যকাল থেকেই বিশেষ যন্ত্রের অংশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রকে ভুলভাবে কাজে লাগানো হয়।'** (মার্কস) আর শুধু শ্রমিকরা নয়, শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণকারী শ্রেণীগুলিও শ্রম-বিভাগের মধ্যে দিয়ে যন্ত্রের কাজকর্মের অধীন হয়ে পড়েঃ নির্বোধ বুর্জোয়ারা তাদের নিজস্ব পুঁজি ও মুনাফার উন্মত্ত লালসার শিকার হয়; ব্যবহারজীবীকে তার মান্ধাতার আমলের আইনী ধ্যানধারণার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখে, যা একটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে তার ওপর চেপে থাকে. 'শিক্ষিত

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৩৯৭। সম্পাদক।
** ক্যাপিটাল, পৃ ৩৯৮। সম্পাদক।

শ্রেণীগুলি'কে সাধারণভাবে আটকে রাখে নানা ধরনের আঞ্চলিক, সংকীর্ণ-, মানসিকতা ও একদেশদর্শিতার মধ্যে, তাদের কায়িক ও মানসিক অদূরদর্শিতার মধ্যে; সংকীর্ণ বিশেষ শিক্ষা এবং সারা জীবন এই ধরনের বিশেষ কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে (এমনকি যখন এই বিশেষ কাজকর্ম কাজেও লাগে না) তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

শ্রম-বিভাগের ফলাফল সম্পর্কে ইউটোপীয়ানদের ধারণা সম্পূর্ণ স্বচ্ছই ছিল: একদিকে শ্রমিক আর অন্যদিকে সারা জীবন ধরে একই রকম যান্ত্রিক কাজের পুনরাবৃত্তির চক্রে বাঁধা থাকার ফলে শ্রম-কর্মের পঙ্গুত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। ফুরিয়ের ও ওয়েন—পুরোনো শ্রম-বিভাগ সম্পূর্ণভাবে দূর করবার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে শহর ও গ্রামের ব্যবধান অবসানের দাবি তুলেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এটা চিন্তা করেছিলেন যে সমগ্র জনসংখ্যাকে ষোলশো থেকে তিন হাজার মানুষের এক-একটা গোষ্ঠীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে; প্রতিটি গোষ্ঠী তার জমির মাঝখানে একটা বিরাট অট্টালিকায় একসঙ্গে বসবাস করবে। একথা ঠিক যে ফুরিয়ের মাঝেমাঝে শহরের কথা বলেছেন, কিন্তু শহরের অর্থ এখানে পরস্পরের নিকটবর্তী চার পাঁচটি অট্টালিকা মাত্র। উভয় লেখকই মনে করেছিলেন যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োজিত থাকতে হবে; ফুরিয়ের অবশ্য শিল্প বলতে মুখ্যত হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র যন্ত্রশিল্প বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু ওয়েন প্রধান ভূমিকা অর্পণ করেছিলেন আধুনিক শিল্পের ওপর এবং গৃহকর্মে বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন দাবি করেছিলেন। কিন্তু উভয়েই কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যতটা সম্ভব বেশি পেশাগত বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করার এবং সেই অনুসারে তরুণদের ব্যাপকতম সর্বাঙ্গীণ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই ভাবতেন যে সর্বজনীন ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে এবং শ্রম-বিভাগ কাজের যে-আকর্ষণী ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে, শ্রম তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে; প্রথমত পারে পেশাগত এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, ফুরিয়েরের[১৭৪] এর ভাষায় বলা যায়, প্রতিটি 'বিশেষ ধরনের কাজের মধ্যে যে স্বল্প বিরতি থাকে, সেই সময়ে 'বসে থাকা'র মধ্যে দিয়ে। হের ড্যুরিং উত্তরাধিকার-সূত্রে শোষক শ্রেণীর যে চিন্তা-পদ্ধতির অধিকারী, ফুরিয়ের ও ওয়েন দু'জনেই সেই চিন্তার তুলনায় অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। এই চিন্তা

অনুযায়ী শহর ও গ্রামের বিরোধ প্রকৃতিগতভাবেই অনিবার্য ; এই চিন্তার মধ্যেই এই সংকীর্ণ দৃষ্টিটি রয়েছে যে কয়েকজন 'মানুষ' সব সময়েই একটি মাত্র জিনিস উৎপাদনের কাজে আটকে থাকবে এবং স্বতন্ত্র জীবন ধারায় চিহ্নিত মানুষগুলি 'আর্থনীতিক প্রজাতিসমূহ'কে চিরদিন টিকিয়ে রাখবে—আর কিছুতে নয়, শুধু এই কাজের মধ্যেই তারা আনন্দ পায় এবং তারা এতই অধঃপতিত যে নিজেদের দাসত্ব ও একপেশে জীবনযাত্রাতেও খুশি থাকে। এমনকি 'নির্বোধ' ফুরিয়েরের-এর বেপরোয়া কল্পনাবিলাস কিংবা 'স্থূল, দুর্বলচিত্ত ও গুরুত্বহীন' ওয়েন-এর তুচ্ছতম ধারণার তুলনায়, এখনও শ্রম-বিভাগের ধারণায় আচ্ছন্ন হের ড্যুরিং একজন নির্লজ্জ বামন ছাড়া আর কিছুই নন।

উৎপাদনের উপকরণগুলিকে একটা সামাজিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এইসব উপকরণের ওপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে সমাজ মানুষের তৈরি উৎপাদনের উপকরণের এতদিনকার বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ মুক্ত না হলে সমাজেরও মুক্তি ঘটে না। সুতরাং পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির আগাগোড়া বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন, আর বিশেষ করে প্রয়োজন পুরানো শ্রম-বিভাগ দূর করা। এর পরিবর্তে গড়ে তুলতে হবে এমন একটা শ্রম-সংগঠন যেখানে, একদিকে, কোনো ব্যক্তিই উৎপাদনশীল শ্রম-কর্মে তার অংশ, মানবিক অস্তিত্বের এই স্বাভাবিক পূর্বশর্তকে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারবে না ; যেখানে, অন্যদিকে, উৎপাদনশীল শ্রম কর্ম মানুষকে অধীন করে রাখার উপায় না-হয়ে মানব-মুক্তির উপায় হয়ে উঠবে, প্রতিটি মানুষ তার কায়িক ও মানসিক গুণগুলির বহুমুখী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে এবং পরিপূর্ণভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করতে পারবে—আর তার ফলে উৎপাদনশীল শ্রম মানুষের পক্ষে বোঝা না হয়ে, আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

এটা এখন আর কল্পনাবিলাস নয়, নয় একটা শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইচ্ছা। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের বর্তমান স্তরে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিকতা বিধান এবং উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদনের উপকরণগুলির অপচয় রোধ ও সেই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূর হওয়ার ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করলে, কাজের সময় যথেষ্ট হ্রাস পাবে, আমাদের বর্তমান ধ্যানধারণার তুলনায়, এই সময়কে বেশ কমই বলতে হয়।

শ্রমোৎপাদনশীলতার ক্ষতি করে পুরানো শ্রম-বিভাগ দূর করার প্রয়োজন আর নেই। বরঞ্চ আধুনিক শিল্প একে খোদ উৎপাদনেরই একটা ভিত্তি করে তুলেছে। 'যন্ত্রের ব্যবহার একই মানুষকে একই নির্দিষ্ট কাজে সবসময়ে যুক্ত রেখে শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনে এই বিভাজনকে সংহত করার প্রয়োজনের অবসান ঘটায়। সমগ্র ব্যবস্থাটির গতিশীলতার উৎস যেহেতু শ্রমিক নয় যন্ত্র, তাই কাজের ব্যাঘাত না করে যে কোনো সময়েই ব্যক্তিদের বদল ঘটতে পারে।...শেষত, তরুণরা যে রকম দ্রুততার সঙ্গে যন্ত্রের কাজ আয়ত্ত করে ফেলে, তাতে একান্তভাবে যন্ত্রের কাজে লাগানো যেতে পারে এমন একটা বিশেষ শ্রেণীর কর্মী-বাহিনী তৈরি করার প্রয়োজনও থাকে না।'* যেহেতু যন্ত্র-ব্যবহারের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বিশেষজ্ঞ তৈরি করার সেকেলে প্রথা ও পুরানো শ্রম-বিভাগকে টিকিয়ে রাখে, অথচ যা কারিগরি দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, সেই কারণে খোদ যন্ত্রই বিদ্রোহ করে কালের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে। আধুনিক শিল্পের কারিগরি ভিত্তিটি বিপ্লবী। 'যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে এটা শুধু উৎপাদনের কারিগরি ভিত্তিতেই পরিবর্তন আনছে না, শ্রমিকদের কাজকর্ম ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক সংহতিকেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত করছে। তার ফলে একই সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রম-বিভাগে বিপ্লবী রদবদল ঘটছে এবং পুঁজি ও শ্রমজীবীরাও অনবরত উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। আধুনিক শিল্প, তার চরিত্র অনুযায়ীই, শ্রমের মধ্যে নানান পরিবর্তন আনে, কাজে দ্রুততা সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের মধ্যে বিশ্বজনীন গতিশীলতা নিয়ে আসে...আমরা দেখেছি এই চরম স্ব-বিরোধ...শ্রমিকদের নিরন্তর বিসর্জন দিয়ে, শ্রমশক্তির নিদারুণ অপচয় ঘটিয়ে এবং সামাজিক নৈরাজ্যের বিপর্যয় সৃষ্টি করে কিভাবে উন্মত্ত রূপে প্রকাশ পায়। এটা এর নেতিবাচক দিক। একদিকে, বর্তমানে কাজের পরিবর্তন যেমন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এইরকম প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ধ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াশীলতা সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, অন্যদিকে, তেমনি চরম বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে আধুনিক শিল্প কাজের পরিবর্তন ও তার ফলস্বরূপ নানা ধরনের কাজে শ্রমিকের উপযুক্ততা ও তজ্জনিত শ্রমিকের স্বাভাবিক

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৩৯৭। সম্পাদক।

প্রবণতার যথাসম্ভব ব্যাপকতম বিকাশকে উৎপাদনের একটা মৌল নিয়ম হিসাবেও প্রতিপন্ন করেছে। উৎপাদন পদ্ধতিকে এই নিয়মের স্বাভাবিক কার্যকারিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করাই সমাজের কাছে একটা জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতপক্ষে আধুনিক শিল্প, জীবনব্যাপী একই গতানুগতিক কাজের ক্রমাগত একঘেয়েমিতে পঙ্গু এবং একটা খণ্ডিত মানুষে পর্যবসিত এ যুগের টুকুরো টুকুরো শ্রম-কর্মে আবদ্ধ শ্রমিককে বদল করার বাধ্যতামূলক কর্তব্যটিকে সমাজের সামনে জীবন-মরণের প্রশ্ন হিসাবে তুলে ধরেছে। পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তি-মানুষ, বৈচিত্র্যময় শ্রম-কর্মের উপযোগী, উৎপাদনে যে কোনো পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত এবং নানা ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম,—এমন মানুষের স্বাভাবিক ও অর্জিত ক্ষমতাগুলি বিকাশের অবাধ সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।*

কমবেশি সর্বজনীনভাবে কার্যকর অণুগুলির গতিকে, কারিগরি উদ্দেশ্যে জনগণের গতিশীলতায় রূপান্তরিত করার শিক্ষা আধুনিক শিল্পের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, এইভাবে উৎপাদনকে বেশ খানিকটা আঞ্চলিকতার বন্ধন মুক্ত করার শিক্ষাও আধুনিক শিল্পই দেয়। জল-শক্তি আঞ্চলিক; বাষ্প-শক্তি আঞ্চলিকতা মুক্ত। জল-শক্তি যেখানে স্বভাবতই গ্রামীণ, বাষ্প-শক্তি কিন্তু কোনোভাবেই শহর-কেন্দ্রিক নয়। এই শক্তির পুঁজিবাদী ব্যবহারই একে প্রধানত শহরের মধ্যে আটকে রাখে এবং কারখানা-প্রধান গ্রামগুলিকে কারখানা-প্রধান শহরে পরিণত করে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে পুঁজিবাদী প্রয়োগ কাজের পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রথম প্রয়োজন এবং আধুনিক শিল্পের প্রায় সমস্ত শাখার উৎপাদনের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল। কিন্তু কারখানাবহুল শহরগুলিতে সমস্ত জলকে তীব্র দুর্গন্ধময় সারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূলভিত্তি যতই শহরে কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, প্রত্যেকটি শিল্পপতি, উৎপাদনের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ বড় বড় শহর থেকে, অনবরত দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাঁর কারখানাকে গ্রামে নিয়ে যেতে চান। ল্যাংকাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের বস্ত্রশিল্পের অঞ্চলে এই ধারাটিকে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা যায়; আধুনিক শিল্প অনবরত শহর থেকে গ্রামে চলে

* ক্যাপিটাল, ৪৫৭-৪৫৮। সম্পাদক।

গিয়ে গ্রামে নতুন নতুন বড় শহরের পত্তন করছে। ধাতুশিল্পের অঞ্চলগুলিতেও একই ব্যাপার ঘটেছে, অংশত ভিন্ন কারণে ঘটলেও সেখানে ফলাফল এই রকম।

আবারও দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র আধুনিক শিল্পের পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপসাধনই এই নতুন পাপচক্র থেকে আমাদের বের করে আনতে পারে এবং প্রতিনিয়ত যে আধুনিক শিল্পের জন্ম হচ্ছে তার মধ্যেকার বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে। যে সমাজে একটি মাত্র বিরাট পরিকল্পনার ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়, একমাত্র সেই সমাজেই তার নিজস্ব বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিতে সারা দেশজুড়ে শিল্পের প্রসার সম্ভব এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের তত্ত্বাবধান ও বিকাশ ঘটানো যায়।

এই হিসাবে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ দূর করার বাস্তবতা এখন আর শুধু সম্ভাবনার পর্যায়ে নেই। এটা এখন শিল্পোৎপাদনের পক্ষেই একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও এর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র শহর ও গ্রামের মিলনই বর্তমানের বিষাক্ত বাতাস, জল ও মাটিকে দূষণ মুক্ত করতে পারে; এবং একমাত্র এই মিলনই যন্ত্রণাক্লিষ্ট শহরবাসীর অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে এবং তাদের মলমূত্র, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির পরিবর্তে, শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে।

পুঁজিবাদী শিল্প এখন কাঁচামালের উৎস-ক্ষেত্রের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন করে তুলতে পেরেছে। বস্ত্র-শিল্প এখন প্রধানত আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। স্পেনের আকরিক লোহা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানিতে কাজ হচ্ছে, এবং স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকার আকরিক তামা নিয়ে কাজ চলছে ইংল্যাণ্ডে। প্রতিটি কয়লা-খনি এখন জ্বালানি সরবরাহ করছে তার সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরবর্তী শিল্পাঞ্চলে আর প্রতি বছর এই অঞ্চলের বিস্তৃতি বাড়ছে। ইউরোপের সমগ্র উপকূল জুড়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলছে ইংল্যাণ্ডের এবং কিছুটা পরিমাণে জার্মানি ও বেলজিয়ামের কয়লায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের বন্ধন-মুক্ত সমাজ আরও এগিয়ে যেতে পারে। সমগ্র শিল্পোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যারা অনুধাবন করতে পেরেছে এবং যাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের যাবতীয় শাখা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে—সর্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত

এইরকম একটা উৎপাদক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এই সমাজ নতুন একটা উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দেবে—যে-শক্তি বহু দূরদূরান্ত থেকে কাঁচামাল ও জ্বালানি নিয়ে আসার জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রম পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাতে সক্ষম হবে।

সুতরাং শহর ও গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করার বিষয়টি আকাশকুসুম কল্পনা নয়, সারা দেশ জুড়ে আধুনিক শিল্পের যতটা সম্ভব সমভাবে প্রসার ঘটালেই এটা সম্পন্ন করা যায়। তবে এটা ঠিক যে সভ্যতা বড় বড় শহরে আমাদের কাঁধে এমন এক উত্তরাধিকার চাপিয়ে দিয়েছে, যার থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় লাগবে ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যতই দীর্ঘমেয়াদী হোক না কেন, এর থেকে মুক্তি পেতেই হবে এবং মুক্তি পাওয়াও সম্ভব। প্রুশিয় জা'তর জার্মান সাম্রাজ্যের ভাগ্যে যা'ই থাকুক না কেন, বিসমার্ক এই গর্ব নিয়ে যেতে পারবেন যে তাঁর এই মনোবাঞ্ছা পূরণ হবেই: বড় বড় শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৭৫]

এখন আমরা বুঝতে পারছি পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির তলা থেকে ওপর পর্যন্ত বৈপ্লবিক রদবদল না ঘটিয়েই এবং সর্বোপরি পুরানো শ্রম বিভাগের অবসান না করেই সমাজ উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণের মালিকানা দখল করতে পারে এবং একবার 'স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তিগত দক্ষতাগুলি হিসাবের মধ্যে ধরলেই' সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে—সুতরাং আগেকার মতোই বহু মানুষ একটি মাত্র দ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, সমগ্র 'জন সংখ্যা' নিয়োজিত থাকবে উৎপাদনের একটি মাত্র শাখায়, এবং মানবজাতি, আগের মতোই, বিভক্ত থাকবে অনেকগুলি পঙ্গু 'আর্থনীতিক প্রজাতি'তে, কেননা তখনও 'কুলি' ও 'স্থপতিদের' অস্তিত্ব থাকবে—হের ডুারিং-এর এইসব ধারণা কী পরিমাণে শিশুসুলভ। সমগ্র উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হতে হবে সমাজকে, যাতে প্রতিটি মানুষ তার উৎপাদনের উপকরণের দাস হয়ে থাকে এবং কোন্ উৎপাদনের উপকরণের দাসত্ব সে করবে, শুধু এইটুকু বেছে নেওয়ার অধিকার তার থাকবে। লক্ষ্য করুন, হের ডুারিং কিভাবে শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতাকে 'প্রকৃতির অনিবার্য ঘটনা' বলে মনে করেন এবং মদ-চোলাই ও বীট-চিনি উৎপাদন—প্রুশিয়ার এই দুটি বিশেষ শিল্প-শাখার মধ্যে তিনি যৎসামান্য স্বস্তি লাভ করেছেন; আরও লক্ষ্য করার বিষয় হলো সারা দেশের শিল্প-বিস্তারকে তিনি কিভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছেন কতকগুলি ভবিষ্যৎ আবিষ্কার ও কাঁচামাল সংগ্রহের সঙ্গে কয়েকটি শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে

মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজনের ওপর—এইসব কাঁচামাল ইতিমধ্যেই তাদের উৎপত্তি-স্থল থেকে ক্রমশই দূর-দূরান্তে গিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে! আর হের ড্যুরিং তাঁর পিছু-হটাকে লুকোবার মতলবে এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে এমনকি আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার বিরুদ্ধে গেলেও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে শেষ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্পের মিলন ঘটবে, তবে এর জন্যে কিছু আর্থনীতিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে!

পুরানো শ্রম-বিভাগ আর সেই সঙ্গে শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে এবং সমগ্র উৎপাদনে বিপ্লবী রূপান্তর আনবে যে বিপ্লবী শক্তিগুলি—তাদের দেখার মতো দূরদৃষ্টি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন; এইসব শক্তি যে ইতিমধ্যেই আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনী অবস্থার অভ্যন্তরে ভ্রূণাবস্থায় রয়েছে এবং প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি যে তাদের বিকাশের প্রতিবন্ধক—এসব বিষয় উপলব্ধি করতে হলে প্রুশীয় লাণ্ডরেখ্‌ট-এর সীমানার বাইরে দৃষ্টিকে আরও বৃহত্তর দিগন্তের দিকে প্রসারিত করা প্রয়োজন; যে দেশে মদ-চোলাই ও বীট-চিনি উৎপাদনই প্রধান শিল্প এবং বইয়ের ব্যবসা থেকে বাণিজ্যিক সংকট বুঝতে হয়—সেই দেশের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত না করলে এসব বিষয় উপলব্ধি করা যায় না। এইসব বিষয় বুঝতে হলে বৃহদায়তন শিল্পের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং তার বর্তমান বাস্তব রূপ সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষ করে সেই দেশটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার যেখানে এর উদ্ভব ঘটেছে এবং তার আদর্শ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই জ্ঞান থাকলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে স্থূলভাবে পরিবেশন করার কথা এবং এটাকে হের ড্যুরিং-এর বিশেষ ধাঁচের প্রুশীয় সমাজবাদে বিকৃতি ঘটাবার কথা কেউ চিন্তা করতে পারবে না।

চার

বণ্টন

ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে হের ড্যুরিং-এর অর্থনীতিকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়ঃ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বেশ ভালো, আর সেটা টিকেও থাকবে, তবে পুঁজিবাদী বণ্টন পদ্ধতি খুব খারাপ, আর সেটার অস্তিত্ব কিছুতেই থাকবে না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি হের ড্যুরিং-এর 'সমাজতান্ত্রিক' পদ্ধতি কল্পনার জগতে এই নীতির প্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুতপক্ষে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে হের ড্যুরিং-এর আপত্তি করার বিশেষ কিছুই নেই, মূলগতভাবে তিনি পুরানো শ্রম-বিভাগের সবকিছুই টিকিয়ে রাখতে চান আর সেইজন্যে তাঁর আর্থনীতিক কমিউনের মধ্যে উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি একটা কথাও বলেন নি। আসলে উৎপাদন এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে জোরালো তথ্যাদি নিয়ে কারবার করতে হয় আর তার ফলে 'যৌক্তিক কল্পনা' তার মুক্ত আত্মাকে শূন্যচারী করার বিশেষ সুযোগ পায় না, কারণ এখানে মর্যাদাহানিকর ভ্রান্তির বিপদ খুব বেশি। কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। হের ড্যুরিং-এর মতে বণ্টনের সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই, উৎপাদন বণ্টনকে নির্ধারণ করে না, এটা নির্ধারিত হয় বিশুদ্ধ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা—বণ্টন তাঁর 'সামাজিক অ্যালকেমি' প্রয়োগের অবধারিত ক্ষেত্র।

> উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি সমান বাধ্যবাধকতার অনুরূপ ভোগের সমান অধিকার সংগঠিতভাবে প্রযুক্ত হয়—আর্থনীতিক কমিউন এবং বহুসংখ্যক কমিউনকে নিয়ে গঠিত বাণিজ্যিক কমিউনের মধ্যে। 'শ্রম···এখানে বিনিময় হয় অন্য শ্রমের সঙ্গে সমান মূল্য-নির্ণয়ের ভিত্তিতে।···এখানে সেবা ও সেবার প্রতিদান শ্রমের পরিমাণের মধ্যেকার প্রকৃত সমতাকে প্রতিফলিত করে।' আর এই 'মানবিক

শক্তির সমতাবিধান' 'বিভিন্ন ব্যক্তি কম-বেশি কাজ করলেও কিংবা হয়ত কিছু না করলেও' প্রযুক্ত হয়; যেকোনো ধরনের কাজকেই, যেহেতু তাতে সময় ও শক্তি ব্যয় হয়, শ্রম-কর্ম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে সুতরাং বলখলা বা ভ্রমণকেও এর মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু এই বিনিময় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ঘটে না, কারণ যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণের আর তার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক হচ্ছে সমাজ; একদিকে এটা সম্পন্ন হয় প্রতিটি আর্থনীতিক কমিউন ও তার পৃথক পৃথক সদস্যদের মধ্যে এবং অন্যদিকে এটা ঘটে বিভিন্ন আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক কমিউনের মধ্যে 'বিশেষ করে এক-একটি আর্থনীতিক কমিউন সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত বিপণনের মাধ্যমে তাদের অঞ্চলগুলিতে খুচরো ব্যবসার উচ্ছেদ ঘটাবে।' পাইকারি ব্যবসাও সংগঠিত করা হবে ঐ একই ধারায়: 'মুক্ত আর্থনীতিক সমাজের পদ্ধতি···স্বভাবতই একটা বিরাট বিনিময় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, এর কাজকর্ম চলে মূল্যবান ধাতুগুলির সৃষ্ট ভিত্তির ওপর নির্ভর করে। এই মৌলিক গুণসম্পন্ন অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধানী দৃষ্টিই সেইসব অস্পষ্ট ধারণার সঙ্গে আমাদের ছকটির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে, যে ধারণাগুলি সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত সমকালীন সমাজবাদী ভাবধারাগুলিকে এখনও আঁকড়ে রয়েছে।'

এই বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রথম দখলদার হিসাবে আর্থনীতিক কমিউনগুলি গড়পড়তা উৎপাদনী ব্যয়ের ভিত্তিতে 'প্রতিটি জিনিসের একটা সমান দাম' ধার্য করে দেয়। 'বর্তমানে মূল্য ও দামের ক্ষেত্রে তথাকথিত উৎপাদনী ব্যয়ের গুরুত্ব'টি নির্ধারিত হবে (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়) নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ হিসাব করে। এইসব হিসাবকে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সমানাধিকারের নীতি অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত শ্রমে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার বিচারে পর্যবসিত করা যেতে পারে; উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থা ও মূল্য আদায়ের সামাজিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দামের সম্পর্কের মধ্যে এগুলির পরিণতি ঘটবে। মূল্যবান ধাতুর উৎপাদন এখনকার মতোই টাকার মূল্যকে নির্ধারণ করতে

থাকবে।···এর থেকে এটা দেখা যাবে যে সমাজের পরিবর্তিত কাঠামোতে মূল্য নির্ধারণ ও পরিমাপের ভিত্তি এবং উৎপন্ন দ্রব্য-গুলির বিনিময় সম্পর্কই যে শুধু নষ্ট হবে তাই নয়, বরঞ্চ এই প্রথম সেগুলিকে যথাযথভাবে জয় করা যাবে।'

সেই বহু-কথিত 'চরম মূল্য' অবশেষে অর্জিত হলো।

> অন্যদিকে, কমিউনকে তার সদস্যদের এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে প্রতিটি সদস্য কমিউনের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারে; সেইজন্যে প্রত্যেককে তার শ্রমের পারিশ্রমিক বাবদ দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক ভিত্তিতে, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে অবশ্যই সমপরিমাণে, কিছু অর্থ কমিউনকে দিতেই হবে। 'সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, মজুরির অস্তিত্ব থাকবে না অথবা সেটাই হয়ে দাঁড়াবে আর্থিক উপার্জনের একমাত্র রূপ—এই সম্বন্ধে আমরা যাই বলি না কেন, তার কোনো গুরুত্ব নেই।' সমান মজুরি ও সমান দাম 'গুণগতভাবে না হলেও পরিমাণগতভাবে ভোগের সমতা নিয়ে আসবে এবং এইভাবে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 'সর্বজনীন ন্যায়বিধান' বাস্তব হয়ে উঠবে।

ভবিষ্যতে এই মজুরির স্তর কিভাবে নির্ধারিত হবে, সেই সম্বন্ধে হের ড্যুরিং শুধু এইটুকুই আমাদের বলেছেন যে

> অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও বিনিময় ঘটবে 'বিভিন্ন সমপরিমাণ শ্রমের মধ্যে।' সুতরাং ছ'ঘণ্টার শ্রমের জন্যে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে যার মধ্যেও নিহিত থাকবে ছ'ঘণ্টার শ্রম।

তা সত্ত্বেও, 'সর্বজনীন ন্যায়বিধান'কে স্থূল সমতাবিধানের সঙ্গে, বিশেষ করে, শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাম্যবাদের সঙ্গে, কিছুতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলা চলবে না, যে ব্যাপারটা সমস্ত ধরনের সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ভয়ঙ্কর উত্তেজিত করে তোলে। যেরকম হওয়ার কথা, এটা সেরকম অপ্রতিরোধ্য নয়।

> 'আর্থিক সমানাধিকারের নীতি ন্যায়ের দাবির তুলনায় কোনো বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মানের স্বেচ্ছামূলক সংযোজনকে বাতিল করে দেয় না।···ভোগের জন্যে একটা পরিমিত অতিরিক্ত বরাদ্দ

মজুর করে উন্নত ধরনের বৃত্তিমূলক দক্ষতাকে সম্মান দিয়ে সমাজ নিজেকেই সম্মানিত করে।'

আর হের ড্যুরিং নিজেকেও সম্মান দিয়েছেন ; কপোতের অকৃত্রিম সরলতা ও সাপের ক্রূরতার সমন্বয় ঘটিয়ে ভবিষ্যতের ড্যুরিংদের পরিমিত বাড়তি ভোগের জন্যে এইরকম স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করে তিনি নিজের প্রতি কুর্নিশ জানিয়েছেন।

এটা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী বণ্টন পদ্ধতির অবসান ঘটাবে। কেননা,

> এই ধরনের পরিস্থিতিতে কারও হাতে সত্যিসত্যিই অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সম্পদ থাকতে পারে ধরে নিলেও, সেটাকে সে পুঁজি হিসাবে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না। কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিনিময় বা ক্রয়ের মাধ্যমে ছাড়া এটা তার কাছ থেকে নেবে না, এজন্যে কেউ তাকে সুদ বা মুনাফা দেওয়ারও সুযোগ পাবে না। অতএব 'সমতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তরাধিকার' অনুমোদনযোগ্য হবে। এটাকে বাদ দেওয়া যাবে না, কারণ 'কয়েক ধরনের উত্তরাধিকার সব সময়েই পারিবারিক নীতির সঙ্গে অবধারিতভাবে জড়িয়ে থাকবে।' কিন্তু উত্তরাধিকারের অধিকারও বিপুল পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জীভূত করার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না···সম্পত্তি গড়ে তোলা···আর কখনই উৎপাদনের উপকরণ এবং নিছক মুনাফা আদায়কারী মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হবে না।'

আর্থনীতিক কমিউন এইরকম সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এইবার এর কার্যধারার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

ধরে নেওয়া যাক হের ড্যুরিং-এর প্রাথমিক শর্তগুলি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে ; সুতরাং আমরা এটাও ধরে নিতে পারি যে আর্থনীতিক কমিউন তার প্রতিটি সদস্যকে দৈনিক ছয় ঘণ্টা শ্রমের জন্যে যে অর্থ দেয়, ধরা যাক বারো শিলিং, তার মধ্যে ছয় ঘণ্টার শ্রম নিহিত রয়েছে। আমরা এটাও ধরে নিচ্ছি যে দাম মূল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং আমাদের অনুমান অনুযায়ী শুধুমাত্র কাঁচামালের খরচা, যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি, শ্রমের হাতিয়ারগুলির ব্যবহার এবং প্রদত্ত মজুরি এই দামের অন্তর্ভুক্ত। একশত কর্মী-সদস্যের একটি আর্থনীতিক কমিউন দিনে বারো শত শিলিং অর্থাৎ ৬০ পাউণ্ড এবং

৩০০ কর্ম-দিবসবিশিষ্ট বছরে ১৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য উৎপাদন করবে। কমিউন তার সদস্যদের ঐ একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে এবং প্রত্যেকে তার অংশ অর্থাৎ দিনে বারো শিলিং কিংবা বছরে ১৮০ পাউণ্ড নিজের পছন্দ মতো ব্যয় করতে পারবে। এক বছরের পর কিংবা একশো বছর পরও কমিউনের সম্পদ শুরুতে যা ছিল, তার থেকে মোটেই বাড়বে না। এই সমগ্র কালপর্বে এর কখনও এমন সামর্থ্য হবে না, যাতে হের ড্যুরিং-এর ব্যবহারের জন্যে পরিমিত পরিমাণ বাড়তি সম্পদ যোগান দিতে পারে, অবশ্য কমিউন যদি তার উৎপাদনের উপকরণের মজুত ভাণ্ডারে হাত না দেয়। সঞ্চয়ের ব্যাপারটাই একেবারে উঠে যাবে। ফলাফল এর চেয়েও খারাপ হবে: সঞ্চয় যেহেতু একটা সামাজিক প্রয়োজন এবং মজুত অর্থ সঞ্চয়ের একটা সুবিধাজনক রূপ, তাই আর্থনীতিক কমিউনের সংগঠন তার সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করতে সরাসরি বাধ্য করবে আর এইভাবে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।

আর্থনীতিক কমিউনের এই প্রকৃতিগত বিরোধকে কিভাবে এড়ানো যাবে? কমিউন তার অতি প্রিয় 'কর', বাড়তি দরের সাহায্য নিতে পারে এবং ১৮,০০০ পাউণ্ডের পরিবর্তে ২৪,০০০ পাউণ্ডে তার বার্ষিক উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু অন্যসব আর্থনীতিক কমিউনের অবস্থাও অনুরূপ, আর তার ফলে তাদেরও ঐ একই পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, তাই তাদের প্রত্যেককেই পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই পরিমাণ 'কর' দিতে হবে, ঐ পরিমাণ কর তারা আবার পকেটস্থ করবে এবং এই 'কর' কমিউনের সদস্যদের নিজেদের ওপরেই চাপবে।

অথবা আর্থনীতিক কমিউন খুব সোরগোল না করে তার প্রত্যেক সদস্যকে ছয় ঘন্টার শ্রমের পাওনা বাবদ ছয় ঘন্টার কম শ্রমের পারিশ্রমিক না দিয়ে, ধরা যাক চার ঘন্টা শ্রমের পারিশ্রমিক দিয়ে ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারে; অর্থাৎ দিনে বারো শিলিং না দিয়ে মাত্র আট শিলিং দিতে পারে এবং পণ্যের দাম আগেকার স্তরেই রেখে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে কমিউন সেই কাজটিই প্রত্যক্ষ ও খোলাখুলিভাবে করবে যা আগে গোপনে ও পরোক্ষভাবে করার চেষ্টা করেছিল: কমিউন মার্কস-কথিত বাৎসরিক ৬,০০০ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করবে আর এটা ঘটবে খোলাখুলি পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে অর্থাৎ তার সদস্যদের উৎপন্ন মূল্যের চাইতে কম পারিশ্রমিক দিয়ে এবং কমিউনই যে-পণ্যগুলির একমাত্র বিক্রেতা, সেগুলিকে পূর্ণমূল্যে সদস্যদের কাছে বিক্রি

করে। সুতরাং আর্থনীতিক কমিউন ব্যাপকতম সাম্যবাদী ভিত্তিক 'উন্নত' বিনিময় পদ্ধতির* আশ্রয় নিয়েই মজুত তহবিল গঠন করতে পারে।

সুতরাং এখানে দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে: হয় আর্থনীতিক কমিউন 'সমপরিমাণ শ্রমের' মধ্যে বিনিময় করবে এবং সেক্ষেত্রে উৎপাদন বজায় রাখা ও তার প্রসার ঘটাবার জন্যে কোনো মজুত তহবিল সৃষ্টি করতে পারবে না, শুধু সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবেই এটা করতে সক্ষম হবে; না হয় এই রকম তহবিল কমিউন সৃষ্টি করতে পারবে কিন্তু সেক্ষেত্রে সেটা 'সমপরিমাণ শ্রমের' মধ্যে বিনিময় ঘটবে না।

আর্থনীতিক কমিউনের মধ্যে বিনিময় চলার এটাই হচ্ছে সারবস্তু। তার রূপটি কী রকম? এই বিনিময়ের মাধ্যম হলো ধাতুর মুদ্রা। এই সংস্কারের 'বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য' সম্বন্ধে হের ড্যুরিং কম গর্বিত নন। কিন্তু কমিউন ও তার সদস্যদের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রা আদৌ মুদ্রা নয়, এটা কোনোভাবেই মুদ্রার কাজ করে না। এটা নিছক শ্রম-সার্টিফিকেট হিসাবে কাজ করে; মার্কসের ভাষায় বলতে গেলে এটা 'সাধারণ শ্রমে ব্যক্তির অংশ-গ্রহণ এবং ভোগের জন্যে নির্দিষ্ট সাধারণ জিনিসপত্রের খানিকটা অংশের ওপর তার অধিকারের প্রমাণপত্র ছাড়া আর কিছুই নয়' এবং এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে 'এটা আর "মুদ্রা" থাকে না, থিয়েটারের টিকিটে পরিণত হয়'।** সুতরাং অন্য যেকোনো প্রতীক বস্তু এর বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে, ঠিক যেমনটি করেছেন ভেইট্‌লিং একটা 'লেজার' বা খতিয়ানের সাহায্যে, যার একদিকে সম্পাদিত কাজের শ্রম-ঘণ্টার হিসাব আর অন্যদিকে জীবনধারণের জন্যে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর হিসাব লেখা রয়েছে।[১৭৬] এক কথায়, আর্থনীতিক কমিউন ও তার সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই মুদ্রা শুধুমাত্র ওয়েনের 'শ্রম-মুদ্রা'র ভূমিকাই পালন করে; এই 'ভূতুড়ে মূর্তি'টিকে হের ড্যুরিং খুব অবজ্ঞা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে একে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। 'উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা' এবং তার ফলে অর্জিত 'প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহারের অধিকার' পরিপূরণের প্রতীক বস্তুটি

---

* ইংল্যাণ্ডের ট্রাক সিস্টেম বা বিনিময় পদ্ধতি, যা জার্মানিতেও সুপরিচিত, অনুযায়ী উৎপাদকেরা নিজেরাই দোকান চালায় এবং তাদের শ্রমিকদের সেখান থেকে জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করে। (এঙ্গেলসের টীকা)।

** ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ৯৮; পাদটীকা। সম্পাদক।

একটুকরো কাগজ, হুণ্ডি বা একটি স্বর্ণমুদ্রা, যাই হোক না কেন, এই ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই ধর্তব্যের বিষয় নয়। অবশ্য এখন আমরা দেখব অন্যক্ষেত্রে এটা গুরুত্বহীন নয়।

সুতরাং আর্থনীতিক কমিউনের সঙ্গে তার সদস্যদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ধাতু মুদ্রা যদি মুদ্রা হিসাবে কাজ না ক'রে ছদ্মবেশী শ্রম-সার্টিফিকেট হিসাবে কাজ করে, তাহলে বিভিন্ন আর্থনীতিক কমিউনের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে সেটার ভূমিকা হবে আরও কম। এইরকম বিনিময়ের ক্ষেত্রে, হের ড্যুরিং অনুমান করেছেন, ধাতু মুদ্রা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আসলে শুধু বুক-কিপিংই যথেষ্ট ; প্রথমে শ্রম-ঘণ্টাকে মুদ্রার পরিমাপে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে শ্রম-ঘণ্টাকে একক ধরে নিয়ে শ্রমের স্বাভাবিক পরিমাপক সময় ব্যবহার করলে সমান পরিমাণ শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে সমান পরিমাণ শ্রমে উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময় সহজ পদ্ধতিতে হতে পারে। আসলে এই বিনিময় দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে সরল বিনিময় ছাড়া আর কিছুই নয় ; অন্যান্য কমিউনের ওপর হুণ্ডি কেটে সমস্ত হিসাব-নিকাশ সহজে ও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি অন্যান্য কমিউনের সঙ্গে ব্যবসা করতে কোনো কমিউনের সত্যি-সত্যিই ঘাটতি হয়, তাহলে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সোনা' 'মুদ্রার চরিত্রগত-গুণসম্পন্ন' হলেও, তার নিজস্ব মেহনতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঘাটতির দুর্ভাগ্য থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না, যদি না কমিউনটি এই ঋণের চাপে অন্যান্য কমিউনের অধীনে চলে যেতে রাজি হয়। কিন্তু পাঠককে সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতের কোনো কাঠামো নির্মাণ করতে বসি নি ; শুধু হের ড্যুরিং-এর অনুমানগুলিকেই ধরে নিয়ে তার থেকে অনিবার্য সিদ্ধান্ত টানছি।

সুতরাং আর্থনীতিক কমিউন ও তার সদস্যদের মধ্যে অথবা বিভিন্ন কমিউনের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে সোনা, যা 'মুদ্রার চরিত্রগত গুণসম্পন্ন', তার চরিত্রকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। তা সত্ত্বেও হের ড্যুরিং মুদ্রার এই ভূমিকা 'সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আরোপ করেছেন। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে এমন কোনো ক্ষেত্র আছে কিনা যেখানে এর আর্থিক ভূমিকা প্রয়োগ করা যায়। এইরকম একটা ক্ষেত্র আছে। হের ড্যুরিং প্রত্যেককে 'সমপরিমাণ ভোগে'র অধিকার মঞ্জুর করেছেন কিন্তু এটা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি কাউকে বাধ্য করতে পারেন না। অন্যদিকে, তিনি এটা ভেবেই গর্বিত

যে তাঁর নির্মিত জগতে প্রত্যেকেই ইচ্ছামতো নিজের অর্থ ব্যয় করতে পারে। সুতরাং কেউ কেউ যখন তাদের মজুরি নিয়ে কোনোমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে অক্ষম হয় তখন সামান্য পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা থেকে তিনি কাউকে বাধা দিতে পারেন না। পারিবারিক সম্পত্তির যৌথ মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাবে, এটা স্বীকার করে নিয়ে তিনি উপরোক্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য করে তুলেছেন এবং সন্তান-সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণে পিতা-মাতার দায়িত্বও এখান থেকে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এর ফলে সমপরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। একজন অবিবাহিত পুরুষ তার দৈনিক আট বা বারো শিলিং মজুরি পেয়ে মহানন্দে জমিদারের মেজাজে থাকতে পারে, অথচ একজন মৃতদার ব্যক্তির পক্ষে তার আটটি নাবালক ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই আয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, কমিউন পাওনা অর্থ নির্বিচারে গ্রহণ করে এই সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় যে এই অর্থ কোনো ব্যক্তির নিজের শ্রম ছাড়া অন্যভাবেও পাওয়া যেতে পারে। টাকার গায়ে কোনো গন্ধ লেগে থাকে না।[১৭৭] এই অর্থ কোথেকে আসছে কমিউন তা জানে না। কিন্তু এইভাবে ধাতু মুদ্রার পক্ষে প্রকৃত মুদ্রার ভূমিকা পালন করার যাবতীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা এতদিন শুধু শ্রম-সার্টিফিকেটের ভূমিকা পালন করে এসেছে। একদিকে মজুত করার আর অন্যদিকে দেনাগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ ও উপাদান থেকেই যায়। অভাবী মানুষ মজুতদারের কাছ থেকে ধার করে জীবনধারণের উপকরণের দাম হিসাবে যে ধার-করা অর্থ কমিউন গ্রহণ করে, সেটা আবার রূপান্তরিত হয় বর্তমান সমাজে মনুষ্য শ্রমের সামাজিক রূপে, শ্রমের প্রকৃত মানদণ্ডে, প্রচলনের সাধারণ মাধ্যমে। নামতা বা জলের রাসায়নিক সংযুক্তির মতো এর বিরুদ্ধেও পৃথিবীর যাবতীয় 'আইনকানুন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ' অনুরূপভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আর যেহেতু অভাবী মানুষের কাছ থেকে মজুতদার সুদ আদায় করতে সক্ষম হয়, তাই অর্থ হিসাবে ধাতু-মুদ্রার ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে তেজারতি কারবার আবার শুরু হয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা বিচার করে দেখলাম ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউনের কর্মক্ষেত্রে ধাতু মুদ্রা প্রচলন থাকার ফলাফল কী হতে পারে। কিন্তু এর বাইরে, দুনিয়ার অবশিষ্ট অংশে, উড়নচণ্ডী জগৎ পুরানো পথেই নিশ্চিন্তে চলতে থাকে। বিশ্ব-বাজারে সোনা ও রূপো সর্বজনীন মুদ্রা হিসাবে লেনদেনের সাধারণ

মাধ্যম ও সম্পদের চূড়ান্ত সামাজিক রূপ হিসাবেই থেকে যায়। মূল্যবান ধাতুর এই সম্পত্তি আর্থনীতিক কমিউনের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মজুত করার, ধনী হওয়ার ও সুদ আদায় করার নতুন ঝোঁক সৃষ্টি করে; কমিউনকে উপেক্ষা করে ও তার চৌহদ্দির বাইরে স্বাধীন ও যদৃচ্ছভাবে কাজকর্ম করার এবং তাদের সঞ্চিত ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে বিশ্ব বাজারে কারবার করার ঝোঁক দেখা দেয়। তেজারতি কারবারীরা পরিণত হয় প্রচলনের মাধ্যমে, ব্যাংক মালিকে, প্রচলনের মাধ্যমের নিয়ন্ত্রকে, যদিও এগুলি বহু বছর ধরে আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক কমিউনের তথাকথিত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। আর এইভাবে মজুতদার ও তেজারতি কারবারীরা হয়ে দাঁড়ায় ব্যাংকের মালিক, খোদ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কমিউনের কর্তা। হের ড্যুরিং-এর 'সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থা অন্যান্য সমাজতন্ত্রীর 'অস্পষ্ট ধারণা' থেকে সত্যিসত্যিই মূলগতভাবে পৃথক। নতুন করে বৃহৎ ধনী সৃষ্টি করা ছাড়া এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই—যাদের নিয়ন্ত্রণে ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যোগানোর জন্যে কমিউন আপ্রাণ পরিশ্রম করে যাবে। মজুত সম্পদের অধিকারীরা তাদের সর্বজনীন অর্থে বলীয়ান হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিউন ছেড়ে চলে যাবে—এটাই কমিউনের মুক্তি পাওয়ার একমাত্র আশা।

আদি সমাজবাদী চিন্তাধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতা জার্মানিতে এত ব্যাপক যে এই পর্যায়ে একজন সরল বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ প্রশ্ন করতে পারেন ওয়েনের শ্রম-নোটেরও অনুরূপ অপব্যবহার ঘটতে পারে কিনা? যদিও ঐসব শ্রম-নোটের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে এখানে আমরা আলোচনা করছি না, তবুও ড্যুরিং-এর 'সামগ্রিক পরিকল্পনা'র সঙ্গে ওয়েনের 'স্থূল, দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর ভাবধারা-গুলি'র তুলনা করার জন্যে কিছুটা স্থান ব্যয় করা প্রয়োজন: প্রথমত, ওয়েনের শ্রম-নোটগুলির এই ধরনের অপব্যবহারের জন্যে সেগুলিকে আসল মুদ্রায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, যেখানে হের ড্যুরিং আসল মুদ্রা অনুমান করে নিয়েছেন, যদিও শ্রম-সার্টিফিকেট ছাড়া এর অন্য কোনো ভূমিকা তিনি নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। যেখানে ওয়েনের পরিকল্পনায় সত্যিকারের অপব্যবহার ঘটবে, সেখানে হের ড্যুরিং-এর পরিকল্পনায় মুদ্রার সহজাত প্রকৃতি, যা মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে; মুদ্রার প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দরুন হের ড্যুরিং মুদ্রার অপব্যবহার জোর করে চালু করতে চান—তা সত্ত্বেও মুদ্রার নির্দিষ্ট, সঠিক ব্যবহার প্রচলিত হবেই। দ্বিতীয়ত,

ওয়েনের শ্রম-নোটগুলি হচ্ছে সমাজ গঠন সম্পূর্ণ করার এবং সামাজিক সম্পদের অবাধ ব্যবহারের পথে রূপান্তরকালীন রূপ, আর খুব বেশি হলেও ইংরেজ জনগণের কাছে সাম্যবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা উপায়। সুতরাং যদি কোনো ধরনের অপব্যবহার শ্রম-নোটগুলিকে বাতিল করে দিতে ওয়েনের সমাজকে বাধ্য করে, তাহলে সমাজ তার লক্ষ্যের দিকেই এক ধাপ এগিয়ে যাবে, প্রবেশ করবে তার বিকাশের আরও নিখুঁত স্তরে। কিন্তু হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউন যদি মুদ্রার ব্যবহার তুলে দেয়, তাহলে এক ধাক্কায় তার 'বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য' ধ্বংস হয়ে যাবে, এর কিম্ভুতকিমাকার সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটবে, এবং এটা আর হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউন থাকবে না, এমন একটা কুয়াসাচ্ছন্ন ধারণার মধ্যে ডুবে যাবে, যা থেকে তাঁর যৌক্তিক কাল্পনিকতার পর্যায়ে একে তোলার জন্যে হের ড্যুরিং এতটা কঠোর পরিশ্রম করেছেন।*

তা হলে হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউন যেসব অদ্ভুত ধরনের ভুলভ্রান্তি ও জটিলতার গোলকধাঁধায় পাক খাচ্ছে, তার উৎস কোথায়? এর সহজ উৎস হচ্ছে হের ড্যুরিং-এর নিজের মনের কুজ্‌ঝটিকা, যা মূল্য ও অর্থের ধারণাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঠেলে দিয়েছে শ্রমের মূল্য আবিষ্কারের দিকে। কিন্তু জার্মানিতে হের ড্যুরিং-ই এই ধরনের কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টির একমাত্র ব্যক্তি নন, তাঁর আরও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। আমরা 'সাময়িকভাবে অনিচ্ছা কাটিয়ে উঠে গিঁটটি খুলে ফেলব'—যে গিঁটটি তিনি এখানে বাঁধার চেষ্টা করেছেন।

অর্থনীতিতে একমাত্র যে-মূল্যটির কথা জানা আছে, তা হচ্ছে পণ্যের মূল্য। পণ্য কী? কম-বেশি পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তিগত উৎপাদক সমাজে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে, তাই প্রাথমিকভাবে এগুলি ব্যক্তিগত উৎপাদকদের উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু এইসব ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র তখনই পণ্যে পরিণত হয়, যখন সেগুলি তৈরি করা হয় উৎপাদকদের নিজস্ব ভোগের জন্যে নয়, অপরের ভোগের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সমাজের ভোগের উদ্দেশ্যে; বিনিময়ের মাধ্যমে

* প্রসঙ্গক্রমে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওয়েনের সাম্যবাদী সমাজে শ্রম-নোটগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে হের ড্যুরিং একেবারে কিছুই জানতেন না। এইসব নোটের কথা তিনি জেনেছেন সারগান্ট-এর কাছ থেকে, শ্রম-বিনিয়োগ বাজারগুলিতে (১৭৮) এইসব নোটের প্রচলন থেকেই তাঁর যা কিছু জানা হয়েছে। প্রচলিত সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে যাবার প্রয়াস, প্রত্যক্ষ শ্রম-বিনিয়োগের মাধ্যমে, অবশ্যই ব্যর্থ হয়। (এঙ্গেলসের টীকা)

সেগুলি সামাজিক ভোগের কাজে লাগে। সুতরাং এইসব ব্যক্তিগত উৎপাদক পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এদের নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। পৃথক পৃথক ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্য হলেও, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য একই সঙ্গে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যও বটে, যদিও এটা ঘটে অনভিপ্রেত ও অনিচ্ছাকৃত-ভাবে। তাহলে এইসব ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্র কোন্ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়? স্পষ্টতই দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে। প্রথমত, এই দ্রব্যগুলি মানুষের কিছু না কিছু প্রয়োজন মেটায়, শুধু উৎপাদক-দের কাছে নয়, অন্যদের কাছেও এইসব দ্রব্যের একটা ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে; দ্বিতীয়ত, যদিও এগুলি নানা ধরনের ব্যক্তিগত শ্রমের ফল, তবুও এগুলি একই সঙ্গে মনুষ্য শ্রম তথা সর্বজনীন মনুষ্য শ্রমের ফল। অন্যদের কাছেও যে-পর্যন্ত এগুলির ব্যবহারিক মূল্য থাকে, সে পর্যন্ত এরাও সাধারণত বিনিময়ের জগতে প্রবেশ করে; যে পর্যন্ত এগুলির মধ্যে সাধারণ মনুষ্য শ্রম, মানুষের শ্রম শক্তির সহজ-সরল প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই পর্যন্ত বিনিময়ের মাধ্যমে এদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা চলে, প্রতিটি দ্রব্যে নিয়োজিত এই শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পার্থক্য বিচার করা যায়। একই রকম সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদিত দুটি একই রকম দ্রব্যের মধ্যে অসম পরিমাণ ব্যক্তিগত শ্রম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবসময় সমপরিমাণ মনুষ্য শ্রমই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একজন অদক্ষ কর্মকার যে সময়ে পাঁচটি ঘোড়ার নাল তৈরি করতে পারে, কোনো দক্ষ কর্মকার সেই সময়ের মধ্যে তৈরি করে দশটি ঘোড়ার নাল। কিন্তু হঠাৎ কোনো ব্যক্তির দক্ষতার অভাবের মাপকাঠিতে সমাজ মূল্য স্থির করে না, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ে গড়পড়তা দক্ষতার মাত্রাকেই সমাজ সাধারণ মনুষ্য শ্রম হিসাবে স্বীকার করে। সুতরাং যে সময়ের মধ্যে প্রথম কর্মকার পাঁচটি ঘোড়ার নাল তৈরি করে, তার সঙ্গে ঐ একই সময়ে নির্মিত অপর কর্মকারের দশটি ঘোড়ার নালের মূল্য বেশি হবে না। ব্যক্তিগত শ্রম যতটুকু সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়, সাধারণ মনুষ্য শ্রমের ততটুকুই এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন বলি, একটা পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য আছে, তখন আমি বলতে চাই (১) এটা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য, (২) এটা তৈরি করেছে একজন ব্যক্তি, ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; (৩) যদিও এটা ব্যক্তিগত শ্রমের সৃষ্টি, তবুও যুগপৎ এটা যেন অনভিপ্রেত ও অনিচ্ছাকৃত সামাজিক

শ্রমের সৃষ্টিও বটে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিকভাবে নিরূপিত এই নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের সৃষ্টি ; (৪) শ্রমের ও শ্রম-ঘণ্টার হিসাবে আমি এই পরিমাণকে ব্যক্ত করছি না, ব্যক্ত করছি আর একটি পণ্যের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং আমি যদি বলি এই ঘড়িটি একটুকরো কাপড়ের দামের সমান এবং তাদের প্রত্যেকটির দাম পঞ্চাশ শিলিং, তার দ্বারা আমি এটাই বলতে চাই যে ঘড়ি, কাপড় ও অর্থের মধ্যে একই পরিমাণ সামাজিক শ্রমের অস্তিত্ব রয়েছে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এগুলিতে নিহিত সামাজিক শ্রম-সময় পরিমাপ করা হয়েছে এবং দেখা গিয়েছে এই শ্রম-সময় সমপরিমাণ। কিন্তু শ্রম-সময় কিংবা শ্রম-দিবস ইত্যাদির মাপে যেভাবে সাধারণত সরাসরি, চূড়ান্তভাবে পরিমাপ করা হয়, তা করা হয় নি, করা হয়েছে বিনিময়ের পদ্ধতির মাধ্যমে ঘোরানো পথে আপেক্ষিকভাবে। সেই কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়কে আমি শ্রম-ঘণ্টায় প্রকাশ করতে পারি না—এই শ্রম-ঘণ্টার পরিমাণ আমার অজানা—প্রকাশ করতে পারি একমাত্র ঘোরানো পথে আপেক্ষিকভাবে, অপর একটি পণ্যের মধ্যে দিয়ে, যে-পণ্যটিতে সমপরিমাণ সামাজিক শ্রম-সময় নিহিত রয়েছে। এইদিক থেকে দেখলে ঘড়ি আর কাপড়ের টুকরোটির দাম সমান।

কিন্তু পণ্যের উৎপাদন ও বিনিময়, পণ্য-ভিত্তিক সমাজকে এই ঘোরানো পথ গ্রহণে যেমন বাধ্য করে, তেমনি এই পথের বক্রতা যত সংক্ষিপ্ত করা যায়, তার জন্যেও সমাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এরা সাধারণ পণ্যসমূহের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেয় এমন একটি সার্বভৌম পণ্যকে, যার মধ্যে দিয়ে অন্য সব পণ্যের মূল্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেতে পারে, এ এমন একটি পণ্য যা সামাজিক শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্ত প্রতীক এবং সেই কারণে এই পণ্যটি, আসলে যা হচ্ছে অর্থ, প্রত্যক্ষভাবে ও নিঃশর্তে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য। মূল্যের ধারণার মধ্যে অর্থ ভ্রূণাকারে বিদ্যমান থাকে, এটা মূল্যেরই উন্নত রূপ। কিন্তু যেহেতু পণ্যের বিপরীতে, অর্থের মধ্যে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাই পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়কারী সমাজে একটা নতুন উপাদান হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে ; এর থাকে নতুন সামাজিক ভূমিকা ও ফলাফল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এইটুকু এখানে বলে রাখা যেতে পারে।

পণ্যোৎপাদনের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিই একমাত্র বিজ্ঞান নয়, যেখানে শুধু আপেক্ষিকভাবে জানা উপাদানগুলিই আলোচিত হয়। ভৌত বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—সেখানে আমরা জানি যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের মধ্যে কতকগুলি পৃথক পৃথক অণু থাকে। কিন্তু আমরা এটা জানি যে, বয়েলের সূত্র যে পর্যন্ত সঠিক, একটা নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সমপরিমাণ গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকবে। সুতরাং আমরা বিভিন্ন ধরনের চাপ ও তাপমাত্রার অবস্থায় বিভিন্ন গ্যাসের বিভিন্ন আণবিক ধর্ম তুলনা করতে পারি; এবং ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও ৭৬৩ মিলিমিটার চাপে এক লিটার গ্যাসকে আমরা যদি একক ধরি, তাহলে এই এককের দ্বারা আমরা উপরোক্ত আণবিক ধর্ম পরিমাপ করতে পারি।

রসায়নে বিভিন্ন মৌল পদার্থের পরম পারমাণবিক ওজনও আমরা জানি না। তবে তাদের ওজন আমরা জানতে পারি আপেক্ষিকভাবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে। পণ্যোৎপাদন ও তার অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন পণ্যসমূহের আপেক্ষিক শ্রমের মর্মবস্তুর ভিত্তিতে পণ্যগুলিকে তুলনা ক'রে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে নিহিত অজ্ঞাত শ্রমের পরিমাণের আপেক্ষিক রূপ পাওয়া যায়, তেমনি রসায়নেও বিভিন্ন মৌল পদার্থের পারমাণবিক ওজনকে আর একটি পদার্থের (সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন) পারমাণবিক ওজনের ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশ ক'রে পারমাণবিক ওজনের মাত্রার আপেক্ষিক রূপ পাওয়া যেতে পারে। পণ্যোৎপাদন যেমন সোনাকে সার্বভৌম পণ্যের স্তরে, অন্য সমস্ত পণ্যের সর্বজনীনভাবে সমতুল্য পর্যায়ে উন্নীত করে, সমস্ত মূল্যের মানদণ্ড করে তোলে, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন ১-এ স্থির রেখে এবং অন্যান্য সব মৌল পদার্থের পারমাণবিক ওজনকে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনে রূপান্তরিত করে এবং এই পারমাণবিক ওজনকে বহুগুণিত করে রসায়নও তেমনি হাইড্রোজেনকে রাসায়নিক মুদ্রা-পণ্যের স্তরে উন্নীত করেছে।

অবশ্য পণ্যোৎপাদন সামাজিক উৎপাদনের একমাত্র রূপ নয়। প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠী-সমাজ ও দক্ষিণাঞ্চলীয় স্লাভদের পারিবারিক দ্রব্যসামগ্রী পণ্যে পরিণত হতো না। গোষ্ঠীভুক্ত লোকজন উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকত; কাজ ভাগ করে দেওয়া হতো ঐতিহ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী এবং দ্রব্যসামগ্রী যে পরিমাণে ভোগের জন্যে নির্ধারিত থাকতো, সেই পরিমাণে সেগুলিকে ভাগ-বাটোয়ারা করা হতো। প্রত্যক্ষ সামাজিক উৎপাদন ও

প্রত্যক্ষ বণ্টন পণ্য-বিনিময়ের সম্ভাবনা রোধ করে দেয়, তাই দ্রব্যসামগ্রীর পণ্যে এবং তার ফলে তাদের মূল্যে রূপান্তরের (গোষ্ঠীর মধ্যে তো বটেই) সম্ভাবনাও আর থাকে না।

সমাজ যখনই উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী হয় এবং উৎপাদনের কাজে সেগুলিকে সরাসরি ব্যবহার করে, তখন থেকেই প্রতিটি শ্রম, তার নির্দিষ্ট উপযোগী চরিত্র যতই বিভিন্ন রকমের হোক না কেন, সরাসরিভাবে সামাজিক শ্রমে পরিণত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ তখন থেকে আর বাঁকা পথে নিরূপণ করার প্রয়োজন হয় না; গড়পড়তা হারে কতটা শ্রম প্রয়োজন হয়—দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই তা সোজাসুজি ধরা পড়ে। একটা স্টিম ইঞ্জিন, গত ফসলের ১ মণ গম কিংবা এক ধরনের একশো বর্গগজ কাপড়ে কত ঘণ্টার শ্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সমাজ তা সহজেই হিসাব করতে পারে। কোনো উৎপন্ন দ্রব্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ তখন সরাসরি এবং সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে এবং তৃতীয় আর একটি দ্রব্য, একটি পরিমাপক যা শুধু আপেক্ষিক, অস্থির ও অসম্পূর্ণ, তার আর প্রয়োজন হবে না—যদিও, উপযুক্ত পরিমাপকের অভাবে আগে এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, শ্রমের পরিমাণকে তখন প্রকাশ করা সম্ভব হবে তার স্বাভাবিক, যথাযথ ও পরম মানদণ্ড সময়ের সাহায্যে। রসায়নে যদি অনুরূপভাবে পারমাণবিক ওজনগুলিকে তাদের যথাযথ পরিমাপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেত, অর্থাৎ এক গ্রামের এক কোটি ভাগের এক ভাগ কিংবা একশো কোটি ভাগের এক ভাগের হিসাবে এদের প্রকৃত ওজনগুলি প্রকাশ করা যেত, তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর মাধ্যমে আপেক্ষিকভাবে ও ঘোরানো পথে এগুলিকে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন থাকত না। সুতরাং, আমাদের উপরোক্ত ধারণা অনুযায়ী সমাজ উৎপন্ন দ্রব্যগুলির ওপর মূল্য ধার্য করবে না। একশো বর্গগজ কাপড় উৎপাদন করতে যদি এক হাজার ঘণ্টার শ্রম লাগে, তাহলে এই সহজ ঘটনাটি প্রকাশ করতে এই পরোক্ষ ও অর্থহীন বক্তব্যের প্রয়োজন হবে না যে একশো বর্গগজ কাপড়ের মূল্য হলো এক হাজার ঘণ্টার শ্রম। এটা সত্যি যে প্রতিটি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে কতটা শ্রম লাগে, সমাজের পক্ষে সেটা জানার প্রয়োজন তখনও থাকবে। সমাজ তখন উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করবে উৎপাদনের উপকরণ অনুযায়ী—বিশেষ করে শ্রম-শক্তি যার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উপযোগী

ফলাফল, পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে এবং সেগুলির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণের বিচার করে সমাজ পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে। যথেষ্ট বিঘোষিত 'মূল্যে'র* হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনগণ খুব সহজ-সরলভাবে সবকিছু পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

মূল্যের ধারণা হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের আর্থনীতিক অবস্থার সবচেয়ে সাধারণ আর তাই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। তার ফলে, এই ধারণার মধ্যে শুধুমাত্র মুদ্রার নয়, পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়ের উন্নততর রূপগুলির বীজও বর্তমান থাকে। ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করা উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের রূপ হচ্ছে মূল্য—এই ঘটনাটিই একই উৎপন্ন দ্রব্যে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক শ্রম ও ব্যক্তিগত শ্রমের মধ্যে পার্থক্য ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তিগত উৎপাদক যদি সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতি ঘটার পরও পুরানো কায়দায় উৎপাদন চালিয়ে যেতে থাকে, তা হলে তার কাছে এটা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে। সমস্ত ব্যক্তিগত উৎপাদক যদি একটা বিশেষ ধরনের দ্রব্য সামাজিক প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত উৎপাদন করে, তাহলেও ঐ একই পরিণতি ঘটবে। পণ্যের মূল্য শুধুমাত্র আর একটি পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে প্রকাশ পেতে পারে এবং তার সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমেই সেটা বিক্রি করা যেতে পারে—তার ফলে বিনিময় আদৌ না ঘটার অথবা অন্তত পক্ষে সঠিক মূল্য আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সবশেষে, বিশেষ পণ্য হিসাবে শ্রম-শক্তি যখন বাজারে আসে, অন্যান্য পণ্যের মতোই তখন তার মূল্য নির্ধারিত হয়—সেটা উৎপাদনের জন্যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের দ্বারা। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-রূপ সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের বিরোধ, শিল্পের জন্যে মজুতবাহিনী এবং সংকটের মধ্যে আগে থেকেই ভ্রূণাকারে নিহিত থাকে। সুতরাং 'প্রকৃত মূল্য' প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি উচ্ছেদ করার প্রয়াস, আর 'প্রকৃত' পোপকে বসিয়ে ক্যাথলিক ধর্মকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস সমার্থবাচক অথবা এ এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের সমার্থক যেখানে

---

* সেই ১৮৪৪ সালেই আমি মত প্রকাশ করেছিলাম যে একটা সাম্যবাদী সমাজে মূল্যের রাজনীতিক-আর্থনীতিক ধারণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল ও শ্রম-ব্যয়ের মধ্যে উপরোক্ত ভারসাম্য স্থাপনের বিষয়টি থেকেই যাবে। অবশ্য এই বক্তব্যের বিজ্ঞানসম্মত যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা একমাত্র মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এর মধ্যেই সম্ভব হয়। (এঙ্গেলসের টীকা)

উৎপাদকরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে—যেখানে আর্থনীতিক বর্গটি প্রতিনিয়ত যে কাজ করে সেটা তাদের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা উৎপাদকদের শৃঙ্খলিত হওয়ার সবচেয়ে ব্যাপকতম রূপ।

পণ্যোৎপাদক সমাজ যখন মূল্য-রূপকে, যা পণ্যের সহজাত, মুদ্রা রূপে বিকাশ ঘটালো, তখন মূল্যের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন বীজ ফেটে গিয়ে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক ফলাফল হচ্ছে পণ্য-রূপের সামান্যীকরণ। এতদিন পর্যন্ত যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতো সরাসরিভাবে ব্যক্তিগত ভোগের জন্যে, মুদ্রা সেগুলিকেও পণ্যরূপে পরিণত করল; টেনে নিয়ে এলো বিনিময়ের মধ্যে। এইভাবে উৎপাদন-কর্মে সরাসরি যুক্ত গোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ কৃষিকাজে পণ্য-রূপ ও মুদ্রার অনুপ্রবেশ ঘটল; তারা একের পর এক গোষ্ঠীগত বন্ধন ভেঙে ফেলল এবং গোষ্ঠীকে পরিণত করল ব্যক্তিগত উৎপাদকদের বাহিনীতে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, প্রথমে মুদ্রা জমির যৌথ চাষের জায়গায় ব্যক্তিগত চাষের প্রবর্তন করল; পরবর্তী পর্যায়ে এটা কর্ষিত জমির যৌথ মালিকানার বিলোপ ঘটালো, মাঝে মাঝে জমির পুনর্বন্টনের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায় (যেমন, মোসেল-এর গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে[১৭] এবং রুশ গ্রামীণ গোষ্ঠীর মধ্যে এটা এখন শুরু হচ্ছে); শেষ পর্যন্ত এটা যৌথ মালিকানাধীন বনভূমি ও পশুচারণ ক্ষেত্রকে ভাগাভাগি করতে বাধ্য করল। উৎপাদন বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে কোনো কারণই থাকুক না কেন, গোষ্ঠীগুলির ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে মুদ্রা বরাবরই সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। আর যাবতীয় 'আইন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ' সত্ত্বেও মুদ্রা ঐ একই রকম স্বাভাবিক অনিবার্যতার চাপে হের ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউনকে নিশ্চয়ই ভেঙে দেবে, অবশ্য আদৌ যদি সেটা কোনোদিন গড়ে ওঠে।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ('রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি', ছয়) শ্রমের মূল্য কথাটি স্ব-বিরোধী। যেহেতু নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের আওতায় শ্রম শুধু দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে না, মূল্যও সৃষ্টি করে, আর শ্রমের দ্বারা এই মূল্যের পরিমাপ করা হয়, তাই শ্রমের কোনো পৃথক মূল্য থাকতে পারে না, ঠিক যেমন ওজনের কোনো পৃথক ওজন কিংবা তাপের কোনো পৃথক তাপমাত্রা থাকতে পারে না। 'প্রকৃত মূল্য' নিয়ে রোমন্থন করতে গিয়ে সমস্ত সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর মধ্যে একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; তাঁরা

মনে করেন বর্তমান সমাজে শ্রমিক তার শ্রমের পূর্ণ 'মূল্য' পায় না, আর সমাজতন্ত্রই এর প্রতিকার করতে পারে। সুতরাং তাঁরা মনে করেন প্রথমে শ্রমের মূল্য আবিষ্কার করা প্রয়োজন, আর এটা করা হয় শ্রমের যথাযথ মানদণ্ড সময়কে ব্যবহার না করে, শ্রমজাত দ্রব্যের সাহায্যে শ্রমকে পরিমাপ করার প্রয়াসের মাধ্যমে। 'শ্রমের সবটুকু ফল' শ্রমিকদের পাওয়া উচিত।[১৮৩] শ্রমজাত দ্রব্যই শুধু নয়, খোদ শ্রমই উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি বিনিময়-যোগ্য হওয়া চাই; এক ঘণ্টার শ্রমের সঙ্গে বিনিময় হওয়া উচিত আর এক ঘণ্টার শ্রমজাত দ্রব্যের। এটা সঙ্গে সঙ্গে 'প্রচণ্ড' প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টিত হয়ে যায়। সমাজের যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল কাজ সেই সঞ্চয়ের কাজটিকে সমাজের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা অর্পিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে, তাদের মর্জির ওপর। এইসব 'উৎপন্ন দ্রব্য' নিয়ে ব্যক্তিরা তাদের যা-খুশি-তাই করতে পারে, কিন্তু সমাজের বৈষয়িক অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। সুতরাং অতীতে সঞ্চিত উৎপাদনের উপকরণগুলি এই জন্যেই সমাজের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যাতে যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণকে ভবিষ্যতে আবার ব্যক্তিদের কাছে সমর্পণ করা যায়। এইভাবে খোদ বক্তব্যটির ভিত্তিই চুরমার হয়ে যায় এবং একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

প্রচলিত শ্রমকে, সক্রিয় শ্রম-শক্তিকে বিনিময় করতে হবে শ্রমজাত দ্রব্যের সঙ্গে। শ্রমজাত দ্রব্যের মতো শ্রম-শক্তিও একটা পণ্য, শ্রমজাত দ্রব্যের সঙ্গে এর বিনিময় ঘটবে। কিন্তু এই শ্রম-শক্তির মূল্য কোনোভাবেই শ্রমজাত দ্রব্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় শ্রম-শক্তির মধ্যে মূর্ত সামাজিক শ্রমের দ্বারা, মজুরি সংক্রান্ত বর্তমান আইন অনুযায়ী।

কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে, ঠিক এটাই হওয়া উচিত নয়। প্রচলিত শ্রমকে, শ্রম-শক্তিকে সম্পূর্ণ শ্রমজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করতে হবে। অর্থাৎ শ্রম-শক্তি তার মূল্যের জন্যে নয়, তার ব্যবহারিক মূল্যের জন্যে বিনিময়যোগ্য। মূল্যমানের নিয়ম অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম রদ করতে হবে। এই ধরনের 'আত্ম-বিধ্বংসী' বিভ্রান্তি লুকিয়ে রয়েছে 'শ্রমের মূল্য' সংক্রান্ত ধারণার অন্তরালে।

'সম-মূল্যের নীতির ভিত্তিতে শ্রমের সঙ্গে শ্রমের বিনিময়'-এর মধ্যে যেটুকু অর্থ আছে তা হচ্ছে সমপরিমাণ সামাজিক শ্রমজাত দ্রব্যের পারস্পরিক

বিনিময়যোগ্যতা। সুতরাং মূল্যমানের নিয়ম নির্দিষ্টভাবে পণ্যোৎপাদনের মৌল নিয়ম আর তাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের সর্বোচ্চ রূপেরও মৌল নিয়ম। ব্যক্তিগত উৎপাদকদের সমাজে আর্থনীতিক নিয়মগুলি একমাত্র যেভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, বর্তমান সমাজে এই নিয়মটিও সেইভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে: বিভিন্ন বস্তু ও সম্পর্কের সহজাত অন্ধভাবে ক্রিয়াশীল প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে এবং উৎপাদকদের ইচ্ছা ও কাজকর্ম নিরপেক্ষভাবে এই নিয়ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নিয়মটিকে তাঁর আর্থনীতিক কমিউনের মৌল নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত করে এবং কমিউনকে অত্যন্ত সচেতন-ভাবে এই নিয়মটিকে কার্যকর করতে হবে—এই দাবি জানিয়ে হের ড্যুরিং বর্তমান সমাজের মৌল নিয়মকে তাঁর কাল্পনিক সমাজের মৌল নিয়মে পরিণত করতে চেয়েছেন। বর্তমান সমাজকেই তিনি চান, তার বিকৃতি-গুলিকে বাদ দিয়ে। এই ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান প্রুঁধোর মতোই। প্রুঁধোর মতোই তিনি এই বিকৃতিগুলিকে দূর করতে চান, যে বিকৃতিগুলির উদ্ভব ঘটেছে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার পুঁজিবাদী উৎপাদনে পরিণতি লাভের মধ্যে দিয়ে; পণ্যোৎপাদনের মৌল নিয়ম প্রয়োগ করে অর্থাৎ যে নিয়মের ক্রিয়াশীলতা থেকে এগুলির সৃষ্টি, সেই নিয়ম প্রয়োগ করেই তিনি এগুলি দূর করতে চান, মূল্যমানের নিয়মের বাস্তব ফলাফলকে তিনি উচ্ছেদ করতে চান কল্পিত ফলাফলের সাহায্যে।

আমাদের আধুনিক ডন কুইক্সট, তাঁর বলিষ্ঠ রোসিনান্ত ঘোড়ার 'সর্বজনীন ন্যায়ের নীতি'র পিঠে বসে এবং তাঁর সাহসী সঙ্গী সাংকো পানজা, আব্রাহাম এনসকে নিয়ে ম্যামব্রিনোর শিরস্ত্রাণ, 'শ্রমের মূল্য' জয় করে আনার নাইটসুলভ কাজের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দম্ভের সঙ্গে যাত্রা করেছেন; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, গুরুতর আশঙ্কা এটাই যে তিনি সেই পুরানো অতি পরিচিত নাপিতের বাটি ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারবেন না।[১৮১]

পাঁচ

রাষ্ট্র, পরিবার, শিক্ষা-ব্যবস্থা

এর আগের দুটি পরিচ্ছেদে আমরা হের ড্যুরিং-এর 'নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা'র আর্থনীতিক বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর পর শুধু এইটুকুই বলা যায় যে তাঁর 'ইতিহাস-পর্যালোচনার বিশ্বজনীন পরিধি' তাঁর বিশেষ আগ্রহগুলিকে বজায় রাখার কাজ থেকে তাঁকে কিছুমাত্র বিরত করতে পারে না, এমনকি ইতিপূর্বে উল্লিখিত তাঁর পরিমিত অতিরিক্ত ভোগের বিষয়টি ছাড়াও একথা সত্যি। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও পুরানো শ্রম-বিভাগ টিকে থাকবে, তাই আর্থনীতিক কমিউনকে শুধু স্থপতি ও কুলিদেরই নয়, পেশাদার লেখকদের বিষয়ও বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং তখন প্রশ্ন দেখা দেবে লেখকদের স্বত্বাধিকারের বিষয়টি কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে। অন্য যেকোনো প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নটিই হের ড্যুরিং-এর মনকে বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন, লুই ব্লাঁ ও প্রুধোঁর প্রসঙ্গে সর্বত্রই পাঠক মাঝেমাঝেই লেখকের স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটির সম্মুখীন হবেন এবং তার 'আলোচনা'র পুরো নয় পৃষ্ঠা জুড়ে আলোচনার শেষে 'শ্রমের পারিশ্রমিক'কে রহস্যজনক রূপে 'সামাজিকতা'র নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়েছে—এর মধ্যে পরিমিত অতিরিক্ত ভোগের স্থান আছে কি নেই তা বলা হয় নি। সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থায় কীটপতঙ্গের স্থান সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ থাকলে ভালোই হতো, অন্তুতপক্ষে সেটা হতো অনেক কম ক্লান্তিকর।

দর্শনের অংশে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কাঠামো সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আছে। এই বিষয়ে রুশো, হের ড্যুরিং-এর 'একমাত্র নামজাদা পূর্বসূরী' হওয়া সত্ত্বেও, ভিত্তিটিকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি; তাঁর আরও প্রগাঢ় উত্তরসূরী রুশোকে একেবারে জলবৎ তরল করে, হেগেলের

রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের কিছু অংশের সঙ্গে সেটাকে মিশিয়ে একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছেন।[১৮২] হের ড্যুরিং-এর ভাবী সমাজের বনিয়াদ হচ্ছে 'ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব'; সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন একে দমন করবে না, বরঞ্চ এর মধ্যেই তার প্রকৃত পরিণতির সন্ধান মিলবে। কিভাবে এটা সম্ভব হবে? খুব সহজ-সরলভাবেই।

> 'যদি ব্যক্তিবিশেষ ও অন্যান্য প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সর্বক্ষেত্রে মতৈক্য ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যায় এবং এইসব মতৈক্যের লক্ষ্য যদি হয় অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহায়তা দান—তাহলে অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাই শুধু জোরদার হয়ে ওঠে এবং শুধু বহুজনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কিংবা সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরুর অধিকতর ক্ষমতা থেকে অধিকার নির্ধারিত হয় না।'

এইরকম সহজে বাস্তবতার দর্শনের ভোজবাজির জীবনীশক্তি সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে গিয়েছে; এবং পাঠক যদি মনে করেন এরপর তাঁর জ্ঞান মোটেই বাড়েনি, তার জবাবে হের ড্যুরিং বলছেন যে ব্যাপারটা এত সহজ-সরল বলে তাঁর আদৌ মনে করা উচিত নয়। কারণ

> 'সমষ্টিগত ভূমিকার ধারণা করার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভুল ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দেবে; এবং শুধুমাত্র এই সার্বভৌমত্ব থেকেই প্রকৃত অধিকার নির্ধারিত হবে।'

হের ড্যুরিং তাঁর ছাত্রদের নিয়ে খেলা করেন, এটা যথাযোগ্যই বটে। তিনি আরও স্থূল আচরণ করতে পারতেন; বাস্তবতার দর্শনের ছাত্রদের অবশ্য সেটা নজরেই আসত না।

ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে মূলগতভাবে বলা হয়েছে যে

> 'ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরংকুশ বাধ্যবাধকতার অধীন'; কিন্তু এই বাধ্যবাধকতা যে পর্যন্ত 'যথার্থই স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজ করে' সেই পর্যন্তই সঠিক। এই উদ্দেশ্য অনুসারে 'আইনসভা ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ' থাকবে, যা অবশ্য 'ন্যস্ত থাকবে সমাজের হাতে'; একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও থাকবে, যার প্রকাশ ঘটবে 'সেনাবাহিনীর সংঘবদ্ধ কর্ম কিংবা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার রক্ষার জন্যে কার্যনির্বাহী অংশের' মধ্যে।

বলতে গেলে, সেনাবাহিনী, পুলিশ বিভাগ ও প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীও

থাকবে। হের ড্যুরিং ইতিমধ্যে বহুবার প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি এক যোগ্য প্রুশিয়ান ; এখানে তিনি সেই আদর্শ প্রুশিয়ানের অনুচর হিসাবে নিজের পরিচয় রেখেছেন, যিনি প্রয়াত মন্ত্রী ফন রোচাভের মতে 'তাঁর প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকে বুক পকেটে করে ঘুরে বেড়ান।' কিন্তু ভবিষ্যতের এই রক্ষী-বাহিনীটি বর্তমান পুলিসঠগীদের মতো এত বিপজ্জনক হবে না। তাদের হাতে সার্বভৌম ব্যক্তিটি যতই নির্যাতিত হোক না কেন, সবসময়েই তার একটা সান্ত্বনা থাকবে :

'পরিস্থিতি অনুযায়ী মুক্ত সমাজের হাতে তার কপালে যাই জুটুক না কেন, প্রকৃতির রাজ্যে তার যা ঘটত, তার চাইতে সেটা কোনোমতেই খারাপ নয়।'

এরপর হের ড্যুরিং সেইসব লেখকের স্বত্বাধিকারের বিষয়টি নিয়ে আমাদের আর একবার ঘুরপাক খাইয়েছেন এবং তারপর আমাদের এই মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে ভাবীকালের পৃথিবীতে

'অবশ্যই সবার পক্ষে বিনামূল্যে লভ্য বিচার ব্যবস্থা পাওয়া যাবে।'

'আজকের ধ্যানধারণা অনুযায়ী মুক্ত সমাজ' ক্রমশই বেশি করে মিশ্র প্রকৃতির হয়ে পড়ছে। স্থপতি, কুলি, পেশাদার লেখক, রক্ষীবাহিনী, আর সেই আইনজীবীর কথাও এখানে বলা হচ্ছে। এই 'সংযত ও বিচার-মূলক চিন্তার জগৎ' এবং বিভিন্ন ধর্মের স্বর্গরাজ্যগুলি যেন একটা যমজের মতো ; এইসব স্বর্গরাজ্যে ধর্মবিশ্বাসী সবসময় তাঁর পার্থিব অস্তিত্বের সুখ-শান্তিকে পরিবর্তিত রূপে দেখতে পান। আর হের ড্যুরিংও এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক যেখানে 'প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব পন্থায় সুখী হতে পারে।'[১৮৩] এর বেশি আর কী আমাদের চাওয়ার থাকতে পারে ?

কিন্তু আমাদের চাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে হের ড্যুরিং কী চান। দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই যে হের ড্যুরিং এর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজনিজ পন্থায় সুখী হতে পারবে না। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে :

'মুক্ত সমাজে কোনো পূজো-অর্চনা চলবে না ; কেননা এই সমাজের প্রতিটি মানুষ আদিম লঘুপ্রকৃতির কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবে যে প্রকৃতির অন্তরালে অথবা তার ঊর্ধ্বে এমন সব সত্তা আছে, বলিদান কিংবা প্রার্থনার মাধ্যমে যাদের প্রভাবিত করা যায়।'

ধর্ম নিষিদ্ধ করা হবে।

অবশ্য সমস্ত ধর্মই মানুষের মনোজগতে বাহ্যিক শক্তিগুলির কাল্পনিক প্রতিফলন—যে শক্তিগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। এই প্রতিফলনের মধ্যে পার্থিব শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ নেয়। মানবেতিহাসের সূচনায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি প্রথমে এইভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ; পরবর্তী বিবর্তন-ধারার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতির মনে এইসব প্রাকৃতিক শক্তি অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় নররূপ পরিগ্রহ করে। তুলনামূলক পুরাণবিদ্যা, অন্ততপক্ষে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই, ভারতীয় বেদের মধ্যে এর সূচনা-পর্বটি আবিষ্কার করেছে এবং এর পরবর্তী বিবর্তন-ধারাটি বিস্তারিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে ভারতীয়, পারসিক, গ্রীক, রোমান ও জার্মানদের মধ্যে এবং কেল্ট, লিথুনীয় ও শ্লাভদের মধ্যেও এই সংক্রান্ত তথ্যগত উপকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পাশাপাশি সামাজিক শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে—এইসব শক্তি প্রকৃতির শক্তির মতোই মানুষের বিরোধী এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতোই প্রথমে দুর্বোধ্য থাকে, প্রকৃতির শক্তিগুলির মতোই আপাত প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সাহায্যে মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। একেবারে শুরুতে যে কাল্পনিক মূর্তিগুলির মধ্যে শুধুমাত্র রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি প্রতিবিম্বিত হতো, এই সময়ে এসে ঐ কাল্পনিক মূর্তিগুলি সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং ইতিহাসের শক্তিসমূহের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।* বিবর্তনের আরও পরবর্তী স্তরে অসংখ্য দেবদেবীর ওপর আরোপিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটিমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপর আরোপ করা হয়, যে-ঈশ্বর আসলে বিমূর্ত মানুষেরই প্রতিমূর্তি। এটাই একেশ্বরবাদ উদ্ভবের উৎস এবং পরবর্তীকালে স্থূল গ্রীক দর্শনের শেষ ঐতিহাসিক রূপ ; ইহুদীদের নিজস্ব জাতীয় দেবতা

---

* পরবর্তীকালে দেবদেবীর এই দ্বৈত চরিত্র পুরাণবিদ্যায় ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ—তুলনামূলক পুরাণবিদ্যা এই কারণটিকে উপেক্ষা করেছে। কারণ এই বিদ্যার একমাত্র অধীতব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিবিম্ব হিসাবে তাদের চরিত্র। তাই দেখা যায় কয়েকটি জার্মান গোষ্ঠীতে রণদেবতার নাম ছিল টির (প্রাচীন নর্ডিক) কিংবা জিও (উচু অঞ্চলবর্তী প্রাচীন জার্মান), যা গ্রীক জিউস ও দিউ-পিতারের লাতিন রূপ জুপিটার-এর মতো ; অন্যান্য জার্মান গোষ্ঠীতে ইর, ইওর শব্দগুলি গ্রীক আরেস ও লাতিন মার্স-এর সমতুল্য। (এঙ্গেলসের টীকা)

পরমেশ্বররূপী জিহোভার মধ্যে এর অভিব্যক্তি ঘটে। এই ধরনের সুবিধাজনক, সহজে আয়ত্তযোগ্য ও সর্বজনীনভাবে উপযোগী রূপে ধর্ম টিকে থাকতে পারে ; মানুষ যতদিন তার বিরোধী প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততদিন ধর্ম এইসব শক্তির সঙ্গে তার ভাবপ্রবণ সম্পর্কের রূপে টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু আমরা বারংবার দেখেছি, বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে মানুষ তার নিজের সৃষ্ট আর্থনীতিক পরিবেশ এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের, যেন একটা বিরোধী শক্তির অধীনস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ধর্মের প্রতিবিম্বিত কাজকর্মের আসল ভিত্তি ও তার সঙ্গে খোদ ধর্মীয় প্রতিবিম্ব থেকেই যাচ্ছে। যদিও বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি মানুষের এই বিরোধী প্রভুত্বের কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো মূলগত হেরফের হয়নি। বুর্জোয়া অর্থনীতি সাধারণভাবে সংকট প্রতিরোধ করতে পারে না, লোকসান, অনাদেয় বা অপরিশোধ্য ঋণ ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার হাত থেকে একজন পুঁজিপতিকে রক্ষা করতে এবং বেকারি ও চরম দারিদ্র্যের কবল থেকেও শ্রমিকদের বাঁচাতে পারে না। মানুষ চিন্তা করে একরকম কিন্তু বিধির বিধানে (অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মনুষ্য-বিরোধী শক্তির চাপে) হয় অন্যরকম—এই প্রবাদটি এখনও সত্যি। নিছক জ্ঞান, এমনকি তা যদি বুর্জোয়া আর্থনীতিক বিজ্ঞানের চাইতেও আরও গভীরগামী হয়, তাহলেও সামাজিক শক্তিগুলিকে সমাজের অধীনের আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্যে বিশেষ করে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সামাজিক কর্মতৎপরতা। এই কর্মতৎপরতা যখন সম্পন্ন করা যাবে, উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সমাজের দখলে এনে সেগুলিকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে এবং মানুষের সৃষ্ট যে উৎপাদনের উপকরণগুলি তাদের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এদের কবল থেকে সমাজ যখন নিজেকে ও তার যাবতীয় লোকজনকে মুক্ত করতে পারবে ; অর্থাৎ যখন মানুষ শুধু চিন্তা করবে না, চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে—একমাত্র তখনই অবলুপ্তি ঘটবে ধর্মের মধ্যে এখনও যা প্রতিবিম্বিত সেই মানববিরোধী শক্তির। আর এই সঙ্গেই অবলুপ্তি ঘটবে ধর্মীয় প্রতিবিম্বের, কেননা প্রতিবিম্বিত হওয়ার মতো তখন আর কিছুই থাকবে না।

কিন্তু হের ড্যুরিং-এর আর তর সইছে না। ধর্মের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে নারাজ। তাঁর হালচাল আরও গূঢ় প্রকৃতির। তিনি বিসমার্ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন ; শুধু ক্যাথলিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধেই তিনি যে আইনের[১৮৪] চাইতেও কঠোরতর আইন জারি করেছেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ রক্ষীবাহিনীকে প্ররোচিত করেছেন ধর্মের বিরুদ্ধে আর এইভাবে ধর্মের শহীদত্ব অর্জনের সহায়কে পরিণত হয়েছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন ধর্মের টিকে থাকার মেয়াদ। যেদিকেই আমরা তাকাই, সর্বত্রই বিশেষ করে প্রুশীয় সমাজবাদই চোখে পড়ে।

হের ড্যুরিং এইভাবে মহানন্দে ধর্মকে ধ্বংস করার পর

> 'মানুষ তার নিজের ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এবং তার যৌথ শক্তির জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়ে নিঃশঙ্কভাবে সেইসব পথে পা ফেলবে যা ঘটনাবলীর ধারা ও তার নিজস্ব সত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেবে।'

একটু বিষয়ান্তরে গিয়ে দেখা যাক, হের ড্যুরিং-এর নেতৃত্বে কোন্ 'ঘটনাবলীর ধারা'য় মানুষ নিজের ওপর নির্ভর করে নিঃশঙ্কভাবে ঐ পথে পা বাড়াবে।

জন্ম থেকে ঘটনাবলীর ধারা শুরু হয়, তাকে নির্ভর করতে হয় নিজের ওপর। তারপর

> প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত 'শিশুর স্বাভাবিক অভিভাবিকা' মায়ের তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়। 'এই কালপর্বটি, প্রাচীন রোমান আইন অনুযায়ী, বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত অর্থাৎ চোদ্দ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।' অশিক্ষা-কুশিক্ষার মধ্যে বড় হয়ে ছেলেপিলে যখন মায়ের কর্তৃত্বকে অসম্মান করবে, একমাত্র তখনই এটা সংশোধনের জন্যে পিতার সহায়তার, বিশেষ করে শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারি নিয়মকানুনের আশ্রয় নিতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর 'তার পিতার স্বাভাবিক অভিভাবকত্বে'র অধীনে থাকে, অবশ্য যদি 'প্রকৃত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পিতা' বলতে কেউ থাকে ; তা না হলে সমাজ একজন অভিভাবক নিয়োগ করে।

এর আগে হের ড্যুরিং ঠিক যেমন মনে করেছিলেন যে উৎপাদনের রদবদল না করেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা

পাল্টে দেওয়া যায়, এখনও ঠিক তেমনি মনে করছেন যে আধুনিক বুর্জোয়া পরিবারকেও, তার সামগ্রিক রূপের পরিবর্তন না ঘটিয়েই, তার সমগ্র আর্থ-নীতিক বনিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। তাঁর কাছে এই রূপটি এতই অপরিবর্তনীয় যে 'প্রাচীন রোমান আইন'কে তিনি সর্বকালে পরিবার-পরিচালনার নীতি করে তুলেছেন, যদিও তার 'মহত্ত্ব' কিছুটা হ্রাস করেছেন। পরিবারকে তিনি একমাত্র 'বংশানুক্রমিক' যার অর্থ সম্পত্তি মালিকানা বজায় রাখার ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে ইউটোপীয় চিন্তাবিদরা হের ড্যুরিং-এর চাইতে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন বালক-বালিকার শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিকতাবিধান এবং সেই সঙ্গে পরিবারের লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত হবে মানুষের স্বাধীন মেলামেশা থেকে এবং পারিবারিক গার্হস্থ্যকর্মকে সামাজিক শিল্পে রূপান্তর ঘটিয়ে। উপরন্তু, মার্কস ইতিপূর্বেই দেখিয়েছেন যে (ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ৫১৫, পরিশিষ্ট) 'আধুনিক শিল্প পারিবারিক ক্ষেত্রের বাইরে, সামাজিকভাবে সংগঠিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নারী, যুবক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দায়িত্ব দিয়ে পরিবার ও নরনারী সম্পর্কের চাইতে উচ্চতর রূপের একটা নতুন আর্থনীতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছে।'*

> হের ড্যুরিং বলছেন, 'সামাজিক সংস্কারের প্রত্যেক স্বপ্নদর্শীই তাঁর নতুন সমাজ-জীবনের উপযোগী একটা শিক্ষা-পদ্ধতি স্বভাবতই রচনা করেন।'

এই মানদণ্ডে বিচার করলে সামাজিক সংস্কারপন্থী ঐসব স্বপ্নদর্শীর মধ্যে হের ড্যুরিং একজন 'যথার্থই দৈত্য'। ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর মনোযোগ দখল করে আছে, অন্ততপক্ষে লেখকের স্বত্বাধিকারের প্রশ্নটির মতোই। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাঠক্রম তিনি ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন, শুধু 'নিকট ভবিষ্যতে'র জন্যেই নয়, রূপান্তরকালের জন্যেও। শেষ ও চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের কী শেখানো হবে—আমরা শুধু সেই আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব।

> সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় 'নীতিগতভাবে মানুষের পক্ষে যা আকর্ষণীয়' এবং যা বিশেষ করে 'জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৪৬০। সম্পাদক

—সেইসব বিজ্ঞানের মূল বিষয় ও প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত' শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং প্রাথমিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে গণিত এবং বস্তুতপক্ষে এটা এমনভাবে 'শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে সরল সংখ্যাগণনা ও যোগ থেকে শুরু করে সমাকলন পর্যন্ত সব কিছুর মৌলিক ধারণা ও পদ্ধতি 'সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধিতে আসে।'

কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই স্কুলে সত্যিসত্যিই কেউ অন্তরকলন বা সমাকলন শিখবে। বরঞ্চ তার বিপরীতটাই ঘটবে। সেখানে যা শিক্ষা দেওয়া হবে তা হচ্ছে সাধারণ গণিতের নতুন বিষয়গুলি, যার মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক ও উচ্চতর গণিত ক্ষুদ্রাকারে থাকবে। যদিও হের ড্যুরিং বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন যে

ভবিষ্যতের স্কুলে ব্যবহারযোগ্য 'পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু'র মোটামুটি রূপরেখার ছক' তিনি ইতিমধ্যেই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন,

কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় হলো 'সাধারণ গণিতের বিষয়বস্তুগুলি' তিনি এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি।

আর তিনি যে-কাজে সফল হতে পারলেন না, সেটা 'নতুন সমাজের স্বাধীন ও উন্নত শক্তিগুলি সমাধা করতে পারবে বলে যথার্থভাবেই আশা করা যেতে পারে।'

কিন্তু ভবিষ্যৎ গণিতের আঙুর ফল যদি এখনও পর্যন্ত টকই হয়ে থাকে, তাহলেও ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেরকম কঠিন বলে মনে হবে না এবং এগুলি

'যাবতীয় শিক্ষার সারবস্তু সরবরাহ করবে', আর 'উদ্ভিদবিদ্যা, ও প্রাণিবিদ্যা, সেগুলির সমস্ত তত্ত্ব সত্ত্বেও, প্রধানত বর্ণনামূলক চরিত্রসম্পন্ন বলেই'··· 'লঘু প্রকৃতির আলাপ-আলোচনার' খোরাক যোগাবে।

দর্শন-এর ৪২৭ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলিই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি হের ড্যুরিং এখনও, প্রধানত বর্ণনামূলক উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার অংশটুকু ছাড়া আর কিছুই জানেন না। সমগ্র জৈব অঙ্গসংস্থানবিদ্যার তুলনামূলক শারীরস্থান, ভ্রূণবিদ্যা, জীবাশ্মবিদ্যা যার অন্তর্ভুক্ত, নাম পর্যন্ত তাঁর জানা নেই। যখন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে, তাঁর জানার বাইরে, অনেকগুলি নতুন নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে, তখন তাঁর শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি 'প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের চিন্তাধারাজাত মহান আধুনিক শিক্ষামূলক উপকরণের' জন্যে রাফ-এর ছোটদের

প্রাকৃতিক ইতিহাস-এর সন্ধান করে, এবং সমগ্র 'নিকট ভবিষ্যতের' জন্য জৈব জগতের এই গঠন সম্বন্ধে অনুরূপ বিধান ঘোষণা করে। আর এখানেও তিনি নিজের স্বভাব অনুযায়ী রসায়নের কথা একেবারেই ভুলে যান।

শিক্ষার নান্দনিক দিকটি হের ড্যুরিং নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। এই উদ্দেশ্যের পক্ষে অতীতের কবিতা কোনো কাজেই লাগবে না। যাবতীয় ধর্মই যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে আজ পর্যন্ত কবিদের বৈশিষ্টমণ্ডিত 'পৌরাণিক বা ধর্মীয় উপকরণ' স্কুল-শিক্ষায় যে বরদাস্ত করা হবে না—তা না বললেও চলে। যেমন 'গ্যয়েটের মতো মানুষ যে কাব্যিক অতীন্দ্রিয়তাকে এত ব্যাপকভাবে চর্চা করেছিলেন', সেটাও বর্জন করতে হবে। সুতরাং কাব্যের যেসব মহান সৃষ্টি 'যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতর কল্পনার দাবিদার' এবং 'জগতের পূর্ণতা-সাধক, সাচ্চা আদর্শের প্রতিনিধি, সেইরকম কাব্য সৃষ্টির জন্যে হের ড্যুরিংকে মনোযোগ দিতে হবে। এজন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে না! আর্থনীতিক কমিউন যখন যুক্তির সঙ্গে মিল রেখে আলেকজেন্দ্রীয় কাব্যপংক্তির তালে দ্রুত ছুটতে শুরু করবে, তখনই সে বিশ্বজয় করে ফেলবে।

ভবিষ্যতের সদ্য-তরুণ নাগরিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ কোনো অসুবিধায় পড়বে না।

> 'মৃত ভাষাগুলি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হবে···তবে বিদেশী জীবন্ত ভাষাগুলি ···গৌণ গুরুত্ব নিয়ে টিকে থাকবে।' যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিপুলসংখ্যক জনগণের সম্পর্ক পর্যন্ত প্রসারিত হবে, একমাত্র তখনই প্রয়োজন অনুপাতে এবং সহজ উপায়ে এইসব ভাষা তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। এক ধরনের সাধারণ ব্যাকরণের সাহায্যে এবং বিশেষ করে 'প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক' শিক্ষাদানের মাধ্যমে 'ভাষার প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ অনুশীলন'এর ব্যবস্থা থাকবে:

আধুনিক মানুষের জাতীয় সংকীর্ণ মানসিকতাই হের ড্যুরিং-এর কাছে যথেষ্ট বিশ্বজনীন। যে-দুটি মাধ্যমে আজকের জগতে মানুষকে সংকীর্ণ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে ওঠার সুযোগ দেয়, তিনি সেই দুটিকেই বর্জন করতে চান: প্রাচীন ভাষাগুলির জ্ঞান, বিভিন্ন জাতির যেসব ব্যক্তি ধ্রুপদী শিক্ষার অধিকারী, তাঁদের সামনে এইসব ভাষা একটা ব্যাপকতর সাধারণ দিগন্ত উন্মোচন করে; এবং আধুনিক ভাষাগুলির জ্ঞান, একমাত্র

এইসব ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্ন জাতির মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারে এবং তাদের নিজ নিজ দেশের সীমানার বাইরে কী ঘটছে তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারে। এরই পাল্টা মাতৃভাষার ব্যাকরণ আচ্ছা করে মগজে ঢোকানো হবে। কিন্তু 'নিজস্ব ভাষার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক' একমাত্র তখনই বোধগম্য হয়, যখন তার উৎপত্তি ও ক্রমিক বিবর্তন-ধারার সন্ধান মেলে এবং প্রথমত, এর হারিয়ে-যাওয়া রূপটির ও দ্বিতীয়ত, জীবন্ত ও মৃত, সগোত্র ভাষাগুলির হদিশ না নিয়ে এটা করা যায় না। কিন্তু এটা আমাদের আবার সেই ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যেটাকে স্পষ্টতই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি হের ড্যুরিং তাঁর পাঠক্রম থেকে যাবতীয় আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যাকরণকে বরবাদ করে দেন, তাহলে সেই পুরনো ধরনের শব্দ-কণ্টকিত ব্যাকরণ ছাড়া তাঁর ভাষা অনুশীলনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; এইসব ব্যাকরণের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, সেকেলে ভাষাতত্ত্বের ছকে বাঁধা অর্থহীন চুলচেরা শব্দ-বিচার ও যথেচ্ছাচার এগুলির ভিত্তি। পুরানো ভাষাতত্ত্বের প্রতি ঘৃণার ফলে হের ড্যুরিং পুরানো ভাষাতত্ত্বের নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে 'ভাষার প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ অনুশীলনের প্রধান বিষয়বস্তু' করে তুলেছেন। এটা সুস্পষ্ট যে এখানে আমরা এমন একজন ভাষাতত্ত্ববিদকে প্রত্যক্ষ করছি যিনি ভাষার ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গত ষাট বছর ধরে যে বিপুল ও সফল অগ্রগতি ঘটছে, সে সম্বন্ধে একটা কথাও শোনেন নি, আর তাই তিনি ভাষার 'মহান আধুনিক শিক্ষামূলক উপকরণগুলির' সন্ধান করেন হেইসে ও বেকার-এর স্মৃতির মধ্যে; বপ, গ্রিম ও দিয়াৎস এর মধ্যে নয়।

কিন্তু এইসব সত্ত্বেও, ভবিষ্যৎ তরুণ নাগরিক 'নিজের ওপর নির্ভর করতে' পারবে না। এটা অর্জনের জন্যে আরও গভীরতর ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, তাই প্রয়োজন হলো

> 'সর্বাধুনিক দর্শন-সূত্রগুলি আয়ত্ত করা।' 'অবশ্য গভীরতর ভিত্তি স্থাপন…খুব একটা কঠিন কাজ হবে না', কারণ হের ড্যুরিং রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, 'যেসব সাধারণ প্রকল্প গর্বের বিষয়, সেইসব সঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে যদি কৃত্রিম, পণ্ডিতী বাহুল্যগুলিকে বাতিল করা যায়' এবং যদি হের ড্যুরিং-এর 'অনুমোদিত বাস্তবতাকে একমাত্র প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়', তাহলে ভবিষ্যৎ তরুণদের কাছে প্রাথমিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে

বোধগম্য হবে। 'সেই অত্যন্ত সহজ-সরল পদ্ধতিগুলি স্মরণ করার চেষ্টা কর, যেগুলির মাধ্যমে অনন্তের ধারণা এবং সেগুলির অদ্যাবধি অজ্ঞাত তাৎপর্যের বিচার-বিশ্লেষণ করত আমরা সক্ষম হয়েছিলাম'—তাহলে 'তোমাদের পক্ষে এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই যে দেশ ও কাল সম্বন্ধে সার্বিক ধারণার উপাদানগুলি, যেগুলিকে গভীরতর ও তীক্ষ্ণতর করে তুলে যথেষ্ট সরল রূপ দেওয়া হয়েছে, কেন কালক্রমে প্রাথমিক অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে না।'...হের ড্যুরিং-এর 'সবচেয়ে নিগূঢ় ধারণাগুলি নতুন সমাজের সর্বজনীন শিক্ষা-প্রকল্পে মোটেই কোনো গৌণ ভূমিকা পালন করবে না।' বস্তুর সমকক্ষ অবস্থা এবং গণনাতীতকে গণনা করার ক্ষমতা বরঞ্চ 'মানুষকে শুধু তার নিজের পায়ের ওপরই দাঁড় করিয়ে দেবে না, তার মধ্যে এই উপলব্ধিও জাগিয়ে তুলবে যে তথাকথিত পরম-সত্তাকে সে পদানত করতে সক্ষম হয়েছে।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভবিষ্যতের সরকারি স্কুলগুলি প্রুশীয় গ্রামার স্কুলের কিছুটা 'পরিবর্তিত' রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেখানে গ্রীক ও লাতিনের বদলে একটু বেশি পরিমাণে তাত্ত্বিক ও ফলিত গণিতের এবং বিশেষ করে বাস্তবতার দর্শনের সূত্রগুলি শেখানো হবে এবং যেখানে জার্মান ভাষা শিক্ষার বিষয়টি বিস্মৃতপ্রায় বেকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বস্তুতপক্ষে, আমরা এখন প্রমাণ করতে পেরেছি যে যেসব বিষয়ে তিনি আলোচনায় হাত দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর 'জ্ঞান' একটা স্কুলের ছেলের মতোই, তাই পাঠকের 'একথা ভাবার কোনো কারণ নেই' যে এটা কিংবা প্রাথমিকভাবে আমাদের 'বর্জন করা'র পর যাকিছু থাকে এবং অন্যান্য টুকিটাকি বিষয় 'কালক্রমে প্রাথমিক অনুশীলনের স্তরে চলে যাবে না', কারণ বাস্তবক্ষেত্রে এটা কখনও এই স্তর পেরোতে পারে নি। এটা ঠিক যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে কর্ম ও শিক্ষার সমন্বয়, যার লক্ষ্য হচ্ছে বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যবহারিক ভিত্তি স্থাপন, সম্বন্ধে হের ড্যুরিং কিছু শুনেছেন; সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতিকে প্রতিপন্ন করতে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ রীতিতে এই বিষয়টিকেও আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু আমরা এটা আগেই দেখেছি যে হের ড্যুরিং-এর ভবিষ্যৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে, পুরানো শ্রম-বিভাগের

মূলগত উপাদানগুলি বজায় থেকেই যাবে, তাই স্কুলে এই কারিগরি প্রশিক্ষণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবহারিক মূল্য বহন করবে না অথবা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে ; এর উদ্দেশ্য স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ : এটা শরীরচর্চার বিষয়টিকে উৎখাত করবে, যেটাকে আমাদের এই ঝানু বিপ্লবী একেবারেই উপেক্ষা করতে চান। তাই এই ধরনের দু'-একটি বাঁধা গৎ তিনি আমাদের কাছে আওড়ে যান :

'যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই যথার্থ পরিশ্রম করবে।'

ক্যাপিটাল-এর ৫০৮-৫১৫ পৃষ্ঠাগুলিতে* যা আছে, তার সঙ্গে এই বিভ্রান্তিকর ও অর্থহীন গালভরা কথাগুলির তুলনা সত্যিসত্যিই যন্ত্রণাদায়ক। এখানে মার্কসের বক্তব্য হচ্ছে 'রবার্ট ওয়েন বিস্তারিতভাবে আমাদের দেখিয়েছেন যে কারখানা-পদ্ধতি থেকে অঙ্কুরিত হয় ভবিষ্যৎ শিক্ষার বীজ, এ এমন একটা শিক্ষা যা নির্দিষ্ট বয়সের প্রতিটি শিশুর জীবনে উৎপাদনশীল শ্রম, শিক্ষা ও শরীরচর্চার সমন্বয় ঘটাবে, উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম পদ্ধতি হিসাবেই শুধু নয়, সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হিসাবেও বটে।'

আমরা ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছি, যেখানে বাস্তবতার দর্শন জ্ঞানের সারবস্তু হয়ে উঠবে, এবং যেখানে চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের পাশাপাশি আইন বিভাগও বহাল তবিয়তে থাকবে ; যেসব 'বিশেষ প্রশিক্ষণদান সংস্থা'য় 'সামান্য কয়েকটি বিষয় পড়ানো হবে' বলে আমরা জানতে পেরেছি, সেগুলির কথাও এখানে বাদ দিচ্ছি। মনে করা যাক ভ'বষ্যতের তরুণ নাগরিক তার শিক্ষার যাবতীয় পাঠক্রম শেষ করে 'নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে' একটি স্ত্রী অন্বেষণের মতো উপযুক্ত হয়ে উঠল। এই ক্ষেত্রে হের ডুরিং তার জন্যে কী ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছেন ?

'বিভিন্ন গুণের সংরক্ষণ, দূরীকরণ ও মিশ্রণের এবং সেই সঙ্গে নতুন গুণের সৃষ্টিশীল বিকাশের জন্য বংশবৃদ্ধির গুরুত্বের বিচারে মানুষ ও অ মানুষের চূড়ান্ত উৎস অনুসন্ধান করতে হবে যৌন মিলন ও নির্বাচনের মধ্যে এবং আরও অনুসন্ধান করতে হবে জন্মের পর কয়েকটি ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া বা না-নেওয়ার মধ্যে। এই ক্ষেত্রে

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৪৫৪-৬০। সম্পাদক

বর্তমানে যে নৃশংসতা ও মূঢ়তা প্রচলিত রয়েছে, সেটা বিচারের ভার বস্তুতপক্ষে পরবর্তী যুগের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তা সত্ত্বেও, প্রথমেই আমরা এটা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এমনকি কুসংস্কারের চাপ সত্ত্বেও, জন্মের সংখ্যার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গুণ-সম্পন্ন জন্মের ক্ষেত্রে প্রকৃতি বা মানুষের সতর্কতা, সেটা সাফল্যমণ্ডিত বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন। এটা সত্যি যে সমস্ত যুগে এবং সর্বপ্রকার আইনী ব্যবস্থায় বিকৃতাঙ্গ জাতককে মেরে ফেলা হয়েছে; কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ ও মানুষের চেহারার সাদৃশ্যবর্জিত বিকৃতাঙ্গ মনুষ্য দেহের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য থাকে।…একটা বিকৃত মানুষের জন্ম রোধ করা স্বভাবতই অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে।'

আরো এক জায়গায় বলা হয়েছে:

'যতটা সম্ভব সেরা মনুষ্য-দেহ লাভের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত পৃথিবীর অধিকার উপলব্ধি করতে দার্শনিক চিন্তা কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এই প্রসঙ্গে গর্ভসঞ্চার, প্রয়োজন হলে সন্তান প্রসব, প্রতিষেধকের কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনায়, পছন্দমতো বাছাই করার সুযোগ সৃষ্টি করে।'

আরও বলা হয়েছে:

'গ্রীক শিল্প—পাথরে মানুষের আদর্শমূর্তি নির্মাণ—তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে না, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে, কম শিল্পসম্মত হলেও, রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষকে সুন্দর করে তোলার কর্তব্যটি হাতে নেওয়া হবে। এই শিল্প-রূপটি নিছক পাথর নিয়ে কারবার করে না এবং এর নন্দনতত্ত্ব মৃত রূপের ভাবনায় আবদ্ধ নয়' ইত্যাদি।

আমাদের তরুণ নাগরিকটিকে আবার মাটির পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। অবশ্য হের ড্যুরিং-এর পরামর্শ ছাড়াই সে জানে যে বিবাহ এমন একটা শিল্প নয়, যা নিছক পাথর কিংবা মৃত রূপগুলির চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে; কিন্তু হের ড্যুরিং বিশেষ করে তাকে *এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ঘটনাবলীর* ধারা ও তার নিজস্ব প্রকৃতি সামনে যে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেই পথে

চললে সে একটি সহানুভূতিপ্রবণ নারীর দেহ-মনের সাক্ষাৎ পাবে। অথচ সে-রকম কিছুই হলো না—'আরও গভীর ও কঠোর নৈতিকতা' তার সামনে গর্জন করে ওঠে। যৌন মিলন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বর্বরতা ও মূঢ়তা ঝেড়ে ফেলার কাজটি প্রথমে তাকে করতে বলা হয় এবং সম্ভাব্য সেরা মানব-দেহ নবজাত পৃথিবীর পাওয়ার অধিকারের কথা তাকে মনে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পবিত্র মুহূর্তে তার কর্তব্য হচ্ছে রক্তমাংসের মানব-দেহকে নিখুঁত করে তোলা, বলতে গেলে, রক্ত-মাংসের ফিডিয়াস সৃষ্টি করা। কী করে সে এই কাজে হাত দেবে? হের ড্যুরিং-এর উপরোক্ত রহস্যময় উক্তিগুলি থেকে সে এর কোনো হদিস পায় না, যদিও হের ড্যুরিং এটাকে 'শিল্প' বলে অভিহিত করেছেন। হের ড্যুরিং 'তাঁর মনশ্চক্ষে, ছক হিসাবে' এই বিষয়ে একটা পাঠ্যপুস্তক কি ইতিমধ্যেই রচনা করে ফেলেছেন—জার্মানির বইয়ের দোকানগুলি এই ধরনের মোড়কে-ঢাকা পাঠ্যপুস্তকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে? বস্তুতপক্ষে, আমরা এখন আর হের ড্যুরিং-কথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে নেই, বরঞ্চ রয়েছি ম্যাজিক ফ্লুট-এর[১৮৫] পরিবেশে।—একমাত্র তফাৎ হচ্ছে আমাদের গূঢ়তর ও কঠোরতর নীতিবাগীশের তুলনায় দৃঢ়চেতা ম্যাসোনিক পুরোহিত সারাস্ট্রোকে কখনই 'দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরোহিত' বলে মনে হয় না। তাঁর দুটি স্বাধীন নরনারীকে 'স্বাধীন ও নৈতিক বিবাহে'র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে হের ড্যুরিং তাদের যে আতঙ্কজনক পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই তুলনায় সারাস্ট্রো তাঁর প্রেম-দক্ষ যুগলকে যে-পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, তা নেহাৎই ছেলেখেলা বলে মনে হয়। আর তাই এমন ঘটে যেতে পারে যে 'নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা' ভবিষ্যতের ট্যামিনো তথাকথিত পরমসত্তাকে পদানত করলেও, তার একটি পা বেঁকে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে গিয়েছে, ফলে দুষ্টু লোকে তাকে খোঁড়া বলতে পারে। এটাও সম্ভব যে তার অতিপ্রিয় ভবিষ্যতের পামিনার ডান কাঁধটা সামান্য ঝুঁকে থাকার দরুন সে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, হিংসুটে লোকে এটাকে ছোট্ট একটা কুঁজ বলেও অভিহিত করতে পারে। তাহলে কী হবে? আমাদের গূঢ়তর ও কঠোরতর সারাস্ট্রো রক্তমাংসের মানুষকে নিখুঁত করে তোলার কলাকৌশল প্রয়োগ করা থেকে তাদের বিরত করবেন? তিনি কি গর্ভধারণের ক্ষেত্রে তাঁর 'প্রতিষেধক ব্যবস্থা' কিংবা জন্মের ক্ষেত্রে 'বাছাই করার পদ্ধতি' প্রয়োগ করবেন? খুবসম্ভব ব্যাপারটা অন্যরকম

ঘটবে ; প্রেমিক যুগল সারাস্ত্রো-ড্যুরিংকে উপেক্ষা করে সোজা রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাবে।

হের ড্যুরিং চিৎকার করে বলছেন, এখানেই থামুন ! আমার কথার মানে এইসব নয়। আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে দিন !

> 'দেহ-মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর যৌন মিলনের উন্নততর, সত্যিকারের মানবিক প্রেরণার ক্ষেত্রে…যৌন উত্তেজনার মানবোচিত রূপ, প্রবল আবেগাত্মক প্রেম যার তীব্র অভিব্যক্তি, যখন পরস্পরকে মথিত করে, মিলনের শ্রেষ্ঠতম গ্যারাণ্টি, তার পরিণতিও গ্রহণযোগ্য।… এই সুষম সম্পর্ক থেকে নিটোলভাবে গঠিত যে ফলের জন্ম হয় সেটা এই সম্পর্কের গৌণ পরিণতি। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে যে-কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতার পরিণতি ক্ষতিকর'— ইত্যাদি।

এইভাবে সবচেয়ে ভালো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সব কিছুর পরিণতি ঘটে ভালোর দিকে : খোঁড়া ও কুঁজো পরস্পরকে তীব্রভাবে ভালোবাসবে এবং তাহলেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত করবে সুষমান্বিত 'গৌণ ধরনের ফল' ; এটা ঠিক উপন্যাসের মতো—তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, পরস্পরকে পেয়ে যায় এবং গূঢ়তর ও কঠোরতর নৈতিকতা একঘেয়ে বুকনিতে পর্যবসিত হয়।

সাধারণভাবে নারীজাতি সম্পর্কে হের ড্যুরিং-এর মহৎ ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগের মধ্যে :

> 'মানুষের কাছে মানুষকে বিক্রি করার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা নিপীড়নমূলক সমাজে পতিতাবৃত্তি স্বীকৃত হয় পুরুষের স্বার্থে বাধ্যতামূলক বিবাহ-বন্ধনের স্বাভাবিক পরিপূরকরূপে এবং এটা খুব সহজেই বোধগম্য ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও যে নারীদের পক্ষে এইরকম কোনো কিছুই সম্ভব নয়।'

নারীদের পক্ষে এইরকম কথা বলার জন্যে, হের ড্যুরিং তাদের কাছ থেকে যে ধন্যবাদ পেতে পারেন, তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু হের ড্যুরিং পেটিকোট ভাতা হিসাবে এক ধরনের উপার্জনের কথা কি কখনই শোনেন নি, যা এখন আর একটা বিরল ঘটনা নয় ? হের ড্যুরিং এক সময় একজন রেফারেণ্ডারি[১৮৬] ছিলেন ; তিনি বার্লিনে থাকেন, যেখানে ছত্রিশ

আমার উপস্থাপিত মতামতগুলির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে পাঠক লক্ষ্য করতে সক্ষম হবেন।

অন্যদিকে, বর্তমান জার্মানিতে 'পদ্ধতি-সৃষ্টিকারী' হের ড্যুরিং আদৌ একজন বিচ্ছিন্ন, একক ব্যক্তি নন। কিছুকাল যাবৎ সেই দেশে গাদাগাদা দার্শনিক, বিশেষত প্রাকৃতিক-দার্শনিক, পদ্ধতিগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠছে; রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে গজিয়ে-ওঠা অসংখ্য নিত্যনতুন পদ্ধতির তো কথাই নেই। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেমন এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি নাগরিকই ভোট দেওয়ার, যাবতীয় বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশের অধিকারী; অর্থনীতিতে যেমন এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার সময় প্রতিটি ক্রেতাই যেকোনো পণ্যের সমঝদার—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বর্তমানে এইরকম ধরে নেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। এখন যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো বিষয়ে লিখতে পারেন এবং 'বিজ্ঞান-সংক্রান্ত স্বাধীনতা' কথাটির অর্থ হচ্ছে যে-বিষয় নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করা হয় নি, সেইসব বিষয় লেখা, আর এটাকেই একমাত্র যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে ঘোষণা করা। আসলে হের ড্যুরিং এই ধরনের গলাবাজি করা মেকি বিজ্ঞানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নমুনা, বর্তমান জার্মানিতে এই ধরনের মেকি বিজ্ঞানের পসার খুব বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, এর অর্থহীন দম্ভ-নিনাদে সব কিছু ডুবে যাচ্ছে। কাব্যে, দর্শনে, অর্থনীতিতে, ইতিহাসতত্ত্বে এই অর্থহীন দম্ভনিনাদ; সভাগৃহে ও বক্তৃতামঞ্চে এই দম্ভনিনাদ; সর্বত্র এই দম্ভনিনাদ—অন্যান্য জাতির সহজ-সরল, গতানুগতিক অর্থহীনতার তুলনায় চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গভীরতার দাবি করছে; অর্থহীন গুরুগাম্ভীর্য—যা কিনা জার্মান মনন-শিল্পে উৎপাদিত বস্তু-সম্ভারের জাত্-বৈশিষ্ট্য—যা সস্তা কিন্তু নিকৃষ্ট—যা জার্মান শিল্পজাত ঠিক অন্যান্য জিনিসের মতোই; একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ফিলাডেলফিয়ার শিল্প-মেলায়[১৮৭] শিল্পজাত জিনিসের সঙ্গে এটাকে দেখানো হয় নি। এমনকি জার্মান সমাজবাদও সাম্প্রতিক কালে বিশেষত হের ড্যুরিং-এর চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর থেকে, বেশ খানিকটা অর্থহীন দম্ভনিনাদে ভরে গিয়েছে। যে দেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদে বর্তমানে প্রায় সব কিছুই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে বাস্তবধর্মী সোস্যাল-ডিমোক্রাটিক আন্দোলন এই অর্থহীন দম্ভনিনাদের পাল্লায় পড়ে যে গোল্লায় যায় নি, সেটা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর সুস্থ অবস্থার এক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

মিউনিখে অনুষ্ঠিত প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সভায়* ভাষণ দিতে গিয়ে নাগেলি যখন এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে মানুষের জ্ঞান কখনও সর্বজ্ঞের চরিত্র পাবে না,[১৮৮] তখন নিশ্চয়ই তিনি হের ড্যুরিং-এর কীর্তির কথা জানতেন না। এই কীর্তি আমাকে এমনসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছে, যেখানে বড়জোর একজন অপেশাদার অনুরাগী হিসাবে আমি ঢুকতে পারি। এটা বিশেষ করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; ইদানিং প্রায়শই মনে করা হয় যে কোনো 'অপেশাদার' ব্যক্তির পক্ষে এই ক্ষেত্রে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। হের ভিরচাও,** মিউনিখের মতো যে-অনুশাসন-বাক্য উচ্চারণ করেছেন এবং অন্যত্র যা বিস্তারিত-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার দ্বারা আমি উৎসাহবোধ করেছি। এতে বলা হয়েছে নিজের বিশেষ জ্ঞানের শাখার বাইরে প্রত্যেক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীই একজন অর্ধ-দীক্ষিত, সাধারণ পর্যায়ভুক্ত : অবিশেষজ্ঞ। একজন বিশেষজ্ঞ যেমন সময়-সময় তার পারিপার্শ্বিক সীমানায় মধ্যে ঢুকে পড়ার সুযোগ নেন এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা যেমন তাঁর ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রকাশভঙ্গির জড়তাকে ক্ষমার চোখে দেখেন, আমিও তেমনি আমার সাধারণ তত্ত্বগত অভিমত প্রমাণ করার ক্ষেত্রে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া ও নিয়মগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি ; সুতরাং আমিও অনুরূপ আনুকূল্য আশা করতে পারি। আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানে অর্জিত ফলাফল তত্ত্বগত বিষয়ে ব্যাপৃত প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এমন একটা অপ্রতিরোধ্যতা চাপিয়ে দেয়, যার ফলে এখনকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন। আর এখানে খানিকটা খেসারত দিতেই হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকরা যদি অর্ধ-দীক্ষিত হয়ে থাকেন, তাহলে তত্ত্বের ক্ষেত্রে, এতদিন যাকে দর্শন বলা হতো তার ক্ষেত্রে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরাও বর্তমানে অনুরূপ অবস্থায় রয়েছেন।

পরীক্ষাভিত্তিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান আজ জ্ঞানের উপযোগী এমন বিপুল পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করেছে, যার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে সুশৃঙ্খলভাবে এবং তার আন্তঃসম্পর্ক অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

---

* ১৮৭৭-এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত। সম্পাদক।

** ভিরচাও-এর 'আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি ১৮৭৭ সালে বার্লিনে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক।

করা একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত করার প্রয়োজনীয়তাও আজ অনুরূপভাবে অনস্বীকার্য। আর এটা সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান তত্ত্বের জগতে প্রবেশ করে এবং এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিগুলি কোনো কাজে আসে না, প্রয়োজন হয় তত্ত্বগত চিন্তার। কিন্তু তত্ত্বগত চিন্তা একটা সহজাত গুণ, স্বাভাবিক ক্ষমতা হিসাবে প্রকাশ পায়। এই স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হয়, উন্নত করে তুলতে হয় এবং আগেকার দর্শনের অনুশীলন ছাড়া এর উন্নতি সাধনের অন্য কোনো পন্থা নেই।

আমাদের যুগ সমেত প্রতিটি যুগেই তত্ত্বগত চিন্তা ইতিহাসের সৃষ্টি; বিভিন্ন সময়ে তার রূপ বিভিন্ন, আর সেই সঙ্গে তার বিষয়বস্তুও বিভিন্ন। সুতরাং অন্য সবের মতো চিন্তার বিজ্ঞান একটা ঐতিহাসিক বিকাশের বিজ্ঞান। আর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে চিন্তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারেও এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমত, চিন্তার নিয়মগুলির তত্ত্ব কোনোমতেই সর্বকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত 'শাশ্বত সত্য' নয়—স্থূল যুক্তিধারায় 'যুক্তিবিদ্যা' বলতে যে রকম মনে করা হয়। পদ্ধতিগত যুক্তিবিদ্যা—অ্যারিস্টটলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রচণ্ড বিতণ্ডার মঞ্চ হয়ে রয়েছে। আর এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন চিন্তানায়ক, অ্যারিস্টটল ও হেগেল ডায়ালেকটিকস নিয়ে নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ডায়ালেকটিকসই হচ্ছে চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ, কেননা প্রকৃতি-জগতে সংঘটিত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়াগুলির সদৃশ দৃষ্টান্ত এবং সেগুলি ব্যাখ্যার পদ্ধতি, সার্বিক আন্তঃসম্পর্ক এবং একটি পরীক্ষা-ক্ষেত্র থেকে অন্য পরীক্ষা ক্ষেত্রে যাওয়ার রীতিনীতি একমাত্র ডায়ালেকটিকস থেকেই পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, মানুষের চিন্তা-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বাহ্য জগতের সাধারণ আন্তঃসম্পর্কগুলি সংক্রান্ত মতামতের সঙ্গে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পরিচয় লাভের প্রয়োজন হয়; এর একটা অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে খোদ প্রকৃতি-বিজ্ঞান যেসব তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে, এই পরিচয় সেটা বিচারের একটা মানদণ্ডও বটে। আর এইখানেই, দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব প্রায়শই প্রকটরূপে দেখা দেয়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে দর্শনে উপস্থাপিত সূত্রগুলিকে, যার সঙ্গে বহুদিন আগেই দার্শনিকভাবে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে, তত্ত্ব-ঘেঁষা প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা নতুন

জ্ঞান হিসাবে হাজির করেন, এমনকি কিছুদিনের জন্যে এগুলি ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠে। নতুন প্রমাণের সাহায্যে শক্তি-সংরক্ষণের সূত্র যে আরও বলিষ্ঠভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এটা আবাধ প্রাধান্য অর্জন করতে পেরেছে—তাদের বলবিদ্যাগত তত্ত্বের এ একটা নিশ্চয়ই মস্ত বড় সাফল্য; কিন্তু যোগ্য পদার্থ-বিজ্ঞানীরা যদি জানতেন যে এই সূত্র ইতিপূর্বেই দেকার্ত প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তাহলে এই সূত্রটিকে একেবারে নতুন হিসাবে হাজির করা কি আদৌ সম্ভব হতো? যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন পুনরায় শুধুমাত্র অণু ও পরমাণু নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে, তাই প্রাচীন গ্রীসের পরমাণু-দর্শনের আবার প্রাধান্য লাভের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু কী রকম ভাসাভাসাভাবে সেটার আলোচনা চলছে! কেকুলে বলছেন ('Ziele und Leistungen der Chemie'*) যে লিউসিপ্পাস নয়, ডিমোক্রিটাস পরমাণু দর্শনের স্রষ্টা এবং তাঁর মতে ডাল্‌টনই প্রথম গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মৌল পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন মৌল পদার্থের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ভিন্ন ভিন্ন ওজন সেগুলির ওপর আরোপ করেন।[১৮৯] যে কেউ ডিওজিনাস লেয়ারটিয়স-এর লেখায় এটা দেখতে পাবেন যে ইতিপূর্বেই এপিকিউরাস শুধু মাত্রা ও আয়তনের দিক থেকে নয়, ওজনের দিক থেকেও বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে পারমাণবিক ওজন এবং পারমাণবিক স্তরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

১৮৪৮ সালে, অন্যদিকে জার্মানিতে নিষ্পত্তিমূলক কিছু না ঘটলেও, একমাত্র দর্শনের জগতে একটা পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটে। বাস্তবে জগতে নিজেকে নিক্ষেপ করে, কোথায়ও আধুনিক শিল্প ও অর্থকরী প্রতারণার সূত্রপাত করে এবং জার্মানিতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অর্জিত অভিজ্ঞতার বিরাট অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটিয়ে—জার্মান জাতি ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়ায়—যে জার্মান দর্শন বার্লিনের পুরানো হেগেলতন্ত্রের বালিয়াড়িতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বার্লিনের পুরানো হেগেলতন্ত্রের এটা বিশেষভাবে পাওনাই ছিল। কিন্তু যে-জাতি বিজ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করতে চায়, সম্ভবত তত্ত্বগত চিন্তা ছাড়া সে এটা অর্জন করতে পারে না। শুধু হেগেলতন্ত্রই নয়, ডায়ালেকটিকসকেও

---

* এখানে এঙ্গেলস কেকুলের 'এমস অ্যাণ্ড এ্যাচিভমেণ্টস অব কেমিস্ট্রি' (১৮৭৮) পুস্তিকাটির উল্লেখ করেছেন। —সম্পাদক।

ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়—আর ঠিক সেই সময়েই এই কাজটি করা হয়, যখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির ডায়ালেকটিক চরিত্র অপ্রতিরোধ্য গতিতে মনের ওপর ছাপ ফেলছে, যখন সুবিশাল তত্ত্ব-জগতের সঙ্গে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সংযোগ স্থাপনে একমাত্র ডায়ালেকটিকসই সহায়ক হতে পারে। তারপর থেকে জনগণের মধ্যে যেটা প্রাধান্য অর্জন করে তা হচ্ছে একদিকে শোপেনহাওয়ার-এর নিস্তেজ দার্শনিক চিন্তা, যা কূপমণ্ডূকদের মনোভাবের সঙ্গে বেশ মানানসই করে তৈরি, আর পরবর্তীকালে হার্টমান-এর চিন্তাভাবনা, এবং অন্যদিকে অনেক ফোগ্‌ট ও বাখনের-এর স্থূল অস্থির-প্রচারধর্মী বস্তুবাদ। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে, হরেকরকম চিন্তাধারার সারসংগ্রহবাদ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালায় এবং এদের মধ্যে মিলের একমাত্র জায়গা হলো: এগুলির সবই উদ্ভাবিত হয়েছে পুরানো দর্শনসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে এবং এগুলির সবই সমপরিমাণে আধিবিদ্যক দর্শন। ধ্রুপদী দর্শনের ধ্বংসাবশেষ থেকে যেটুকু রক্ষা পেয়েছিল, সেটা হচ্ছে নব্য-কান্টবাদ, যার শেষ কথা হচ্ছে অজ্ঞেয় বস্তু-সত্তা, অর্থাৎ কান্টের যেটুকু টিকিয়ে রাখার একেবারে অযোগ্য। এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে এখনকার প্রাধান্যমূলক অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্বগত চিন্তা।

খোদ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরাই এই অসংলগ্নতা ও বিভ্রান্তির কী পরিমাণ শিকার, সেটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে-কোনো একখানা তত্ত্বগত গ্রন্থ দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। বর্তমানে বাজার-চলতি তথাকথিত দর্শন এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সামনে আদৌ হাজির করতে পারে না। তাই আধিবিদ্যক দর্শন থেকে ডায়ালেকটিক পদ্ধতিসম্মত চিন্তায় কোনো না কোনোভাবে ফিরে আসা ছাড়া স্বচ্ছতায় পৌঁছানোর সত্যি সত্যিই কোনো উপায়, কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই ফিরে আসার ব্যাপারটা বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। এটা ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সেইসব নিজস্ব আবিষ্কারের জোরেই, যে আবিষ্কারগুলি অধিবিদ্যার দর্শনের পুরোনো ছাঁচের মধ্যে আর মোটেই খাপ খায় না। কিন্তু এটা খুব দীর্ঘমেয়াদি, আয়াসসাধ্য প্রক্রিয়া, যার মধ্যে বিপুল পরিমাণ অহেতুক দ্বন্দ্ব-বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে। বিশেষ করে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকরা যদি ডায়ালেকটিক দর্শনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক

রূপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের পরিচয় করাতেন, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হতে পারত। এইসব রূপের মধ্যে দুটি বিষয় আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

এর প্রথমটি হচ্ছে গ্রীক দর্শন। এখানে ডায়ালেকটিক চিন্তা এখনও তার আদি, অকৃত্রিমরূপে বিদ্যমান: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আধিবিদ্যা-মূলক দর্শনের (ইংল্যাণ্ডে বেকন ও লক, জার্মানিতে ভোল্‌ফ) বিঘ্নপ্রকর বাধাগুলি সত্ত্বেও এটা এখনও অবিকৃত রয়েছে। এই দর্শন সমগ্রের উপলব্ধির দিকে না গিয়ে বিষয় বা বস্তুর সাধারণ আন্তঃসম্পর্কের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, অংশের উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ থেকে নিজের অগ্রগতিকেই ব্যাহত করেছে। প্রকৃতিকে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করার কাজে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি বলেই গ্রীকরা তখন প্রকৃতিকে দেখেছিল অখণ্ডরূপে, সাধারণভাবে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সার্বিক সম্পর্ক বিশেষ-বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিপাদিত হয় নি। গ্রীক দর্শনের অসম্পূর্ণতা এখানেই, যার ফলে এই দর্শনকে পরবর্তীকালে অন্যান্য বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী আধিবিদ্যক দর্শনের চাইতে তার শ্রেষ্ঠত্বও এইখানে। ঘটনাবলীর বিশেষ দিকটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধিবিদ্যক দর্শন যদি গ্রীকদের তুলনায় সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ঘটনাবলীর সাধারণ রূপটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গ্রীকরা আধিবিদ্যক দর্শনের তুলনায় সঠিক। আর এই প্রাথমিক কারণেই, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো দর্শনের জগতেও, এই ছোট জাতিটির সুকৃতির কাছে আমরা বারবার ফিরে যেতে বাধ্য হই; এই জাতিটির সার্বজনীন প্রতিভা ও কর্ম-তৎপরতা মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে একে এমন একটা আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা অন্য কোনো জাতি দাবি করতে পারে না। অপর কারণটি হচ্ছে গ্রীক দর্শনের রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে, পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রূণাকারে, জায়মান অবস্থায় নিহিত ছিল। সুতরাং, তত্ত্বগত প্রকৃতি-বিজ্ঞান যদি বর্তমান সাধারণ সূত্রগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে চায়, তাহলে তাকেও অনুরূপভাবে গ্রীকদের কাছে ফিরে যেতে হবে। এবং এই অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশই বেশি মাত্রায় প্রাধান্য অর্জন করছে। সেইরকম প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টান্ত ক্রমশই বিরল হয়ে উঠছে, যাঁরা গ্রীক দর্শনের অংশবিশেষ, যেমন পর-মাণু তত্ত্ব কিংবা চিরন্তন সত্য, নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গ্রীকদের প্রতি বেকনের মতো উন্নাসিকতা দেখিয়ে তাদের এই কারণেই অবজ্ঞা করেন যে, গ্রীকদের

পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান ছিল না। অন্তর্দৃষ্টিকে এগিয়ে নিতে হলে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা অর্জন করাই একমাত্র কাম্য বিষয়।'

জার্মান প্রকৃতিবাদীদের খুব কাছাকাছি দ্বিতীয় ধরনের ডায়ালেকটিকস হচ্ছে কান্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত ধ্রুপদী জার্মান দর্শন। এক্ষেত্রে আর একটি ধারা বেশ 'ফ্যাশনেবল' হয়ে উঠেছে: কান্টে ফিরে চল, এছাড়া উপরোক্ত নব্য কান্টবাদ তো রয়েছেই। কান্ট দুটি চমকপ্রদ প্রকল্পের স্রষ্টা, যা ছাড়া আজকের তত্ত্বগত প্রকৃতি-বিজ্ঞান এগোতেই পারত না। আগে লাপলাসের নামে প্রচলিত সৌর জগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং জোয়ার-ভাটার ফলে পৃথিবীর আবর্তনের মন্দন সংক্রান্ত তত্ত্বের জনক কান্ট—এই আবিষ্কারের পর প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি মর্যাদার আসন পেয়েছেন। এটা ন্যায্যতই তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু কান্টের রচনাবলীর মধ্যে ডায়ালেকটিকস খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম এবং তাতে কোনোই লাভ হবে না; কেননা হেগেলের রচনাবলীতে ডায়ালেকটিকসের সামগ্রিক সংক্ষিপ্তসার এখন পাওয়া যায়, যদিও অত্যন্ত ভ্রান্ত পথে এর বিকাশ ঘটানো হয়েছে।

একদিকে, 'প্রাকৃতিক দর্শনের' বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটার পর এবং নিছক বিকৃতিতে পর্যবসিত হওয়ার পর এবং অন্যদিকে তত্ত্বগত প্রয়োজনের দিক থেকে বর্তমান সারসংগ্রহকারী আধিবিদ্যক দর্শন প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে অবহেলায় পরিত্যাগ করার পর সম্ভবত প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সামনে আবার হেগেলের নাম উচ্চারণ করা সম্ভব হবে, হের ড্যুরিং যে চমকের সঙ্গে সেন্ট ভিটাস-এর নাচ নেচেছেন, সেটাকে উসকে না দিয়েই এটা ঘটবে।

প্রথমত, এটা বলতেই হচ্ছে যে এখানে বিষয়টা মোটেই এই নয় যে হেগেলের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিকে, অর্থাৎ আত্মা, মন, ধারণা আদি, এবং বাস্তব জগৎ হচ্ছে ধারণার নিছক প্রতিচ্ছবি, সমর্থন করতে হবে। ফয়েরবাখই সেটা বর্জন করে গিয়েছেন। আমরা সবাই এটা স্বীকার করি যে, বিজ্ঞানের, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কাজ শুরু করতে হয় নির্দিষ্ট কতকগুলি তথ্য থেকে, আর সেই কারণে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে কাজ শুরু হয় বিভিন্ন ভৌতরূপ এবং ভৌত পদার্থের গতির বিভিন্ন রূপ থেকে*; সুতরাং

---

* মূল রচনায় এখানে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া ছিল। তারপর সন্নিবিষ্ট ছিল এই অসম্পূর্ণ বাক্যটি, এঙ্গেলস পরে এটাকে বাদ দিয়ে দেন: 'এই সম্বন্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের চাইতেও আমরা সমাজবাদী-বস্তুবাদীরা আরও বেশি এগিয়ে যাই এইভাবে···'। সম্পাদক।

তত্ত্বমূলক প্রকৃতি-বিজ্ঞানেও আন্তঃসম্পর্কগুলিকে তথ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় না, সেগুলিকে আবিষ্কার করা হয় তথ্যের মধ্যে থেকে, আর সেগুলি আবিষ্কৃত হলে যতটা সম্ভব যাচাই করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে।

পুরানো ও নতুন ধারার বার্লিন-হেগেলপন্থীরা হেগেলীয় পদ্ধতির যে গোঁড়া বিষয়বস্তুটিকে প্রচার করেন, সেটা রক্ষা করার প্রশ্নটিও অনুরূপভাবে অর্থহীন। সুতরাং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতির, বিশেষ করে হেগেলীয় প্রাকৃতিক দর্শনেরও পতন ঘটে। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা হেগেলকে যতটুকু বুঝে ওঠতে পেরেছিলেন, তার উপর নির্ভর করে তাঁর বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞানীদের বিতর্ক পরিচালিত হয় শুধুমাত্র এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে: ভাববাদী অবস্থান এবং যদৃচ্ছ, তথ্য অগ্রাহ্য-করা দর্শন-পদ্ধতির সৃষ্টি।

এইসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করার পরও যেটা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস। 'সংস্কৃতিবান জার্মানিতে যে এখন বড় বড় কথা বলে, সেই অবাধ্য, উদ্ধত ও মাঝারি'* বুদ্ধিবৃত্তির লোকের তুলনায়, মার্কসের এটাই কৃতিত্ব যে তিনিই প্রথম বিস্মৃত ডায়ালেকটিকস পদ্ধতিকে, হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস পদ্ধতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্যকে পুনরায় সামনে নিয়ে আসেন এবং একই সময়ে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন গবেষণামূলক বিজ্ঞান—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে। আর এই কাজে তিনি এতই সাফল্যলাভ করেন যে, এমনকি জার্মানিতেও নবতর আর্থনীতিক চিন্তাধারা স্থূল অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় মার্কসকে সমালোচনা করার অজুহাতে তাঁর রচনা থেকে নকল করার মাধ্যমে (যদিও প্রায় সময়েই ভুলভাবে)।

হেগেলীয় পদ্ধতির অন্যান্য শাখাতে যা ঘটেছে, তাঁর ডায়ালেকটিকসের মধ্যেও বাস্তব আন্তঃসম্পর্কগুলি সেইভাবেই উলটে গিয়েছে। মার্কস বলছেন, কিন্তু 'হেগেলের হাতে ডায়ালেকটিক রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তিনিই প্রথম একটা সামগ্রিক রূপে ও সচেতনভাবে এর কার্যকর সাধারণ রূপটি উপস্থিত করেন। তিনি এটাকে এর মাথার ওপর দাঁড় করান। এর রহস্যময় আবরণীর

---

* ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ২৯। সম্পাদক।

মধ্যে থেকে যদি যৌক্তিক শাঁসটিকে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে একে আবার উল্টো করে দাঁড় করাতে হবে।'*

অবশ্য খোদ প্রকৃতি-বিজ্ঞানেই প্রায়শই আমরা এমনসব তত্ত্বের সম্মুখীন হই, যেখানে বাস্তব সম্পর্ককে দাঁড় করানো হয় এর মাথার ওপর, প্রতিফলনটিকে মনে করা হয় আদি রূপ আর এখানেও উল্টো করে দাঁড় করানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বেশ কিছুকাল ধরে এই ধরনের তত্ত্বের প্রাধান্য চলতে থাকে। যখন প্রায় দুশো বছর ধরে, তাপকে সাধারণ পদার্থের গতির একটা রূপ হিসাবে গণ্য না করে একটা বিশেষ রহস্যময় পদার্থ বলে মনে করা হতো, তখন সেটাই ছিল এই ধরনের ব্যাপার এবং তাপের যান্ত্রিক তত্ত্ব এই ধারণাকে উল্টে দেবার কাজটিই করেছিল। তা সত্ত্বেও তাপের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করে ক্যালরিক তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং সঠিক ধারণা অর্জনের পথ খুলে গিয়েছিল, বিশেষ করে ফুরিয়ের ও সাদি কার্নট-এর[১৯০] চিন্তাধারার সাহায্যে। এখন আবার পূর্বসূরীদের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি উল্টো করে দাঁড় করাতে হয়, সেগুলিকে ব্যক্ত করতে হয় এর নিজের ভাষায়।* অনুরূপভাবে, রসায়নে, শতবর্ষের পরীক্ষামূলক কাজের পর, ফ্লোজিস্টিক থিওরি প্রথম এমনসব উপাদান সরবরাহ করেছিল, যার সাহায্যে ল্যাভোসিয়ের অকসিজেনের মধ্যে কল্পিত ফ্লোজিস্টন-এর বাস্তব বিপরীত উপাদান আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং এইভাবে সমগ্র ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু তার ফলে ফ্লোজিস্টিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল মোটেই নষ্ট হয়ে যায় না। সেগুলি টিকে থাকে, শুধু মূল্যায়নগুলি পাল্টে যায়, ফ্লোজিস্টিক থেকে রসায়নের উপযুক্ত ভাষায় রূপান্তরিত হয়, আর এইভাবে তাদের যৌক্তিকতা বজায় থাকে।

তাপের যান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে ক্যালোরিক তত্ত্বের যে-সম্পর্ক এবং ল্যাভোসিয়ের-এর তত্ত্বের সঙ্গে ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের যে সম্পর্ক, যুক্তিসঙ্গত ডায়ালেকটিকস-এর সঙ্গে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস-এর সম্পর্কও তাই।

---

* ক্যাপিটাল, পৃ ২৯। সম্পাদক।

অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর জন্যে এঙ্গেলসের প্রারম্ভিক লেখা[১৯১]

১

প্রথম অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

(চিন্তা—বাস্তবতার প্রতিফলন)

অভিজ্ঞতালব্ধ সকল চিন্তাই, সত্য হোক কিংবা বিকৃত হোক, বাস্তবতার প্রতিফলন।

তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৪৫-৪৭

(বস্তু-জগৎ ও চিন্তার নিয়মসমূহ)

দুই ধরনের অভিজ্ঞতা—বাহ্য, বস্তুগত ও অভ্যন্তরীণ—এবং চিন্তার নিয়মসমূহ ও চিন্তার রূপ। বিকাশের ধারায় আংশিক উত্তরাধিকার সূত্রেও চিন্তার রূপগুলি গড়ে ওঠে। (যেমন, ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ-গুলির স্বতঃপ্রমাণতা, যা নিশ্চয়ই বুশম্যান ও অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রোদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

আমাদের প্রস্তাবনাগুলি যদি সঠিক হয়, এবং চিন্তার নিয়মকে যদি আমরা ঐক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে ফল বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ঠিক যেমন বৈশ্লেষিক জ্যামিতির কোনো হিসাব জ্যামিতি অংকনের সঙ্গে মিলে যাবে। যদিও এই দুটির পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটা প্রায় কখনই ঐইরকম হয় না, আর যদি হয়ও, তাও সাধারণ, খুব মামুলি বিষয়ে।

বাহ্য জগৎ হচ্ছে প্রকৃতি কিংবা সমাজ।

তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৪৫ ৪৮ ; চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ৫২-৫৫ এবং
দশম অধ্যায়, পৃ ১১৩

(চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক)

চিন্তার একমাত্র বিষয়বস্তু হচ্ছে জগৎ ও চিন্তার নিয়মগুলি।

জগৎ সম্বন্ধে অনুশীলনের সাধারণ ফলাফল অর্জিত হয় এই অনুশীলন-কর্মটির শেষে, সুতরাং এগুলি সূত্র নয়, ব্যতিক্রমী বিষয় নয়, এগুলি হচ্ছে ফলাফল, সিদ্ধান্ত। কারও মগজ থেকে এই সিদ্ধান্ত নির্মাণ, সূচনা-বিন্দু হিসাবে এটাকে গ্রহণ এবং তারপর মগজ থেকে জগৎ-কল্পনা—এটাই হচ্ছে ভাবাদর্শ, এই ভাবাদর্শ এযাবৎকালের সব ধরনের বস্তুবাদকেই কলঙ্কিত করেছে ; কেননা প্রকৃতির ব্যাপারে চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক বস্তুবাদের কাছে অনেকখানি পরিষ্কার ছিল, ইতিহাসের ব্যাপারে তা ছিল না, একটা নির্দিষ্ট যুগের বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর যে যাবতীয় চিন্তা নির্ভরশীল, বস্তুবাদ সেটাও বুঝতে পারে নি।

যেহেতু ড্যুরিং তথ্যের বদলে 'সূত্র' থেকে শুরু করেন, তাই তিনি একজন ভাবাদর্শী এবং তিনি তাঁর সত্তার বিচার করেন এমনসব সাধারণ ও শূন্যগর্ভ শব্দের দ্বারা যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ, বৈশিষ্ট্যহীন বলে মনে হয়। তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদনের এটাই একমাত্র পদ্ধতি। উপরন্তু, এগুলি থেকে কোনো সিদ্ধান্তই টানা যায় না ; এগুলিকে একধরনে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন একমাত্র সত্তার সূত্রটি। জগতের ঐক্যের সত্যতা এবং পরজগতের অর্থহীনতা জগৎ সংক্রান্ত সামগ্রিক অনুশীলনের ফল, অথচ এখানে সেটাকে প্রমাণ করতে হবে পূর্বতঃসিদ্ধ হিসাবে, চিন্তার স্বতঃসিদ্ধতাকে ভিত্তি করে। সুতরাং এ এক মূঢ়তা।

কিন্তু এটা ছাড়া শুধু একটা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামানো অসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৪৭-৪৮

(অখণ্ড সমগ্ররূপে জগৎ। জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান)

হেগেলের পর পূর্ণাঙ্গ দর্শনতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব। জগৎ স্পষ্টতই একটা একক ব্যবস্থা, অর্থাৎ অখণ্ড সমগ্র, কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে সমগ্র প্রকৃতি ও ইতিহাসকে জানতে হবে, যা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না, সুতরাং যিনি একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শনতন্ত্র গড়ে তোলেন, তাঁকে তাঁর

নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অসংখ্য ফাঁক পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ তাঁকে অযৌক্তিক কল্পনা ও ভাবাদর্শ সৃষ্টির কাজে নামতে হয়!

যৌক্তিক কল্পনা—অপর নাম সংযোগসাধন!

তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৪৮-৫১
(গাণিতিক পদ্ধতি ও বিশুদ্ধ যৌক্তিক কর্ম)

গণনামূলক যুক্তি—গণনাকারী যন্ত্র। গাণিতিক পদ্ধতির একটা অদ্ভুত তালগোল পাকানো ব্যাপার—এই পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রমাণ দিতে সক্ষম, কেননা বিমূর্ত হলেও একটা বাস্তব ভিত্তিক চিন্তার ওপর নির্ভরশীল, আর বিশুদ্ধ যুক্তি প্রমাণ হাজির করে অনুমানের সাহায্যে, আর সেই কারণে গাণিতিক পদ্ধতির ইতিবাচক নিশ্চয়তা এর মধ্যে নেই। সংযুক্তির জন্যে যন্ত্র, তুলনীয়, অ্যানড্রুজ-এর ভাষণ, 'নেচার', সেপ্টেম্বর ৭, ৭৬*

ছক=বাঁধা-ধরা

তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ৪৮-৫১, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ৫২-৫৫।
(বাস্তবতা ও বিমূর্তন)

সর্বব্যাপক সত্তার এককত্বের সূত্রের সাহায্যে সমস্ত সত্তার বস্তুগত অস্তিত্ব প্রমাণ করা ড্যুরিং-এর পক্ষে সেইরকমই অসম্ভব (পোপ ও শেখ-উল-ইসলামের[১৯২] পক্ষে তাঁদের বিশ্বাসের অভ্রান্ততা ও ধর্ম থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে যে সর্বব্যাপক সত্তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া খুবই সহজ), যেমন তাঁর পক্ষে অসম্ভব কোনো গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ থেকে একটি ত্রিভুজ বা গোলক অঙ্কন করা অথবা পিথাগোরাসের উপপাদ্য নির্ণয় করা। উভয়ের জন্যেই বাস্তব ভিত্তি প্রয়োজন এবং একমাত্র এই ভিত্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বস্তুজগতের পাশাপাশি মানব-মস্তিষ্কের সৃষ্টি ও প্রক্রিয়ার বাইরে কোনো পৃথক আত্মিক জগতের অস্তিত্ব নেই—এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তটি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এক দীর্ঘমেয়াদি ও শ্রমসাধ্য গবেষণার ফল।

---

* অ্যানড্রুজ-এর বক্তৃতা, 'নেচার', সেপ্টেম্বর ৭, ১৮৭৬: ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর ৪৬তম বার্ষিক সভায় টমাস অ্যানড্রুজ-এর বক্তৃতার প্রসঙ্গ এখানে এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন। ১৮৭৬, সেপ্টেম্বর ৬ গ্লাসগো শহরে এই সভার উদ্বোধন হয়। সম্পাদক।

জ্যামিতির ফলাফল বিভিন্ন রেখা, তল ও ঘন কিংবা তাদের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়; এগুলির বেশির ভাগই মানুষের জন্ম হওয়ার আগেই প্রকৃতিতে ছিল (রেডিওলারিয়া, কীটপতঙ্গ, স্ফটিক ইত্যাদি)।

ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৭২-৭৩ ইত্যাদি

(বস্তুর অস্তিত্বের ধরন হিসাবে গতি)

গতি হচ্ছে অস্তিত্বের ধরন, সুতরাং এটা বস্তুর নিছক ধর্মের অতিরিক্ত কিছু। গতি ছাড়া বস্তু নেই, কোনো দিন ছিলও না। মহাজাগতিক বিশ্বে গতি, নভোমণ্ডলের যেকোনো বস্তু-দেহে ক্ষুদ্রতর ভরের যান্ত্রিক গতি, তাপ, বৈদ্যুতিক প্রসারণ-সংকোচন, চৌম্বকীয় মেরুত্ব, রাসায়নিক বিভাজন ও মিশ্রণ, জৈবদেহের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রূপ, চিন্তা—প্রতিটি মুহূর্তে বস্তুর প্রতিটি পরমাণু হচ্ছে গতির এইসব রূপের প্রকাশ। সমস্ত ভারসাম্যই হয় আপেক্ষিক স্থিতি অথবা গতিশীল ভারসাম্য, যেমন গ্রহগুলির ভারসাম্য। বস্তুর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেই শুধু পরম স্থিতির ধারণা করা সম্ভব। সুতরাং গতিকে অথবা যান্ত্রিক শক্তির মতো তার যেকোনো রূপকে অবাস্তব পর্যায়ে না নিয়ে পদার্থ থেকে পৃথক করা কিংবা একে স্বতন্ত্র বা বহিরাগত হিসাবে বস্তুর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায় না।

সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৮৪-৮৬

(প্রাকৃতিক নির্বাচন)

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটা নিয়ে ড্যুরিং-এর উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা উচিত, কেননা এটা তাঁর সচেতন লক্ষ্য ও পদ্ধতি সংক্রান্ত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ডারউইন যেখানে অনুসন্ধান করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিভিন্ন রূপের, যেমন পরিবর্তন ঘটে ধীর গতিতে, সেখানে ড্যুরিং-এর দাবি হচ্ছে, ডারউইন-এর উচিত পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করা, যে সম্বন্ধে হের ড্যুরিং-এরও কিছু জানা নেই। বিজ্ঞানের যে-অগ্রগতিই ঘটুক না কেন, হের ড্যুরিং সব সময়েই এটা বলে যাবেন যে এখানে ওখানে নানান ঘাটতি রয়েছে, আর সেই কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করার অজুহাতও যথেষ্ট থাকবে।

সপ্তম অধ্যায়

(ডারউইন প্রসঙ্গে)

একান্ত বিনম্র ডারউইনের ব্যক্তিত্ব কী মহান—যিনি সমগ্র জীববিদ্যা থেকে শুধু বিপুল তথ্য-সম্ভার সংগ্রহ, পুনর্বিন্যাস ও ব্যাখ্যাই করেন না, এমনকি তাঁর নিজস্ব গৌরব ম্লান হয়ে যেতে পারে জেনেও তাঁর পূর্বসূরীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন, ঐ পূর্বসূরী একজন তুচ্ছ ব্যক্তি হলেও ; সেই তুলনায় হামবড়া ড্যুরিং নিজে বিন্দুমাত্র অবদান না রেখেই অন্যদের ভুলত্রুটির ব্যাপারে কী সাংঘাতিক খড়্গহস্ত এবং যিনি…

সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৮৫-৮৬ ; অষ্টম অধ্যায়, পৃ ৯৪-৯৫

ডুরিংঙ্গিয়ানা, ডারউইনবাদ, পৃ ১১৫*

উদ্ভিদের **অভিযোজন** হচ্ছে ভৌত শক্তি কিংবা রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণ ; সুতরাং অভিযোজন নয়। যদি 'বেড়ে ওঠার সময়ে কোনো উদ্ভিদ এমন দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে এটা সব থেকে বেশি আলো পাবে', উদ্ভিদ এই কাজটি করে বিভিন্নভাবে ও নানা পদ্ধতিতে, উদ্ভিদের প্রজাতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর মধ্যে তারতম্য ঘটে। কিন্তু ভৌত শক্তি ও রাসায়নিক উপাদান প্রতিটি গাছের ক্ষেত্রে এখানে বিভিন্নভাবে কাজ করে এবং গাছের সহায়ক হয়, যা কিনা শেষ পর্যন্ত এইসব 'রাসায়নিক ও ভৌত ইত্যাদি' প্রক্রিয়া থেকে অন্য রকম ; সুদীর্ঘ পূর্বতন বিবর্তন ধারার মধ্যে দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠেছে, সেইভাবেই উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় আলো পাওয়ার চেষ্টা করে। বস্তুতপক্ষে, এই আলো উদ্ভিদের কোষগুলিতে উদ্দীপকের কাজ করে এবং সাড়া হিসাবে ঠিক-ঠিক সেইসব শক্তি ও উপাদানকে উদ্ভিদের মধ্যে সক্রিয় করে তোলে।** যেহেতু এই প্রক্রিয়া জৈব কোষের গঠনের মধ্যে চলতে থাকে এবং উদ্দীপক ও সাড়ার রূপ গ্রহণ করে, যা কিনা মানব মস্তিষ্কে স্নায়ুমণ্ডলী যে প্রেরকের কাজ করে, ঠিক তার মতোই, তাই উভয় ক্ষেত্রেই অভিযোজন কথাটি বেশ যুতসই। আর যদি সম্পূর্ণভাবে চেতনার মাধ্যমে অভিযোজন সম্পন্ন করতে হয়,

* ড্যুরিং-এর 'দর্শনের আলোচনা' গ্রন্থটির পৃষ্ঠা, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পাদক।

** এখানে মার্জিনে এই মন্তব্যটিতে রয়েছে: 'আর প্রাণীদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' সম্পাদক।

তাহলে চেতনা ও অভিযোজনের শুরু ও শেষ কোথায় ? ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে, পতঙ্গভুক বৃক্ষের ক্ষেত্রে, পরাশ্রয়ী জলচর প্রাণী, প্রবাল কীট ও প্রথম স্নায়ুর ক্ষেত্রে এটা কখন শুরু হয়, আর কখন বা শেষ হয় ? ড্রারিং যদি এই সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারেন, তাহলে তিনি এতদিনকার মর্যাদাসম্পন্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের বিরাট উপকার করতে পারবেন। যেখানেই জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম পাওয়া যাবে, সেখানেই সন্ধান মিলবে প্রোটোপ্লাজম উদ্দীপক ও প্রোটোপ্লাজম সাড়ার। আর যেহেতু ধীরে পরিবর্তনশীল উদ্দীপকগুলি প্রোটোপ্লাজম-এর মধ্যেও পরিবর্তন আনে, তা না হলে এটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাই ঐ একই শব্দ—অভিযোজন—সমস্ত জৈব দেহের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রযোজ্য।

সপ্তম অধ্যায়

(অভিযোজন ও বংশগতি)

প্রজাতিগুলির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে হেকেল অভিযোজনকে নেতিবাচক কিংবা পরিবর্তনসাধক হিসাবে, বংশগতিকে ইতিবাচক কিংবা সংরক্ষণকর হিসাবে মনে করেছেন। এর পাল্টা ড্রারিং বলেছেন যে (পৃ ১২২) বংশগতিরও একটা নেতিবাচক ফল আছে, আছে পরিবর্তনসাধক ভূমিকা (এছাড়া পূর্বতন রূপ[১৯৩] সংক্রান্ত একটা বাজে তত্ত্বও রয়েছে)। এখন এই ধরনের বৈপরীত্যের দিকে, অন্যান্য বৈপরীত্যের মতোই, নজর দেওয়া এবং এটা প্রমাণ করার চাইতে সহজ আর কিছু নেই যে, আঙ্গিক গঠনের রদবদল ঘটিয়ে অভিযোজন সারসত্তা অর্থাৎ খোদ জৈব দেহটিকে বজায় রাখে, আর বংশগতি, প্রতিটি সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি ব্যক্তির মিলনের মাধ্যমে সঞ্চিত উপাদানে অনবরত পরিবর্তন ঘটায়, ফলে প্রজাতির পরিবর্তনও সম্ভব হতে পারে! বস্তুতপক্ষে, অভিযোজনের ফলও বংশগতির মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এটা আমাদের এক-পাও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে না। ঘটনার বাস্তবতাগুলিকে স্বীকার ক'রে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারব যে হেকেল-এর কথাই ঠিক, অর্থাৎ বংশগতি মূলত সংরক্ষণকর, এই প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিক, আর অভিযোজন বিপ্লবাত্মক, নেতিবাচক দিক। গার্হস্থ্য জীবনের পত্তন ও বংশবৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোজনের গুরুত্ব ড্রারিং-এর সুচতুর ধ্যানধারণার চাইতে অনেক বেশি।

প্রাণ। প্রাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বিপাকক্রিয়া, পদার্থের রূপান্তর। শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত রসায়নবিদ ও রাসায়নিক শারীরবৃত্তবিদরা বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে অসংখ্যবার এটা প্রতিপন্ন করেছেন এবং এটাকেই প্রাণের সংজ্ঞা হিসাবে বারবার অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা একেবারে সঠিকও নয়, পূর্ণাঙ্গও নয়। প্রাণের অস্তিত্বহীন ক্ষেত্রেও পদার্থের বিনিময় বা রূপান্তর ঘটে, যেমন ঘটে স্বাভাবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে; উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচামাল পেলে এই প্রক্রিয়াগুলি অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণে (মৃত জৈব, এমন কি অজৈব ঝিল্লীগুলির মধ্যে দিয়ে?), ট্রাউবি-র কৃত্রিম কোষের মধ্যে ও তাদের মাধ্যমে, তাদের নিজস্ব পরিবেশ, এই প্রক্রিয়ার বাহক হিসাবে নির্দিষ্ট বস্তুদেহ (যেমন, রোসকোর গ্রন্থের ১০২ পৃ দেখুন, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি)[১২৪] অনবরত সৃষ্টি করে থাকে। যে বিপাক-ক্রিয়াকে প্রাণের অপরিহার্য উপাদানস্বরূপ বলে মনে করা হয়, তার আরও যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রাণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রগাঢ় ভিত্তি, সূক্ষ্ম ধারণা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও আমরা এখনও এই পদার্থটির মূল খুঁজে পাই নি, তাই প্রাণ কী—এই প্রশ্ন আমাদের থেকেই যাচ্ছে।

বিজ্ঞানে সংজ্ঞাগুলি অর্থহীন, কেননা সেগুলি সবসময়েই অসম্পূর্ণ। খোদ বস্তুটির বিকাশই একমাত্র যথার্থ সংজ্ঞা, কিন্তু এইভাবে বললে এটা আর কোন সংজ্ঞা থাকে না। প্রাণ কী—এটা জানা ও জানানোর জন্যে প্রাণের সমস্ত অভিব্যক্তিকে আমাদের অনুশীলন করে দেখতে হবে এবং সেগুলি উপস্থিত করতে হবে তাদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে। অন্যদিকে সাধারণ উদ্দেশ্যে, তথাকথিত সংজ্ঞার একেবারে সাধারণতম ও সেই সঙ্গে সর্বাধিক তাৎপর্যব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ প্রায় সময়েই বেশ উপযোগী, এমনকি প্রয়োজনীয়ও বটে। এই ধরনের সংজ্ঞা যতটুকু অর্থ প্রকাশ করে, তার অতিরিক্ত যদি আশা করা না হয়, তাহলে এটা ক্ষতিকরও নয়। সুতরাং প্রাণ সম্বন্ধে এই ধরনের একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক, যে চেষ্টায় অনেকে বৃথাই মাথা ঘামিয়েছেন (নিকলসন দ্রষ্টব্য।)[১২৫]

প্রাণ হচ্ছে অ্যালবুমিনযুক্ত পদার্থের অস্তিত্বের ধরন এবং অস্তিত্বের এই

ধরনটি মূলত পুষ্টিবিধান ও বর্জ্য পদার্থ নিঃসারণের মাধ্যমে রাসায়নিক উপাদানগুলিকে অনবরত নতুনভাবে গড়ে তোলে।

…তারপর, অ্যালব্যুমিন-এর মূল ক্রিয়া হিসাবে জৈবপদার্থের বিনিময় থেকে এবং এর বৈশিষ্ট্যময় বিপাকক্রিয়াজাত রূপান্তর থেকে অতি সাধারণ যাবতীয় জীবন-ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে; যেমন, উত্তেজিতা—পুষ্টিবিধান ও অ্যালব্যুমিন-এর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে যা বর্তমান; খাদ্য-ব্যবহারের মধ্যে সংকোচনশীলতা; বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সর্বনিম্ন স্তরে (মে'নেরন) যার মধ্যে থাকে বিভাজনের মাধ্যমে বংশবিস্তার; অভ্যন্তরীণ গতি, যা না থাকলে খাদ্য গলাধঃকরণ কিংবা হজম, কোনোটাই সম্ভব নয়। কিন্তু কিভাবে সরল প্লাস্টিক অ্যালবুমিন থেকে কোষের দিকে এবং কোষ থেকে জৈবগঠনের দিকে অগ্রগতি ঘটে, সেটা প্রথমত বুঝতে হবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, কিন্তু প্রাণের সরল ব্যবহারিক সংজ্ঞা কোনো মতেই এই ধরনের গবেষণার অঙ্গ নয়। (১৪১ পৃষ্ঠায় ড্যুরিং একটা অন্তবর্তী জগতের উল্লেখ করেছেন, যেহেতু সংবহন প্রণালী ও 'জীবাণু-তন্ত্র' ছাড়া কোন বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এ একটা চমৎকার অনুচ্ছেদ।)

দশম অধ্যায়, পৃ ১১৪-২০

(ড্যুরিং—অর্থনীতি। দুই ব্যক্তি)

নৈতিকতা যতক্ষণ আলোচ্য বিষয়, ততক্ষণ ড্যুরিং বেশ সমতার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু অর্থনীতি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেই, ব্যাপারটা আর এইরকম থাকে না। যেমন, কিন্তু যদি একজন মার্কিনির ব্যবসায়িক ব্যাপার এসে পড়ে, আর একজন বার্লিনের ছাত্রের যদি গ্রাজুয়েট হওয়ার সার্টিফিকেট ও বাস্তবতার দর্শন ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তাহলে এই সমতা কোথায় যায়? ঐ মার্কিনি সব কিছুই উৎপাদন করে আর ছাত্রটির টুকিটাকি সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই, কিন্তু সম্পদের বণ্টন হয় প্রত্যেকের অবদান অনুযায়ী; অচিরেই ঐ মার্কিনি উপনিবেশের জনসংখ্যার ওপর শোষণ বৃদ্ধি করার মতো পুঁজিতান্ত্রিক উপকরণের অধিকারী হবে। সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তির কেউই কোনো তলোয়াল না ঘুরিয়েই, সমগ্র আধুনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সেই সংক্রান্ত অন্যসব কিছু গড়ে তুলতে পারবে।

দশম অধ্যায়. পৃ ১১৭-২৫

ড্যুরিঙ্গিয়ানা

সমতা—ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের অভিব্যক্তি হচ্ছে সমতা, পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধানের সূত্র—ঐতিহাসিকভাবে এই ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে। আদিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই ধারণাটির অস্তিত্ব ছিল না কিংবা থাকলেও খুব সীমাবদ্ধভাবে ছিল। প্রাচীনকালের গণতন্ত্রেও ব্যাপারটা ছিল তাই। গ্রীক, রোমান ও বর্বর জাতির লোকজন, স্বাধীন নাগরিক ও দাস, দেশের প্রজা ও বিদেশী, নাগরিক ও বিদেশী বাসিন্দা ইত্যাদি ব্যক্তিদের সমানাধিকারের ধারণা প্রাচীনকালের মানুষদের মনে শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীন বলেই মনে হতো না, অপরাধমূলক বলেও মনে হতো। খ্রিস্টীয় জগতে এর সূত্রপাত ঘটলে স্বভাবতই দমনপীড়ন চালানো হতো।

খ্রিস্টধর্মে পাপী হিসাবে সমস্ত মানুষের ঈশ্বরের কাছে প্রথম একটা নেতিবাচক সমতা দেখা দেয় এবং আরও সংকীর্ণ অর্থে খ্রিস্টের করুণা ও রক্তের বিনিময়ে দায়মুক্ত ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানের সমানাধিকারের ধারণা গড়ে ওঠে। দাস, নির্বাসিত, অধিকারবঞ্চিত, দণ্ডিত ও নিপীড়িত মানুষের ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টধর্মের ভূমিকার মধ্যে এই দুটো বক্তব্যই পাওয়া যায়। খ্রিস্টধর্মের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতি অন্তরালে চলে যায়, এবং মুখ্য গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে খ্রিস্টধর্মবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের মধ্যেকার, গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্ম-বিরোধীদের মধ্যেকার বিরোধ।

শহরের উদ্ভব ও তার ফলে কমবেশি উন্নত বুর্জোয়াদের এবং সেই সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব হওয়ার মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে সমানাধিকারের দাবি ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে, এবং রাজনৈতিক থেকে সামাজিক সমানাধিকারের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রলেতারিয়েতের দাবি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। স্বভাবতই এটা ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করে, প্রথম এর সুতীব্র প্রকাশ ঘটে কৃষক যুদ্ধের মধ্যে।

বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিটিকে মর্মভেদী ভাষায় প্রথম সূত্রায়িত করেন রুশো, অবশ্য তখনও তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির কথাই ছিল। বুর্জোয়াদের সমস্ত দাবির প্রেক্ষাপটে, প্রলেতারিয়েতের অনিবার্য অস্তিত্বের ছায়াটিও প্রতিভাত হয়, তারা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানতে থাকে (বেব্যুফ)।

(বুর্জোয়া সমতা এবং প্রলেতারিয়েতের স্বকীয় সিদ্ধান্তের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হবে।)

সুতরাং অতীতের প্রায় সমগ্র ইতিহাস জুড়েই সমতার অর্থাৎ ন্যায়বিচারের নীতিটি বিশদ রূপ পেয়েছে, কিন্তু এর সাফল্য অর্জিত হয়েছে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের উদ্ভবের পর। সমতার নীতিটির তাৎপর্য হচ্ছে যেকোনো রকম বিশেষ সুবিধার অনস্তিত্ব, তাই এটা মূলত নেতিবাচক। এই নীতি সমগ্র অতীত ইতিহাসকে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় বলে ঘোষণা করেছে। ইতিবাচক মর্মবস্তুর অভাবে এবং সমগ্র অতীতকে নির্বিচারে নাকচ করে দেওয়ায় এই নীতিটি একটা মহৎ বিপ্লবের ঘোষণার উপযোগী হয়েছে। কিন্তু সমতা = ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ নীতি ও চূড়ান্ত সত্য বলে উপস্থিত করাটা অবাস্তব ব্যাপার। সমতার অস্তিত্ব বৈষম্যের বিপরীতেই সম্ভব, ন্যায়বিচারের কথা ওঠে অন্যায়ের অস্তিত্ব থাকলে। সুতরাং এগুলি এখনও পুরানো, অতীত ইতিহাসের, আর সেই কারণে প্রাচীন সমাজের সঙ্গে রজ্জুতে বাঁধা।*

এটাই এগুলির চিরন্তন ন্যায়বিচার ও সত্য হয়ে ওঠার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। সাম্যবাদী সমাজ ও বর্ধিত সম্পদের পরিবেশে বিকাশমান সমাজের কয়েকটি প্রজন্ম মানবজাতিকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করবে, যেখানে সমতা ও অধিকার নিয়ে গর্বের বিষয়টি সেইরকম হাস্যকর হয়ে উঠবে, আজকের দিনে যেমন হাস্যকর অভিজাত ও উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের বিশেষ পদমর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, যেখানে পুরোনো বৈষম্য এবং পুরানো ইতিবাচক আইন, এমনকি নতুন, অন্তর্বর্তীকালীন আইনের বিরোধিতা বাস্তব জীবন থেকে একেবারে মিলিয়ে যাবে। যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যের সমান ও ন্যায্য ভাগবাটোয়ারার পণ্ডিতি দাবি বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। এমনকি ড্যুরিংও এটাকে তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। তখন এই সমতা ও ন্যায়বিচারকে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের যাদুঘর ছাড়া আর কোথায় স্থান দেওয়া যাবে?, আজকের দিনে প্রচারযোগ্য এইসব চমৎকার বিষয়বস্তু কালক্রমে চিরন্তন সত্যে পরিণত হবে না।

(সমতার বিষয়বস্তু আরও বিশদ করতে হবে।—অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি)।

---

* এখানে পাণ্ডুলিপির মার্জিনে এই কথাগুলি রয়েছে: 'সমতার ধারণার (উদ্ভব) ঘটেছে পণ্যোৎপাদনে সর্বজনীন মনুষ্য-শ্রমের সমতা থেকে। ক্যাপিটাল, পৃ ৩৬' ।—সম্পাদক।

উপরন্তু বিমূর্ত সমতার তত্ত্ব আজকের দিনেই একটা অবাস্তব ব্যাপার এবং ভবিষ্যতে বহুদিন পর্যন্তও এইরকম থাকবে। কোনো সমাজবাদী প্রলেতারীয় বা তাত্ত্বিক তাঁর নিজের ও একজন বুশম্যানের মধ্যে অথবা তিয়েরা দেল ফ্যুৎগানের মধ্যে কিংবা একজন কৃষক অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-মজুরের মধ্যে কখনও এই বিমূর্ত সমতা স্বীকার করবেন না ; এটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, তা যদি শুধু ইউরোপেও হয়, বিমূর্ত সমতার দৃষ্টিভঙ্গিকেও কাটিয়ে ওঠা যাবে। যুক্তিসঙ্গত সমতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের সমতা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। এখন যদি সমতা দাবি করা হয়, সেটা করা হচ্ছে বৌদ্ধিক ও নৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যার উদ্ভব ঘটে এর নিজের মধ্যে থেকেই। চিরন্তন নৈতিকতা যে কোনো সময়েই এবং যে কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব। কিন্তু সমতার ব্যাপারে এমনকি ড্যুরিংও এটা মনে করেন না ; বরঞ্চ তিনি একটা অস্থায়ী নিপীড়নের কালপর্ব স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁকে এটা মানতে হয় যে সমতা একটা চিরন্তন সত্য নয়, ইতিহাসের সৃষ্টি এবং একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত।

বুর্জোয়াদের সমতা (শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধার বিলোপ) প্রলেতারিয়েতের সমতা (খোদ শ্রেণীগুলির বিলোপ) থেকে একেবারেই ভিন্ন। এটাকে যদি বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সমতা অবাস্তবতায় পর্যবসিত হয়। আর তাই হের ড্যুরিং শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে সশস্ত্র বাহিনী ও সেই সঙ্গে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় ও পুলিসী শক্তি পুনঃপ্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।

সুতরাং সমতার ধারণাটি হচ্ছে ইতিহাসের সৃষ্টি এবং এটাকে বিশদ করার জন্যে সমগ্র পূর্বতন ইতিহাসকেই প্রয়োজন হয়। অতএব এটা সত্য হিসাবে অনন্তকাল ধরে টিকে নেই। এখন বেশির ভাগ মানুষ যে এটাকে নীতি হিসাবে নির্বিচারে মেনে নেয়, তার কারণ এই নয় যে এটা স্বতঃসিদ্ধ, অষ্টাদশ শতকের প্রচারিত ভাবধারাগুলির জন্যেই ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যদি দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি বর্তমানে সমতার নীতি সম্বন্ধে তাঁদের অবস্থান গ্রহণ করেন, তাহলে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে তাঁরা উনিশ শতকের 'বিরাট ব্যক্তিদের' দ্বারা প্রভাবিত এবং তাঁদের পক্ষে এটাই 'স্বাভাবিক'। বাস্তব মানুষেরা কি রকম আচরণ করেন এবং অতীতে করতেন, সেটা নির্ভর

করে ও সবসময়েই নির্ভর করত যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা বসবাস করতেন, তার ওপর।

নবম অধ্যায়, পৃ ১০৯-১২ ; দশম অধ্যায়, পৃ ১১৮-২৫

(সামাজিক সম্পর্কের ওপর ভাবধারার নির্ভরতা)

জনগণের ভাবধারা ও ধ্যানধারণা তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা সৃষ্টি করে, জীবনযাত্রার অবস্থা থেকে ভাবধারা ও ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয় না—এই মত সমগ্র অতীত ইতিহাসের বিরোধী ; ইতিহাসে দেখা যায় যা প্রত্যাশা করা হয়, ফলাফল অনবরতই হয় তার থেকে ভিন্ন এবং ঘটনা-প্রবাহে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীত। একমাত্র কমবেশি দূর-ভবিষ্যতে মানুষ যখন পরিবর্তনশীল অবস্থার বিচারে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আগে থেকেই উপলব্ধি করবে এবং পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতনতা কিংবা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই এটা তাদের ওপর চেপে বসার পূর্বেই পরিবর্তনের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠবে—একমাত্র তখনই এই মতটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

আইনের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য, সুতরাং রাজনীতির ব্যাপারেও এটা খাটে ('দর্শনে'র অধ্যায়ে এটা আলোচিত হবে, আর 'বল-প্রয়োগ' নির্ধারিত রইল অর্থনীতির জন্যে)।

একাদশ অধ্যায়, (তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়)

এমনকি প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণাও অত্যন্ত দুরূহ, সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফল। আদিম মানুষের কাছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ছিল এক ধরনের বিরোধী, রহস্যময় ও উন্নততর শক্তি। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে, সমস্ত সভ্য জাতিকেই যে পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, মানুষ সেগুলিকে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাদের ওপর নরত্ব আরোপ করে। নরত্ব আরোপ করার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সব দেশে দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি অনিবার্য অন্তর্বর্তী পর্যায় হিসাবে নরত্ব আরোপজনিত এই আকাঙ্ক্ষার সর্বজনীনতা ও তার ফলে ধর্মের সর্বজনীনতাও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে অভিন্ন মতামত গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির শক্তিগুলি সম্বন্ধে একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানই দেবতাদের বা ঈশ্বরকে একের পর এক সিংহাসন থেকে হটিয়ে দিয়েছে (সেক্‌চি ও তাঁর সৌরজগৎ)। এই ধারাটি এখন এতই এগিয়ে গিয়েছে, যাতে বলা যায় যে তত্ত্বগতভাবে এই প্রক্রিয়াটির নিষ্পত্তি ঘটেছে।

সমাজের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি আরও কঠিন। সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় আর্থনীতিক সম্পর্ক, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির দ্বারা, তা ছাড়াও নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বতন ইতিহাসের সৃষ্ট অবস্থার দ্বারা।

দ্বাদশ অধ্যায়, (তুলনীয় 'সাধারণ')

বৈপরীত্য—কোনো বস্তু বা বিষয় যদি তার বৈপরীত্যে আকীর্ণ থাকে, তাহলে সেটা তার নিজের সঙ্গেই বিরোধে জড়িত, সুতরাং চিন্তার মধ্যেও এটা প্রকাশ পাবে। যেমন, কোনো একটা জিনিসের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, সেটা বাহ্যত একই রকম থাকলেও অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে, কারণ তার মধ্যে রয়েছে 'জাড্য' ও 'পরিবর্তনের' বৈপরীত্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(নেতিকরণের নেতিকরণ)

·· সমস্ত ইন্দো-জার্মান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে এজমালি সম্পত্তির প্রচলন ছিল। সমাজ বিকাশের ধারায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সামন্ত সম্পত্তি প্রভৃতি নানা ধরনের মালিকানার চাপে প্রায় সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এর বিলোপ, নেতিকরণ ঘটে। সমাজ বিপ্লবের কাজ হচ্ছে এই নেতিকরণটির নেতিকরণ ঘটিয়ে এজমালি সম্পত্তিকে বিকাশের আরও উন্নত স্তরে পুনঃস্থাপন করা। কিংবা : প্রাচীন জগতের দর্শন আদিতে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ থেকেই উদ্ভব ঘটে ভাববাদের, অধ্যাত্মবাদের ; বস্তুবাদের নেতিকরণ হয় প্রথমে দেহ ও আত্মার বৈপরীত্যের আকারে, তারপর এটা রূপ নেয় অমরত্ব ও একেশ্বরবাদের মধ্যে। খ্রিস্টধর্মের মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই নেতিকরণের নেতিকরণ হচ্ছে পুরাতন বস্তুবাদের আরও উন্নত পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তুবাদ অতীতের তুলনায় তার তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের সন্ধান পায় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মধ্যে···

বলা বাহুল্য, এইসব প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে চিন্তাশীল মস্তিষ্কে এবং এর মধ্যেই সেগুলির প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়, ওপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যা দেখতে পাওয়া যায় $-ax-a$, ইত্যাদি ; ডায়ালেকটিকস-এর বড় বড় সমস্যা একমাত্র এই পদ্ধতিতেই সমাধান করা যায়।

কিন্তু আর একটা নিকৃষ্ট, নিষ্ফলা নেতিকরণও আছে।

প্রকৃত, স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক ও ডায়ালেকটিক নেতিকরণ (আনুষ্ঠানিক-

ভাবে ধরলে) হচ্ছে ঠিক তাই যা সমস্ত বিকাশের গতিশীল নিয়ম—বৈপরীত্যে' বিভক্ত হয়ে পড়া, তাদের সংগ্রাম ও সংগ্রামের নিষ্পত্তি। এই সঙ্গেই, অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পৃথক হয়ে যাওয়ার আদি পর্যায়ে পুনরায় পৌঁছাতে হয় (ইতিহাসে আংশিকভাবে, চিন্তায় সামগ্রিকভাবে), তবে আরও উচ্চতর পর্যায়ে।

নিষ্ফলা নেতিকরণ একেবারেই ব্যক্তিনিষ্ঠ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এটা বস্তুর প্রকৃতিগত বিকাশের কোনো পর্যায় নয়, বাইরে থেকে আমদানি করা একটা মত। আর যেহেতু এর থেকে কিছুই সৃষ্টি হয় না, তাই নেতিকার বা খণ্ডনকারী সারা দুনিয়া ও ইতিহাসের সমগ্র ধারার সঙ্গেই বিরোধে প্রবৃত্ত হন এবং যা কিছুর অস্তিত্ব আছে কিংবা যা কিছু ঘটেছে, খুঁতে খুঁতে মন নিয়ে তার সব কিছুর মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বেড়ান। এটা ঠিক যে প্রাচীন-কালের গ্রীকরা অনেকগুলি কাজ করেছিল কিন্তু তারা বর্ণালী বিশ্লেষণ, রসায়ন, অন্তরকলন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, চৌসেস, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম কিংবা রেলপথের কিছুই জানত না। এই ধরনের গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন মানুষদের সৃষ্টি নিয়ে এত বিস্তারিত চিন্তা-ভাবনা কেন? এই ধরনের খণ্ডনকারী যতক্ষণ নিরাশাবাদী, ততক্ষণ তাঁর কাছে সব কিছুই খারাপ—আমাদের মহান আত্মাকে বজায় রাখো, এটা বিশুদ্ধ এবং এইভাবে আমাদের নিরাশাবাদ আশাবাদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এবং এইভাবে আমরা নিজেরাই একটা নেতিকরণজনিত অপরাধ করে ফেলেছি।

এমনকি রুশোর ইতিহাস-বিচারের পদ্ধতিও—আদি সমতা, বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে তার অধঃপতন, উচ্চতর পর্যায়ে সমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।—নেতি-করণের নেতিকরণ*

ড্যুরিং অনবরত ভাববাদ—ভাষাগত ধারণা ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। আমরা যদি প্রচলিত সম্পর্কগুলি থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানি, ইতিহাসের ধারায় ক্রিয়াশীল নেতিবাচক উপাদানগুলির ইতিবাচক দিককে আমরা যদি অবলোকন ও অনুসন্ধান করি—যা এমনকি অত্যন্ত সংকীর্ণমনা প্রগতিশীল লাস্কার তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে করেছেন—ড্যুরিং একে বলেন 'ভাববাদ' এবং এর থেকেই অধিকার দাবি করেন ভবিষ্যতের

* এই মন্তব্যটি পাণ্ডুলিপির মার্জিনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সম্পাদক।

পরিকল্পনা রচনার, যা এমনকি স্কুলের পাঠক্রম রচনার কাজেও লাগবে। তবে এ একটা অবাস্তব পরিকল্পনা কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞতা। আর এটা তাঁর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে যে এটা করতে গিয়ে তিনিও নেতিকরণের নেতিকরণ ঘটাচ্ছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নেতিকরণের নেতিকরণ ও বিরোধ

হেগেল বলছেন: 'অস্তিত্বের 'নাস্তি' একটা সুনির্দিষ্ট নাস্তি।'[১৯৬] 'অবকলগুলিকে প্রকৃত শূন্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা পরস্পর-সম্পর্কিত, আলোচ্যমান প্রশ্নটির অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত।'[১৯৭] বোসাট বলছেন যে গাণিতিক দিক থেকে এটা নিরর্থক নয়;

$\frac{O}{O}$ ভগ্নাংশটি একটি সুনির্দিষ্ট মান প্রকাশ করতে পারে, যদি তাকে পাওয়া যায় লব ও হরের যুগপৎ অবলুপ্তির মাধ্যমে, যেমন, O:O=A:B সম্পর্কটি, যখন $\frac{O}{O}=\frac{A}{B}$, A অথবা B-এর মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। (পৃ ৯৫, উদাহরণ) এটা কি স্ব-বিরোধী নয় যে শূন্যগুলি অনুপাতে প্রকাশিত হচ্ছে, অর্থাৎ সাধারণভাবে কোনো মান গ্রহণ করতে পারে না তা নয়, এমনকি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় এমন বিভিন্ন মান গ্রহণে সমর্থ? যেমন, 1:2=1:2; 1-1:2-2=1:2; O:O=1:2.[১৯৮]

ড্যুরিং নিজেই বলেন যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যামানের সেইসব যোগফলগুলিই অঙ্কশাস্ত্রে সর্বোচ্চ (গরিষ্ঠ), ইত্যাদি, যা সহজ কথায়, সমাকলনের (integral calculus) বিবেচ্য বিষয়। কি ভাবে এটা হয়? আমার কাছে দুই, তিন বা ততোধিক চল রাশি (variable quantities) আছে, যেগুলি নিজেরা পরিবর্তিত হতে হতেও পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত—ধরা যাক, দুটি রাশি, x ও y, এবং আমাকে এমন একটি বিশেষ সমস্যা সমাধান করতে হবে, যা সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সম্ভব নয়, এবং যেখানে x এবং y দুটি অপেক্ষক (function)। আমি x এবং y-কে অবকলন (differentiate) করি অর্থাৎ x এবং y অপেক্ষক দুটিকে এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানে গ্রহণ করি যে, তা যে কোন বাস্তব রাশির তুলনায়, সে বাস্তব রাশি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে—অর্থাৎ x ও y-এর কোন

অবশেষই থাকে না। শুধুমাত্র 'ব্যতিহারী সম্পর্ক' (reciprocal relation) ছাড়া, আর কোন বাস্তব ভিত্তি ছাড়াই ; এর ফলশ্রুতি, $\frac{dx}{dy} = \frac{o}{o}$ । কিন্তু $\frac{o}{o}$ ভগ্নাংশটি $\frac{x}{y}$ এর অনুপাতে প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত রাশি দুটির অনুপাত, যে রাশি দুটি অন্তর্হিত হয়েছে, এবং অন্তর্হিত হওয়ার নির্দিষ্ট মুহূর্ত যে স্ব-বিরোধী সেটা আমাদের বিচলিত করে না। এখন x এবং y-এর অনস্তিত্ব প্রকাশ করা (negate) ছাড়া আর কি করেছি, যদিও এমনভাবে করা হয় নি যাতে উপরোক্ত রাশিগুলি সম্পর্কে আর কখনও মাথা ঘামাতে না হয় ; বরঞ্চ, এইভাবে করা হয়েছে যাতে প্রকৃত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আমার সামনে x এবং y রাশির পরিবর্তে, ফর্মুলাতে বা সমীকরণে আছে তাদের অনস্তিত্ব dx ও dy। আমি এখন সেই ফর্মুলা-গুলিকে নিয়ে কাজ করি, ধরে নিই যেন dx ও dy বাস্তব রাশি, এবং এক নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে সেই অনস্তিত্বকে (negation) অস্বীকার (negate) করি। অর্থাৎ অন্তরকলিত ফর্মুলাকে সমাকলিত (integrate) করি, এবং dx ও dy-এর পরিবর্তে বাস্তব রাশি দুটি x এবং y ব্যবহার করি। এই পদ্ধতিতে যদিও যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম সেখানে পৌঁছান যায় নি, কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগে এমন একটি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি, যা সাধারণ জ্যামিতি ও বীজগণিতের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাসপ্রথা যেখানেই উৎপাদনের প্রধান রূপ হয়ে উঠেছে, সেখানেই এটা শ্রমকে গোলামের বৃত্তিতে পরিণত করেছে, আর তার ফলে এটা দাঁড়িয়েছে স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে অসম্মানজনক কাজ। তাই এই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতি অবরুদ্ধ, অন্যদিকে দাসপ্রথা আরও উন্নততর উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধক, উন্নততর উৎপাদন এটাকে অপসারণের জন্যে জরুরী তাগিদ সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বের জন্যেই দাসপ্রথাভিত্তিক উৎপাদন ও এর ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠীর ধ্বংস অবধারিত হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর নিষ্পত্তি ঘটে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীগুলির জবরদস্তিমূলক পরাজয়ে

(ম্যাসিডোনিয়া ও পরবর্তীকালে রোমের দ্বারা গ্রীসের পরাজয়)। যতদিন পর্যন্ত দাসপ্রথা এদের ভিত্তি হিসাবে টিকে থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা-কেন্দ্রের অদলবদল হয় মাত্র এবং ঐ একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে উচ্চতর পর্যায়ে—যতদিন না অন্যজাতি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আর একটি উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে দাসপ্রথাকে হটিয়ে দেয়। কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘটাতে হয়, যার ফলে ধ্বংস হয়ে যায় পূর্বতন উৎপাদন পদ্ধতি এবং দখলদার ছোট চাষীরা বৃহদায়তন কৃষিকে হটিয়ে দেয়, আমেরিকাতে যা ঘটেছে। গ্রীসের ধ্বংসের কারণও এই দাসপ্রথা। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে দাসদের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ নাগরিকদের অধঃপতন ঘটায়, আর দাসপ্রথা যে নাগরিকদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব করে তোলে—সেটা এই প্রসঙ্গে না বললেও চলে। (প্রাচ্যে গৃহ-ভৃত্য রাখার ব্যাপারটা ভিন্ন ধরনের বিষয়। এখানে পরিবারের অঙ্গ হিসাবে দাসপ্রথা উৎপাদনের পরোক্ষ ভিত্তি, প্রত্যক্ষ নয় এবং এটা অদৃশ্যভাবে পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত হয় [হারেমের বাঁদীরা])।

তৃতীয় অধ্যায়

ড্যুরিং-এর নিকৃষ্ট ধরনের ইতিহাসে বলপ্রয়োগের প্রাধান্য। কিন্তু প্রকৃত, প্রগতিশীল ঐতিহাসিক আন্দোলনে প্রাধান্য পায় বৈষয়িক সাফল্য, যেটাকে রক্ষা করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বলপ্রয়োগের হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে কিভাবে প্রতিপালন করা হয়? অর্থের সাহায্যে, সুতরাং নির্ভর করতে হয় উৎপাদনের ওপর। তুলনীয়: অ্যাথেন্স-এর নৌবাহিনী ও রণনীতি। দীর্ঘমেয়াদি ও উদ্যমশীল যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে বৈষয়িক উপকরণের অভাবের ফলে মিত্রদের বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নতুন শিল্প, আধুনিক শিল্প থেকে অর্থ-সম্পদের যোগান পাওয়ায় ইংরেজরা নেপোলিয়নকে পরাজিত করতে পেরেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

(পার্টি ও সামরিক প্রশিক্ষণ)

বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই এবং সংগ্রাম ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে ড্যুরিং-এর বাগাড়ম্বরী ভাষণ বিবেচনা করতে গিয়ে এটা বলা প্রয়োজন যে বিপ্লবী পার্টিকে

জানতে হবে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়। সম্ভবত নিকট-ভবিষ্যতে এই পার্টিকে বিপ্লব করতে হবে, তবে সেটা বর্তমান সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। রাজনৈতিকভাবে সেটা হবে ডাইরেক্টরেট থেকে সরাসরি সাম্য-বাদে বেবুফ-এর ঝাঁপ দেওয়ার মতো পাগলামি ; এমনকি সেটা হবে আরও বেশি পাগলামি, কেননা ডাইরেক্টরেট ছিল আসলে বুর্জোয়া ও কৃষকদের সরকার[১৯৯] কিন্তু খোদ বুর্জোয়াদের জারি করা আইনগুলিকেই রক্ষা করার জন্যে সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পার্টিকে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতে পারে, যে-বুর্জোয়া রাষ্ট্র বর্তমান রাষ্ট্রকে বাতিল করে দেবে। সুতরাং সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনী গঠন আমাদের স্বার্থানুকূল এবং কী করে যুদ্ধ করতে হয়, সেটা শিক্ষার সুযোগ সবাইকেই, বিশেষ করে তাদের গ্রহণ করা উচিত, যারা শিক্ষাগত যোগ্যতায় এক বছরের জন্যে স্বেচ্ছামূলক সামরিক কাজে অফিসারের প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকারী।

চতুর্থ অধ্যায়

('বলপ্রয়োগ' প্রসঙ্গে)

এটা স্বীকৃত যে সমাজবদ্ধতায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন 'ক্রান্তিকালীন' যুগে বলপ্রয়োগ বৈপ্লবিক ভূমিকা নেয়, কিন্তু তখনও এটা ঘটে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার তাগিদে। ষোড়শ শতকের ইংল্যাণ্ডে অভ্যুত্থানের যে চিত্র মার্কস উপস্থিত করেছেন, তারও একটা বৈপ্লবিক দিক ছিল। সামন্ত ভূসম্পত্তির বুর্জোয়া ভূসম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের এটাই ছিল মৌলিক ভিত্তি। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবও অনুরূপভাবে বেশ খানিকটা বলপ্রয়োগ করেছিল ; ৪ঠা আগস্ট কৃষকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের দলিলটি অনুমোদন করেছিল মাত্র এবং এর সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায় ও চার্চের সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করেছিল।[২০০] প্রাচীন জার্মানদের দ্বারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিজয়, বিজিত অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলির প্রতিষ্ঠা, যেখানে শহর নয়, প্রাচীনকালের মতো গ্রামাঞ্চলেরই প্রাধান্য—আর এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল দাসপ্রথার অনুগ্র ভূমিদাসত্বে কিংবা সামন্ততান্ত্রিক অধীনতায় রূপান্তর (প্রাচীনকালে কর্ষিত জমির চারণভূমিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি ছিল বৃহৎ ভূস্বামীতন্ত্রের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য)।

চতুর্থ অধ্যায়

(বলপ্রয়োগ, গোষ্ঠী-সম্পত্তি, অর্থনীতি ও রাজনীতি)

'ইন্দো-জার্মানরা ইউরোপে এসে আদিম অধিবাসীদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে এবং গোষ্ঠীর মালিকানাধীন জমি চাষ করতে থাকে। কেল্ট, জার্মান ও স্লাভদের মধ্যে গোষ্ঠী-মালিকানার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় এবং স্লাভ, জার্মান আর কেল্টদের (রানডালে) মধ্যে এটা এখনও প্রত্যক্ষ (রুশ দেশে) বা পরোক্ষ (আয়ারল্যাণ্ডে) সামন্ত-বন্ধনের রূপে টিকে রয়েছে। ল্যাপ ও বাস্কদের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বলপ্রয়োগের অবসান ঘটে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে সমতা কিংবা অযাচিতভাবে সমর্পিত বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রাধান্য পায়। যেখানে এজমালি সম্পত্তির মধ্যে থেকে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হয়, সেখানে গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এই বিভাজন ঘটেছিল একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছিল ক্রমান্বয়িকভাবে এবং যৌথ মালিকানার অবশেষগুলির সঙ্গে এটার প্রায়শই বিরোধ বাধত। বলপ্রয়োগ করার কোনো ধারণা তখন ছিল না; এটা প্রধানত প্রযুক্ত হয়েছিল ঐসব অবশেষ-গুলির বিরুদ্ধে (আঠারো ও উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে, জার্মানিতে প্রধানত উনিশ শতকে)। আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নানা ধরনের বিজয় ও স্বৈরতন্ত্রের আওতায় ভারত ও রুশদেশে এই যৌথ মালিকানা বেশ নিরুপদ্রবেই টিকে ছিল, এবং এই মালিকানার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। উৎপাদন সম্পর্ক কিভাবে বলপ্রয়োগজাত সম্পর্ক গড়ে তোলে, রুশদেশ তার প্রমাণ। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত রুশ কৃষকদের নিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি বললেই চলে, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার তাদের ছিল এবং খতবন্দী দাসত্বও তাদের ভোগ করতে হয়নি। প্রথম রোমানভ কৃষকদের জমির সঙ্গে আবদ্ধ করেন। পিটারের সময়ে রুশদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন হয়, তখন একমাত্র কৃষিজাত দ্রব্যই রপ্তানি করা হতো। এর ফলেই কৃষকদের ওপর দমনপীড়ন শুরু হয়। যে রপ্তানির তাগিদে এটা প্রবর্তিত হয়, সেটা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দমনপীড়নও বাড়তে থাকে। ক্যাথারিনের হাতে এই দমনপীড়ন চূড়ান্ত রূপ পায় এবং তিনি এই সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পূর্ণ করেন। এই আইনের বলে ভূস্বামীরা

কৃষকদের ওপর আরও বেশি মাত্রায় উৎপীড়ন চালাতে থাকে, সুতরাং এই উৎপীড়নের বোঝা তাদের কাছে ক্রমশই অসহনীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্থ অধ্যায়

বলপ্রয়োগ যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণ হয়, তাহলে বলপ্রয়োগের কারণটি কী? অন্যদের শ্রমজাত দ্রব্য ও অন্যদের শ্রমশক্তি আত্মসাৎ করা। বলপ্রয়োগ দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল, খোদ উৎপাদন পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে পারে নি; যতদিন না উপযুক্ত ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং খতবন্দী শ্রম উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, ততদিন এটা খতবন্দী শ্রমকে মজুরি-শ্রমে রূপান্তরিত করতে পারে নি।

চতুর্থ অধ্যায়

এযাবৎকাল বলপ্রয়োগ—এখন থেকে সামাজিকভাবে 'ন্যায় বিচারের' দাবি নেহাৎই একটা সদিচ্ছা। ৩৫০ বছর আগেই টমাস মুর এই দাবি তুলেছিলেন,[২০১] কিন্তু আজও তা পূরণ হয়নি। এখন এটা পূরণ হবে কেন? এর জবাব পেতে গিয়ে ড্যুরিং হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে, আধুনিক শিল্প এই দাবি তুলেছে, ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, উৎপাদনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে, আর তার ফলে সব কিছু পাল্টায়।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

ফুরিয়ে ('নতুন শিল্পগত ও সামাজিক জগৎ'-গ্রন্থ থেকে)

অসাম্যের উপাদান: 'সহজাত সংস্কারের দিক থেকেই মানুষ সমতার শত্রু', পৃ ৫৯।

'সভ্যতা হচ্ছে লোক-ঠকানোর কৌশল', পৃষ্ঠা ৮১।

'তাদের (নারীদের) খ্যাতি-প্রশংসাহীন কর্মে, দর্শনে তাদের জন্যে যে ঝি চাকরানীর কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে (দর্শনের মতে নারীদের জন্ম হয়েছে শুধু বাসনপত্র ধোওয়ামোছা করা এবং পুরানো জামাকাপড় সেলাইয়ের জন্যে)

তাদের সেদিকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। আমরা সে কাজ কখনই করব না' ; পৃ ১৪১।

'ঈশ্বর উৎপাদনশীল শ্রমকে একটা আকর্ষণীয়তায় মণ্ডিত করেছেন, যার শুধু এক-চতুর্থাংশ সময়ই সামাজিক মানুষ তার কর্মে ব্যয় করতে পারে।' বাকি সময়টা নিয়োজিত হবে কৃষি, পশুপালন, রান্নাবান্না ও শিল্পবাহিনী ইত্যাদির জন্যে, পৃ ১৫২।

'বাণিজ্যের দয়ালু ও অকৃত্রিম বন্ধু সূক্ষ্ম নীতিবোধ', পৃ ১৬২ ও অন্যান্য পৃষ্ঠায়।

বর্তমান সমাজে, 'সভ্যতার যন্ত্রে', 'কাজকর্মে ছলচাতুরি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে বিরোধ' প্রধান হয়ে ওঠে ; এটা হচ্ছে 'বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনসমষ্টির মধ্যে একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। অথচ আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানগুলি কর্মের ঐক্য সম্পর্কে কথা বলতে সাহসী হয়', পৃ ১৭২।

'প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুশীলনের ক্ষেত্রে আধুনিকরা সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা ব্যতিক্রমের কিংবা উত্তরণের তত্ত্ব, বর্ণসংকরতার তত্ত্ব জানত না।' (বর্ণসংকরের উদাহরণ : কুইনস, মধু জাতীয় দ্রব্য, বান মাছ, বাদুড় ইত্যাদি), পৃ ১৯১।

দুই

('যে ইচ্ছামূলক কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়ে মানুষের নানা ধরনের সংঘ-সমিতি গড়ে ওঠে, সেগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী'—ড্যুরিং এর এই বক্তব্যের জবাবে এঙ্গেলসের মন্তব্য :)

সুতরাং ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো উল্লেখ এই প্রসঙ্গে নেই। নিছক, শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মই সব। সব কিছুই মনস্তত্ত্ব এবং দুঃখের বিষয় এটা রাজনীতি থেকেও অনেক বেশি 'পশ্চাৎপদ'।

'নিছক রাজনৈতিক চরিত্রের সামাজিক-আর্থনীতিক সাংবিধানিক রূপ' হিসাবে বলপ্রয়োগভিত্তিক দাসপ্রথা, শ্রম-দাসত্ব ও সম্পত্তি সম্বন্ধে ড্যুরিং-এর গবেষণা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছেন :

সব সময়েই এটা মনে করা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি শুধুমাত্র প্রকৃতির

শাশ্বত নিয়মগুলির চরিত্রসম্পন্ন এবং শয়তানী রাজনীতিই যাবতীয় রদবদল ও বিকৃতির কারণ।

বলপ্রয়োগের সমগ্র তত্ত্বটি এই দিক থেকে সঠিক যে এযাবৎকালের সমস্ত ধরনের সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্যে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে এবং এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কমবেশি পরিমাণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। এই বলপ্রয়োগের সংগঠিত কাঠামোটির নামই হচ্ছে রাষ্ট্র। সুতরাং এখানে আমরা এই মামুলি ধারণাটা পাচ্ছি যে মানুষের আদিমতম অবস্থা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, আর এটা জানার জন্যে জগৎকে ড্যুরিং-এর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় নি।

এযাবৎকাল যত রকমের সমাজ দেখা দিয়েছে তাদের সবগুলির মধ্যেই রাষ্ট্র ও বলপ্রয়োগ ছিল অভিন্ন উপাদান; আমি যদি প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র, প্রাচীনকালের প্রজাতন্ত্র, ম্যাসিডনের রাজতন্ত্র, রোমক সাম্রাজ্য এবং মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে এটাই বলি যে এগুলির ভিত্তি ছিল বলপ্রয়োগ, তাহলে কিছুই বলা হয় না। সুতরাং নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপের কারণ বলপ্রয়োগ, যা কিনা সব সময়েই ছিল,—বিষয়টিকে কিছুতেই এইভাবে ব্যাখ্যা না করে, এটা দেখতে হবে যে কোন্ কারণে কোন্ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে, বলপ্রয়োগ করে কোন্ জিনিসটি আত্মসাৎ করা হয়েছে—ব্যাখ্যা করতে হবে কোনো একটি যুগের উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির ভোগদখল এবং এগুলির বণ্টন কিভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তখন এটা প্রতীয়মান হবে যে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ছিল যৌথ মালিকানা, শহরে প্রাচীন প্রজাতন্ত্রগুলি নিযুক্ত ছিল কৃষিতে, রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল ভূস্বামীতন্ত্র এবং সামন্ত-তন্ত্রের বনিয়াদ ছিল শহরের ওপর গ্রামাঞ্চলের প্রাধান্যের মধ্যে, যার বাস্তব কারণও ছিল।

(ড্যুরিং-এর রচনা থেকে এঙ্গেলস নিম্নোক্ত অংশটি উদ্ধৃত করেছেন:

'রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির ওপর, বিশেষ করে বলপ্রয়োগভিত্তিক সম্পত্তি ও মজুরি-দাসত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পত্তির ওপর, যেসব প্রভাব পড়ে, সেগুলিকে মন থেকে মুছে ফেলে এবং শেষোক্তটিকে মানুষের বশ্য প্রকৃতির (!) অনিবার্য ফল হিসাবে সচেতনভাবে গণ্য না করে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম-সমূহকে অত্যন্ত সঠিকভাবে উদ্ঘাটন করা যায়··· ।'

ড্যুরিং-এর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে এঙ্গেলস নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন :)

তাহলে অর্থনীতির প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে একমাত্র তখনই আবিষ্কার করা যায়, যখন আবিষ্কারক তাঁর মনটিকে এ যাবৎকালের প্রচলিত সমস্ত আর্থব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন ; তা না হলে এগুলিকে কখনও অবিকৃতভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়।

মানুষের বশ্য প্রকৃতি—এপ্ থেকে গ্যোয়েটে !

মনে হয় ড্যুরিং 'বলপ্রয়োগ'এর এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই বলপ্রয়োগের শিকার হয়েছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা এই বলপ্রয়োগ করেছে। শুধু এর থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে বলপ্রয়োগ-সম্পর্কটি আর্থব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যে-ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উপায়ে পাল্টে দেওয়া সহজসাধ্য নয়।

ড্যুরিং-এর আলোচনায় খাজনা, মুনাফা, সুদ ও মজুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি ; নিছক এটাই বলা হয়েছে যে এগুলি বলপ্রয়োগের সৃষ্টি : কখন থেকে বলপ্রয়োগ হয়েছে ? এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। বলপ্রয়োগ থেকে সম্পত্তির মালিকানা এবং সম্পত্তির মালিকানা থেকে আর্থনীতিক ক্ষমতা। সুতরাং বলপ্রয়োগ = ক্ষমতা।

মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এ (সপ্তম অধ্যায়) দেখিয়েছেন যে সামাজিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পণ্যোৎপাদনের নিয়মানুযায়ী নানা প্রতারণার মধ্যে দিয়ে কিভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের অনিবার্য উদ্ভব ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে কোনোরকম বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি।[২০২]

ড্যুরিং যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইতিহাসের চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করাতে চান যে এ একটা নতুন আবিষ্কার, তখন তিনি পূর্বতন ঐতিহাসিকদের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন—যাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে সমাজের রূপগুলি একমাত্র রাজনৈতিক রূপের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, উৎপাদনের দ্বারা নয়।

বেশ ভালো ভালো কথা ! অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে অবাধ বাণিজ্যের সকল প্রবক্তা ও যাবতীয় প্রাক্-মার্কসীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আর্থনীতিক নিয়মসমূহকে যতটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সেই অনুযায়ী 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসাবে গণ্য করেছে এবং এটাই মনে করেছে যে রাষ্ট্রীয়

কার্যকলাপের ফলে, 'রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপের ফলে' আর্থনীতিক নিয়মগুলির বিকৃতি ঘটে!

এই সমগ্র তত্ত্বটাই নিছক ক্যারি-র সমাজবাদকে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস: অর্থনীতি প্রকৃতিগতভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, রাষ্ট্র নাক গলিয়েই সবকিছু পণ্ড করে দেয়।

চিরন্তন ন্যায়বিচার বলপ্রয়োগের পরিপূরক; ২৮২ পৃষ্ঠায় এটা আসবে।

(স্মিথ, রিকার্ডো ও ক্যারি-র সমালোচনা প্রসঙ্গে ড্যুরিং-এর মতামতকে এঙ্গেলস এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 'রবিনসনকে উদাহরণ হিসাবে ধরে উৎপাদনের বিমূর্ত রূপকে বেশ ভালোভাবেই অনুশীলন করা যেতে পারে; একটা দ্বীপে দুজন নিঃসঙ্গ মানুষকে নিয়ে এবং প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা আর পরিপূর্ণ বিরোধিতার মধ্যেকার যাবতীয় অন্তর্বর্তী স্তরকে কল্পনা করে বণ্টনের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে……'। ড্যুরিং-এর লেখা থেকে এঙ্গেলস এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন: 'বণ্টন-তত্ত্বের পক্ষে শেষ পর্যন্ত যা সত্যিসত্যিই চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা অর্জন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গভীর সামাজিক (!) অনুধ্যান (!)'। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মন্তব্য:)

সুতরাং প্রথমে বাস্তব ইতিহাস থেকে বিভিন্ন আইনী সম্পর্ককে আলাদা করে ফেলতে হবে এবং যে-ঐতিহাসিক বনিয়াদের ওপর তাদের উদ্ভব ও যার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলে তাদের তাৎপর্য বোধগম্য হয়, তার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে আর তারপর তাদের নিবদ্ধ করতে হবে রবিনসন ও ফ্রাইডে—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে, যেখানে স্বভাবতই তাদের প্রকাশ ঘটবে একেবারে খেয়ালখুশিমাফিক। তারা একেবারে বিশুদ্ধ বলপ্রয়োগের রূপ ধারণ করলে, তাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে বাস্তব ইতিহাসে এবং এইভাবে প্রমাণিত হবে যে এখানেও সবকিছুই নিছক বলপ্রয়োগভিত্তিক। এই বলকে বস্তুগত ভিত্তির ওপর প্রয়োগ করতে হবে; যেখান থেকে এর উদ্ভব ঘটেছিল সেটা প্রমাণ করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

(ড্যুরিং-এর 'কোর্স' অফ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোস্যাল ইকোনমি' বইটি থেকে এঙ্গেলস এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন: 'গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমস্ত পদ্ধতিই বণ্টনকে এমন এক অস্থায়ী প্রক্রিয়া বলে মনে করে, যা বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাকে

যৌথ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হয় ; ···বরঞ্চ যে-বন্টন আর্থনীতিক কিংবা আর্থনীতিকভাবে ক্রিয়াশীল নিয়মগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, শুধুমাত্র এইসব নিয়মের অস্থায়ী ও পুঞ্জীভূত ফলাফলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, সেই বন্টনের আরও গভীরতর ভিত্তি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।' এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মন্তব্য :)

প্রচলিত উৎপাদনের বন্টন-পদ্ধতি অনুসন্ধান করাই যথেষ্ট নয়।

ভূসম্পত্তি ভূমি-খাজনার পূর্ববর্তী, মুনাফার আগে ছিল পুঁজি, প্রথমে সম্পত্তিহীন মজুর, শ্রম-শক্তির অধিকারী মজুর—তার পর মজুরি। সুতরাং কোথা থেকে এদের উদ্ভব ঘটল—সেটাই খোঁজ করা দরকার। মার্কস যতটা পেরেছেন, তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডে পুঁজি ও সম্পত্তিহীন শ্রম-শক্তির অধিকারীদের সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছেন ; আধুনিক ভূ-সম্পত্তির উদ্ভব সংক্রান্ত গবেষণা ভূমি-খাজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর সেই কারণে এটা তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[২০৩] ড্যুরিং-এর গবেষণা ও ঐতিহাসিক ভিত্তিটি শুধুমাত্র 'বলপ্রয়োগ' শব্দটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত ড্যুরিং-এর ব্যাখ্যাটি পাওয়া যাবে 'সম্পদ ও মূল্যে'র অধ্যায়ে।

সুতরাং বলপ্রয়োগই একটা যুগের জনগণের আর্থনীতিক, রাজনীতিক জীবনের অবস্থা সৃষ্টি করে। কিন্তু বলপ্রয়োগকে সৃষ্টি করে কে? মুখ্যত সেনাবাহিনী হচ্ছে বলপ্রয়োগের সংগঠিত শক্তি। সেনাবাহিনীর গঠন, সংগঠন, অস্ত্রশস্ত্র, রণনীতি ও রণকৌশল সবচেয়ে বেশি নিভরশীল আর্থ-নীতিক অবস্থার ওপর। অস্ত্রশস্ত্রই হচ্ছে ভিত্তি কিন্তু এটা আবার উৎপাদনের স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। আগেকার পাথর, লোহা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র, বর্ম, ঘোড়সওয়ার বাহিনী ও বারুদের জায়গায় এখনকার রাইফেল বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর মাধ্যমে আধুনিক শিল্প যুদ্ধবিদ্যায় প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটিয়েছে ; একমাত্র আধুনিক শিল্পই তার উৎপাদনশীল যন্ত্রের তালে তালে ঐ ধরনের বস্তুসামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম। সেনাবাহিনীর গঠন ও সংগঠন, রণনীতি ও রণকৌশল আবার যুদ্ধোপকরণের ওপর নির্ভরশীল। রণকৌশল যোগাযোগ ব্যবস্থা—সৈন্য চলাচল ব্যবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত রেলপথের ওপরও নির্ভর করে। সুতরাং প্রচলিত উৎপাদনের অবস্থার চাইতে অন্য কোনো

উপাদান বলপ্রয়োগকে এত বেশি প্রভাবিত করে না, যা ক্যাপ্টেন ইহান্‌সও উপলব্ধি করেছেন। (কে. জেড.—ম্যাকিয়াভেলি ইত্যাদি)।*

রাইফেল ও বেয়নেট থেকে ব্রিচ-লোডার পর্যন্ত যুদ্ধ-বিদ্যার আধুনিক পদ্ধতির উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হবে। যেখানে তরোয়ার-হাতে যোদ্ধার বদলে অস্ত্রই নিয়ামক শক্তি; সৈন্যদের সারি যেখানে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, সেখানে দাঁড় করাতে হয় রাইফেলধারী সৈন্যদের (জেনার বিপরীত ওয়েলিংটন) এবং শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের ছড়িয়ে পড়াটা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়, ধীরগতি কুচকাওয়াজ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

(ড্যুরিং-এর মতে 'দক্ষ হাত ও বুদ্ধিমান মাথাকেই সমাজের মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে, সমাজের মালিকানাধীন উৎপন্ন দ্রব্যের যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু যন্ত্র মূল্য সংযোজিত করে না, অথচ দক্ষ হাত তা করে।' এই বিষয়ে এঙ্গেলসের মন্তব্য:)

সুতরাং মূল্যের আর্থনীতিক নিয়মটি নিষিদ্ধ হলেও কার্যকর থাকবে।

('সমগ্র সামাজিকতার রাজনৈতিক-আইনগত ভিত্তি' সম্বন্ধে ড্যুরিং-এর ধারণা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন:)

সুতরাং ভাববাদী মাপকাঠিটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রযুক্ত হয়েছে। উৎপাদন নয়, আইনই হচ্ছে আসল।

(ড্যুরিং-এর 'কমিউন' এবং শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা, বন্টন, বিনিময় ও কমিউনের মধ্যেকার মুদ্রা ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঙ্গেলসের মন্তব্য:)

অতএব প্রত্যেকটি শ্রমিককে মজুরিও দেবে সমাজ।

এই সঙ্গে মজুতদারি, মহাজনী ঋণ এবং মুদ্রা সংকট ও মুদ্রার অভাব সমেত যাবতীয় ফলাফলও থাকবে। মুদ্রা যেভাবে বর্তমানে রুশ দেশের কমিউনকে, ও সেই সঙ্গে পারিবারিক কমিউনকেও, ভেঙে ফেলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ড্যুরিং-এর আর্থনীতিক কমিউনও অনিবার্যভাবে সেই রকম ভাঙনের মধ্যে পড়বে। কমিউনের বিভিন্ন সদস্য মুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিনিময় শুরু করলেই এটা ঘটবে।

---

* এঙ্গেলস এখানে 'কোলোনিশে সাইতুং' (কোলোন গেজেট) পত্রিকায় ১৮৭৬, ১৮, ২০, ২২ ও ২৫ এপ্রিলে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন। বার্লিনের বিজ্ঞান সমিতির সভায় ইহান্‌স 'ম্যাকিয়াভেলি এবং সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।
—সম্পাদক।

(ড্যুরিং-এর লেখা থেকে নিম্নোক্ত বাক্যটি উদ্ধৃত করে এঙ্গেলস বন্ধনীর মধ্যে নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন : 'সুতরাং যেকোনো ধরনের বাস্তব কর্মই হচ্ছে প্রকৃতির সামাজিক নিয়ম; যা সুস্থ সংগঠনগুলির নিয়ন্ত্রক [এর থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে আগেকার সমস্ত কর্মই ছিল অস্বাস্থ্যকর]' এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মন্তব্য :)

এখানে শ্রমকে আর্থনীতিক কিংবা বৈষয়িকভাবে উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে ধারণা করা হয়েছে, যেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হয় না, এবং এটা সমগ্র অতীত ইতিহাসের বিরোধী। কিংবা শ্রমকে ধারণা করা হয়েছে আরও সাধারণ রূপে, যাতে একটা সময়ে অপরিহার্য অথবা প্রয়োজনীয় সবরকম কাজকে, যেমন শাসন, বিচারব্যবস্থা পরিচালনা ও সামরিক তৎপরতা, এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এইসব কাজের ওপর অতিরিক্ত প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এই পচা আবর্জনাকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসাবে হাজির করে সোস্যালিস্টদের প্রভাবিত করার চেষ্টা একটা নির্লজ্জ বেহায়াপনা।

(সম্পদ ও লুণ্ঠন সম্বন্ধে ড্যুরিং-এর আলোচনার প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মন্তব্য :)

এখানে আমরা তাঁর পুরো পদ্ধতিটাই পেয়ে যাচ্ছি। প্রথমে উৎপাদন সম্পর্ককে ধারণা করা হয় উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে—ঐতিহাসিক নির্ধারক উপাদানকে বাদ দিয়ে। সুতরাং একেবারে সাধারণ বিষয়গুলিই বলা যায় ; আর হের ড্যুরিং যদি তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে চান, তাহলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট যুগটির নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সম্পর্কগুলিকে অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে, অর্থাৎ বিমূর্ত উৎপাদনকে উল্টেপাল্টে দিতে হবে এবং একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। তখন ঐ একই আর্থনীতিক সম্পর্ককে ধারণা করা যাবে। বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ সেই চলমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকে এতদিন বলপ্রয়োগ শব্দটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার যার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করা হয় বলপ্রয়োগের অশুভ ফলাফলের উল্লেখ করে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আলোচনার সময় আমরা দেখবো এটা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।

(বৃহদায়তন সংস্থার পরিচালনা থেকে দাসপ্রথা কিংবা সামন্ত সমাজের নির্ভরতা দেখা দেয়—ড্যুরিং-এর এই বক্তব্য সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন :)

সুতরাং, প্রথমত, বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তি থেকেই বিশ্ব-ইতিহাসের সূচনা!

বৃহদাকার ভূমিখণ্ডের চাষকে বৃহৎ ভূস্বামীদের চাষের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে! বৃহৎ ভূস্বামীরা ইতালির জমিকে পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত করার আগে সেটা অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল! 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল প্রসারের জন্যে ক্রীতদাস, ভূমিদাস ইত্যাদির কাছে ঋণী, স্বাধীন কৃষকদের কাছে নয়!

আবার একটা স্থূল কৌতুক: 'বড় মাপের জমিতে চাষ', সেটা পরিষ্কার করার শামিল কিন্তু এটাকে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাখ্যা করা হয় বৃহদাকার চাষ হিসাবে, এটা বিবেচিত হয় বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তির সমান বলে! এই অর্থে এ একটা বিরাট নতুন আবিষ্কারই বটে: কেউ যদি এতটা জমির মালিক হয় যা সে নিজে ও তার পরিবারের লোকজন মিলে চাষ করতে অপারগ, তাহলে অন্যদের শ্রমকে কাজে না লাগিয়ে এই জমি সে চাষ করতে পারবে না, উপরন্তু, ভূমিদাসদের সাহায্যে চাষ বেশি জমি চাষ নয়, অল্প জমি চাষ এবং কৃষি সবসময়েই ভূমিদাসপ্রথার পূর্ববর্তী (রুশী, ফ্লেমিশ, ওলন্দাজ এবং শ্লাভিক মার্ক-এর ফ্রিশিয় উপনিবেশগুলি), আগেকার স্বাধীন কৃষককে ভূমিদাসে পরিণত করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে এটা বিভিন্ন জায়গায় স্বেচ্ছা-মূলকভাবে ঘটে।

(মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের মাত্রার দ্বারা এবং এর জন্যে 'কমবেশি আর্থনীতিক শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন হয়' (!)—ড্যুরিং-এর এই বক্তব্যের জবাবে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন:)

প্রতিরোধকে পরাজিত করা—গাণিতিক বলবিদ্যা থেকে ধার করা শব্দ, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে একেবারেই অচল। 'আমি যথাক্রমে সুতো কাটি, কাপড় বুনি, কাপড় সাদা করি এবং কাপড় ছাপাই'-এর বদলে এখন এটাই বলতে হবে: 'সুতো কাটার জন্যে তুলোর, বোনার জন্যে সুতোর এবং সাদা করা ও ছাপাইয়ের জন্যে কাপড়ের প্রতিরোধকে আমায় পরাজিত করতে হবে।' 'আমি বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করছি' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'লোহার বাষ্পীয় ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রতিরোধকে আমি পরাজিত করছি।' বিষয়টিকে আমি বাগাড়ম্বর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছি, যাতে বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু এইভাবে আমি বণ্টন-মূল্যের বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি, সম্ভবত সেখানেও একটা প্রতিরোধকে পরাজিত করতে হবে। সেই কারণেই!

(ড্যুরিং বলছেন 'বন্টন-মূল্য একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ও একান্তরূপে দেখা দেয়, যেখানে অনুৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষমতা, কিংবা' (!) 'সাধারণের ভাষায় বলতে গেলে, যেখানে এইসব (অনুৎপাদিত !) দ্রব্য সার্ভিস অথবা প্রকৃত উৎপাদন-মূল্যের দ্রব্যগুলির সঙ্গে বিনিময় করা যায়।' এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন :)

অনুৎপাদিত দ্রব্য বস্তুটি কী ? আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ ? কিংবা এমন দ্রব্য বোঝানো হয়েছে যা উৎপাদক নিজে উৎপাদন করেনি ? কিন্তু সেক্ষেত্রে 'প্রকৃত উৎপাদন-মূল্য' স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। নিম্নোক্ত বাক্যটি থেকে দেখা যায় আমরা আবার একটা স্থূল কৌতুকের মধ্যে পড়েছি। অনুৎপাদিত প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে একত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'মূল্যের নানা অংশের সঙ্গে, যেগুলিকে কোনোরকম প্রতিদান ছাড়াই আত্মসাৎ করা হয়।'

(মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সেটা 'প্রকৃতিতে বাহ্য শক্তিসমূহের খেলার মতো নয়', সেগুলি আদৌ 'তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কার্যত অপরিবর্তনীয়' নয়—ড্যুরিং-এর এই বক্তব্যকে সমালোচনা করে এঙ্গেলস বলেছেন :)

ফলত এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সেইভাবেই থাকবে।

অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত যাবতীয় উৎপাদনের আর্থনীতিক নিয়মগুলি মানুষের সামনে বস্তুগত নিয়ম হিসাবে উপস্থিত হয়, যার বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষমতাহীন, সুতরাং এগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের আকারে দেখা দেয়—এই সম্বন্ধে একটা কথাও নেই।

('যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মৌল নিয়ম'কে ড্যুরিং এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন : 'আর্থনীতিক উপকরণের—প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুষ্য-শক্তি—উৎপাদনশীলতা উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং বন্টনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এটা ঘটে থাকে, তা সত্ত্বেও এটা বেশ খানিকটা পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে বা পরিবর্তনের কারণস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রধান ফলাফলের প্রভাবটি (!) নির্ধারণ করে না।' এঙ্গেলসের মন্তব্য :)

'এটা ঘটে থাকে'—বাক্যের এই অংশটুকুর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির নিয়ম

সম্বন্ধে নতুন কোনো কথা নেই, নিয়মটি যদি সত্য হয়, তাহলে বন্টন এর কোনো কিছুই পাল্টাতে পারে না এবং এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সবরকম বন্টনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য, অন্যথায় এটাকে আর নিয়ম বলা চলবে না। নিছক এই কারণেই এটা বলা হচ্ছে যে এই শূন্যগর্ভ অর্থহীন নিয়মটিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে হাজির করতে ড্যুরিংও লজ্জা বোধ করেছেন। তাছাড়া এটা স্ব-বিরোধী, কেননা বন্টন বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, আবার বলা হচ্ছে এটা 'সম্পর্কহীনভাবে' ঘটবে তাও বলা যায় না। সুতরাং আমরা বাক্যের শেষ অংশটুকু বাদ দিলে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মৌল নিয়মটিকে বিশুদ্ধ রূপে পেয়ে যাই।

কিন্তু এটাও যথেষ্ট অগভীর নয়।

(ড্যুরিং-এর 'কার্সাস ডের ন্যাশানাল-উণ্ড সোসিওলোকোনমি' থেকে এঙ্গেলস আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন)

(ড্যুরিং বলেছেন যে উৎপাদনের সমগ্র উপকরণের ওপর আর্থনীতিক অগ্রগতি নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে 'জ্ঞান এবং কার্যপ্রণালীর সাধারণ কারিগরি পদ্ধতিগুলির ওপর' এবং ড্যুরিং-এর মতে এটা 'পুঁজিকে তার স্বাভাবিক অর্থে, উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়।' এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলছেন:)

নীল নদের ধারে পড়ে-থাকা খিদিভদের২০৪ বাষ্পীয় লাঙল এবং চালা ঘরে অকেজো হয়ে-থাকা রুশ অভিজাতদের ফসল মাড়াইয়ের মেসিন ইত্যাদি এর প্রমাণ। বাষ্প ইত্যাদির জন্যেও একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রয়োজন হয়, এগুলি তৈরি করা সহজ হলেও কাজে লাগানো সহজ নয়। কিন্তু ড্যুরিং এতই গর্বিত যে তিনি এই তত্ত্বটিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে চান। অর্থনীতি-বিদরা এখনও মনে করেন যে এই নিয়মটির মধ্যে অনেকখানি সারবস্তু রয়েছে। ড্যুরিং এটাকে মামুলি বিষয়ে পরিণত করেছেন।

('শ্রম-বিভাগের স্বাভাবিক নিয়ম' সংক্রান্ত ড্যুরিং-এর সূত্রটিতে বলা হয়েছে: 'ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বিভাজন ঘটা এবং কর্মতৎপরতার ভাগাভাগি শ্রমোৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করে।' এই সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন:)

এই ব্যাখ্যাটি ভুল, কেননা এটা একমাত্র বুর্জোয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রেই খাটে

এবং কর্মতৎপরতার ভাগাভাগি এখানেও ইতিমধ্যেই উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে, কারণ এটা ব্যক্তিকে পঙ্গু করে ফেলছে এবং এক ধরনের কাজের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। ভবিষ্যতে এর বিলোপ ঘটতে বাধ্য। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে বর্তমানের কর্ম-বিভাগটি ড্যুরিং-এর মনে স্থায়ীভাবে চেপে বসেছে।

বস্তুগত কারণ থেকে উদ্ভূত পদাতিক বাহিনীর রণকৌশল[২০৫]

১৭০০–১৮৭০

চতুর্দশ শতকের পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে বারুদ ও বন্দুক জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ঘটে, এবং যেকোনো স্কুলের ছাত্রেরও এটা জানা আছে যে এই নিছক কারিগরি অগ্রগতিটি যুদ্ধবিদ্যায় বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। তবে এই বিপ্লবের পূর্ববর্তী ধারাটির অগ্রগতি ঘটে ধীর গতিতে। প্রথম আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিশেষ করে আরক্যুইবাস (সেকেলে বন্দুক) ছিল অত্যন্ত স্থূল ধরনের। যদিও বহুদিন আগেই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক উদ্ভাবনা ঘটেছিল, যেমন রাইফেল ব্যারেল, ব্রিচ-লোডার, হুইল-লক ইত্যাদি, তবুও তিনশো বছর ধরে—সপ্তদশ শতকের শেষে সমগ্র পদাতিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলার মতো গাদাবন্দুক তৈরি করা সম্ভব হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পদাতিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল অংশত বর্শাচালক ও সেকেলে ধরনের বন্দুকধারীদের নিয়ে। প্রথমে বর্শাচালকরা শত্রুকে আঘাত করে লড়াইয়ের সূচনা করত, অন্যদিকে বন্দুকধারীর নিক্ষিপ্ত গুলি প্রতিরক্ষার সহায়ক হতো। বর্শাচালকরা ঘনসন্নিবদ্ধভাবে অনেকগুলি সারিতে বিভক্ত হয়ে প্রাচীন গ্রীকদের মতো কলাম রচনা করে যুদ্ধ করত: বন্দুকধারীরা লড়ত আট থেকে দশটি সারিবদ্ধ বাহিনী একত্রিত হয়ে—যাতে একজন গুলি ভরবার আগেই অন্যেরা পরপর গুলি ছুঁড়তে পারে। যারই বন্দুকে গুলি ভরা হয়ে যেতো, সেই লাফিয়ে সামনে চলে আসত, গুলি ছুঁড়ত এবং আবার গুলি ভরবার জন্যে একেবারে পিছনের সারিতে চলে যেতো।

আগ্নেয়াস্ত্র ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠতে থাকায় এই পদ্ধতি পাল্টে যায়। বন্দুকে গুলি ভরার কাজ এত দ্রুত সম্পন্ন হতে থাকে যে একটানা গুলিবর্ষণের জন্যে মাত্র পাঁচ জন সৈন্যের অর্থাৎ পাঁচটি সমসংখ্যক বন্দুকধারী, তাদের চাইতে

দ্বিগুণ দীর্ঘ বাহিনীকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। অনেকগুলি সারিতে বিভক্ত বাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ আগের চাইতে বিধ্বংসী রূপ নেয়; এই অবস্থায় বর্শাচালকদেরও মাত্র ছয়থেকে আটটি বাহিনী প্রয়োজনে লাগে, যাতে রণক্ষেত্র সাজানোর ব্যাপারটি ক্রমশ সারিবদ্ধ কলাম রচনায় পর্যবসিত হয়, যেখানে গুলিবর্ষণই নির্ধারক উপাদান হয়ে ওঠে এবং বর্শাচালকদের আর প্রাথমিক আক্রমণের কাজে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, তাদের ব্যবহার করা হয় অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে বর্শা ছোঁড়ার কাজে ওঁতপেতে থাকার জন্যে। এই সময়ের শেষভাগে রণক্ষেত্রটি সাজানো হতে থাকে দুটি যোদ্ধবাহিনী ও একটি সংরক্ষিত বাহিনীকে নিয়ে, প্রতিটি বাহিনীকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৬টি সারিতে দাঁড় করানো হয়, বন্দুকধারী ও অশ্বারোহীরা থাকে অংশত বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে, অংশত ব্যাটেলিয়ানের পার্শ্বভাগে; প্রতিটি পদাতিক বাহিনী গঠিত হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ বর্শাধারী ও অন্তুতপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ বন্দুকধারীদের নিয়ে।

সপ্তদশ শতকের শেষে বেয়নেট ও রেডিমেড গুলিসমেত গাদাবন্দুক তৈরি করা সম্ভব হয়। এরপর পদাতিকবাহিনী থেকে বর্শাধারী সৈন্যদের চিরদিনের মতো বিদায় নিতে হয়। গুলি ভরতে ক্রমশই কম সময় লাগতে থাকে, দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারাটাই আত্মরক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনের সময় বর্শা ব্যবহারের স্থান নেয় বেয়নেট। তার ফলে সারিবদ্ধ লাইনের সংখ্যা প্রথমে ছয় থেকে চার, পরে তিন এবং শেষ পর্যন্ত দুইয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। সুতরাং একই সংখ্যক সৈন্য নিয়ে লাইনের দৈর্ঘ্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এমনকি একই সময়ে বৃদ্ধি পায় বন্দুকধারীর সংখ্যা। কিন্তু এইসব দীর্ঘ, সরু লাইন পরিচালনা করা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ে এবং এদের গতি-বিধি সম্ভব হয় শুধুমাত্র সমতল, মসৃণ ভূমিতে, আর তাও খুব ধীরে ধীরে, মিনিটে ৭০-৭৫টি পদক্ষেপে; আর ঠিক এই সমতলভূমিতেই সেনাবাহিনীর একটি সারিতে, বিশেষ করে তার পার্শ্বভাগে শত্রুর পদাতিক বাহিনী সফল আক্রমণের সুযোগ পেতো। খানিকটা পার্শ্বভাগ রক্ষার জন্যে এবং খানিকটা লড়াইকারী অংশকে শক্তিশালী করার জন্যে পদাতিক বাহিনীকে দুই পাশে জমায়েত রাখা হতো, যাতে লড়াইয়ের আসল অংশটা ভর্তি থাকত শুধুমাত্র পদাতিক সৈন্য ও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীতে। ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক বড় বড় কামান বসানো হতো বাহিনীর পার্শ্বভাগে এবং যুদ্ধ

চলার সময়ে একবারই মাত্র সেগুলির অবস্থান পরিবর্তন করা যেতো। পদাতিক সৈন্যদের দুটো ভাগে ভাগ করে তাদের প্রতিরক্ষার জন্যে পদাতিক বাহিনীকে কোনাকুনিভাবে দাঁড় করানো হতো—সমগ্র বিন্যাসটির চেহারা হতো একটি সুদীর্ঘ ফাঁকা আয়তক্ষেত্রের মতো। এই কিম্ভূতকিমাকার বাহিনীর সবটাকে যখন চালনা করার প্রয়োজন হতো না, তখন এটাকে ভাগ করা হতো তিনটি অংশে—মধ্য অংশে ও দুটি পার্শ্বভাগে। এই ভাগাভাগি করার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর পাশ কাটিয়ে তাকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে একটি পার্শ্বকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—পার্শ্বভাগের সৈন্যসংখ্যা শত্রুর সৈন্য সংখ্যার তুলনায় বেশি থাকত, আর অপর পার্শ্বকে মজুত রাখা হতো শত্রুপক্ষ যাতে তার সম্মুখভাগকে পুনর্বিন্যস্ত না করতে পারে, সেই কাজে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে। যুদ্ধের মধ্যে সেনাবাহিনীর অবস্থান পুরোপুরিভাবে পাল্টাতে গিয়ে এত বেশি সময় লাগত এবং শত্রুর সামনে এত বেশিসংখ্যক দুর্বল-ক্ষেত্র প্রকট হয়ে পড়ত যে প্রায় সব সময়েই এর পরিণতি ঘটত পরাজয়ে। সুতরাং একেবারে প্রথমে যেভাবে সৈন্য সাজানো হতো, সমগ্র যুদ্ধকালে সেটাই বহাল থাকত, এবং পদাতিক সৈন্যরা লড়াইয়ে যোগ দিলেই সেদিনের মতো কপালে জুটত শোচনীয় পরাজয়। যুদ্ধবিদ্যার সমগ্র পদ্ধতিটিকে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক যে চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলেছিলেন—সেটা একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল দুটি বস্তুগত উপাদানের অনিবার্য পরিণতি: প্রথমত, তৎকালীন মনুষ্য-উপাদান, রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সেনাবাহিনী, কঠোর শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত কিন্তু মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, একমাত্র শাসনদণ্ডেই তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়, অনেকেই বিদ্রোহী যুদ্ধ-বন্দী, যাদের জবরদস্তি করে যুদ্ধে নামানো হয়েছে; আর দ্বিতীয়ত, অস্ত্রশস্ত্র—কিম্ভূতকিমাকার ভারি ভারি কামান এবং বেয়নেট-বসানো গাদা-বন্দুক, যার গুলি ভরার নল মসৃণ হলেও গুলি বেরোবার নলটি নিকৃষ্ট ধরনের।

উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী যতদিন লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে একই স্তরে ছিল, ততদিন পর্যন্ত লড়াইয়ের এই কৌশলই বজায় থেকেছে এবং যুদ্ধের নির্ধারিত রীতিনীতির সঙ্গেও এটা ছিল মানানসই। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কুচকাওয়াজে পোক্ত ভাড়াটে সেনাবাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাট এক বিদ্রোহী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এরা যুদ্ধের রীতিনীতি না জানলেও চমৎকারভাবে রাইফেল চালাতে জানত এবং লড়ে যেত তাদের আদর্শের জন্যে;

সুতরাং পালিয়ে যেত না। বিদ্রোহীরা ইংরেজ-বাহিনীকে এমন সুযোগ দিত না, যাতে তারা সামরিক রীতিনীতির প্রচলিত নিয়ম-কানুন মাফিক ফাঁকা সমতলভূমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। তারা বিরোধী পক্ষকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেত, যেখানে দীর্ঘ সারিবদ্ধ বাহিনী আত্মরক্ষার সুযোগ পেত না। বিক্ষিপ্ত, অদৃশ্য আক্রমণ-কারীদের গুলির মুখে পড়ত। ঢিলেঢালাভাবে লড়তে গিয়ে তারা শত্রুকে হয়রানি করার জন্যে এই রকম যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি আড়াল-আবডালের সুযোগ গ্রহণ করত, আর সেই সঙ্গে বজায় রাখতে পারত তাদের ক্ষিপ্রগতি, যা শত্রু-পক্ষের কিম্ভূতকিমাকার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে আদৌ বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুবহ আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধে গোলাগুলি বর্ষণের পদ্ধতি এক্ষেত্রে, লম্বা লাইনে সাজানো বাহিনীর তুলনায়, উন্নততর বলে প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে ছোট ছোট বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে তো বটেই।

যে সৈন্যদের নিয়ে ইউরোপে ভাড়াটে বাহিনী গড়ে তোলা হয়, ঢিলে-ঢালাভাবে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা ছিল অনুপযোগী ; তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল সেই রকম। এটা ঠিক যে সেকেলে গাদা বন্দুকের মতো এই গাদা বন্দুককে তখন আর বুকে লাগিয়ে গুলি বর্ষণ করতে হতো না, এখনকার মতো কাঁধের ওপর রেখেই বন্দুক চালানো যেত। কিন্তু তখনও কোনো নিশানা করার প্রশ্ন ছিল না, কেন না একেবারে সোজা বন্দুকের কুঁদোর সঙ্গে যুক্ত নলের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে নিশানা করা সম্ভব ছিল না। একমাত্র ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সে শিকার করার বন্দুকের মতো ঢালু কুঁদো-লাগানো বন্দুক পদাতিক বাহিনীতে প্রবর্তন করা হয় এবং সঠিক নিশানা অনুযায়ী গুলিবর্ষণ সম্ভব হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে হাল্কা ধরনের কামানবাহী শকট। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে গ্রিবিউভ্যাল এটা নির্মাণ করেন ; পরবর্তীকালে গোলন্দাজ বাহিনীতে যে ত্বরিত গতির প্রয়োজন হয়, একমাত্র এটাই সেই প্রয়োজন পূরণ করে।

রণক্ষেত্রের পক্ষে এই দুটি কারিগরি অগ্রগতিকে ব্যবহারের দায়িত্ব পড়ে ফরাসি বিপ্লবের ওপর। অাঁতাতে আবদ্ধ ইউরোপের দ্বারা আক্রান্ত হলে, এই বিপ্লব অস্ত্র ধারণে সক্ষম সমগ্র জনগণকে সরকারের হাতে সমর্পণ করে। কিন্তু এই জাতির হাতে তখন সারিবদ্ধভাবে জটিল রণকৌশল প্রয়োগের সময়

ছিল না—যার দ্বারা অনুরূপ রণকৌশলে পারদর্শী প্রুশীয় ও অস্ট্রিয় পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। অন্যদিকে, ফ্রান্সের শুধু যে আমেরিকার মতো আদিম অরণ্যের অভাব ছিল তাই নয়, বস্তুতপক্ষে পেছু হটার জন্যে আমেরিকার সীমাহীন ভূখণ্ডও তার ছিল না। যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে সীমান্ত এলাকা ও প্যারীর মধ্যবর্তী এলাকায় শত্রুকে পরাজিত করা, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে রক্ষা করা; শেষ পর্যন্ত একটা প্রকাশ্য গণ-যুদ্ধের মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব ছিল এর ফলে ক্রমাগত হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধ চালানো ছাড়াও আরও এক ধরনের রণকৌশলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যে-যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যায় আনাড়ি ফরাসি জনগণ খানিকটা সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে ইউরোপের স্থায়ী সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারে। এই ধরনের একটা রণকৌশল ছিল নিবিড় কলাম রচনা। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই এটা করা হয়েছিল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল প্যারেড করার ময়দানে। লম্বা লম্বা লাইনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার চাইতে কলামের শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ। এমনকি কলামের ঘননিবদ্ধ সৈন্যরা খানিকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও, অন্ততপক্ষে তারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। এই ধরনের কলাম পরিচালনা করাও সহজ, কলামকে অনেক বেশি পরিমাণে সেনাপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, দ্রুত এগোনো-পিছানো করতে পারে। এদের পদক্ষেপের সংখ্যা প্রতি মিনিটে ১০০ কি তার চাইতেও বেশি। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো: গণযুদ্ধের একান্ত কৌশল হিসাবে কলাম গঠনের পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের সেকেলে সারিবদ্ধ কিম্ভূত-কিমাকার ইউনিফর্মকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করা সম্ভব হয়, প্রতিটি অংশকেই কিছুটা স্বাধীন গতিবিধির সুযোগ দেওয়া যায়, এবং প্রতিটি অংশই পরিস্থিতি অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আর ইচ্ছা করলে সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগকে নিয়েই এক-একটা অংশ গঠন করা যায়। এইসব কলামের গড়ন এতই নমনীয় ছিল যে নিযুক্ত সৈন্যদের নিয়ে নানা ধরনের সমাবেশ ঘটানো যেতো; গ্রাম ও গোলাবাড়িও কলামের কাজে লাগতো—দ্বিতীয় ফ্রেডারিক যেটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন; এরপর থেকে এইগুলি প্রতিটি যুদ্ধের প্রধান অবলম্বন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কলামকে সমতল বা বন্ধুর যে কোনো ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো যায় এবং একমাত্র ভরসাস্থল হিসাবে সারিবদ্ধ রণকৌশলকে শেষ পর্যন্ত এই কলামই

ভিন্নতর লড়াইয়ের কৌশলে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এই কৌশল অনুযায়ী ক্রমাগত মুখোমুখি খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে সারিবদ্ধ সৈন্যদের ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত করে ফেলা হতে থাকে এবং ক্রমাগত সৈন্য নিয়ে এসে লড়াইকে এমন-ভাবে বিলম্বিত করা হয় যাতে একেবারে শেষ পর্যন্ত মজুত রাখা বাহিনীর নতুন তরতাজা সৈন্যদের আক্রমণ শত্রুপক্ষের আর সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না। সারিবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর সমস্ত অংশই যেখানে সমান শক্তিশালী, সেখানে ঘননিবদ্ধ কলাম রচনাকারী প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনী অল্প সৈন্য নিয়ে কৃত্রিম আক্রমণ চালিয়ে সারিবদ্ধ সৈন্যদের অংশবিশেষকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারত এবং ঐ সারির প্রধান অংশের ওপর তার শক্তিশালী বাহিনীর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করত।

এই সময়ে মুখোমুখি খণ্ডযুদ্ধ করার বাহিনীই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোলাগুলি ছুঁড়ত আর কলাম বেয়নেট দিয়ে আক্রমণের কাজ চালাত। ষোড়শ শতকের শুরু থেকে এই পর্যন্ত হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধ ও বর্শাচালকদের মধ্যে যে-সম্পর্ক চলে এসেছে, এই ব্যাপারটিও অনুরূপ সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই সময়ে যে ব্যতিক্রমটি দেখা যায় তা হলো: হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধ করার জন্যে আধুনিক কলামগুলিকে যে কোনো সময়েই ভেঙে দেওয়া যেত এবং ফের কলাম রচনার জন্যে সৈন্যদের জড়ো করাও যেত।

লড়াইয়ের এই নতুন পদ্ধতিটি নেপোলিয়নের হাতে চূড়ান্ত রূপ পায়। পুরানো পদ্ধতিটির তুলনায় এটাই এত উন্নত ছিল যে পুরানো পদ্ধতিটি এর সম্মুখীন হয়ে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জেনার যুদ্ধে কিম্ভূত-কিমাকার, ধীরগতিসম্পন্ন প্রুশীয় সারিবদ্ধবাহিনী, যা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাতাহাতি যুদ্ধের পক্ষে বহুলাংশে অনুপযুক্ত, ফরাসি তেরাইয়ের বাহিনীর নিখুঁত লক্ষ্যসম্পন্ন গোলাবর্ষণের সামনে যেন বাতাসের মতো মিলিয়ে যায়। প্রুশীয় বাহিনীর পক্ষে বড়োজোর সম্ভব ছিল সারিবদ্ধ সৈন্যদের একটি বাহিনীর দ্বারা গুলিবর্ষণ করা। কিন্তু সারিবদ্ধ বাহিনীর বিন্যাস পরাজিত হলেও সারিবদ্ধ লড়িয়ে বাহিনীর ক্ষেত্রে এটা সত্যি নয়। জেনাতে সারিবদ্ধ বাহিনী নিয়ে প্রুশীয়দের এই শোচনীয় পরাজয়ের কয়েক বছর পরে, ওয়েলিংটন ইংরেজদের সারিবদ্ধ বাহিনীকে ফরাসি কলাম পদ্ধতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বে দেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পরাজিত করেন। ওয়েলিংটন ফরাসি রণকৌশলের সবটাই গ্রহণ করেছিলেন, একমাত্র

ব্যতিক্রম ছিল কলাম রচনা না করে তিনি ও তাঁর পদাতিকবাহিনী ঘননিবদ্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আর এইভাবে তিনি যুগপৎ লড়াই চালাবার সুযোগ পান: গুলিবর্ষণের সময় তাঁর সমস্ত রাইফেল ব্যবহৃত হতো, আবার আক্রমণের সময় তাঁর সমস্ত বেয়নেট সক্রিয় হয়ে উঠত। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ইংরেজরা এই ধরনের রণসজ্জায় যুদ্ধ করেছে এবং এমনকি যখন সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনও আক্রমণ (আলবুহেরা) ও আত্মরক্ষায় (ইনকারম্যান)[২০৬] সবচেয়ে ভালো ফলই পেয়েছে। যে বুগেউয়াদ ইংরেজদের সারিবদ্ধ বাহিনীর সঙ্গে লড়েছেন, তিনি কলামের চাইতে সারিবদ্ধ বাহিনীকে আমৃত্যু উন্নততর মনে করে এসেছেন।

উপরন্তু পদাতিকবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিল খুবই নিকৃষ্ট ধরনের, এতই নিকৃষ্ট ছিল যে একশো পা দূরে তারা কোনো ক্বচিৎ একটা লোককে এবং তিনশো পা দূরে সমগ্র ব্যাটেলিয়ানকে আঘাত করতে পারত। ফরাসিরা আলজিয়ার্স-এ এসে বেদুইনদের হাতে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা বেদুইনদের লম্বা লম্বা গাদা বন্দুকের সাহায্যে দূর থেকে গুলি ছোঁড়া যেত, অথচ তাদের বন্দুক অতদূর থেকে গুলি ছুঁড়তে পারত না। এই ক্ষেত্রে একমাত্র রাইফেল জাতীয় গাদা বন্দুকই উপযুক্ত। কিন্তু ফ্রান্সে, এমনকি আপৎকালীন অস্ত্র হিসাবেও, রাইফেল সম্বন্ধে বরাবরই আপত্তি উঠেছে, কারণ এতে গুলি ভরতে অনেক সময় লাগে এবং তাড়াতাড়ি গুলি বেরোবার পথ আটকে যায়। কিন্তু সহজে গুলি ভরা যায় এমন গাদা বন্দুকের প্রয়োজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উদ্ভাবনা ঘটে। ডেলভিগনের প্রাথমিক কাজের পরে থৌভেনিন-এর টাইগ-রাইফেল ও মিনি-র সম্প্রসারণশীল বুলেট নির্মিত হয়। এই বুলেট গুলি ভরা ও ছোঁড়ার সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা নিয়ে আসে, যার ফলে সমগ্র পদাতিক বাহিনীকে দূরবর্তী সঠিক নিশানাযুক্ত রাইফেলে সজ্জিত করে তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু মুখ দিয়ে গুলি ভরার রাইফেলের ব্যবহারোপযোগী কৌশল চালু হওয়ার পূর্বেই আর একটি সর্বাধুনিক অস্ত্র, পিছন দিয়ে গুলি ভরার রাইফেল, তাকে হটিয়ে দেয়, আর একই সঙ্গে রাইফেল তৈরির কাজও চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান দক্ষতার সঙ্গে।

গোটা জাতিকে সশস্ত্র করে তোলার যে-কাজ বিপ্লব শুরু করেছিল, শীঘ্রই তার ওপর যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন আরোপিত হয়। সেনাবাহিনীতে কাজের উপযুক্ত একমাত্র যুবকদের একটা অংশকেই স্থায়ী সেনাবাহিনীতে যোগদানের

জন্যে আহ্বান করা হয় এবং বাকি নাগরিকদের বৃহত্তর কিংবা ক্ষুদ্রতর অংশকে নিয়ে বড়জোর গড়ে তোলা হয় একটা তালিম ছাড়া জাতীয় প্রহরী বাহিনী। অথবা সুইজারল্যাণ্ডের মতো যেসব দেশে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ সত্যি-সত্যিই কঠোরভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল, সেখানেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলিশিয়া গঠন করা হয়, যাদের নিয়ে কয়েক সপ্তাহের বেশি সামরিক কুচকাওয়াজের ভড়ং করা হয় নি। ইউরোপের একটিমাত্র দেশে, যা তখনকার দরিদ্রতম দেশগুলির একটি, সর্বজনীন সামরিকবাহিনী গঠন ও স্থায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সমন্বয় আনার চেষ্টা হয়েছিল। সেই দেশটি হচ্ছে প্রুশিয়া। স্থায়ী সেনাবাহিনীতে কাজ করা সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হলেও, তার মধ্যে ফাঁক ছিল, আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারা সেটা প্রভাবিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রুশীয় লাণ্ডভেহ্‌র* ব্যবস্থা সৈন্য হিসাবে তৈরি এমন বহুসংখ্যক প্রশিক্ষিত লোকজনকে সরকারের কাছে হাজির করেছিল, যার ফলে সমপরিমাণ জনসংখ্যাবিশিষ্ট যে কোনো দেশের তুলনায় প্রুশিয়ার স্থান ছিল সকলের ঊর্ধ্বে।

১৮৭০ সালের ফরাসি-জার্মান যুদ্ধে ফরাসিদের বাধ্যতামূলক সৈন্যদল গঠন ব্যবস্থা প্রুশিয়ার লাণ্ডভেহ্‌র ব্যবস্থার কাছে নতিস্বীকার করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই এই প্রথম পিছন থেকে গুলি ভরার রাইফেলে সজ্জিত ছিল, তবে সৈন্যদের গতিবিধি ও লড়াইয়ের নিয়মকানুন ছিল মূলই একই রকম—সেই সেকেলে গাদাবন্দুকের যুগের মতো। বড়োজোর তেরাইয়ের বাহিনীকে আরও ঘন নিবদ্ধ করে সাজানো হতো। ফরাসিরা তখনও কলামের আকারে সৈন্য সাজিয়ে পুরানো পদ্ধতিতেই লড়ছিল, কখনও বা লড়ছিল সারিবদ্ধভাবে, অন্যদিকে জার্মান বাহিনী, কলামের আকারে সৈন্য সাজানোর পদ্ধতি প্রবর্তন করে, অন্ততপক্ষে এমন এক ধরনের লড়াইয়ের কায়দা অনুসন্ধান করছিল যা নতুন ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের পক্ষে আরও উপযোগী হয়। এইভাবে প্রথমদিকে কয়েকটি যুদ্ধ চালানো হয়। কিন্তু যখন, সঁা প্রাইভাত বিধ্বস্ত (১৮ অগাস্ট) করার সময়, প্রুশীয় গার্ডদের তিনটি বিগ্রেড কলাম আকারের বাহিনীকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়োগ করে, তখনই পিছন থেকে গুলি ভরার রাইফেলের প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়। যুদ্ধে নিয়োজিত প্রধানত

---

* ৮৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

পাঁচটি বাহিনীর (১৫,০০০ সৈন্য) প্রায় সমস্ত অফিসার (১৭৬ জন) ও ৫,১১৪ জন সৈন্য অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি নিহত হয়। লড়াইয়ে যোগদানের সময় যে গার্ড ইনফ্যান্ট্রির মোট সংখ্যা ছিল ২৮,১৬০, তাদের মধ্যে ৩০৭ জন অফিসার সমেত ৮,২৩০ জন সৈন্য ঐ একই দিনে হতাহত ও বন্দী হয়।[২০৭] সেই সময় থেকে, কলামের আকারে সৈন্য সাজানোর পদ্ধতি, সারিবদ্ধ সৈন্য সাজানোর পদ্ধতি থেকে কম নিন্দনীয় হয় নি। শত্রুপক্ষীয় রাইফেলের গুলিবর্ষণের সামনে নিবিড়ভাবে সৈন্য দাঁড় করাবার সব রকম ধারণাই তখন থেকে পরিত্যক্ত হয়। জার্মান পক্ষ পরবর্তী যাবতীয় লড়াই চালিয়েছে ঘন-নিবদ্ধ তেরাইয়ের বাহিনীর সাহায্যে, শত্রুপক্ষের তুমুল গুলিবর্ষণের মুখে এই বাহিনীর কলামগুলি নিজেরাই সরে পড়তে পারত, যদিও উচ্চতর কমাণ্ডের অফিসাররা এই যুক্তিতে এটার বিরোধিতা করত যে এই রীতিটি সুষ্ঠু সৈন্য-বিন্যাস পদ্ধতির বিপরীত। এই সময়ে আবার প্রমাণিত হয় যে সৈন্যরা অফিসারদের চাইতে বেশি বিচক্ষণ; তারাই লড়াইয়ের একমাত্র পন্থা সহজাতভাবে খুঁজে পেয়েছিল—পিছন থেকে গুলি ভরার রাইফেলের অগ্নি-বর্ষণের মুখে এই পন্থাই এখনও পর্যন্ত যথার্থ বলে প্রমাণিত এবং অফিসারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারাই এটাকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছে। অনুরূপভাবে ভয়ঙ্কর গুলিবর্ষণের পরিধির মধ্যে ডবল মার্চ করে পিছিয়ে যাওয়াই ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ।

অ্যান্টি ড্যুরিং-এর নোট[২০৮]

ক) বাস্তব জগতে গাণিতিক 'অসীম'-এর আদিরূপ প্রসঙ্গে

চিন্তা ও সত্তার সাদৃশ্য।
গণিতে অসীমের ধারণা।

বস্তুতপক্ষে মানুষের চিন্তা ও চিন্তা-নিরপেক্ষ বাস্তব জগৎ একই প্রকার নিয়মের অধীন। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাদের পরিণতির ক্ষেত্রে তারা পরস্পরবিরোধী নয়। আমাদের সমগ্র তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে সেগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাত্ত্বিক চিন্তার এটাই অচেতন ও নিঃশর্ত প্রারম্ভসূত্র। আঠারো শতকের বস্তুবাদ তার মূলত আধিবিদ্যক চরিত্রের জন্যে এই প্রারম্ভ-সূত্রটি অনুসন্ধান করেছিল শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকে। এ এই বক্তব্য প্রমাণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল যে চিন্তার যাবতীয় বিষয় ও জ্ঞান উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা থেকে এবং এই সূত্রটির পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছিল: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu.[২০৯] আধুনিক ভাববাদী, সেইসঙ্গে দ্বান্দ্বিকও বটে, দর্শনে বিশেষ করে হেগেলের রচনায়, প্রথম এর অনুশীলন করা হয় রূপের দিক থেকেও। অসংখ্য যদৃচ্ছ ধ্যানধারণা ও উদ্ভট কল্পনা সত্ত্বেও, চিন্তা ও সত্তার ঐক্যটি ভাববাদী, বিশৃঙ্খলরূপে উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে এই দর্শনই চিন্তার প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে, অসংখ্য ঘটনায় আর বিচিত্র ক্ষেত্রে অনুরূপ নিয়মগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। অন্যদিকে, আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তার বিষয়বস্তুর উৎপত্তির নীতিকে এমনভাবে প্রসারিত করেছে যা ভেঙে ফেলেছে এর প্রাচীন আধিবিদ্যক গণ্ডি ও সূত্রটিকে। অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিষয়কে ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী পর্যন্ত প্রসারিত

করেছে ; অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একক ব্যক্তির এখন আর প্রয়োজন নেই, এর ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা কিছুটা পরিমাণে অপসারিত করা যায় তার বহুসংখ্যক পূর্ব-পুরুষের অভিজ্ঞতার ফলাফলের দ্বারা। যেমন, যদি আমাদের মধ্যে গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধগুলি প্রতিটি আট বছর বয়স্ক শিশুর কাছে স্বতঃপ্রমাণিত বলে মনে হয় এবং অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা 'সঞ্চিত উত্তরাধিকারে'র পরিণতি। একজন বুশম্যান কিংবা কোনো অস্ট্রেলিয়ান নিগ্রোকে প্রমাণের সাহায্যে এই স্বতঃসিদ্ধগুলি বোঝানো কঠিন।

বর্তমান গ্রন্থে ডায়ালেকটিক্সকে অনুধাবন করা হয়েছে সমস্ত গতির অত্যন্ত সর্বজনীন নিয়মের বিজ্ঞান হিসাবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এর নিয়মগুলি চিন্তার গতির ক্ষেত্রের মতোই প্রকৃতি ও মানবেতিহাসের গতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে বৈধ। এই নিয়ম উপলব্ধি করা যায় এই তিনটির মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে, এমনকি তিনটি ক্ষেত্রেই, অথচ আধিবিদ্যক স্থূল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তি এটা বুঝতেই পারেন না যে ঐ একই নিয়ম তাঁকে জানতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সতেরো শতকের শেষ অর্ধাংশে অনুকলনের (infinitesimal calculus) আবিষ্কারের সমতুল্য মানব-মনের সমুন্নত বিজয় তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আর অর্জিত হয়নি বললেই চলে। অন্য কোথায়ও না পেলেও, এখানেই মানব-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ও স্বাতন্ত্র্যসূচক কীর্তির আমরা সন্ধান পাই। অনুকলনের মধ্যে, বিভিন্ন ঘাতের অবকল ও অসীমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মানগুলি যেভাবে এখনও রহস্যাবৃত রয়েছে, তার থেকেই এটা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রমাণিত হয় যে এখানে যা ধারণা করা হয়েছে সেটা মানব-মনের বিশুদ্ধ 'স্বাধীন সৃষ্টি ও কল্পন'—বস্তুজগতে অনুরূপ কোনো কিছুই নেই। অথচ ঘটনাটি এর বিপরীত। এইসব কল্পিত মানের আদিরূপ প্রকৃতিই আমাদের সামনে হাজির করে।

আমাদের জ্যামিতি শুরু হয় ক্ষেত্র সম্পর্কগুলি থেকে এবং আমাদের পাটি-গণিত ও বীজগণিতের প্রারম্ভ-সূত্র হচ্ছে সংখ্যাগত মান, যা আমাদের পার্থিব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, এটা বস্তুর মানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত—বল-বিদ্যায় একে ভর বলা হয়—পৃথিবীতে এই ভর রয়েছে এবং মানুষ এগুলি নিয়ে কাজ করে। এইসব ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর যেন অপরিমেয়ভাবে বিপুল আর পৃথিবী সংক্রান্ত বলবিদ্যায় একে অপরিমেয়ভাবে বিপুল বলেই গণ্য করা হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $= \infty$, পতন সূত্রে এটাই হচ্ছে সমস্ত বলবিদ্যার মূল-

নীতি। কিন্তু শুধু পৃথিবীই নয়, সমগ্র সৌরজগৎ এবং সৌরজগতের মধ্যেকার দূরত্ব একেবারে যৎসামান্য, বলে মনে হয়, যখন দূরবীক্ষণের সাহায্যে আমাদের কাছে দৃশ্যমান নক্ষত্র জগতের দূরত্বকে আলোক-বর্ষের হিসাবে বিচার করা হয়। সুতরাং এখানেই আমরা অসীমের সন্ধান পাই, শুধু প্রথম মাত্রার নয়, দ্বিতীয় মাত্রারও, এবং সীমাহীন দেশে (space) আরও উচ্চতর মাত্রার অসীমকে ধারণা করবার দায়িত্ব আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কল্পনা-শক্তির ওপর ছেড়ে দিতে পারি, অবশ্য তাঁরা যদি তাতে আগ্রহবোধ করেন।

কিন্তু বর্তমানে ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রচলিত মতবাদ অনুসারে পার্থিব পদার্থের ভর বস্তুসমূহ গঠিত হয়েছে অণু, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার দ্বারা—কোনো বস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক গুণ বিনষ্ট না করে এইসব অণু ও কণার আর বিভাজন করা সম্ভব নয়। ডাবলিউ টমসনের পরিমাপ অনুসারে এইসব কণার ক্ষুদ্রতম ব্যাস এক মিলিমিটারের পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারে না। বলবিদ্যা, ভৌতবিদ্যা এমনকি রসায়নও যেসব ক্ষুদ্রতম ভর নিয়ে কাজ করে, এটা তার থেকেও বহু সহস্র গুণ ক্ষুদ্র। তা সত্ত্বেও, এটার মধ্যে ভরের সর্বপ্রকার ধর্ম বর্তমান। এটা ভৌত ও রাসায়নিকভাবে ভরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যাবতীয় রাসায়নিক সমীকরণে এর বাস্তব প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, চলরাশিগুলির ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রভেদকের যে সম্পর্ক, সংশ্লিষ্ট ভরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর ধর্ম অনুরূপ। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে প্রভেদকের ক্ষেত্রে, গাণিতিক বিমূর্তনের ক্ষেত্রে যা রহস্যজনক ও ব্যাখ্যাতীত বলে মনে হয়। এখানে সেটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

প্রকৃতি এইসব প্রভেদক ও অণুগুলি নিয়ে ঠিক সেইভাবেই এবং সেই নিয়মানুসারে কাজ করে, গণিত যেমনভাবে কাজ করে তার বিমূর্ত প্রভেদকগুলির সাহায্যে। তাই দেখা যায়, x^3-কে অবকলন করলে পাওয়া যায়, $3x^2dx$, যেখানে $3xdx^2$ ও dx^3-এর মান উপেক্ষিত হয়। এটাকে আমরা যদি জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে x দৈর্ঘ্যের উভয় পার্শ্বে আমরা ঘন মান পাব, এবং দৈর্ঘ্য অতিক্ষুদ্র dx হারে বাড়তে থাকবে। মনে করা যাক এই ঘনকটি গন্ধকের ; এর একটি কোণের তিনটি তল আচ্ছাদিত আর অপর তিনটি তল উন্মুক্ত। এই গন্ধকের ঘনকটিকে গন্ধক-বাষ্পের পরিবেশে এখন উন্মুক্ত করে দেওয়া যাক এবং তাপমাত্রা অনেক কমিয়ে আনা যাক ; তাহলে ঐ ঘনকের তিনটি উন্মুক্ত পার্শ্বদেশে গন্ধক জমা হবে। এই

প্রক্রিয়াটিকে বিশুদ্ধরূপে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে আমরা যদি অনুমান করি যে প্রথমে একটি কণার ঘনত্বের স্তর ঐ তিনটি পার্শ্বের প্রত্যেকটিতে জমতে থাকে, —তাহলে আমরা ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়নের সাধারণ পদ্ধতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকব। ঘনকের পার্শ্বগুলির x দৈর্ঘ্য dx হারে কণার ব্যাস বৃদ্ধি পায়। x^3 ঘনকের উপাদান বৃদ্ধি পায় x^3 এবং $x^3+3x^2dx+3xdx^2+dx^3$ অন্তরে যেখানে x^3 একটি কণা এবং $3xdx^2$, $x+dx$ দৈর্ঘ্যের তিনটি সারি হচ্ছে সরল ও রৈখিক কণার বিন্যস্ত। এটাকেও গণিতের মতোই একই যুক্তিতে উপেক্ষা করা যায়। ফল দাঁড়ায় একই। ঘনকের ভর বৃদ্ধি হয় $3x^2dx$।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, গন্ধকের ঘনকের ক্ষেত্রে dx^3 ও $3xdx^2$ ঘটে না, কারণ দুটি কি তিনটি অণু একই ক্ষেত্রে থাকতে পারে না, ঘনকের আয়তন বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সঠিক হচ্ছে $3x^2dx+3xdx+dx$. এর ব্যাখ্যা হচ্ছে গণিতে dx একটি রৈখিক মান, যার বেধ কিংবা প্রস্থ নেই, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে এর অস্তিত্ব মেলে না; অতএব একমাত্র বিশুদ্ধ গণিতেই গাণিতিক বিমূর্তনের অবাধ যৌক্তিকতা রয়েছে। আর গণিতে $3xdx^2+dx^3$-কে উপেক্ষা করা হলেও কোনো তারতম্য ঘটে না।

বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। যখন এক গেলাস জলের সর্বোচ্চ আণবিক স্তর বাষ্প হয়ে যায়, জল-স্তরের উচ্চতা x তখন dx হারে হ্রাস পায় এবং একের পর এক আণবিক স্তরের ক্রমাগত বিলুপ্তির প্রক্রিয়াটি হয়ে দাঁড়ায় বস্তুতপক্ষে ধারাবাহিক ব্যবকলন। আর যখন গরম বাষ্পকে একটা পাত্রের মধ্যে চাপের ও ঠাণ্ডা করার মাধ্যমে আর একবার ঘনীভূত করা হয় এবং পাত্রটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটি আণবিক স্তর অপরটির ওপর জমতে থাকে (গৌণ পরিস্থিতিটির বিবরণ এখানে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে প্রক্রিয়াটি অবিশুদ্ধ রূপ নেয়), তখন আক্ষরিকভাবেই প্রক্রিয়াটি সংহত হয় যা গাণিতিক প্রক্রিয়া থেকে একমাত্র এই অর্থেই ভিন্ন যে সেখানে ব্যাপারটি ঘটানো হয় মানব-বুদ্ধির সচেতনতার সাহায্যে, আর অন্যটি ঘটে প্রকৃতিতে অচেতনভাবে। কিন্তু তরল থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় এবং তার বিপরীত ধারায় রূপান্তরের মধ্যেই শুধু এই প্রক্রিয়াটি ঘটে না। এইসব প্রক্রিয়া অনুকলনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

যখন অন্য প্রভাবের সাহায্যে ভর-গতি বিলুপ্ত হয় এবং সেটা রূপান্তরিত হয় তাপে, আণবিক গতিতে তখন যা ঘটে সেটা ভর-গতির বিভাজন ছাড়া

আর কী ? আর যখন বাষ্পীয় ইন্‌জিনের সিলিণ্ডারে বাষ্পের অণুগুলির গতি একত্রিত করা হয় যাতে সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পিস্টনকে তুলে ফেলতে পারে, যাতে ঐ গতি রূপান্তরিত হতে পারে ভর-গতিতে, তখন কি সেগুলি সংহত হয় না ? রসায়ন অণুগুলিকে পরমাণুতে, কম ভরযুক্ত মান ও ক্ষেত্রগত আয়তনে পরিণত করে কিন্তু সেগুলির মান একই শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে যাতে ঐ দুটি পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ সম্পর্কে অবস্থান করতে পারে। সুতরাং বস্তুর আণবিক গঠন প্রকাশ পায় যেসব রাসায়নিক সমীকরণের দ্বারা, সেগুলির রূপ হচ্ছে অবকল সমীকরণ।

পরমাণুকে আর বস্তুর সরল কিংবা সাধারণভাবে ক্ষুদ্রতম কণা হিসাবে গণ্য করা হয় না। রসায়নও ক্রমশই এই ধারণার দিকে ঝুঁকছে যে পরমাণু যৌগিক পদার্থ। রসায়ন ছাড়াও বেশির ভাগ পদার্থবিজ্ঞানী এটা মনে করেন যে সর্বজনীন ঈথার, যার মাধ্যমে আলো ও তাপের বিকিরণ ঘটে, সেটাও অনুরূপ পৃথক পৃথক কণার সমষ্টি ; অবশ্য সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে— রসায়নের পরমাণু ও ভৌত বিজ্ঞানের অণুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একই রকম, যেহেতু এদের যান্ত্রিক ভর রয়েছে, অর্থাৎ বলা যায় d^2x থেকে dx।

সুতরাং এখানে আমরা বস্তুর গঠনের একটা স্বাভাবিক ধারণা পাচ্ছি। প্রকৃতি জগতে d^3x d^4x ইত্যাদির সমতুল্য কিছু কল্পনা না করার পক্ষেও কোনো যুক্তি নেই।

অতএব বস্তুর গঠন সম্বন্ধে যে ধারণাই থাকুক না কেন, এটা নিশ্চিত যে বস্তুর গঠন বৃহৎ, আপেক্ষিকভাবে পৃথক ভর-চরিত্রের বৃহৎ, সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত, এমনভাবে বিভক্ত যাতে প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরের সম্পর্কে নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ ভরের অনুপাতে টিকে থাকে। দৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডল, সৌরজগৎ, পার্থিব বস্তুর ভরসমূহ, অণু, পরমাণু এবং শেষ পর্যন্ত ঈথারের কণাগুলি—সবই এক-একটি গোষ্ঠীর রূপ নেয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে মধ্যবর্তী যোগসূত্র দেখা যায়, তাতেও এর কোনো হেরফের হয় না। এইভাবে সৌরজগৎ ও পার্থিব বস্তুপুঞ্জের মধ্যে দেখা দেয় গ্রহাণু (এর মধ্যে কতকগুলির আয়তন রিউস্সে রাজ্যের* নতুন শাখার চাইতে বড় নয়), উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি। এইভাবে জীবজগতে কোষের অস্তিত্ব দেখা যায় পার্থিব বস্তুপুঞ্জ ও অণুর মধ্যবর্তী স্থানে। এই মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলি শুধু

* অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি রাজ্য, ১৮৬১ সালে এটা দ্বিতীয় জার্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। সম্পাদক।

এটাই প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে কোনো উল্লম্ফন নেই। আর তার সঠিক কারণ হচ্ছে প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উল্লম্ফনের দ্বারাই গঠিত।

গণিত যে-পর্যন্ত প্রকৃত মানগুলি নিয়ে কারবার করে, তাকেও নির্দ্বিধায় এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগাতে হয়। পার্থিব বলবিদ্যায় পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জকে অতি বিশাল আকারে গণ্য করা হয়। ঠিক যেমন জ্যোতির্বিদ্যায় পার্থিব বস্তুপুঞ্জ ও উল্কাপিণ্ডকে গণ্য করা হয় অতিক্ষুদ্র রূপে, এবং জ্যোতির্বিদ্যা যখনই নিকটতম স্থির নক্ষত্রগুলির চাইতে দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলের গঠন অনুসন্ধান করতে শুরু করে, তখনই সৌর জগতের গ্রহগুলির মধ্যেকার দূরত্ব ও ভর যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু গণিতজ্ঞরা যখন তাঁদের বিমূর্ত চিন্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ, তথাকথিত বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে আশ্রয় নেন, তখন এইসব সাদৃশ্য ভুলে যাওয়া হয়. অসীম হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ রহস্যময়, এখানে যে-পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের কাজ চলে সেটা যেন একেবারে বোধগম্যতার অতীত; সমস্ত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। গণিতজ্ঞদের কর্মপদ্ধতির দুর্বোধ্যতা ও অবাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা না গেলেও মার্জনা করা যায়। সেটা সব সময়েই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য উপায়; হেগেলের প্রাকৃতিক দর্শনের দুরূহ অস্পষ্টতা ও উদ্ভট কল্পনাকেও তাঁদের কর্মপদ্ধতি অতিক্রম করে যায়, যে-সম্বন্ধে গণিতজ্ঞ ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট ভয়-ভীতি প্রকাশ করেন নি। হেগেলের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে হেগেল বিমূর্ত চিন্তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই আরও বৃহত্তর পরিমাপে এ কাজ করে থাকেন। তাঁরা এটা ভুলে যান যে তথাকথিত বিশুদ্ধ গণিত বিমূর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর সমস্ত মানই কাল্পনিক এবং সমস্ত বিমূর্তনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলে সেগুলি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় কিংবা সেগুলি বিপরীত অর্থে পরিণত হয়। গণিতে অসীম রাশির ধারণাটি গৃহীত হয়েছে বাস্তব জগৎ থেকে, যদিও সচেতনভাবে নয়, সুতরাং বাস্তবতার সাহায্যেই একে ব্যাখ্যা করতে হবে, অসীম রাশি থেকে, গাণিতিক বিমূর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর আমরা এটা দেখেছি যে এই সংক্রান্ত বাস্তবতাকে আমরা যদি অনুসন্ধান করি তাহলে আমরা বাস্তব সম্পর্কগুলিকেও পাই, যেখান থেকে অসীমের গাণিতিক সম্পর্ক নেওয়া হয়েছে। এমনকি গাণিতিক পদ্ধতির স্বাভাবিক উপমাগুলিও এইভাবে পাওয়া যায়। এইভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যাত হতে পারে।

(চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতা সংক্রান্ত হেকেলের নিকৃষ্ট ধারণা। অখণ্ড ও খণ্ড খণ্ড বস্তুর মধ্যেকার স্ববিরোধ প্রসঙ্গে, হেগেল দ্রষ্টব্য ২১০)।

খ) প্রকৃতি সম্বন্ধে 'যান্ত্রিক' ধারণা প্রসঙ্গে: গতির বিভিন্ন রূপ ও সেগুলির আলোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহ।*

উপরোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পর (ফোরভার্টস, ফেব্রুয়ারি ৯, ১৮৭৭)** কেকুলে (Die wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der chemie)*** বলবিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়নকে অনুরূপভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

> 'বস্তু-প্রকৃতির এই ধারণাটি যদি ভিত্তি হয়, তাহলে রসায়নকে পরমাণু-বিজ্ঞান হিসাবে আর ভৌতবিজ্ঞানকে অণু-বিজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞাম্বিত করা যেতে পারে, এবং তখন আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের যে-অংশটিতে ভরসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়, সেটাকে পৃথক করাই সঙ্গত হবে আর তাকে বলবিদ্যা নামে অভিহিত করা যেতে পারবে। এইভাবে বলবিদ্যা হবে ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়নের ভিত্তি-বিজ্ঞান। কেননা কতকগুলি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কয়েকটি হিসাবের ব্যাপারে, উভয় বিজ্ঞানেই তাদের অণু বা পরমাণুকে ভর হিসাবে গণ্য করা হয়।'

এটা দেখা যায় যে এই সূত্রটির সঙ্গে মূল পাঠের**** এবং পূর্বেকার টীকার পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে এটা ততটা সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু একটি ইংরেজি সাময়িক পত্রে ('নেচার') কেকুলের উপরোক্ত বক্তব্যকে যখন এইভাবে উপস্থিত করা হয় যে বলবিদ্যা হচ্ছে ভরসমূহের স্থিতিবিদ্যা এবং গতিবিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান হচ্ছে অণুগুলির স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যা,২১১ তখন আমার কাছে এটাই মনে হয় যে সমধর্মী রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির নিছক বলবিদ্যার রূপে পরিণত করার ফলে ক্ষেত্রটি অযথা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্ততপক্ষে রসায়নের ক্ষেত্রে তো বটেই। অথচ এটাই এখন এমন প্রচলিত রীতি যে হেকেল

---

* এই আলোচনাটি বর্তমান সংস্করণের প্রথম ভাগ, সপ্তম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। সম্পাদক।

** ফোরভার্টস পত্রিকার ঐ সংখ্যায় অ্যান্টি ড্যুরিং-এর সপ্তম অধ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

*** 'রসায়নের বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ও সাফল্য'। সম্পাদক।

**** অর্থাৎ অ্যান্টি ড্যুরিং-এর প্রথম ভাগ, সপ্তম অধ্যায়ের সূচনা। সম্পাদক।

'যান্ত্রিক' ও 'একত্ববাদী' শব্দ দুটিকে অনবরত ব্যবহার করেছেন, যেন তাদের অর্থ একই। তাঁর মতে

> 'আধুনিক শারীরবিজ্ঞান…তার নিজস্ব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভৌত-রাসায়নিক—কিংবা ব্যাপকতর অর্থে যান্ত্রিক—শক্তিগুলির ক্রিয়া স্বীকার করে।'

আমি যদি ভৌতবিজ্ঞানকে অণুগুলির বলবিদ্যা, রসায়নকে পরমাণু-সমূহের ভৌতবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানকে অ্যালবুমিনের রসায়ন বলে নাম দিই তবে তার মাধ্যমে আমি এই বিজ্ঞানগুলির যে-কোনো একটির অপরটিতে রূপান্তরের কথাই বলি। অতএব এদের মধ্যে যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা সবই রয়েছে। আরও এগিয়ে রসায়নকে এক ধরনের বলবিদ্যা হিসাবে আখ্যাত করাটা আমার কাছে একেবারেই অনভিপ্রেত। ব্যাপকতর কিংবা সংকীর্ণতর অর্থে বলবিদ্যা শুধু পরিমাণগুলিকেই জানে, হিসাব করে গতিবেগ ও ভরসমূহকে নিয়ে, বড়জোর আয়তন নিয়ে। বস্তুসমূহের গুণের সম্মুখীন হলেই (হাইড্রোস্ট্যাটিক্স ও এয়ারোস্ট্যাটিক্স-এ যেমনটি ঘটে) আণবিক অবস্থা ও আণবিক গতির মধ্যে না গিয়ে এর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না। এ একটা সহায়ক বিজ্ঞান মাত্র, ভৌতবিজ্ঞানের পূর্বশর্ত। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানে, আরও বেশি পরিমাণে রসায়নে, পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে অনবরত গুণগত পরিবর্তনই শুধু দেখা দেয় না, এমন সব গুণগত পরিবর্তনও ঘটে যেগুলি হিসাবের মধ্যে আনা প্রয়োজন, পরিমাণগত পরিবর্তনের ওপর যেগুলির নির্ভরতা কোনো-ভাবেই প্রমাণিত হয় নি। বিজ্ঞানের বর্তমান প্রবণতা যে এইদিকে তা সহজেই মেনে নেওয়া যায়, তবে তার থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে এই ধারাটিই একমাত্র সঠিক, একই প্রবণতা অনুসরণের মধ্যেই সমগ্র ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়নের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। যান্ত্রিক গতি, বস্তুর বৃহত্তম কিংবা ক্ষুদ্রতম অংশের স্থান পরিবর্তন, সবই গতির অন্তর্ভুক্ত। আর বিজ্ঞানের প্রথম, নিছক প্রথমই, কাজ হচ্ছে এই গতির জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু যান্ত্রিক গতির মধ্যেই যাবতীয় গতি নিঃশেষিত নয়। স্থান পরিবর্তনই একমাত্র গতি নয়, বলবিদ্যার চাইতে উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুণের পরিবর্তনও গতি। তাপ যে আণবিক গতি, এই আবিষ্কারটি ছিল যুগান্তকারী। কিন্তু অণুগুলির স্থান পরিবর্তন ছাড়া তাপ আর কিছুই নয়। এর বেশি যদি কিছু বলার না থাকে

তাহলে আমার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো। পারমাণবিক আয়তন ও পারমাণবিক ওজনের অনুপাত থেকে পদার্থের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলির ব্যাখ্যায় রসায়ন বেশ পারঙ্গম বলেই মনে হয়। তবে কোনো রসায়নবিদই বলবেন না যে কোনো একটি পদার্থের ধর্মগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় লোথার মেয়ার তরঙ্গে[২১২] পদার্থটির অবস্থান অনুযায়ী, জৈব জীবনের অপরিহার্য বাহক কার্বনের বিশেষ প্রকৃতির গঠন কিংবা মস্তিষ্কে ফসফরাসের আবশ্যকতা—ইত্যাদি বিষয়কে এই তরঙ্গের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথচ 'যান্ত্রিক' (বলবিদ্যাভিত্তিক) ধারণায় এর বেশি কিছু পাওয়া যায় না। এই ধারণায় সব পরিবর্তনকেই স্থান-পরিবর্তন, সব গুণগত পরিবর্তনকে পরিমাণগত পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এটা লক্ষ্য করা হয় না যে গুণ ও পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটা পারস্পরিক, পরিমাণ যেমন গুণে পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি গুণও পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে পারস্পরিক ক্রিয়া। সমস্ত গুণগত পার্থক্য ও পরিবর্তনকে যদি পরিমাণগত পার্থক্য ও পরিবর্তনে, যান্ত্রিক স্থান-পরিবর্তনে পর্যবসিত করা হয় তাহলে অবধারিতভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে সমস্ত বস্তুই সমধর্মী ক্ষুদ্রতম কণার দ্বারা গঠিত এবং বস্তুর রাসায়নিক পদার্থের যাবতীয় গুণগত পার্থক্যগুলি দেখা দেয় সংখ্যার পরিমাণগত পার্থক্যগুলির দ্বারা এবং পরমাণু গঠনকল্পে ঐসব ক্ষুদ্রতম কণাগুলি এক জায়গায় পুঞ্জিত হওয়ার ফলে। কিন্তু এখনও আমরা ঐরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি নি।

আমাদের আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত মাঝারী গোছের স্থূল দর্শন ছাড়া অন্য কোনো দর্শনের সঙ্গে সেরকম পরিচিত নন। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন এই স্থূল দর্শনেরই রমরমা বাজার। এর প্রভাবেই ঐ বিজ্ঞানীরা 'যান্ত্রিক' কথাটি এইভাবে ব্যবহার করে থাকেন; এটা যে তাঁদের ওপর কী গুরুভার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার ফলাফল তাঁরা বিচার করে দেখেন না, এমনকি এ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কোন সংশয়ও দেখা দেয় না। বস্তুর সম্পূর্ণ গুণগত অভিন্নতার তত্ত্বটির সমর্থক আছেন—এটাকে ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ বা খণ্ডন করা সমানভাবেই অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা সব কিছুকেই 'যান্ত্রিকভাবে' ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—তাঁরা এর পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন কি না এবং বস্তুর অভিন্নতা মানেন কিনা—তাহলে হরেক রকম উত্তর পাওয়া যায়!

এখানে সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে 'যান্ত্রিকতা'র সঙ্গে 'বস্তুবাদিত্বে'র সমকক্ষতা দেখানোর বিষয়টি, যার উৎস হচ্ছেন হেগেল, যিনি 'যান্ত্রিকতা' আরোপ করে বস্তুবাদকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলেন। হেগেল যে বস্তুবাদের সমালোচনা করেছিলেন—তা হচ্ছে আঠারো শতকের ফরাসি বস্তুবাদ—যা ছিল একান্তভাবেই যান্ত্রিক এবং যথার্থই একান্ত স্বাভাবিক কারণেই সেই সময়ে ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান ছিল তাদের শৈশবে, প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি রচনা করা তাদের পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব। অনুরূপভাবে হেকেল হেগেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন causae efficientes—যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়াশীল কারণসমূহ এবং causae finales—উদ্দেশ্যমুখীভাবে ক্রিয়াশীল কারণসমূহ—এই শব্দ দুটিকে; হেগেল যেখানে যান্ত্রিকতাকে ব্যবহার করেছেন অন্ধভাবে কাজ করার, অচেতনভাবে কাজ করার অর্থে, হেকেল যে অর্থে যান্ত্রিকতাকে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে নয়। কিন্তু এই সমগ্র বৈপরীত্যটি হেগেলের কাছেই এতটা খণ্ডনযোগ্য বিষয় যে, কার্যকারণ সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'লজিক' গ্রন্থে তিনি এর উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র তার 'হিস্টরি' অব ফিলোসফি'তে যেখানে বিষয়টি এসেছে ঐতিহাসিকভাবে (অগভীরতার জন্যে হেকেল তাই ভুল বুঝেছেন!) এবং পরম কারণ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে। এখানে একটা রূপ হিসাবে এর উল্লেখ করেছেন—যে রূপের মধ্যে পুরানো অধিবিদ্যা যান্ত্রিকতা ও পরম কারণের বৈপরীত্যকে বুঝেছিল অথচ এর আলোচনা করেছিল বহু পূর্বেই খণ্ডিত বিষয়বস্তু হিসাবে। সুতরাং নিজের 'যান্ত্রিক' ধারণার সমর্থন দেখতে পেয়ে হেকেল যে আনন্দ পেয়েছিলেন, তা ছিল ভ্রান্ত, আর তার ফলেই তিনি এই চমৎকার সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিণতিতে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে, তার কারণ হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়াশীল শক্তি, কিন্তু কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে যদি ঐ একই পরিবর্তন ঘটানো হয় তাহলে সেটা ঘটে উদ্দেশ্যমুখী ক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা! স্রষ্টা উদ্দেশ্যমুখী ক্রিয়াশীল শক্তি! অবশ্য হেগেলের মতো প্রতিভাবান দ্বন্দ্ব-বিজ্ঞানী যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়াশীল কারণ আর উদ্দেশ্যমুখী ক্রিয়াশীল কারণের সংকীর্ণ বৈপরীত্যের কানাগলির মধ্যে আটকা পড়তে পারেন না। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই বৈপরীত্য সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থহীন বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কেননা অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ব থেকে এখন আমরা

জানতে পেরেছি যে বস্তুকে এবং তার অস্তিত্বের অবস্থা অর্থাৎ গতিকে সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং এগুলি 'নিজেরাই নিজেদের চূড়ান্ত কারণ; যেসব পৃথক পৃথক কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সাময়িক-ভাবে ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিংবা আমাদের চিন্তাশীল মনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—সেগুলিকে ফলপ্রসূ কারণ হিসাবে অভিহিত করলে মোটেই নতুন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। যে কারণ ফলপ্রসূ নয়, আদৌ সেটা কোনো কারণ নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নিছক বস্তু চিন্তার বিশুদ্ধ সৃষ্টি এবং একটি বিমূর্ত ধারণা। বস্তুর ধারণার আওতাভুক্ত অস্তিত্ববান বিষয়গুলিকে একত্রিত করে তাদের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যসমূহের বিবরণ আমরা বাদ দিয়ে থাকি। সুতরাং নির্দিষ্ট, অস্তিত্ববান খণ্ড খণ্ড জিনিস থেকে পৃথক যে বস্তু, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই। যদি প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিছক একই রকম বস্তুর সন্ধানে, একই প্রকার ক্ষুদ্রতম কণাগুলির সংহতি সাধনের জন্য গুণগত পার্থক্যগুলিকে নিছক পরিমাণগত পার্থক্যে পর্যবসিত করার লক্ষ্যে প্রয়াসী হয় তাহলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে জাম, নাশপাতি[২১৩] ইত্যাদিকে না দেখে নিছক ফল দেখতে চাওয়ার শামিল কিংবা বিড়াল. কুকুর, ভেড়া ইত্যাদির বদলে নিছক স্তন্যপায়ী প্রাণী অথবা বিশুদ্ধ গ্যাস, ধাতু, পাথর বা রাসায়নিক যৌগ এবং বিশুদ্ধ গতি দেখতে চাওয়ার শামিল। ডারউইনের তত্ত্বে এই রকম আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী, হেকেলের প্রায়-স্তন্যপায়ী প্রাণীর[২১৪] কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে এই প্রায়-স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে যদি যাবতীয় ভবিষ্যৎ ও বর্তমান স্তন্যপায়ীদের জীবাণু থেকে থাকে, তাহলে বাস্তবিক পক্ষে সেটা ছিল বর্তমান স্তন্যপায়ীদের চাইতে নিম্নস্তরের এবং আদিমতায় স্থূল ধরনের, সুতরাং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবর্তনশীল। হেগেল ইতিপূর্বেই দেখিয়েছেন যে (এনসাইক্লোপিডিয়া ১, পৃ ১৯৯), এই অভিমত, এই 'একপেশে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি' (যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তু শুধুমাত্র পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত হয়, তার গুণগত দিকটি আদি অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত) আঠারো শতকের ফরাসি বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া 'আর কিছুই নয়'।[২১৫] এটা এমনকি পিথাগোরাস-এর কাছে ফিরে যাওয়ার সামিল, যিনি সংখ্যা, পরিমাণগত নির্ধারক উপাদানকেই বস্তুর সারাংসার বলে মনে করতেন।

টীকা

ডের ফল্‌ক্‌সস্টাট ('জনগণের রাষ্ট্র')—জার্মান সোস্যাল ডিমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির (আইসেনঅ্যাকার্স) কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৮৬৯, ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬-এর ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় (প্রথমে সপ্তাহে দুবার এবং ১৮৭৩-এর জুলাই থেকে সপ্তাহে তিনবার)। জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার মুখপত্র হিসাবে এর সাহসী বিপ্লবী বক্তব্যের জন্যে পত্রিকাটিকে অনবরত নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। পত্রিকার সম্পাদকরা অনবরত গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে সম্পাদকমণ্ডলীতেও ক্রমাগত রদবদল ঘটতে থাকে। তবে পত্রিকার সাধারণ নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল ভিলহেল্‌ম লাইবনেক্ট-এর হাতে। পত্রিকায় অগাস্ট বেবেল-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তিনি ফল্‌ক্‌সস্টাট ছাপাখানার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, তাঁরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁরা পত্রিকাটির উপর অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন, এর কাজকর্মের ওপর নজর দিতেন, ভুলত্রুটি ঘটলে সমালোচনা করতেন এবং একে সঠিক পথে রাখার জন্যে পরামর্শ দিতেন। এইসব কারণে পত্রিকাটি ১৮৭০-এর দশকে শ্রমিকদের একটি নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

১৮৭৬-এ গোথা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফল্‌ক্‌সস্টাট ও নিউয়ের সোসিয়াল ডিমোক্রাট ('নতুন সোস্যাল-ডিমোক্রাট')-এর বদলে ফোরভার্টস ('অগ্রণী') পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়; এটাই হয়ে ওঠে জার্মান সোস্যাল-ডিমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র কেন্দ্রীয় মুখপত্র। সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন চালু হওয়ার পর ১৮৭৮-এর ২৭ অক্টোবর ফোরভার্টস বন্ধ হয়ে যায়। (৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (১৭৭৬, ৪ জুলাই) শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৭৬-এর ১০ মে ফিলাডেলফিয়া শহরে ষষ্ঠ বিশ্ব-বাণিজ্য মেলার

উদ্বোধন হয়। ৪০টি প্রদর্শক দেশের অন্যতম ছিল জার্মানি। বার্লিন শিল্প আকাদেমির পরিচালক অধ্যাপক ফ্রানৎস রিউল্যাক্সকে জার্মান সরকার জার্মান বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি এটা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মান শিল্প অনেক পিছিয়ে আছে এবং এর কর্মনীতি হচ্ছে 'সস্তা কিন্তু বাজে' জিনিস উৎপাদন। এই বক্তব্য সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যেমন, ফল্‌ক্‌সস্টাট, এই মর্যাদাহানিকর ব্যাপারটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেখা প্রকাশ করে।

'বাস্তবিকপক্ষে তারা একটা বর্ণও শেখেনি'—ব্যাপকভাবে চালু হওয়া এই উক্তিটি করেছিলেন ফরাসি অ্যাডমিরাল দ্য পানাত। কখনও এটাকে টেলিরাঁ্যাণ্ড-এর উক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। এটা রাজতন্ত্রীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সে যে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়, তার থেকে তারা কোনো শিক্ষাই নিতে পারে নি।

এঙ্গেলস এখানে, ১৮৭৭-এর ২২ সেপ্টেম্বর মিউনিকে জার্মান প্রকৃতিবিদ ও চিকিৎসকদের ৫০তম কংগ্রেসে রুডলফ ভিরচাও-এর ভাষণের উল্লেখ করেছেন।

১৮৭৮, ২৪ অক্টোবর পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে বিসমার্ক সরকার সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন প্রবর্তন করে। সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনে জার্মান সোস্যাল-ডিমোক্রাটিক পার্টি, অন্যান্য সমস্ত পার্টি সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়, নিষিদ্ধ করা হয় শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সোস্যাল-ডিমোক্রাটদের ওপর দমনপীড়ন চলে। তবে মার্কস ও এঙ্গেলসের সক্রিয় সাহায্যে সোস্যাল-ডিমোক্রাটিক পার্টি তার কর্মীদের মধ্যে থেকে সুবিধাবাদী ও 'অতিবাম' সদস্যদের পরাজিত করতে সমর্থ হয় এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনটি কার্যকর থাকার সময়ে আইনসম্মত সুযোগগুলির সঙ্গে বেআইনি কাজকর্মের সঠিক সমন্বয় ঘটাতে পারে আর এইভাবে জনগণের মধ্যে তার প্রভাব বাড়াতে ও প্রসারিত করতে পারে। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে ঐ আইনটি ১৮৯০-এর ১ অক্টোবর প্রত্যাহার করে নেওয়া

হয়। এঙ্গেলস তাঁর 'বিসমার্ক ও জার্মান ওয়ার্কার্স' পার্টি, নিবন্ধে আইনটির মূল্যায়ণ করেন।

৬ হোলি অ্যালায়েন্স—বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে দমন এবং বিভিন্ন দেশের সামন্ত রাজন্যবর্গকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জারের রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত ইউরোপীয় নৃপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল আঁতাত।

৭ কার্ল মার্কস, মিজারে ডে লা ফিলসফি ('দর্শনের দারিদ্র'), পারী-ব্রাসেলস, ১৮৪৭। মেনিফেস্ট ডের কমিউনিস্টিশ্চেন পার্টেই, লণ্ডন, ১৮৪৮। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে, 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' শিরনামে। কার্ল মার্কস, ডাস ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, হামবুর্গ, ১৮৬৭।

৮ ইউগেন ড্যুরিং, ১৮৬৩ সাল থেকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ; ১৮৭৩ সাল থেকে মেয়েদের বে-সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৮৭২ সালের পর থেকে তিনি তাঁর লেখাপত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তীব্র সমালোচনা করতেন। যেমন, তিনি তাঁর 'বলবিদ্যার সাধারণ সূত্রগুলির ইতিহাস বিচার' (১৮৭২, ১ম সংস্করণ) গ্রন্থে এইচ. হেলমহোলৎসকে এই মর্মে সমালোচনা করেন যে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে রবার্ট মায়ার-এর রচনাকে উপেক্ষা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতিনীতিকেও তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপকদের হাতে তাঁকে হয়রান হতে হয়। ১৮৭৬ সালে এই অধ্যাপকদের চাপের ফলেই মেয়েদের কলেজে তাঁর অধ্যাপনার পদটি পাওয়া সম্ভব হয় না। 'বলবিদ্যার ইতিহাসের' (১৮৭৭) দ্বিতীয় সংস্করণে এবং নারী শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা একটি গ্রন্থে (১৮৭৭) আরও তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি ঐ সমালোচনার পুনরাবৃত্তি করেন। ১৮৭৭-এর জুলাইয়ে দর্শন-বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাদানের অধিকারটি কেড়ে নেয়। এইভাবে বরখাস্ত হওয়ার ফলে তাঁর সমর্থকরা এক তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং গণতান্ত্রিক মতামতসম্পন্ন বহু মানুষ এর নিন্দা করেন। ১৮৮১ সাল থেকে বিসমার্কের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ই. শেভেনিগর ১৮৮৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

৯ এঙ্গেলসের বইটির প্রথম ফরাসি তর্জমা করেন লাফার্গ, Socialisme utopique et socialisme scientifique ('সমাজবাদ : ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক') শিরনামে, Revue Socialiste পত্রিকায় (সংখ্যা ৩-৫, মার্চ-মে, ১৮৮০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ; বইটি ঐ বছরই একটি পৃথক সংস্করণ হিসাবে পারীতে প্রকাশিত হয়। পোলিশ সংস্করণটি বার হয় ১৮৮২ সালের জেনিভাতে, ইতালীয় সংস্করণটি বার হয় ১৮৮৩ সালে বেনেভেন্তো শহরে। বইটির প্রথম জার্মান সংস্করণ Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wsssenschaft ('ইউটোপিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে বিবর্তন') প্রকাশিত হয় ১৮৮২-র হটিংগেন-জুরিখ শহরে এবং অবিকল দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঐ একই শহর থেকে ১৮৮৩ সালে। রুশ ভাষায় বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৮২, ডিসেম্বরে, 'ছাত্র' নামের বে-আইনী পত্রিকার ১নং সংখ্যায়, তখন এর নাম হয় Nauchny sotsializm ('বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ') ; ১৮৮৪ সালে জেনিভাতে শ্রম-মুক্তি গোষ্ঠী Razvitiye nauchnogo sotsializma ('বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের বিবর্তন') নামে বইটির একটি পৃথক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ডেনিশ সংস্করণ বার হয় কোপেনহেগেন-এ, ১৮৮৫ সালে।

১০ লুইস এইচ. মর্গান-এর মৌলিক গ্রন্থ Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilisation, লণ্ডন, ১৮৭৭।

১১ ১৮৬৯, ১ জুলাই মাঞ্চেস্টারের ব্যবসায়ীর বাড়ি ছেড়ে এঙ্গেলস ১৮৭০, ২০ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে চলে যান।

১২ জাস্টাস লাইবিগ কৃষি রসায়নের ওপর তাঁর মৌলিক গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'রসায়ন একটা অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রসায়নবিদরা একটা নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছেন। প্রথম ডানা নিয়ে উড়তে না পেরে, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু নতুন ডানা গজাবার পর আবার ওড়া শুরু হয়েছে, আরও জোরের সঙ্গে, আরও স্বচ্ছন্দে।' (Chemistry in its Application to Farming and Physiology, সপ্তম সংস্করণ, ব্রাউনশভেগ, ১৮৭২, খণ্ড ১, পৃ ২৬)।

১৩ ১৮৮০, ৬ নভেম্বর, মার্কসের কাছে লেখা জার্মান সোস্যাল ডিমোক্রাট হাইনরিখ ভিলহেলম ফ্রেবিয়ান-এর পত্র প্রসঙ্গ।

১৪ এঙ্গেলস এখানে 'হেকেলের চতুর্থ বক্তৃতার শেষ অংশ 'গ্যয়েটে ও বিবর্তনের ওকেন তত্ত্ব' প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন, হেকেলের গ্রন্থে Naturliche Schopfungs-geschichte, চতুর্থ সংস্করণ, বার্লিন, ১৮৭৩, পৃ ৮৩-৮৮।

১৫ এঙ্গেলস তাঁর ডায়ালেকটিকস অফ নেচার-এর 'গতির মৌল রূপগুলি' শীর্ষক অধ্যায়ে হেগেল ও হেলমহোলৎস-এর বক্তব্য পর্যালোচনা করেছেন।

১৬ কান্ট-এর নীহারিকা তত্ত্ব সম্বন্ধে ২৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
জোয়ার-ভাটার ঘর্ষণ সংক্রান্ত কান্টীয় তত্ত্বের জন্যে এঙ্গেলস-এর ডায়ালেকটিকস অফ নেচার-এর 'জোয়ার-ভাটার ঘর্ষণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭ প্রসঙ্গ-সূত্র: এঙ্গেলসের ডায়ালেকটিকস অফ নেচার ও মার্কসের গাণিতিক পাণ্ডুলিপি। ১০০০ শীট কাগজে লেখা এই পাণ্ডুলিপি-গুলি রচিত হয় ১৮৫০-এর দশকের শেষে এবং ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে।

১৮ আইরিশ পদার্থবিদ টমাস অ্যানড্রুজ (১৮৬৯), ফরাসি পদার্থবিদ লুই-পল কলিয়েতেত ও সুইস পদার্থবিদ রাউল পিকটেট-এর (১৮৭৭) রচনাবলীর প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯ প্রথমটি প্লাটিপাস (অস্ট্রেলিয়ার এক ধরনের জন্তু) ও দ্বিতীয়টি আর্কিও-পেট্রিক্স (এক ধরনের পাখি) সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

২০ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সেলুলার প্যাথোলজি' গ্রন্থে ভিরচাও এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন যে প্রাণীদেহ কলাতে বিভক্ত, কলা কোষ-অঞ্চলে বিভক্ত, কোষ অঞ্চল কোষে বিভক্ত, যার ফলে একটি প্রাণী শেষ পর্যন্ত পৃথক পৃথক কোষের যান্ত্রিক সমষ্টিতে পরিণত হয়।
এই তত্ত্বের 'প্রগতিশীল' চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস জার্মানির বুর্জোয়া প্রগতিশীল পার্টিতে ভিরচাও-এর সদস্যপদের উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন এই পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও একজন উল্লেখযোগ্য নেতা। ১৮৮৬-র জুন মাসে এই পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির কর্মসূচিতে

বিশেষ করে দাবি করা হয়েছিল প্রাশীয় কর্তৃত্বাধীনে জার্মানির একীকরণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োগ।

২১ রুশোর তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ প্রথমে বর্বর অবস্থায় বসবাস করত, যেখানে সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব এবং সম্পত্তির বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অবস্থা থেকে সভ্য অবস্থায় সমাজের উত্তরণ ঘটতে থাকে এবং সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অসাম্য গভীরতর হতে থাকায় সামাজিক চুক্তি লঙ্ঘিত হয় এবং নতুন একটা নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। নতুন সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র এই নিপীড়ন দূর করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২২ দেনিস দিদেরো-র Le reveu de Remeau বইটি লেখা হয় ১৭৬২ সালে, পরবর্তীকালে লেখক এর দুবার সংশোধন করেন। গ্যয়েটে-র জর্মান অনুবাদে এটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৫ সালে, লাইপজিগে। প্রথম ফরাসি সংস্করণ oeuvres inedites de Diderot ("দিদেরো-র অপ্রকাশিত রচনাবলী") মুদ্রিত হয় প্যারীতে, ১৮২১ সালে, তবে এর প্রকাশ ঘটে ১৮২৩-এ।

২৩ বিজ্ঞানের আলেকজান্দ্রীয় কালপর্বটি হচ্ছে খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক পর্যন্ত। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর নামে এর নামকরণ হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এই নগরীটি ছিল তৎকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র। আলেকজান্দ্রীয় যুগে গণিত, বলবিদ্যা (ইউক্লিড, আর্কিমিডিস), ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ও অন্যান্য বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে।

২৪ দ্য বাইবেল, মথি-লিখিত মঙ্গল সমাচার, পঞ্চম অধ্যায়, ৩৭ স্তবক, পৃ ৩১।

২৫ কান্টের নীহারিকা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি আদিতম নীহারিকা থেকে সৌর জগতের উদ্ভব ঘটেছে। কান্ট তাঁর General History of Nature and the Theory of the Heavens, or an Experiment at Expounding the Arrangement and Mechanical Origin of the Whole Universe After the Principles of Newton গ্রন্থে (জার্মান ভাষায়) এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন। কোনিংসবার্গ

ও লাইপজিগ, ১৭৫৫। প্রকাশের সময় বইটিতে লেখকের নাম ছিল না।

সৌর জগতের উৎপত্তি-সংক্রান্ত লাপ্লাসীয় প্রকল্পটি প্রথম স্থান পায় Exposition du systeme du monde ('বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকাশ') গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে। খণ্ড ১-২, পারী, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ বর্ষ (১৭৯৬)। বইটির শেষ চতুর্থ সংস্করণ, লাপ্লাস-এর জীবদ্দশায় প্রস্তুত হলেও, ১৮৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বইটির শেষে একটি টীকার মধ্যে এই প্রকল্পটি স্থান পেয়েছে।

কাণ্ট লাপ্লাস-এর নীহারিকা তত্ত্বে যে আদিতম নীহারিকা অনুমান করা হয়েছিল, উজ্জ্বল গ্যাসীয় পদার্থের অস্তিত্ব, (কাণ্ট-লাপ্লাসীয় নীহারিকা তত্ত্বে অনুমিত আদি নীহারিকার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৬৪ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হিউগিনস প্রমাণ করেন। এই জ্যোতির্বিদ বর্ণালীবিশ্লেষণ পদ্ধতি (১৮৫৯ সালে গুস্তাভ কিরচভ ও রবার্ট বুনসেন কর্তৃক উদ্ভাবিত) জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

২৬ 'সমাজবাদ : ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' গ্রন্থটির প্রথম জার্মান সংস্করণেই (১৮৮২) এঙ্গেলস এই বক্তব্যটিকে নিম্নোক্ত ভাষায় মূলগত পার্থক্য সূচিত করেন : '…অতীতের সমস্ত ইতিহাসই হচ্ছে, আদিম স্তরগুলির ইতিহাস বাদে, শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস…'। মার্কস ও এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, মস্কো, খণ্ড ৩, ১৯৭৬, পৃ ১৩২।

২৭ ই. ড্যুরিং-এর জার্মান ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা।

২৮ ফ্যালানস্টিরিজ : এক ধরনের বাড়ি। ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী চার্লস ফুরিয়ের ধারণা অনুযায়ী, উৎপাদক-ভোক্তা সমবায়ের সদস্যরা এইরকম বাড়িতে বসবাস করবে।

২৯ জি. ডাবলিউ. এফ. হেগেল : 'দর্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ।' হাইডেলবার্গ, ১৮৭১। এই গ্রন্থের তিনটি অংশ : (ক) তর্কবিদ্যা, (খ) প্রকৃতির দর্শন, (গ) মনোদর্শন।

এঙ্গেলস অ্যান্টি-ড্যুরিং গ্রন্থে হেগেলের 'রচনাবলী' সংস্করণটি ব্যবহার করেছেন। হেগেলের মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্ররা এটা প্রকাশ করেন।

৩০ এঙ্গেলস মাইকেলেটকে 'হেগেলীয় সম্প্রদায়ের যাযাবর ইহুদি' আখ্যা দিয়েছিলেন এই কারণেই যে এই ভদ্রলোকের হেগেল-দর্শনের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য সত্ত্বেও, এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল ভাসা-ভাসা। যেমন, ১৮৭৬ সালে তিনি পাঁচ খণ্ডে 'দর্শন-তন্ত্র' প্রকাশ করতে শুরু করেন, যার কাঠামো ছিল হেগেলের 'বিশ্বকোষে'র অবিকল প্রতিরূপ।

৩১ ১৮৮৫ সালে এঙ্গেলস যখন অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন, তখন তিনি এখানে একটি টীকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যার রূপরেখা (On the Prototypes of the Mathematical Infinite in the Real World) তিনি পরবর্তীকালে ডায়ালেকটিকস অফ নেচার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন (এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৩২ প্রাশীয়দের দাসসুলভ বশ্যতার কথা এখানে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৪৮-এর ৫ ডিসেম্বর প্রাশিয়ার রাজা সংবিধান অনুমোদন করে যেভাবে প্রাশিয়ার সংবিধান পরিষদ বাতিল করে দিয়েছিলেন, প্রাশিয়ার জনগণ সেটা মেনে নেয়। প্রতিক্রিয়াশীল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারন ম্যানটিউফেল নিজে অংশগ্রহণ করে যে সংবিধান রচনা করেন, ১৮৫০-এর ৩১ জানুয়ারি চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম তা অনুমোদন করেন।

৩৩ হেগেল, 'দর্শনসংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ', অনুচ্ছেদ ১৮৮ দ্রষ্টব্য ; এছাড়া 'তর্কবিদ্যার বিজ্ঞান', ভাগ ৩, খণ্ড ১, অধ্যায় ৩ দ্রষ্টব্য।

৩৪ অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর প্রথম ভাগে এই ধরনের যাবতীয় প্রসঙ্গ-সূত্র নেওয়া হয়েছে ড্যুরিং-এর 'কোর্স অফ ফিলসফি' থেকে।

৩৫ উনিশ শতকের অনেকগুলি বড় বড় যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস।
অস্টারলিৎস-এর যুদ্ধঃ ডিসেম্বর ২, ১৮০৫, এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন সম্মিলিত রুশ-অস্ট্রিয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন।
জেনার যুদ্ধঃ অক্টোবর ১৪, ১৮০৬, এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন প্রাশীয় সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেন। এরপরই প্রাশিয়া নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে।
কোনিগ্রাৎস-এর যুদ্ধঃ জুলাই ৩, ১৮৬৬, বোহেমিয়াতে, এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া ও স্যাক্সনির সেনাবাহিনীকে চূড়ান্ত-

ভাবে পরাজিত করে, যার ফলে ১৮৬৬-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া বিজয়ী হয়। সাডোভার যুদ্ধ হিসাবেও এটা পরিচিত।

সেডানের যুদ্ধ ঃ সেপ্টেম্বর ১-২, ১৮৭০। এই যুদ্ধে প্রাশীয় বাহিনী ম্যাকমাহনের পরিচালিত ফরাসি বাহিনীকে পরাজিত করে, যার ফলে তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৮৭০-৭১-এর ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধে এটাই ছিল চূড়ান্ত লড়াই।

৩৬ জি. ডাবলিউ. এফ. হেগেল, 'তর্কবিদ্যার বিজ্ঞান', খণ্ড ১-৩, নুরেমবার্গ, ১৮১২-১৬, খণ্ড ১—'বিষয়গত তর্কবিদ্যা. সত্তার তত্ত্ব' (১৮১২ সালে প্রকাশিত ; খণ্ড ২—'বিষয়গত তর্কবিদ্যা, স্বরূপের তত্ত্ব' (১৮১৩ সালে প্রকাশিত) ; খণ্ড ২—'বিষয়ীগত তর্কবিদ্যা অথবা ধারণার তত্ত্ব' (১৮১৬ সালে প্রকাশিত)

৩৭ হেগেল, 'দর্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ', অনুচ্ছেদ ৯৪।

৩৮ ইমানুয়েল কান্ট, kritik der reinen vernunft. 1781

৩৯ অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, বিশেষ করে বহুমাত্রিক দেশের (space) জ্যামিতি সম্বন্ধে প্রখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডারিক গাউস-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে ড্যুরিং-এর সমালোচনার প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪০ হেগেল, 'তর্কবিদ্যার বিজ্ঞান', ২য় ভাগ, 'স্বরূপের তত্ত্ব'-এর সূচনা ' নব্য-শেলিংবাদের 'ধারণাতীত সত্তা'র সূত্রটির জন্যে এঙ্গেলসের 'শেলিং ও রহস্যোদ্ঘাটন' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৪১ দেকার্ত তাঁর 'আলোক সংক্রান্ত গবেষণা'র মধ্যে গতির পরিমাণ সংরক্ষণের ধারণাটি উপস্থিত করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় আমস্টারডামে, ১৬৪৪ সালে।

৪২ উদ্ধৃতির মধ্যে উল্লিখিত গ্রহটি হচ্ছে নেপচুন। বার্লিন মানমন্দিরের যোহান গেলে ১৮৪৬ সালে গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

৪৩ পরবর্তীকালে নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ হচ্ছে ১০০° সেন্টিগ্রেড, যা ৫৩৮'৯ ক্যাল/জি-র সমতুল্য।

৪৪ অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করার সময় এঙ্গেলস এই সম্বন্ধে একটা টীকা দিতে চেয়েছিলেন। এই সংক্রান্ত খসড়াটি পরবর্তীকালে ডায়ালেকটিকস অফ নেচার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই

গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'প্রকৃতি সম্বন্ধে "যান্ত্রিক ধারণা" প্রসঙ্গে' রচনাটি দ্রষ্টব্য।

৪৫ চার্লস ডারউইন, দা ওরিজিন অফ স্পিসিজ বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন, অর দ্য প্রিজারভেশন অফ ফেভার্ড রেসেজ ইন দ্য স্ট্রাগল ফর লাইফ, ষষ্ঠ সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৭২, পৃ ৪২৮। ডারউইনের নিজের দ্বারা সংশোধিত ও বর্ধিত এটাই শেষ সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় লণ্ডনে, ১৮৫৯ সালে।

৪৬ আর্নস্ট হেকেল, দ্য ন্যাচারাল হিস্টরি অফ ক্রিয়েশন। অভিব্যক্তিবাদ এবং ডারউইন, গায়েটে ও লামার্ক-এর অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে জনবোধ্য বক্তৃতামালা। ৪র্থ সংস্করণ, বার্লিন, ১৮৭৩। প্রথম সংস্করণ: ১৮৬৮।

প্রটিস্টা (গ্রীক প্রটিস্টস—যার অর্থ প্রথম), হেকেলের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী সরল জৈবদেহের বৃহৎ গোষ্ঠী। এককোষী ও বহুকোষী উভয় ধরনেরই হয়। বহু কোষী জৈবরূপের দুটি জগতের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) পাশাপাশি একটা বিশেষ, জৈব-প্রকৃতির তৃতীয় জগতেরও অস্তিত্ব রয়েছে।

মনেরা (গ্রীক মনেরেস—অর্থ একক)—হেকেলের মতে মনেরা অ্যালবুমেনের অবয়বহীন বস্তু, নিউক্লিয়স না থাকলেও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা চালায়: খাদ্যগ্রহণ, গমন, উত্তেজনার প্রতি সাড়া প্রবণতা, বংশবৃদ্ধি। হেকেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাত আদি মনেরা, বর্তমানে লুপ্ত, এবং আধুনিক, বর্তমানে অস্তিত্ববান মনেরার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। আদি মনেরা থেকে জৈব প্রকৃতির তিনটি জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আদি মনেরা থেকে উদ্ভব ঘটেছে কোষের। আধুনিক মনেরার অস্তিত্ব রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে। হেকেল যাকে প্রটিস্টা বলে অভিহিত করেছিলেন, বর্তমানে সেই জৈবদেহগুলিকে উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপভাবে মনেরার অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় নি। তবে কোষহীন অবস্থা থেকে কোষযুক্ত জৈবদেহের অভিব্যক্তির সাধারণ ধারণাটি এবং প্রাথমিক জৈবদেহের উদ্ভিদ ও প্রাণীতে বিভাজনের ধারণাটি বিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৪৭ নিবুলাং-এর আংটি—রিচার্ড ভাগনারের চারখানি বৃহৎ নাটক: 'রাইনগোল্ড', 'ফলকায়ার', 'সিগফ্রিড' এবং 'ডেথ অফ দ্য গডস'।

এঙ্গেলস এখানে রিচার্ড ভাগনারকে রসিকতা করে 'ভাবীকালের সঙ্গীতারচয়িতা' আখ্যা দিয়েছেন। ভাগনারের বিরোধীরা তাঁর সঙ্গীতকে 'ভাবীকালের সঙ্গীত' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

৪৮ জুফাইটাস (উদ্ভিদ-প্রাণী)—একগুচ্ছ অমেরুদণ্ডী প্রাণী (প্রধানত স্পন্‌জ, পরাশ্রয়ী জলচর প্রাণী এবং জেলিফিশ, প্রবাল কীট ইত্যাদি), যারা উদ্ভিদের লক্ষণযুক্ত। ষোড়শ শতক থেকে এদের এই নামে অভিহিত করা হয়। এগুলিকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যবর্তী রূপ হিসাবে গণ্য করা হতো। বর্তমানে এই নামটি বর্জিত।

৪৯ হাকস্‌লি-র 'লেকচারস অন দ্য এলিমেন্টস অফ কম্পারেটিভ অ্যানাটমি' গ্রন্থে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

৫০ ট্রাউবে-র কৃত্রিম কোষ—অজৈব গঠন, বিপাকক্রিয়া ঘটাতে ও বৃদ্ধিতে সক্ষম জৈবকোষের প্রতিরূপ। জৈব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের গবেষণায় কাজে লাগে। জার্মান রসায়নবিদ ও শারীরবিদ্যাবিদ মরিৎস ট্রাউবে এটা সৃষ্টি করেন কোলাইডল সলিউশনের মিশ্রণ ঘটিয়ে। মার্কস ও এঙ্গেলস ট্রাউবে-র আবিষ্কারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

৫১ এখানে এঙ্গেলস, ১৮৭৬, ১৬ নভেম্বর-এ 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের বিষয়বস্তু উপস্থিত করেছেন। ১৮৭৬-এর ৩ সপ্টেম্বর ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত রুশ প্রকৃতিবিদ ও চিকিৎসকদের ৫ম কংগ্রেসে ডি. আই. মেণ্ডেলিয়েভ-এর পঠিত নিবন্ধটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। মেণ্ডেলিয়েভ তাঁর নিবন্ধে নিজের পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করেন। বয়েল মারিয়োত্তি র সূত্র যাচাই করে দেখার জন্যে ১৮৭৫-৭৬ সালে তিনি জে. জে. বোগিউস্কি-র সঙ্গে যৌথভাবে এই পরীক্ষা চালান।

এঙ্গেলস স্পষ্টতই এই টীকাটি লিখেছিলেন, অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর এই অধ্যায়টির প্রুফ দেখার সময়। অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর এই অংশটি ফোরভার্টস পত্রিকার ২৮ ফেব্রুয়ারির (১৮৭৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। টীকার শেষ অংশটি অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের সময়, ১৮৮৫ সালে যোগ করা হয়।

৫২ গ্যয়েটে, ফাউস্ট, প্রথম ভাগ, ৩য় দৃশ্য।

৫৩ দ্য বাইবেল, মোজেজ-এর ২য় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২০, শ্লোক ১৫ এবং মোজেজ-এর ৫ম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ৫, শ্লোক ১৯।

৫৪ গ্যয়েটে, ফাউস্ট, প্রথম ভাগ, ২য় ও ৩য় দৃশ্য।

৫৫ রুশোর 'মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উৎপত্তি ও ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা'। গ্রন্থটি লেখা হয় ১৭৫৪ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ সালে (২১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫৬ তিরিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের (১৬১৮-৪৮) সূচনা হয় প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে। জার্মানি হয়ে ওঠে এই যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র এবং যুদ্ধমানদের সামরিক লুঠতরাজ ও ভূখণ্ড দখলদারির লক্ষ্য।

৫৭. জারতন্ত্রী রাশিয়ার মধ্য এশিয়া দখলের সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে, এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৮ এঙ্গেলস এখানে মার্কসের ক্যাপিটাল, খণ্ড ১ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মস্কো সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ ৬৫।

৫৯ কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭৪, পৃ ৬৫।
এঙ্গেলস তাঁর অ্যান্টি-ড্যুরিং-এ ক্যাপিটাল-এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ, খণ্ড ১ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর তৃতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, দশম অধ্যায় সংশোধনের সময়ে তিনি তৃতীয় জার্মান সংস্করণটি (খণ্ড ১) ব্যবহার করেছেন।

৬০ লাসালে দলিল সমেত একটা ক্যাশবাক্স চুরিতে প্ররোচিত করার অভিযোগে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন। কাউন্টেস সোফিয়া হাৎসফেল্ড-এর বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় এই দলিলগুলি ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই মামলার আইনী পরামর্শদাতা। লাসালের বিচার হয় ৫-১১ আগস্ট, ১৮৪৮ সালে। জুরিরা তাঁকে মুক্তি দেন।

৬১ কোড পেনাল—১৮১০ সালে ফরাসি পেনাল কোড বা ফৌজদারি বিধি গৃহীত হয়। ফ্রান্স এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির ফরাসি-অধিকৃত অঞ্চলে এটা কার্যকর করা হয় ১৮১০ সালে; ১৮১৫ সালে প্রাশিয়া রাইন প্রদেশ দখল করার পরেও দেওয়ানি বিধির পাশাপাশি এটাও প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে

প্রাশিয়ার সরকার এই প্রদেশটিতে প্রাশীয় আইন-কানুন প্রবর্তন করার চেষ্টা চালায়। এইসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ শুরু হয় এবং মার্চ বিপ্লবের ১৮৪৮; ১৫ এপ্রিলের এক ডিক্রির বলে এগুলি বাতিল হয়ে যায়।

৬২ কোড নেপোলিয়ন—১৮০৪ সালে গৃহীত ফরাসি দেওয়ানি বিধি। এঙ্গেলস তাঁর 'লুডভিগ ফয়েরবাখ এবং ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান' বইয়ে এটাকে 'বুর্জোয়া সমাজের আদর্শ আইনবিধি' আখ্যা দিয়েছিলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩, মস্কো, ১৯৭৭, পৃ ৩৭১।
এখানে ব্যাপকার্থে এই বিধির কথা বলার সময় এঙ্গেলসের মনে এসেছিল নেপোলিয়নের সময়ে গৃহীত পাঁচটি বিধি: দেওয়ানি, দেওয়ানির কার্যধারা, বাণিজ্যিক, অপরাধমূলক ও অপরাধমূলক কার্যধারা।

৬৩ স্পিনোজা-এথিকস। চূড়ান্ত কারণ হিসাবে 'দৈব দূরদর্শিতা'র দ্বারা সবকিছু নির্ধারিত হয়—এই ধর্মীয় পরমকারণবাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই যাদের একমাত্র হাতিয়ার—তাদের বিরুদ্ধে স্পিনোজা এই উক্তিটি করেছিলেন।

৬৪ কর্পাস জুরিস সিভিলিস—রোমান দাস-মালিকদের সমাজে সম্পত্তি-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী দেওয়ানি নিয়মগুলির বিধি; ৬ষ্ঠ শতকে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময়ে এই বিধি রচিত হয়। এঙ্গেলস তাঁর 'লুডভিগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান' বইয়ে এই বিধিকে 'পণ্যোৎপাদক সমাজের প্রথম বিশ্ব-আইন' বলে অভিহিত করেন। মার্কস, এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ ৩৭০।

৬৫ প্রাশিয়াতে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু রেজেস্ট্রি করার বাধ্যতামূলক আইন পাশ হয় বিসমার্কের উদ্যোগে; এটা ১৮৭৪ এর ৯ মার্চে গৃহীত হয়ে ১ অক্টোবর চালু হয়। ১৮৭৫-এর ৬ ফেব্রুয়ারি অনুরূপ একটি আইন জারি করা হয় সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের জন্যে। গির্জা এই ধরনের রেজেস্ট্রি করার অধিকার হারায়, আর এর ফলে তার প্রভাব ও আয় হ্রাস পায়। এই আইনটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্যাথলিক গির্জার প্রভাব

কমানো। বিসমার্কের তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক উদ্যোগের' এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৬৬ ব্রাণ্ডেনবার্গ, পূর্ব প্রাশিয়া, পশ্চিম প্রাশিয়া, পোজনান, পোমারেনিয়া ও সাইলেশিয়া প্রদেশ সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে ; ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস পর্যন্ত এগুলি ছিল প্রাশিয়া রাজ্যের অংশ। আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সবচেয়ে উন্নত রাইন প্রদেশ এগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই প্রদেশটি ১৮১৫ সালে প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬৭ ব্যক্তিগত সমীকরণ—পর্যবেক্ষকের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-পথ নির্ধারণে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রহ-নক্ষত্রের ধরা-বাঁধা পথ অতিক্রম করার মুহূর্ত গণনায় যে-ভ্রান্তি ঘটে, তাকেই ব্যক্তিগত সমীকরণ বলা হয়।

৬৮ হেগেল 'দর্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ', ১৪৭ অনুচ্ছেদ, পরিশিষ্ট।

৬৯ মার্কস তাঁর প্রধান অর্থনীতিক গ্রন্থটি রচনার মধ্যেই বারবার এর পরিকল্পনা সংশোধন করেন। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর থেকে, ১৮৬৭ সালের পরে, মার্কস পরিকল্পনা করেছিলেন যে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তিনি তিন খণ্ডে চারটি পৃথক বই হিসাবে প্রকাশ করবেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইটি একত্র করে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। মার্কসের মৃত্যুর পর, এঙ্গেলস দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইগুলিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হিসাবে প্রকাশ করেন। শেষ বই, থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু (ক্যাপিটালের চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশিত হয় এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর।

৭০ Enganzungsblatter Zur Kenntniss der Gegenwart পত্রিকাটি ১৮৬৭ সালে মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের ড্যুরিং-কৃত সমালোচনা প্রকাশ করে।

৭১ 'নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্সের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত স্মৃতিচারণ। নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্ট হেলেনায় বন্দী দশায় থাকা সেনাপতিবৃন্দ কর্তৃক লিখিত।' ১৮২৩-এ প্যারীতে প্রকাশিত।

৭২ প্রসঙ্গ-সূত্র : রুশোর 'ডিসকোর্স'। ১৭৫৪।

৭৩ আর্নেস্ট হেকেল, Naturliche Schopfungsgeschichte, ৪র্থ সংস্করণ, বার্লিন, ১৮৭৩, পৃ ৫৯০-৯১। হেকেলের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে হোমো স্যাপিয়ান্সদের ঠিক পূর্ববর্তী পর্যায় হচ্ছে আলালি। আলালি হচ্ছে 'ভাষাহীন আদিম মানুষ' কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে এপম্যান (পিথেক্যানথ্রোপি)। হেকেলের অনুমান অনুসারে অ্যানথ্রোপয়েড এপ ও আধুনিক মানবজাতির মধ্যে আরও একটা অন্তঃবর্তী রূপ ছিল; ওলন্দাজ নৃতত্ত্ববিদ ই. দুবোইস জাভাতে ১৮৯১ সালে মানুষের যে জীবাশ্মের সন্ধান পান, তার মধ্যে দিয়ে এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

৭৪ ১৬৭৪, সালের ২ জুন, জারিখ জেলাস-এর কাছে লেখা স্পিনোজার চিঠির মধ্যে 'ডিটারমিনেশিও এস্ত নেগেশিও' কথাটি পাওয়া যায়। (বারুচ স্পিনোজা, 'চিঠিপত্র', পত্রসংখ্যা ৫০)। সেখানে এটা ব্যবহৃত হয়েছে 'নেতিকরণের নির্ধারক' হিসাবে। 'ওমনিস ডিটার-মিনেশিও এস্ত নেগেশিও' কথাটি ও 'প্রতিটি নির্ধারকই একটি নেতিকরণ'—এই অর্থে তার ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায় হেগেলের রচনাবলীর মধ্যে।

৭৫ রোমক কবি জুভেনাল-এর প্রথম ব্যঙ্গ রচনা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে।

৭৬ অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয় ভাগের যাবতীয় টীকার প্রসঙ্গ-সূত্র হচ্ছে ড্যুরিং-এর এ কোর্স অফ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোস্যাল ইকোনমির দ্বিতীয় সংস্করণ। একমাত্র দশম অধ্যায় এর ব্যতিক্রম।

৭৭ আত্মমর্যাদাহীন সংবাদপত্র—সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া-শীল সংবাদপত্র।

৭৮ অর্থাৎ ড্যুরিং-এর এ কোর্স অফ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোস্যাল ইকোনমির দ্বিতীয় সংস্করণে।

৭৯ এঙ্গেলস এখানে শেকসপীয়রের 'রাজা চতুর্থ হেনরি' (প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংক, ৪র্থ দৃশ্য) নাটকের ফলস্টাফের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

৮০ এখানে প্রসঙ্গ-সূত্র হচ্ছে অগাস্তিন থিয়েরি, ফ্রাঁসোয়া পিয়েরি গুইজো, ফ্রাঁসোয়া অগুস্তে মিগনেত ও লুই অ্যাডলফি থিয়েস।

৮১ এঙ্গেলস সম্ভবত এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন জার্মান লেখক ভাকমুথ-এর (এ স্টাডি অফ হেলেনিক অ্যান্টিকুইটি ফ্রম দ্য ভিউপয়েন্ট অফ ইটস স্টেট সিস্টেম, ১৮২৯, পৃ ৪৪) গ্রন্থ থেকে।

গ্রেকো-পার্শিয়ান যুদ্ধের সময়ে করিন্থ ও অ্যাজিনাতে দাসদের সংখ্যার উৎস-গ্রন্থ হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক লেখক অ্যাথেনাউস-এর 'সোফিস্টদের ভোজ' বইটি।

৮২ এঙ্গেলসের ব্যবহৃত বইটি হচ্ছে জি. হ্যানসেন-এর জার্মান ভাষায় লেখা ভিলেজ কমিউনিটিস (হেরিডিটারি অ্যাসোসিয়েশনস) ইন ট্রিয়ের রিজিয়ন, বার্লিন, ১৮৬৩।

৮৩ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৮৭১ ৭৩ সালে শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স জার্মানিকে যে ৫,০০০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক দিয়েছিল, এখানে তার কথা বলা হয়েছে।

৮৪ প্রশিয়ার লাণ্ডভেহ্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট গড়ে উঠত পরিণতবয়স্ক সক্ষম লোকদের নিয়ে। নিয়মিত সেনাবাহিনীতে কাজ করার পর এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকার শেষে এদের লাণ্ডভেহ্র-এর দায়িত্ব দেওয়া হতো। নেপোলিয়নকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে গণবাহিনী হিসাবে ১৮১৩-১৪ সালে প্রাশিয়াতে প্রথম লাণ্ডভেহ্র গড়ে তোলা হয়।

৮৫ ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রশিয়ান যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৮৬ সেন্ট প্রাইভাট-এর লড়াই, ১৮ আগস্ট, ১৮৭০, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে জার্মান বাহিনী ফরাসী রাইনস বাহিনীকে পরাজিত করে। এটাকে গ্রাভেলোত্তে-র লড়াইও বলা হয়।

এই লড়াইয়ে প্রাশীয় বাহিনীর যে বিপুল ক্ষতি হয়, সেই তথ্য এঙ্গেলস পেয়েছিলেন ১৮৭০-৭১-এর ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সরকারি ইতিহাস থেকে। প্রাশীয় সেনাপতিমণ্ডলীর সামরিক ইতিহাস বিভাগ এটা প্রস্তুত করে। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৮৭ ম্যাক্স জাহন-এর 'মোকিয়াভেলি ও বাধ্যতামূলক সৈন্যদল গঠনের ধারণা' নামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় কোলোনিশে সাইতুং-এর ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৫নং সংখ্যায়, এপ্রিল ১৮, ২২, ২৫ ও ৩০, ১৮৭৬।

কোলোনিশে সাইতুং—১৮০২ সালে কোলোন শেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র. প্রাশিয়ার উদারপন্থী বুর্জোয়াদের মুখপত্র।

৮৮ ১৮৫৩-৫৬ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—একদিকে রাশিয়া এবং অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স তুরস্ক ও সার্দিনিয়ার সমন্বয়ে গঠিত জাঁতাতের মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে। মধ্যপ্রাচ্যে এই দেশগুলির আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতই এর কারণ।

৮৯ এই টীকাটির শেষ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত বাক্যটি এঙ্গেলসের। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর তৃতীয় সংস্করণে তিনি এটা যোগ করেন।

৯০ ড্যুরিং তাঁর নিজের 'ডায়ালেকটিকস'কে 'প্রাকৃতিক' আখ্যা দিয়েছেন, হেগেলের 'অ-প্রাকৃতিক' ডায়ালেকটিকস থেকে এর পার্থক্য দেখাবার জন্যে।

৯১ গিওর্গ লুডভিগ মরিয়ের-এর রচনাবলীর (১২ খণ্ডে) মধ্যে মধ্যযুগীয় জার্মানির কৃষি, শহর ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯২ হাইনের কোবাস ১ কবিতা থেকে।

৯৩ হাইনরিখ-এর উপাধিটি এঙ্গেলস বিদ্রূপ করে পাল্টে দিয়েছেন।

৯৪ গাইয়ুস প্লিনি সেকেণ্ডাস, হিস্তোরিয়া ন্যাচারালিস (প্রাকৃতিক ইতিহাস)।

৯৫ প্রাশীয় সেনাবাহিনীর কাছে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম (৪র্থ)-এর নববর্ষের বাণী থেকে উদ্ধৃতি (১ জানুয়ারি, ১৮৯৪)। এই বাণীর সমালোচনা-মূলক পর্যালোচনার জন্যে মার্কসের 'নববর্ষের অভিনন্দন' দ্রষ্টব্য।

৯৬ এফ. ই. রোচাউ, 'ছোটদের বন্ধু (জার্মান ভাষায়)। গ্রামের স্কুলের পাঠ্য', ব্রাণ্ডেনবুর্গ উণ্ড লাইপজিগ, ১৭৭৬।

৯৭ প্রসঙ্গ-সূত্র: ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস', এর মধ্যে প্রাচীন গণিতের মূলসূত্রগুলি তিনি বিবৃত করেছেন।

৯৮ পি. জে. প্রুঁধো, 'সম্পত্তি কাকে বলে? কিংবা অধিকার ও ক্ষমতার নীতি-বিচার', পারী, ১৮৪০, পৃ ২।

৯৯ ডেভিড রিকার্ডো, 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সূত্র প্রসঙ্গে, এবং কর পদ্ধতি'। ৩য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮২১, পৃ ১।

১০০ শ্রমের 'সম্পূর্ণ' কিংবা 'সবটুকু ফসলে'র লাসালেপন্থী শ্লোগানের বিস্তৃত

পর্যালোচনা মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' নিবন্ধটির প্রথম অংশে রয়েছে।

১০১ রোমক নাট্যকার টেরেনটিয়াস-এর মিলনান্তক নাটক 'অ্যাদেলফো'-র সংক্ষিপ্তসার থেকে গৃহীত (পঞ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য)।

১০২ বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী, ইজরাইয়েলিরা জেরিকো অবরোধ করলে, জয়ঢাকের প্রচণ্ড আওয়াজে এর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ধসে পড়ে। (দ্য বাইবেল, দ্য বুক অফ জোশুয়া, অধ্যায় ৬)।

১০৩ বিশ্বস্ত এক্কার্ট—মধ্যযুগীয় জার্মান লোকগাথার একটি চরিত্র, অনুরক্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রহরী। টানহাউসার-সংক্রান্ত কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে এই প্রহরীটি ভেনাস পর্বতের পাদদেশে প্রহরায় থাকত এবং যারাই এই পর্বতের কাছে আসত, তাদের ভেনাসের মোহিনী শক্তির বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিত।

১০৪ মলিয়ের, বুর্জোয়া জেন্টিলহোমি, দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য।

১০৫ ফল্কসাইটুং—জার্মানির গণতান্ত্রিক দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৫৩ সাল থেকে বার্লিনে প্রকাশিত। ১৮৬০-এর ১৫ সেপ্টেম্বর, মার্কসের কাছে লেখা এক চিঠিতে এঙ্গেলস এর 'স্থূল দার্শনিকতা' সম্বন্ধে লিখেছেন।

১০৬ ড্যুরিং-এর 'জাতীয় আর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচারমূলক মৌল শিক্ষা' বইটির পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস।

১০৭ কার্ল মার্কস, মস্কো, ১৯৭০, পৃ ৫২। এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি। প্রথম ভাগ, পৃ ২৯।

১০৮ প্রসঙ্গ-সূত্র : মাক্স স্টার্নার-এর প্রধান গ্রন্থ দ্য ইগো অ্যাণ্ড হিজ ওন। ড্যুরিং-এর মতো স্টার্নারও ছিলেন আত্মম্ভরী।

১০৯ অ্যারিস্টটেলেস, ডে রিপাবলিক, প্রথম খণ্ড, নবম অধ্যায়। মার্কস এই অংশটি ক্যাপিটাল গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১১০ মার্কস প্লেটোর ডে রিপাবলিক-এর উল্লেখ করেছেন।

১১১ মার্কস জেনোফন-এর উল্লেখ করেছেন।

১১২ ডাবলিউ. রশার, 'জাতীয় আর্থব্যবস্থা', খণ্ড ১, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৫৮, পৃ ৮৬।

১১৩ অ্যারিস্টটলের রিপাবলিক। কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ১৫০-৫৫, ১৬২।

১১৪ মার্কস এখানে অ্যারিস্টটলের এথিকা নিকোমাটিয়ে-র উল্লেখ করেছেন; পঞ্চম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়।

১১৫ এফ লিস্ট, 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জাতীয় ব্যবস্থা', খণ্ড ১, ১৮৪১, পৃ ৪৫১, ৪৫৬।

১১৬ আন্তনিও সেরা, এ শর্ট ডিসকোর্স অন দ্য কজেজ কেপেবল অফ ব্রিঙ্গিং অ্যাবাউট অ্যান অ্যাবানডান্স অফ গোল্ড অ্যাণ্ড সিলভার ইন কান্ট্রিজ নট পজেজিং মাইনস অফ দেয়ার ওন, নেপলস, ১৬১৩।

১১৭ এ ডিসকোর্স অফ ট্রেড ফ্রম ইংল্যাণ্ড ইনটু দ্য ইস্ট ইণ্ডিজ, টমাস মান, লণ্ডন, ১৬০৯।

১১৮ উইলিয়াম পেটির এ ট্রিটিজ অন ট্যাক্সেস অ্যাণ্ড কনট্রিবিউশন বইটি নাম ছাড়াই ১৬৬২তে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এখানে ও অন্যত্র মার্কস বইটির ২৪-২৫ পৃ উল্লেখ করেছেন।

১১৯ প্রসঙ্গ-সূত্র: কেয়োনতালামকান কুই (অর এ ট্রাক্ট) কনসার্নিং মানি, উইলিয়াম পেটি এটা লেখেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-র উদ্দেশে, ১৬৮২ সালে এবং ১৬৯৫এ এটা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। মার্কস ১৭৬০-এর সংস্করণটি ব্যবহার করেছেন।

১২০ প্রসঙ্গ সূত্র ফরাসি রসায়নবিদ এ এল ল্যাভোশিয়ের-এর আর্থনীতিক রচনাবলী।

১২১ পি. বইসগিউল্লেবার্ত—এর গ্রন্থ।

১২২ জন ল, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ও অর্থবিনিয়োগকারী। মুদ্রার অনুপাতে স্বর্ণ মজুত না রেখেই রাষ্ট্র ব্যাংকনোট বাজারে ছেড়ে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে—তিনি এই অবাস্তব ধারণাটিকে বাস্তবে কার্যকর করার চেষ্টা করেন। ১৭১৬ সালে তিনি ফ্রান্সে একটি বেসরকারি ব্যাংক স্থাপন করেন; ১৭১৮ সালে এটা সরকারি ব্যাংকে পরিণত হয়। অপরিমিত ব্যাংকনোটের পাশাপাশি ল-এর ব্যাংক বাজারে প্রচলিত মুদ্রা তুলে নেয়। তার ফলে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকাবাজি এক অশ্রুতপূর্ব স্তরে পৌঁছায় এবং ১৭২০ সালে ব্যাংকটি ও ল-এর পদ্ধতি দেউলে হয়ে পড়ে।

১২৩ উইলিয়াম পেট্টি, এ ট্রিটিজ অন ট্যাক্সেজ অ্যাণ্ড কন্‌ট্রিবিউশনস, লণ্ডন, ১৬৬২, পৃ ২৮-২৯।

১২৪ ডাডলি নর্থ, ডিসকোর্সেস আপন ট্রেড, লণ্ডন, ১৬৯১, পৃ ৪।

১২৫ প্রসঙ্গ-সূত্র: ডেভিড হিউম, পলিটিক্যাল ডিসকোর্স, এডিনবরা, ১৭৫২।

১২৬ কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭৪, পৃ ১২৪-৪৮২।

১২৭ এখানে চার্লস মণ্টেস্কু, দ্য স্পিরিট অফ ল্জ বইটি পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এইটি ১৭৪৮ সালে জেনিভাতে প্রকাশিত হয়।

১২৮ ডেভিড হিউম, এসেজ অ্যাণ্ড ট্রিটিজেস অন সেভারল সাবজেক্টস, খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃ ৩০৩-০৪।

১২৯ কার্ল মার্কস, এ কনট্রিবিউশন টু দ্যা ক্রিটিক অফ পলি ক্যা'ল ইকোনমি, মস্কো, ১৯৭৫, প ১৬৩।

১৩০ ডেভিড হিউম এসেজ অ্যাণ্ড ট্রিটিজেস অন সেভারল সাবজেক্টস, খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃ ৩১৩।

১৩১ উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭৩৯।

১৩৫ ১৮৬৬ সালে বিসমার্ক, তাঁর উপদেষ্টা হেরমান ভ'গনারের মাধ্যমে, প্রাশীয় সরকারের জন্যে শ্রম সমস্যা সম্বন্ধে একটা স্মারকলিপি রচনা করতে ড্যুরিংকে অনুরোধ জানান। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপসরফার প্রবক্তা ড্যুরিং এই অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন। কিন্তু প্রথমে এটা প্রকাশিত হয় তাঁর অজ্ঞাতে ও পরে ভাগনারের নামে। ড্যুরিং কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ভাগনারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৮৬৮-তে তিনি মামলায় জেতেন। এই কলংকজনক মামলার চূড়ান্ত পর্যায়ে ডুরিং তাঁর দ্য ফেট অফ মাই মেমোরেণ্ডাম অন দ্য সোশ্যাল প্রব্লেম ফর দ্য প্রাশিয়ান মিনিস্ট্রি নামে লেখাটি প্রকাশ করেন।

১৩৬ এফ. সি. স্কোলোসার, 'জার্মান জনগণের জন্যে বিশ্ব-ইতিহাস', খণ্ড ১৭, ১৮৫৫, পৃ ৬৬।

১৩৭ উইলিয়াম ক্যাবেট, 'ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে' গ্রন্থে প্রটেস্টান্ট 'রিফর্মেশনের' ইতিহাস, লণ্ডন ১৮২৪।

১৩৮ কোয়েসনে-র তাবলো ইকোনমিক প্রথম প্রকাশিত হয় পুস্তিকাকারে, ১৭৫৮ সালে।

১৩৯ কোয়েসনের রচনা অ্যানালাইজ দ্য তাবলো ইকোনমিক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৬৬ সালে, ফিজিওক্রাটদের কৃষি, বাণিজ্য, অর্থ সংক্রান্ত সাময়িকপত্রে।

১৪০ L'abbe Baudeau's Explicatian du Tableau economique মার্কস লেখাটির শেষ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন।

১৪১ 'কালো ঘোড়া', হোরেস-এর গীতিকাব্য থেকে।

১৪২ লিভরে তুরনৈ, তুর শহরের নামাংকিত ফরাসি মুদ্রা। ১৭৪০-এর পর থেকে এক ফ্রাংকের সমতুল্য। ১৭৯৫ সালে এর বদলে ফ্রাংক প্রচলিত হয়।

১৪৩ ফিজিওক্রাটস, খণ্ড ১, পারী, ১৮৪৬, পৃ ৬৮।

১৪৪ প্রসঙ্গ-সূত্র: জেমস স্টুয়ার্ট এর অ্যান এনকোয়ারি ইনটু দ্য প্রিন্সিপলস অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি, দুই খণ্ডে, লণ্ডন, ১৭৬৭।

১৪৫ হেনরি চার্লস ক্যারি, দ্য পাস্ট, দ্য প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড দ্য ফিউচার, ফিলাডেলফিয়া, ১৮৪৮, পৃ ৭৪-৭৫।

১৪৬ এঙ্গেলস এখানে 'ভূমিকা'র প্রথম অধ্যায়ের সূচনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমে ফোরভার্টস পত্রিকাটি অ্যান্টি ড্যুরিং-এর ১৪টি অধ্যায় 'দর্শনে হের ইউগেন ড্যুরিং-এর বিপ্লব' নামে প্রকাশ করে। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হলে (এবং পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে) প্রথম দুটি অধ্যায়, সমগ্র পুস্তকটির, 'ভূমিকা' হিসাবে স্থান পায়, প্রথম ভাগের ১২টি অধ্যায় নিয়ে 'দর্শন' অংশটি মুদ্রিত হয়। অধ্যায়গুলির মোট সংখ্যার রদবদল হয়নি। প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের পাদটীকা এঙ্গেলস লিখেছিলেন ঐ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণেই বিনা পরিবর্তনে এটা স্থান পেয়েছিল।

১৪৭ এখানে জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের কালপর্বটির (জুন ১৭৯৩-৬ জুলাই ১৭৯৪) প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে গিরোঁপন্থী ও রাজতন্ত্রীদের প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জ্যাকোবিনরা পাল্টা বিপ্লবী সন্ত্রাস চালায়।

ডিরেক্টরেট (পাঁচজন ডিরেক্টরের একটা গোষ্ঠী, এঁদের মধ্যে একজন

পালাক্রমে প্রতিবছর নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকারী)—১৭৯৪ সালে জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী একনায়কত্বের পতনের পর ১৭৯৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সের শাসন সংস্থা। ১৭৯৯-এ নেপোলিয়নের কুদেতা পর্যন্ত এটা বহাল ছিল। সরকারি ক্ষমতায় থাকাকালীন এই গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায় এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে।

১৪৮ অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে প্রচলিত 'সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা'র শ্লোগানটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪৯ Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains ('সমকালীন ব্যক্তিদের কাছে জেনিভাস্থিত জনৈক রেসিডেন্ট-এর পত্রাবলী'), সাঁ-সিমোঁর প্রথম রচনা। এটা প্রথম লেখা হয় জেনিভা শহরে, ১৮০২-এ এবং ১৮০৩ সালে লেখকের নাম বাদেই এটা পারীতে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে প্রকাশের স্থান ও কাল উল্লেখ করা ছিল না। এঙ্গেলসের ব্যবহৃত সংস্করণটিতে প্রকাশের তারিখ এবং সাঁ সিমোঁ-র বিভিন্ন রচনা সম্বন্ধে অনেক ভুলত্রুটি ছিল।

চার্লস ফুরিয়ের-এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে Theorie des quatre mouvements et des destinies generales ('সাধারণভাবে তিনটি আন্দোলন ও ভবিতব্যের তত্ত্ব')। উনিশ শতকের প্রথম দিকে লিখিত এবং লেখকের নাম ছাড়াই ১৮০৮-এ প্রকাশিত। বইটি লিঅঁতে প্রকাশিত হলেও, সম্ভবত সেন্সরের ভয়ে প্রকাশনার নাম ছিল লাইপজিগ।

নতুন লানার্ক—স্কটল্যাণ্ডে লানার্ক শহরের কাছে শ্রমিকদের বাসস্থান-সন্নিহিত একটি কাপড়ের কল। ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত।

১৫০ এঙ্গেলস এখানে সাঁ-সিমোঁর পত্রাবলীর দ্বিতীয় পত্র উদ্ধৃত করেছেন।

১৫১ 'জনৈক আমেরিকানের কাছে সাঁ-সিমোঁর পত্রাবলী' (৮নং চিঠি) থেকে একটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস।

১৫২ এখানে সাঁ-সিমোঁ ও তাঁর ছাত্র এ. থিয়েরি-র যৌথভাবে লিখিত 'ইউরোপীয় সমাজের পুনর্গঠন' এবং '১৮১৫-র কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাবলী সংক্রান্ত মতামত' বই দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ফরাসি-বিরোধী কোয়ালিশনের (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন,

প্রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ) মিত্র সেনাবাহিনী ১৮১৪, ৩১ মার্চ পারীতে প্রবেশ করে। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং সিংহাসন ত্যাগ করার পর নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হন। ফ্রান্সে বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

একশো দিন—নেপোলিয়ন-সাম্রাজ্যের স্বল্পকালীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৮১৫, ২০ মার্চ পারীতে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তনের দিন থেকে ঐ একই বছরে ২২ জুন তাঁর দ্বিতীয়বার সিংহাসন পরিত্যাগ করার সময় পর্যন্ত।

১৫৩ ওয়াটারলুর লড়াইয়ে (বেলজিয়াম, জুন ১৮, ১৮১৫) নেপোলিয়নের বাহিনী ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইঙ্গ-ওলন্দাজ সৈন্যদের দ্বারা এবং ব্লুচারের সেনাপতিত্বে প্রাশীয় বাহিনীর দ্বারা পরাজিত হয়। ১৮১৫-র অভিযানের নিষ্পত্তি ঘটে এই লড়াইয়ে এবং ফরাসি-বিরোধী কোয়ালিশনের চূড়ান্ত বিজয়ের এবং নেপোলিয়ন-সাম্রাজ্যের পতনের সম্ভাবনা এখানেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

জার্মান অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে ড্যুরিং-এর 'দোষত্রুটি ধরার অভিযান' সম্বন্ধে ৮নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪ চার্লস ফুরিয়ের-এর Thearie des quatre mouvements-এ এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সাধারণ বক্তব্যটি সেখানে রয়েছে: 'একটা সময়ের সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী স্বাধীনতার দিকেও অগ্রগতি ঘটে, আর সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের স্বাধীনতা হ্রাস পেতে থাকে।' এর থেকে ফুরিয়ের এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন: 'যাবতীয় সামাজিক প্রগতির মৌল নীতি হচ্ছে নারী-অধিকারের প্রসার।' (ফুরিয়ের, Oeuvres-completas, খণ্ড ১, পারী, ১৮৪১, পৃ ১৯৫-৯৬।

১৫৫ চার্লস ফুরিয়ের, Theory de L unita universeller, খণ্ড ১ ও ৪; Oeuvres complates, খণ্ড ২, পারী, ১৮৪৩, পৃ ৭৮-৭৯।

১৫৬ চার্লস ফুরিয়ের, Oeuvres completes, খণ্ড ৬, পারী, ১৮৪৫, পৃ ২০২, ২৪৩, ২৫৫।

১৫৭ চার্লস ফুরিয়ের, oeuvres complets, খণ্ড ৬, পারী, ১৮৪৫, পৃ ৩৫।

১৫৮ চার্লস ফুরিয়ের, ঐ গ্রন্থ, খণ্ড ১, ১৮৪১, পৃ ৫৬, ৩১৫।

১৫৯ রবার্ট ওয়েন, '...মার্চ ১৮, এপ্রিল ১২, ১৯ ও মে ৩ তারিখগুলিতে ডাবলিনে অনুষ্ঠিত কতকগুলি জনসভার বিবরণীর রিপোর্ট', ডাবলিন, ১৮১৩।

১৫০ ১৮১৫ সালের জানুয়ারি মাসে গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত একটি বড় জনসভায় ওয়েন কারখানায় নাবালক ও সাবালক কর্মীদের কাজের অবস্থা উন্নত করার জন্যে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ১৮১৫-র জুনে ওয়েনের উদ্যোগের ফলে উপস্থাপিত বিলটি অনেক কাটছাঁট করে সংসদে গৃহীত হয় ১৯১৯-র জুলাই মাসে। আইনে কাপড়ের কলে নয় বছরের নিচে বালকদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়, ১৮ বছরের কম বয়স্কদের কর্ম-দিবস ধার্য হয় ১২ ঘন্টা, সমস্ত মজুর একবার প্রাতঃরাশ ও আর একবার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে দু'বার, মোট দেড় ঘন্টা, কর্মবিরতির সুযোগ পায়।

১৬০ ওয়েনের সভাপতিত্বে সমবায় সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে, অক্টোবর, ১৮৩৩ সালে। এই কংগ্রেস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনসোলিডেটেড ট্রেডস ইউনিয়ন। এর সনদটি গৃহীত হয় ১৮৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ওয়েনের ইচ্ছা ছিল এই ইউনিয়ন উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের পুনর্গঠনে হাত দেবে। কিন্তু এই ইউটোপীয় পরিকল্পনা অচিরেই বানচাল হয়ে যায়। বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৮৩৪-এর আগস্টে ইউনিয়নের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

১৬১ শ্রমজাত দ্রব্যের সম-বিনিময় বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক-সমবায়গুলির দ্বারা। ১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর লণ্ডন শহরে প্রথম এই ধরনের বাজারের পত্তন হয় ওয়েনের উদ্যোগে। ১৮৩৪-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এটা টিকে ছিল।

১৬২ ১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের সময়ে প্রুধোঁ একটি বিনিময়-ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'জনগণের ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৯-এর জানুয়ারি মাসে প্যারী শহরে। ব্যাঙ্কটি কাগজে কলমে প্রায় দু'মাস চলেছিল, এমনকি নিয়মিত চলার আগেই এটা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং এপ্রিলের গোড়ার দিকেই একেবারে বন্ধ হয়।

১৬৩ ডাবলিউ. এল. সারগান্ট, রবার্ট ওয়েন অ্যাণ্ড হিজ সোস্যাল ফিলসফি, লণ্ডন, ১৮৬০।

বিবাহ ও সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়েনের প্রধান গ্রন্থগুলি হচ্ছে: দ্য ম্যারেজ সিস্টেম অফ দ্য নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড (১৮৩৮), দ্য বুক অফ দ্য নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড (১৮৩৬-৪৪), দ্য রেভোলিউশন ইন দ্য মাইণ্ড অ্যাণ্ড প্রাকটিস অফ দ্য হিউম্যান রেস (১৮৪৯)।

১৬৪ হার্মনি হল—১৮৩৯ সালের শেষভাগে রবার্ট ওয়েনের নেতৃত্বে ইংরেজ ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্টরদের কুইনউড, হ্যাম্পশায়ার ও ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী কলোনির নাম। ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত এটা টিকে ছিল।

১৬৫ এখানে প্রদত্ত দ্য মার্ক প্রসঙ্গে টীকাটি এঙ্গেলস 'সমাজবাদ: ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' বইয়ে দিয়েছেন।

১৬৬ ভারতে ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং ঔপনিবেশিক বাজার দখল করার জন্যে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল, এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড (১৬৫২-৫৪, ১৬৬৪-৬৭ ও ১৬৭২-৭৪-এর ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধগুলি ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। এইসব যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রায় সবটাই তার হাতে চলে যায়।

১৬৭ এখানে এঙ্গেলস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৬৮ কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, ১৯৭৪, পৃ ৪৩৫।

১৬৯ ফুরিয়ের, Oeuvres Completes, খণ্ড ৬, পারী, ১৮৪৫, পৃ ৩৯৩-৯৪, ৫৩৪।

১৭০ দ্য রয়াল মেরিটাইম কোম্পানি—১৭৭২-এ প্রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য ও ঋণদান সংস্থা; এটা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং সরকারকে বিপুল পরিমাণ ঋণের যোগান দিত। আসলে এটা ছিল সরকারের ব্যাঙ্কার ও আর্থিক লেনদেনের ব্রোকার। ১৯০৪ সালে এটা সরকারিভাবে প্রাশিয়ার স্টেট ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়।

১৭১ 'স্বাধীন জন-রাষ্ট্র'—১৮৭০-এর দশকে জার্মান সোস্যাল-ডিমোক্র্যাটদের কর্মসূচিগত দাবি ও বহুল প্রচারিত শ্লোগান। মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'র চতুর্থ অংশে, ১৮৭৫-এর ১৮-২৪ মার্চ বেবেলের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির মধ্যে এবং লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ৪ ও অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ ৩ (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৫, পৃ ৩৯৫-৪০১ ও ৪৩৯-৪২) গ্রন্থে এই শ্লোগানটির সমালোচনা করা হয়েছে।

১৭২ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মোট সম্পদ সংক্রান্ত সংখ্যাতথ্যগুলি রবার্ট গিফেন-এর 'যুক্তরাজ্যে সাম্প্রতিক পুঁজি সঞ্চয়' নিবন্ধ থেকে গৃহীত। ১৮৭৮-এর ১৫ জানুয়ারি স্ট্যাটিসটিক্যাল সোস্যাইটিতে এটা পাঠ করা হয় এবং প্রকাশিত হয় ১৮৭৮, মার্চে লণ্ডনের জার্নাল অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটিতে।

১৭৩ জার্মান শিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৮-এর ২১-২২ ফেব্রুয়ারিতে বার্লিন শহরে।

১৭৪ চার্লস ফুরিয়ের—দ্য নিউ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড সোস্যাল ওয়ার্ল্ড, খণ্ড ৩, অধ্যায় ২, ৫, ৬।

১৭৫ ১৮৫২ সালের ২০ মার্চ প্রাশীয় ল্যাণ্ডটাগের নিম্ন কক্ষে প্রদত্ত বিসমার্কের ভাষণটির প্রসঙ্গ এঙ্গেলসের মনে ছিল (১৮৪৯ সাল থেকে বিসমার্ক ঐ কক্ষের সদস্য ছিলেন)। বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে বড় বড় শহরের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার য়ুংকার (অভিজাত ভূস্বামী)-দের ঘৃণা প্রকাশ করে বিসমার্ক বলেছিলেন যে আবার যদি বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে এইসব শহরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

১৭৬ ভাবলিউ ভেটলিং তাঁর বইয়ে ('সুষমা ও স্বাধীনতার সুনিশ্চিতি' এই লেজার-এর (খতিয়ান) বিবরণ দিয়েছেন। ভেটলিং-এর ইউটোপীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভাবী সমাজে প্রতিটি সক্ষম মানুষ প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা করে কাজ করবে এবং তার বদলে জীবনধারণের সামগ্রী পাবে। এই সময়ের পরে প্রতিটি মানুষের কয়েক 'ঘন্টা বাণিজ্যিক' কাজকর্ম করার অধিকার থাকবে, এর বিনিময়ে সে বিলাসদ্রব্য পাবে।

এই বাড়তি কাজের ঘণ্টাগুলি এবং এর থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ লেজার বা খতিয়ানে লিপিবদ্ধ থাকবে।

১৭৭ নন ওলেত (টাকার গায়ে গন্ধ নেই)—এই কথাগুলি বলেছিলেন রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান (খ্রিঃ ৬৯-৭৯) তাঁর পুত্রের সমালোচনার জবাবে। পায়খানার ওপর কর ধার্য করায় তাঁর পুত্র পিতাকে নিন্দা করেন।

১৭৮ সারগান্ট-এর পুস্তক প্রসঙ্গে ১৬৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময় বাজার—১৬১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৯ ৮২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮০ ১০০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮১ ম্যামব্রিনোর ঐন্দ্রজালিক শিরস্ত্রাণ জয় করার (আসলে এই শিরস্ত্রাণটি ছিল সাধারণ নাপিতের গামলা) সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত অ্যাডভেঞ্চারটি বিবৃত হয়েছে সারভানটেস-এর 'ডন কুইক্সোট' উপন্যাসে, খণ্ড ১, অধ্যায় ২১। আব্রাহাম এন্‌স—মার্কস ও এঙ্গেলসকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ কবিতার লেখক। ১৮৭৭-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির 'ফোরভার্টস' পত্রিকায় অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর প্রথম অধ্যায়গুলি প্রকাশিত হলে ইনি ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখেন।

১৮২ গ্যোয়েটের 'ফাউস্ট' থেকে।

১৮৩ প্রটেস্টান্ট প্রাশীয় রাষ্ট্রে ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন করা যায় কিনা—মন্ত্রী ফন ব্রাণ্ড ও কন্‌সিসটরি রাইখবাখ এর প্রশ্নের উত্তরে ১৭৪০, ২২ জুলাইয়ে প্রাশীয়রাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ-এর উত্তর।

১৮৪ মে মাসের আইন—১৮৭৩, ১১-১৪ মে তারিখে বিসমার্কের উদ্যোগে প্রাশীয় সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ফল্‌ক রাইখস্টাগে ৪টি আইন পাশ করান। এই আইনগুলির মাধ্যমে ক্যাথলিক গির্জার ওপর কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয় এবং এটাই হচ্ছে তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক উদ্যোগে'র চূড়ান্ত পরিণতি। এই আইনগুলির মাধ্যমেই বিসমার্ক ১৮৭২-৭৫ সালে 'সেন্টার' পার্টির স্তম্ভ হিসাবে ক্যাথলিক পাদরিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এই পার্টি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে রুখে দাঁড়ান এবং

বহু ক্যাথলিক শহিদদের মহিমা অর্জন করেন। ১৮৮০-৮৭' সালে, শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জোটবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিসমার্ক সরকার ক্যাথলিক-বিরোধী আইনগুলিকে প্রথমে শিথিল এবং পরে প্রায় বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৮৫ যাদুকরী বাঁশি—এমানুয়েল শিকানেডার-রচিত মোৎসার্টের শেষ অপেরা। ১৭৯১ সালে এটা গ্রথিত ও অভিনীত হয়। স্থাপত্যকর্মের ধারণা এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অপেরার গ্রন্থিক ও মোৎসার্ট উভয়েই ছিলেন রাজমিস্ত্রি। এখানে উল্লিখিত জারাস্ট্রো, টোমিনো ও পেমিনা—সবাই এই অপেরার পাত্র-পাত্রী।

১৮৬ রেফারেণ্ডারি—জার্মানির নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা, প্রধানত আইনজ্ঞ, আদালতে কিংবা সরকারি অফিসে শিক্ষানবিশ, হিসাবে ইনি প্রশিক্ষণ পান। সাধারণত কোনো বেতন পান না।

১৮৭ ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৮ Tageblatt der 50. Versammlung deutcher Naturforscher und Aerzte in Munchen 1877, Beilage, পৃ ১৮।

১৮৯ এ কেকুলের গ্রন্থ।

১৯০ ফুরিয়ের ও এস কারনট-এর বই দ্রষ্টব্য।

১৯১ অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর জন্যে এঙ্গেলসের প্রস্তুতিমূলক রচনার দুটি অংশ। প্রথমটি নানা সাইজের পৃথক পৃথক কাগজে লেখা (মোট পাণ্ডুলিপির ৩৫ পৃষ্ঠা)। এর মধ্যে রয়েছে ড্যুরিং-এর বই থেকে উদ্ধৃতাংশ ও এঙ্গেলসের টীকা। দ্বিতীয় অংশ লেখা হয়েছে বড় সাইজের কাগজে (পাণ্ডুলিপির মোট ১৭ পৃষ্ঠা), দুধারে কলাম করে সাজানো; বাঁদিকের কলাম রয়েছে প্রধানত ড্যুরিংয়ের কোর্স অফ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোস্যাল ইকোনমি গ্রন্থের ২য় সংস্করণ থেকে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি এবং ডানদিকের কলামে রয়েছে এঙ্গেলসের সমালোচনামূলক মন্তব্য।

এছাড়াও, প্রস্তুতিমূলক লেখার মধ্যে আরও রয়েছে: দাসপ্রথা সম্বন্ধে টীকা, ফুরিয়ের-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এবং আধুনিক সমাজবাদ সম্বন্ধে টীকা। অ্যান্টি ড্যুরিং-এর বর্তমান সংস্করণে প্রস্তুতিমূলক লেখার মধ্যে থেকে যে-অংশ নেওয়া হয়েছে, তা বইটির মূল পাঠের অনুপূরক।

১৯২ শেখ-উল-ইসলাম—ওসমান সাম্রাজ্যের মুসলিম মোল্লাদের প্রধানের উপাধি।

১৯৩ পূর্ব গঠন—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আধিবিদ্যক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবদেহের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বীজের মধ্যে নিহিত থাকে এবং বিকাশের সময় সেগুলির আকার বৃদ্ধি পায় মাত্র. সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব ঘটে না। ভোলফ থেকে ডারউইন পর্যন্ত খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন।

১৯৪ এইচ. ই. রসকো-র রসায়নবিজ্ঞানের গ্রন্থ।

১৯৫ এখানে এঙ্গেলসের মনে ছিল নিকলসন-এর মানুয়্যাল অফ জুলজি-র সাধারণ ভূমিকার কথা। এই ভূমিকার একটি অনুচ্ছেদে প্রকৃতি ও প্রাণ সৃষ্টির পরিবেশের বিষয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক জীবনের বিভিন্ন সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন।

১৯৬ হেগেল, তর্কবিদ্যার বিজ্ঞান, খণ্ড ১, পর্ব ১, অধ্যায় ১, ধারণার ক্ষেত্রে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সমন্বয় সংক্রান্ত টীকা।

১৯৭ সি. এইচ. বোসট, ট্রিটিজেস অন ডিফারেনসিয়াল অ্যাণ্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, খণ্ড ১, পারী, ১৭৯৮, পৃ ৯৪।

১৯৮ বোসাট-এর বইয়ের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠাতে শূন্যগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯৯ ১৪৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২০০ ১৭৮৯, ৪ আগস্ট, ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনের চাপে ফরাসি সংবিধান পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকগুলি সামন্ত শুল্ক রদ করার ঘোষণা জারি করে। বিদ্রোহী কৃষকরা অবশ্য সেগুলিকে ইতিপূর্বেই কার্যত বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে আইন পাশ হয়, তাতে বিনা ক্ষতিপূরণে শুধু ব্যক্তিগত শুল্ক রদ হয়েছিল। বিনা ক্ষতিপূরণে যাবতীয় শুল্ক বাতিল হয়েছিল একমাত্র জ্যাকোবিন একনায়কত্বের শাসনে, ১৭৯৩, ১৭ জুলাই তারিখে আইন পাশ করে।

গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ডিক্রিটি সংবিধান পরিষদ পাশ করে ১৭৮৯, ২. নভেম্বর, এবং নির্বাসনে থাকা অভিজাতদের

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৭৯২, ৯ ফেব্রুয়ারি, আইন পরিষদে গৃহীত একটি বিধানের মাধ্যমে।

২০১ প্রসঙ্গ-সূত্র: টমাস্ মোর-এর ইউটোপিয়া। ১৫১৬ সালে বেলজিয়াম-এ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২০২ এঙ্গেলস এখানে ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, অধ্যায় ৭ ('পুঁজির সঞ্চয়')-এর উল্লেখ করেছেন।

২০৩ ৬৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২০৪ খাদিব—তুর্কি শাসনের সময়ে (১৪৬৭ সালে শুরু) মিশরে বংশানুক্রমিক শাসকদের উপাধি।

২০৫ এই প্রবন্ধটি প্রথমে ছিল আ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয় পর্বের পাণ্ডুলিপির একটা অংশ। এটা দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এঙ্গেলস পরে এটাকে সংক্ষেপিত করেন এবং আগের লেখাটির নাম দেন 'বস্তুগত কারণ থেকে উদ্ভূত পদাতিক বাহিনীর রণকৌশল-১৭০০-১৮৭০'।

২০৬ লা আলব্যুয়েরা-র লড়াই—(স্পেন), মে ১৬, ১৮১১। ভিসকাউন্ট বেরসফোর্ড-এর সেনাপতিত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী বাদাজোস দুর্গ অবরোধ করে এবং মার্শাল সোল-এর পরিচালিত ফরাসি বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটায়। এঙ্গেলস তাঁর 'আলব্যুয়েরা' প্রবন্ধে এই যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন।

ইনকারম্যানের লড়াই, নভেম্বর ৫, ১৮৫৪—ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে রুশ সেনাবাহিনী ও ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর মধ্যে লড়াই। মিত্রশক্তিগুলি, বিশেষ করে ইংরেজরা, প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তার ফলে তাদের অবিলম্বে সেবাস্তিপোল অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে দুর্গ-অবরোধ চলতে থাকে। এঙ্গেলস তাঁর 'ইনকারম্যানের লড়াই' প্রবন্ধে এর বিবরণ দিয়েছেন।

২০৭ ৮৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২০৮ এই টীকাগুলি লেখা হয় সম্ভবত ১৮৮৫ সালে; যেকোনোভাবেই ১৮৮৪ সালের মধ্য-এপ্রিলের আগে কিছুতেই নয়। এই সময়ে এঙ্গেলস প্রকাশের উদ্দেশ্যে অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর দ্বিতীয়, বৃহত্তর সংস্করণ প্রস্তুত করা মনস্থ করেন। ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে দ্বিতীয়

সংস্করণের মুখবন্ধ লেখা শেষ হয় এবং তিনি এটা প্রকাশকের কাছে পাঠান। ১৮৮৪ সালে ই. বার্নস্টাইন ও কে. কাউটস্কির কাছে লেখা চিঠি এবং ১৮৮৫-তে জি. স্মিটার-এর কাছে লেখা চিঠি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে তিনি অনেকগুলি 'টীকা' কিংবা 'পরিশিষ্ট' লিখতে চেয়েছিলেন এবং সেগুলিকে সন্নিবেশিত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় সংস্করণের শেষদিকে। কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপে (প্রধানত কাপিটালের ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের তাগিদে) এটা তিনি আর লিখে উঠতে পারেন নি। একমাত্র অ্যান্টি-ড্যুরিং-এর প্রথম সংস্করণের জন্যে দুটি 'টীকা'-র রূপরেখা তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন। এগুলিকে তিনি ডায়ালেকটিকস অফ নেচার-এর অন্তর্ভুক্ত করেন।

২০৯ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে যা নেই, মননেও তা থাকতে পারে না— ইন্দ্রিয়াসক্তিবাদের মূল তত্ত্ব। এই সূত্রটি এসেছে অ্যারিস্টটল থেকে।

২১০ এখানে এঙ্গেলস সম্ভবত হেকেলের দেহ-মনের একত্ববাদ ও বস্তুর গঠন সংক্রান্ত হেকেলীয় মতবাদের উল্লেখ করেছেন। হেকেলের মতে শুধুমাত্র 'প্লাস্টিডিউল'-এর (যেমন, প্রোটোপ্লাজমের অণু) মধ্যেই আদি 'আত্মা' নেই, পরমাণুর মধ্যেও আছে। অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুই 'সজীব' এবং 'বোধ' ও 'ইচ্ছা' সম্পন্ন। হেকেল তাঁর Die Perigenesis der Plastidule-এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিযুক্ত, একেবারে অবিভাজ্য ও একান্তভাবে অপরিবর্তনীয় পরমাণুর কথা বলেছেন এবং বিযুক্ত পরমাণু ছাড়াও এমন এক ইথারের কথা বলেছেন যা একান্ত অবিচ্ছিন্ন।

২১১ প্রসঙ্গ-সূত্র: নেচার, সংখ্যা ৪২০, নভেম্বর ১৫, ১৮৭৭। এই বছরের ১৮ অক্টোবর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকটর পদ গ্রহণ উপলক্ষে এ. কেকুলের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার।

২১২ দ্য লোথার মেয়ার তরঙ্গ (কার্ভ)—পারমাণবিক ভরের তুলনায় পদার্থের পারমাণবিক ওজনের অনুপাত এর দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জার্মান রসায়নবিদ লোথার মেয়ার এই তরঙ্গ (কার্ভ) অঙ্কন করেন এবং ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

পারমাণবিক ওজন এবং রাসায়নিক পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলির মধ্যেকার প্রাকৃতিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত রুশ

বিজ্ঞানী দমিত্রি মেণ্ডেলিয়েফ। রাসায়নিক পদার্থের পর্যায় সূত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। ১৮৬৯ সালের মার্চে এটা উদ্ভাবিত হয়। মেয়ার তাঁর পর্যায় সূত্র প্রতিপন্ন করার কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ে মেণ্ডেলিয়েফের আবিষ্কার সম্বন্ধে জানতে পারেন। মেণ্ডেলিয়েফের আবিষ্কৃত সূত্রটি লোথার মেয়ার তরঙ্গে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, কিন্তু এই তরঙ্গের মধ্যে এটা প্রকাশ পেয়েছে বাহ্যিকভাবে, একপেশেভাবে, যা মেণ্ডেলিয়েফের সারণী থেকে আলাদা ধরনের।

নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলিয়েফ মেয়ারের চাইতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত পর্যায় সূত্রের ভিত্তিতে তিনি এমন সব রাসায়নিক মৌল পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেগুলি তখনও অজ্ঞাত। অন্যদিকে মেয়ারের পরবর্তী কাজকর্মে দেখা যায়, তিনি পর্যায় সূত্রের সারবস্তুটি বুঝে উঠতে পারেন নি।

২১৩ হেগেল, 'দর্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ'. অনুচ্ছেদ ১৩। টীকা: 'আনুষ্ঠানিকভাবে ধরে বিশেষের পাশাপাশি রাখলে, সাধারণ ও অনুরূপভাবে বিশেষে পরিণত হয়; দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের অসামঞ্জস্য ও অবাস্তবতা তখনই প্রকট হয়ে ওঠে, যদি কেউ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফল চায় অথচ জাম, নাসপাতি ও আঙ্গুর এই যুক্তিতে প্রত্যাখান করে যে সেগুলি জাম, নাসপাতি ও আঙ্গুর, ফল নয়।'

২১৪ ই. হেকেল, Naturliche Schoplun-gsgeschichte, ৪র্থ সংস্করণ, বার্লিন। ১৮৭৩. পৃ ৫৩৮, ৫৪৩, ৫৮৮; Anthropogenie, লাইপজিগ, ১৮৭৪, পৃ ৪৬০, ৪৬৫, ৪৯২।

২১৫ হেগেল, 'দর্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ', অনুচ্ছেদ ৯৯।

নাম-সূচি

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮১৮-১৮৮১) রুশ সম্রাট।

অ্যানাক্সাগোরাস (ক্লাসোমেনা, এশিয়া মাইনর), আনুমানিক ৫০০-৪২৮ খ্রিঃ পূঃ—বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিক।

টমাস অ্যানড্রুজ (১৮১৩-১৮৮৫)—আইরিশ রসায়নবিদ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী।

অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক দার্শনিক, বস্তুবাদ ও ভাব-বাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত।

গ্রাচুস বেব্যুফ (ফ্রাঁসোয়া নোয়েল) (১৭৬০-১৭৯৭)—ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় সাম্যবাদের খ্যাতনামা প্রবক্তা 'সমানদেব' চক্রান্তের সংগঠক।

ফ্রান্সিস বেকন, ব্যারন ভেরুলাম (১৫৬১-১৬২৬)—ইংলণ্ডে বস্তুবাদের জনক, প্রকৃতিবিদ ও ঐতিহাসিক।

নিকোলাস বাদে (১৭৩০-১৭৯২)—ফরাসি মোহান্ত, প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদ।

প্রিন্স অটো বিসমার্ক, (১৮১৫-১৮৯৮)—প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী (১৮৬২-৭১) এবং জার্মান সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী (১৮৭১-৯০), প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে জবরদস্তি করে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন, সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইনের (১৮৭৮) প্রবর্তক।

লুই ব্লাংক, (১৮১১-১৮৮২)—ফরাসি পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ও ঐতিহাসিক, ১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের প্রখ্যাত নায়ক, বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসরফার প্রবক্তা।

জোসেফ জেরসি বোগুইস্কি, (১৮৫৩-১৯৩৩)—পোলিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ।

পিয়েরে বইসগিলবের্ত, (১৬৪৬-১৭১৪)—ফ্রান্সে বুর্জোয়া ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক, প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদদের পূর্বসূরী।

ফ্রানৎস বপ (১৭৯১-১৮৬৭)—জার্মান সংস্কৃত ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

চার্লস বোসাত (১৭৩০-১৮১৪)—ফরাসি গণিতজ্ঞ, গণিতের তত্ত্ব ও ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির লেখক।

রবার্ট বয়েল (১৬২৭-১৬৯১)—ইংরেজ রসায়নবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী।

লুডভিগ বুচনার (১৮২৪-১৮৯৯)—জার্মান শারীরবিদ্যাবিদ ও স্থূল বস্তুবাদী দার্শনিক।

বিউগাউড ডেলা পিকোনেরি, টমাস রবার্ট (১৭৮৪-১৮৪৯)—ফ্রান্সের মার্শাল; সমরবিজ্ঞানের লেখক; ১৮০৮-১৮১৪ সালের পেনিনসুলার যুদ্ধে যোগদানকারী।

লুডল্ফ কাম্পহাউসেন (১৮০৩-১৮৯০)—জার্মান ব্যাংক মালিক; রাইন প্রদেশের উদারপন্থী বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা; প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী (১৮৪৮, মার্চ জুন)।

রিচার্ড কান্টিলন (১৬৮০-১৭৩৪)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদদের পূর্বসূরী।

হেনরি চার্লস কেরি (১৭৯৩-১৮৭৯)—আমেরিকার স্থূল অর্থনীতিবিদ।

টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)—স্কচ প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক; ভাববাদী দার্শনিক।

নিকোলাস লিওহার্ড সাদি কর্নোট (১৭৯৬-১৮৩২)—ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ও পদার্থবিজ্ঞানী।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭২৯-১৭৯৬)—রুশ সম্রাজ্ঞী (১৭৬২-৯৬)।

সাভেদ্রা সারভেন্টিস (১৫৪৭-১৬১৬)—স্পেনীয় লেখক।

জোসিয়া চাইল্ড (১৬৩০-১৬৯৯)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, ব্যাংক মালিক ও বণিক, বণিকতন্ত্রের প্রবক্তা।

উইলিয়াম কবেট (১৭৬৩-১৮৩৫)—ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক; পেটিবুর্জোয়া প্রগতিশীলতার প্রখ্যাত মুখপাত্র।

কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিঃ পূঃ)—চীনা দার্শনিক, নৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সময়কার প্রগতিশীল চিন্তানায়ক।

নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)—পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ; সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব-বিধানের মতবাদের জনক।

জন ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪)—ইংরেজ রসায়নবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী।

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)—ইংরেজ প্রকৃতিবিদ; বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের স্রষ্টা।

ড্যানিয়েল ডেফো (১৬৬০-১৭৩১)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক।

হেনরি গুস্তাফ দেলভিগনে (১৭৯৯-১৮৭৬)—ফরাসি সেনাবাহিনীর অফিসার ও উদ্ভ বক্ত।

ডিমোক্রিটাস (আনুমানিক ৪৬০-৩৭০ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক।

রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)—ফরাসি দ্বৈতবাদী দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও প্রকৃতিবিদ।

দেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪)—ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক ও লেখক; এনসাইক্লোপিডিয়া রচনাকারীদের প্রধান।

ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক ডায়েস (১৭৯৪-১৮৭৬)—জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ডায়োজিনাস লোয়ারটাস (তৃতীয় শতাব্দী)—দর্শনের গ্রীক ঐতিহাসিক, প্রাচীন দার্শনিকদের দর্শন-চিন্তার সংকলক।

কার্ল ইউগেন ড্যুরিং (১৮৩৩-১৯২১)—সারসংগ্রহবাদী জার্মান দার্শনিক ও স্থূল অর্থনীতিবিদ।

বার্থলেমি প্রস্পার এনফান্তিন (১৭৯৬-১৮৬৪)—ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী ও সাঁ-সিমোঁর শিষ্য।

আব্রাহাম এনস (উনিশ শতক)—প্রাশীয় কৃষক, আইনসেনাকদের সমর্থক, ড্যুরিং-এর অনুগামী; মার্কস ও এঙ্গেলসকে কুৎসা করে একটা জঘন্য প্রবন্ধের লেখক।

এপিকিউরাস (আনুমানিক ৩৪১-২৭০ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক।

ইউক্লিড (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতকের শেষ ও তৃতীয় শতকের শুরু)—গ্রীক জ্যামিতিবিদ।

হাইনরিখ ভিলহেলম ফেবিয়ান—জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট।

ফ্রাঁসোয়া লুই অগস্তে ফেরিয়ার (১৭৭৭-১৮৬১)—ফরাসি বুর্জোয়া দার্শনিক।

লুডভিগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২)—জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক।

যোহান গোটলিয়েব ফিক্টে (১৭৬২-১৮১৪)—ধ্রুপদী জার্মান দার্শনিক, বিষয়গত ভাববাদী।

চার্লস ফুরিয়ের (১৭৭২ ১৮৩৭)—ফরাসি ইউটোপীয় দার্শনিক।

জাঁ ব্যাপতিস্তে জোসেফ ফুরিয়ের (১৭৬৮-১৮৩০) ফরাসি গণিতজ্ঞ।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ (১৭১২-১৭৮৬)—প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০-৮৬)।

তৃতীয় ফ্রেডারিখ উইলিয়াম (১৭৭০-১৮৪০)—প্রাশিয়ার রাজা (১৭৯৭-১৮৪০)।

ক্লডিয়াস গ্যালেন (আনুমানিক ১৩০-২০০ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক চিকিৎসক ও দার্শনিক, আরিস্টটলের অনুগামী, রক্ত সংবহন পদ্ধতি অনুশীলনের পথিকৃৎ।

কার্ল ফ্রেডারিখ গাউস (১৭৭৭-১৮৫৫)—জার্মান গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

চার্লস ফ্রেডারিক গেরহার্ড (১৮১৬-১৮৫৬)—ফরাসি রসায়নবিদ।

এডোয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪)—ইংরেজ ঐতিহাসিক, বহু খণ্ডে লেখা 'রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক।

রবার্ট গিফেন (১৮৩৭ ১৯১০)—ইংরেজ বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানবিদ, অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

যোহান ভোলফগাং গ্যোয়েটে (১৭৪৯-১৮৩২)—জার্মান মহাকবি ও নাট্যকার।

জাঁ ব্যাপতিস্তে গ্রিবিউভাল (১৭১৫-১৭৮৯)—ফরাসি সেনাপতি ও উদ্ভাবক।

জ্যাকোব গ্রিম (১৭৮৫ ১৮৬৩)—জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা, জার্মান-ভাষাগোষ্ঠীর প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণের রচয়িতা।

আর্নস্ট হাইনরিখ হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯)—জার্মান জীববিজ্ঞানী, ডারউইনের অনুগামী ; ফিলোজেনিসিস ও অনটোজেনিসিস-এর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রক বায়োজেনিটিক সূত্রের আবিষ্কারক।

এডোয়ার্ড হার্টমান (১৮৪২-১৯০৬)—জার্মান ভাববাদী দার্শনিক।

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)—ইংরেজ চিকিৎসক, শারীরবিত্থার প্রতিষ্ঠাতা ; রক্ত-সংবহনতন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

গিওর্গ ভিলহেলম ফ্রেডারিখ হেগেল—ক্রুপদী জার্মান দার্শনিক, বিষয়মুখী ভাববাদী।

হাইনরিখ হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬)—বিপ্লবী জার্মান কবি।

দ্বাবিংশ হাইনরিখ এল (১৭৯৭-১৮৫৩)—ক্ষুদ্রাকার জার্মান রাষ্ট্র রুয়েস-লোবেন স্টেইন-এবার্সডর্ফ-এর প্রিন্স (১৮২২-৪৮)।

হেরমান লুডভিগ ফার্ডিনাণ্ড হেলমহোলৎস (১৮২১-১৮৯৪)—জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ও শারীরবিত্থাবিদ ; দোদুল্যমান বস্তুবাদী হিসাবে নব্য কান্টবাদী অজ্ঞাবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

হেরাক্লিটাস (আনুমানিক ৫৪০-৪৮০ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক দার্শনিক, স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী, ডায়ালেকটিকস এর প্রতিষ্ঠাতা।

যোহান ক্রিশ্চিয়ান অগাস্ট হেইসে (১৭৬৪ ১৮২৯)—জার্মান ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ।

হোরেস (৬৫-৮ খ্রিঃ পূঃ)—রোমক কবি।

ডেভিড হিউম (১৭১১ ১৭৭৬)—ভাববাদী ইংরেজ দার্শনিক ও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ; বণিকতন্ত্রের বিরোধী ; পরিমাণগত অর্থতত্ত্বের প্রবক্তা।

টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫ ১৮৯৫)—ইংরেজ জীববিজ্ঞানী, ডারউইনের অনুগামী ও বন্ধু এবং তাঁর মতবাদকে জনপ্রিয় করার ভূমিকা নেন।

ম্যাক্‌স জাহ্নস (১৮৩৭-১৯০০)—প্রাশীয় সেনাবাহিনীর অফিসার, সমরবিজ্ঞানের লেখক।

জুভেনাল (আনুমানিক ৬০ খ্রিঃ পূঃ)—রোমক কবি ও ব্যাঙ্গাত্মক রচনার লেখক।

ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)—ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ; প্রকৃতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখার জন্যেও পরিচিত।

কনস্তানতিন পেত্রোভিচ কাউফমান (১৮১৮-১৮৮২)—রুশ সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ ; ককেশাস অঞ্চল ও মধ্য এশিয়া বিজয়ে জারের নীতি সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত করেন।

ফ্রেডরিখ অগস্ট কেকুলে (১৮২৯ ১৮৯৬)—জার্মান রসায়নবিদ।

যোহানেস কেপলার (১৫৭১ ১৬৩০) - জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গ্রহগুলির গতির সূত্রের আবিষ্কর্তা।

গুস্তাফ রবার্ট কিরচফ (১৮২৪-১৮৮৭)—জার্মান পদার্থবিদ।

পল লাফার্গ (১৮৪২ ১৯১১)—ফরাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রচারক। মার্কস ও এঙ্গেলসের শিষ্য ও সহকর্মী।

জঁ ব্যাপতিস্তে পিয়েরে লামার্ক (১৭৪৪ ১৮২৯)—ফরাসি প্রকৃতিবিদ, জীববিদ্যায় প্রথম সামগ্রিক বিবর্তনমূলক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, ডারউইনের পূর্বসূরী।

ক্রিশ্চিয়ান এডোয়ার্ড লাঙ্গেথাল (১৮০৬ ১৮৭৮)—জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।

পিয়েরে সাইমন লাপ্লাস (১৭৪৯ ১৮২৭) ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ: কান্টের দ্বারা প্রভাবিত না হয় নিজে নীহারিকা প্রকল্পটি গাণিতিকভাবে প্রতিপন্ন করেন।

এডোয়ার্ড লাস্কার (১৮২৯-১৮৮৪)—জার্মান রাজনীতিবিদ, বিসমার্কের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমর্থক জাতীয় উদারপন্থী দলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা।

ফার্ডিনাণ্ড লাসালে (১৮২৫-১৮৬৪)—জার্মান পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, লাসালেবাদের জনক; দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ভাববাদী।

অগস্তে লরে (১৮০৭-১৮৫৩)—ফরাসি রসায়নবিদ।

আন্তনি লরে ল্যাভোইশিয়ার (১৭৪৩-১৭৯৪)—ফরাসি রসায়নবিদ, ফ্লজিস্টন প্রকল্প খণ্ডন করেন; রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানবিদ্যার ওপরও বই লিখেছেন।

জন ল (১৬৭১ ১৭২৯)—স্কচ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও অর্থবিনিয়োগকারী; ১৭১৯-২০ সালে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী; কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে অখ্যাতি অর্জন করেন, এর ফলে অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে।

গটফ্রিড ভিলহেলম লাইবনিস (১৬৪৬-১৭১৬)—জার্মান গণিতজ্ঞ, ভাববাদী দার্শনিক।

লিউসিপ্পাস (খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)—বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিক, পরমাণুবাদী তত্ত্বের জনক।

জাস্টাস লাইবিগ (১৮০৩-১৮৭৩)—জার্মান রসায়নবিদ, কৃষি রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা।

ভিলহেলম লাইবনেক্ট (১৮২৬-১৯০০)—জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের খ্যাতনামা নেতা, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের সহকর্মী ও বন্ধু।

কার্ল লেনে (১৭০৭-১৭৭৮)—সুইড উদ্ভিদবিজ্ঞানী, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতির স্রষ্টা।

ফ্রেড্রিক লিস্ট (১৭৮৯-১৮৪৬)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, সংরক্ষণতন্ত্রের প্রবক্তা।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪)—ইংরেজ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ; বস্তুতান্ত্রিক ইন্দ্রিয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা।

গাব্রিয়েল মেবলে (১৭০৯-১৭৮৫)—ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ, ইউটোপীয় সমতাবিধায়ক সাম্যবাদের প্রবক্তা।

হেনরি ডানিং মেকলেঅড (১৮২১-১৯০২)—স্কচ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ।

মারচেল্লো ম্যালপিঘি (১৬২৮-১৬৯৪)—ইতালীয় জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসক, আণুবীক্ষণিক শারীরস্থানবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, ১৬৬১ সালে কৈশিক সংবহনের আবিষ্কার করেন।

টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

অটো থিওডোর মানটেউফেল (১৮০৫-১৮৮২)—প্রাশিয়ার রাজনীতিবিদ; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৮৪৮-৫০) ও প্রধানমন্ত্রী (১৮৫০-৫৮)।

জোসেফ ম্যাসি (মৃত্যু ১৭৮৪)—ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ।

গিওর্গ লুডভিগ মাউয়ের (১৭৯০-১৮৭২)—জার্মান ঐতিহাসিক; প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জার্মানির, বিশেষ করে মার্ক নামক মধ্যযুগীয় গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করেন।

জুলিয়াস রবার্ট মেয়ার (১৮১৪-১৮৭৮)—জার্মান প্রকৃতিবিদ; শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের সূত্রের অন্যতম প্রথম আবিষ্কারক।

দমিত্রি ইভানোভিচ মেণ্ডেলিয়েফ (১৮৩৪-১৯০৭)—রুশ রসায়নবিদ ১৮৬৯-এ পর্যায় সূত্র নির্ণয় করেন।

প্রিন্স ক্লিমেন্স মেটারনিংক (১৭৭৩-১৮৫৯)—অস্ট্রীয় রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিজ্ঞ; ১৮০৯-১৮২১ এর মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৮২১-১৮৪৮-এ অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

জুলিয়াস লোথার মেয়ার (১৮৩০-১৮৯৫)—জার্মান রসায়নবিদ, বিশেষ করে ভৌত রসায়নের সঙ্গে যুক্ত।

কার্ল লুডভিগ মিচেলেট (১৮০১-১৮৯৩)—ভাববাদী জার্মান দার্শনিক, হেগেলের অনুগামী।

ক্লদ এতেনে মিনি (১৮০৪-১৮৭৯)—ফরাসি সেনাবাহিনীর অফিসার, আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবক।

হোনোরে গাব্রিয়েল মিরাবাউ (১৭৪৯-১৭৯১)—অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতা।

মোলিয়ের (জাঁ ব্যাপতিস্ত পোকিউলিন-এর ছদ্মনাম) (১৬২২-১৬৭৩)—ফরাসি নাট্যকার।

চার্লস মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)—ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিজ্ঞ; ফরাসি বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক।

টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫)—ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও মানবতাবাদী লেখক; ইউটোপীয় সাম্যবাদের প্রথম প্রবক্তা।

মোরেল্লি (অষ্টাদশ শতক)—ইউটোপীয় সমতাবিধায়ক সাম্যবাদের প্রবক্তা।

লুইস হেনরি মর্গান (১৮১৮-১৮৮১)—আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং প্রাচীন সমাজের ঐতিহাসিক।

টমাস মান (১৫৭১-১৬৪১)—ইংরেজ বণিক ও অর্থনীতিবিদ, বাণিজ্যিক ভারসাম্যের বণিকতন্ত্রী তত্ত্বের রচয়িতা, ১৬১৫ সাল থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কমিটি-সদস্য।

টমাস মুনজের (আনুমানিক ১৪৯০-১৫২৫)—রিফর্মেশন ও ১৫২৫-এর কৃষক-যুদ্ধের সময়ে কৃষক ও নিপীড়িত জনগণের নেতা ও তাত্ত্বিক; ইউটোপীয় সমতাবিধায়ক সাম্যবাদের প্রচারক।

কার্ল ভিলহেলম নাগেলি (১৮১৭-১৮৯১)—জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ডারউইনের বিরোধী।

বোনপার্তে নেপোলিয়ন (১৭৬৯-১৮২১)—ফরাসি সম্রাট (১৮০৪-১৪. এবং ১৮১৫)।

আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)—ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, ধ্রুপদী বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা।

হেনরি অ্যালিনে নিকলসন (১৮৪৪-১৮৯৯)—ইংরেজ প্রাণিবিদ্যাবিদ ও জীবাশ্মবিজ্ঞানী।

ডাডলি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১)—ইংলণ্ডে ধ্রুপদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রথম দিকের প্রতিনিধি।

লোরেনৎস ওকেন (১৭৭৯ ১৮৫১)—জার্মান প্রকৃতিবিদ ও প্রকৃতি-দার্শনিক।

রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) -ব্রিটিশ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।

প্রথম পিটার (১৬৭২ ১৭২৫) রুশী জার (১৬৮২ ১৭২১) এবং রুশ সম্রাট (১৭২১-২৫)।

উইলিয়াম পেট্টি (১৬২৩ ১৬৮৭)- ইংলণ্ডে ধ্রুপদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক।

ফিডিয়াস (আনুমানিক ৫০০-৪৩০ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক ভাস্কর।

প্লেটো (আনুমানিক ৪২৭ ৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ) গ্রীক দার্শনিক, বিষয়মুখী ভাববাদী।

প্লিনি (গাইআস প্লিনিআস সেকেণ্ডাস, ২৩-৭৯)—রোমক পণ্ডিত, ৩৭ খণ্ডে রচিত 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক।

জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪) ইংরেজ রসায়নবিদ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী ; বস্তুবাদী দার্শনিক ; ১৭৭৪-এ অক্সিজেন আবিষ্কার করেন।

পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫)—ফরাসি সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক, নৈরাজ্যবাদের জনক।

পিথাগোরাস (আনুমানিক ৫৭১-৪৯৭ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক গণিতজ্ঞ ও ভাববাদী দার্শনিক।

ফ্রাঁসোয়া কোয়েসনে (১৬৯৪-১৭৭৪)—ফরাসি অর্থনীতিবিদ, প্রকৃতিবাদী আর্থনীতিক মতবাদের স্রষ্টা।

গিওর্গ ক্রিশ্চিয়ান রাফ (১৭৪৪-১৭৮৮)—জার্মান শিক্ষাতাত্ত্বিক, ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানগ্রন্থের লেখক।

হেনরি ভিক্তর রেগনাউল্ড (১৮১০-১৮৭৮)—ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ।

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)—ইংলণ্ডে ধ্রুপদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রখ্যাত প্রতিনিধি।

ফ্রেডরিখ এবারহার্ড রোচাভ (১৭৩৪-১৮০৪)—জার্মান শিক্ষাতত্ত্ববিদ।

গুস্তাফ এডলফ রোচাভ (১৭৯২-১৮৪৭)—প্রাশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৮৩৪-৪২)।

যোহান কার্ল রোডবার্টাস-ইয়াগেৎস-ওভ (১৮০৫-১৮৭৫)—জার্মান স্থূল অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিক; প্রতিক্রিয়াশীল প্রাশীয় 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের' প্রবক্তা।

মিখাইল ফিওদরোভিচ রোমানফ (১৫৯৬-১৬৪৫)—রাশিয়ার জার (১৬১৩-৪৫)।

ভিলহেলম গিওর্গ ফ্রিডারিখ রুশ্চার (১৮১৭-১৮৯৪)—জার্মান স্থূল অর্থনীতিবিদ।

হেনরি এনফিল্ড রসকো (১৮৩৩-১৯১৫)—ইংরেজ রসায়নবিদ।

জাঁ জ্যাকুয়েস রুশো (১৭১২-১৭৭৮)—ফরাসি দার্শনিক ও লেখক; ফরাসি নবজাগরণের দূত।

হেনরি সাঁ-সিমোঁ (১৭৬০-১৮২৫)—ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।

উইলিয়ম লুকাস সারগান্ট (১৮০৯-১৮৮৯)—ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ, রবার্ট ওয়েনের জীবনী লেখক।

জাঁ ব্যাপতিস্তে সে (১৭৬৭-১৮৩২)—ফরাসি স্থূল অর্থনীতিবিদ।

ফ্রেডরিখ ভিলহেলম শেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪)—জার্মান দার্শনিক, বিষয়মুখী ভাববাদী।

ফ্রেডারিখ ক্রিসটোফ শ্চিলোসার (১৭৭৬-১৮৬১)—জার্মান ঐতিহাসিক।

আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) জার্মান ভাববাদী দার্শনিক; স্বেচ্ছাক্রিয়াবাদ, অযৌক্তিকতাবাদ ও নৈরাশ্যবাদের তত্ত্বকার।

আর্নস্ট শোফেনিংগার (১৮৫০-১৯২৪)—১৮৮১ থেকে বিসমার্কের

ব্যক্তিগত চিকিৎসক ; ১৮৮৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অ্যাঞ্জেলো সেকচি (১৮১৮-১৮৭৮)—ইতালীয় জ্যোতির্বিদ।

আন্তনিও সেরা (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক)—ইতালীয় অর্থনীতির্বিদ, বণিকতন্ত্রের একজন আদি প্রবক্তা।

উইলিয়ম শেকসপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬)—ইংরেজ নাট্যকার ও কবি।

জঁ চার্লস লিওনার্ড সিসমণ্ডি (১৭৭৩-১৮৪২)—সুইস আর্থনীতিক রোমান্টিকতার প্রধান প্রতিনিধি।

অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)—ইংলণ্ডে ধ্রুপদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির প্রখ্যাত প্রবক্তা।

জর্জ স্মিথ (১৮৪০-১৮৭৬)—আসিরিয়া অঞ্চলে খননকার্যের জন্যে পরিচিত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ।

জেমস স্টুয়ার্ট (১৭১২-১৭৮০)—ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, বণিকতন্ত্রের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি।

বারুচ (বেনেডিক্ট) স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭)—হল্যাণ্ডবাসী বস্তুবাদী দার্শনিক।

ম্যাক্স স্টারনার (ক্যাসপার শ্মিড এর ছদ্মনাম, ১৮০৬ ১৮৫৬)—জার্মান দার্শনিক। তরুণ হেগেলপন্থী।

গুস্তাফ স্ট্রুফে (১৮০৫-১৮৭০)—জার্মান পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রী, সাংবাদিক।

স্টুয়ার্টস—স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের শাসক রাজবংশ (শাসনকাল যথাক্রমে ১৩৭১-১৭১৪ ও ১৬০৩ ৪৯ এবং ১৬৬০ ১৭১৪)।

টেরেন্স (আনুমানিক ১৮৫-১৫৯ খ্রিঃ পূঃ)—রোমক নাট্যকার।

উইলিয়াম টমসন (১৮২৪-১৯০৭)—ইংরেজ চিকিৎসক, 'তাপে বিশ্বের মৃত্যু ঘটবে'—১৮৫২ সালে এই ভাববাদী প্রকল্প উপস্থিত করেন।

লুই ইতিয়েন থাউভেনিন (১৭৯১ ১৮৮২) ফরাসি সেনাবাহিনীর অফিসার ও উদ্ভাবক।

মরিৎস ট্রাউবে (১৮২৬ ১৮৯৪)—জার্মান রসায়নবিদ ও শারীরবিদ্যাবিদ. বিপাকক্রিয়া ও বৃদ্ধিতে সক্ষম কৃত্রিম কোষের স্রষ্টা।

গটফ্রিড রাইনহোল্ড ট্রেভিরানাস (১৭৭৬-১৮৩৭)—জার্মান প্রকৃতিবিদ। জৈবপ্রকৃতির বিবর্তনের ধারণা উপস্থিত করেন; ৬-খণ্ডে রচিত 'জীববিদ্যা অথবা জীবন্ত প্রকৃতির দর্শন' গ্রন্থের লেখক।

অ্যানি রবার্ট জ্যাকুয়েস তুরগত (১৭২৭-১৭৮১)—ফরাসি রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদ।

জ্যাকোব ভাণ্ডেরলিণ্ট (মৃত্যু ১৭৪০)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদদের পূর্বসূরী; পরিমাণগত অর্থ-তত্ত্বের আদি প্রবক্তা।

ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯০১)—গ্রেট ব্রিটেনের রাণী (১৮৩৭-১৯০১)।

রুডলফ ভিরচাও (১৮২১-১৯০২)—জার্মান প্রকৃতিবিদ, কোষিক রোগবিদ্যার জনক, ডারউইনের বিরোধী; প্রগতিবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

কার্ল ফগ্‌ট (১৮১৭-১৮৯৫)—জার্মান প্রকৃতিবাদী, স্থূল বস্তুবাদের প্রবক্তা; পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রী।

হারমান ভাগেনার (১৮১৫-১৮৮৯)—জার্মান সাংবাদিক ও রাজনীতিক, প্রাশীয় রক্ষণশীল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা; বিসমার্ক-সরকারে প্রিভি কাউন্সিলার (১৮৬৩-৭৩)।

রিচার্ড ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩)—জার্মান সঙ্গীত রচয়িতা।

রবার্ট ওয়ালপোল (১৬৭৬-১৭৪৫)—ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ; হুইগদের নেতা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী (১৭২১-৪২)।

ভিলহেলম ভিয়েটলির, (১৮০৪-১৮৭১)—জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাপর্বে শ্রমিক নেতা, ইউটোপীয় সমতাবিধায়ক সাম্যবাদের তত্ত্বকার।

আর্থার ওয়েলসলি, ডিউক অফ ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫২)—ইংরেজ সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ; প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ১৮০৮ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার।

ক্রিশ্চিয়ান ভোলফ (১৬৭৯-১৬৫৪)—জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, অধিবিদ্যাবাদী।

জেনোফোন (৪৩০-৩৫৪ খ্রিঃ পূঃ)—গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক।